আর্য্য-গৌরব।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা)

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

(কিশোরগঞ্জ সংস্কৃত কলেজ ও বেদ বিদ্যালয় হইতে প্রচারিত)

"সুমতি", "সতী-শতকম্", "সুনীতি শতকম্", "পঞ্চরত্নম্"
"বন্ধু শতকম্", "দিগ্বিজয় রত্নম্" প্রভৃতি প্রণেতা
শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ।

সূচী পত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দোপাধ্যায়।
মেট্কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়াকস্।
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ক মূল্য ১।০ টাকা (প্রতি খণ্ড ৵৬ পাই মাত্র।

আর্য্য-গৌরব।

প্রার্থনা।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

ভগবন্! তোমাকে স্মরণ করিয়া এই সুদুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, তুমি আমাদের মঙ্গলবিধান কর। তুমি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র, তুমি কর্ত্তা, আমরা করণ, তুমি দণ্ডী, আমরা দণ্ড, তুমি জীব, আমরা জড়দেহ, তুমি প্রেরক, আমরা প্রেরণ-দণ্ড, তুমি চালক, আমরা চালিত পদার্থ; তোমা ছাড়া আমরা কিছুই নই, আমাদের শক্তি, সামর্থ্য, অর্থ, বল, প্রাণ, মান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যশঃ, অপযশঃ, সকলই তুমি, তোমা ছাড়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই। তুমি আছ তাই আমরা বাঁচিয়া আছি, তুমি করাও তাই আমরা করি, তুমি দাও তাই আমরা খাই, তুমিই জ্ঞান, তুমিই বেদ, তুমিই তন্ত্র, তুমিই মন্ত্র, তুমিই শক্তি, তুমিই ভক্তি, তুমিই যুক্তি, তুমিই মুক্তি, তুমিই অরূপ, তুমিই বহুরূপ, আজ তুমিই আমাদের মনে এই এক অপূর্ব্ব ভাব ঢালিয়া দিয়াছ। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা" তুমিই আজ বুদ্ধিরূপে আমাদের মনে বিরাজিত হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে "বেদ-বিদ্যালয়" স্থাপন করিতে নিযুক্ত করিয়াছ, আবার তুমিই পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র জড়পদার্থ-সদৃশ অজ্ঞান ব্যক্তিকে "আর্য্য-গৌরব" প্রচারে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। তোমার মহিমা অনন্ত! তোমার কার্য্য অনন্ত!! কে তাহা বুঝিতে পারে? তোমার লীলা অপার, তোমার দয়া অসীম! তোমার দয়াসাগরে নিমগ্ন

থাকিয়াও আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। মানব কি করিতে পারে? পৃথিবীর দেড় শত কোটি লোক মিলিয়াও (তোমার সৃষ্টি ব্যতীত) একটি ক্ষুদ্র সজীব তৃণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতেছে না। তাই বলি দেব, আমরা কিছুই নহি। তুমিই আমাদের অভয়দাতা, আমাদের ভয় কি? তোমারই যশঃ, তোমারই লজ্জা, তোমারই মান, তোমারই অপমান। আমরা তোমাতেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি। তোমাতেই অচলা অটলা ভক্তি রাখিয়া তোমারই যেন কর্ত্তব্যকার্য্যে অগ্রসর হই; এই আশীর্ব্বাদ কর দেব! এক মুহূর্ত্ত যেন তোমায় বিস্মৃত না হই। তোমার নিষ্কলঙ্ক স্নেহে যেন কালিমা সঞ্চারিত না হয়। তোমার বলেই বলীয়ান্ হইয়া তোমার ঈপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। হে বিশ্বস্রষ্ট! তুমিই ইহার স্রষ্টা, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। আমরা অজ্ঞান, বর্ণক্রমবিহীন বাক্যার্থ তুমিই বুঝিয়া লও। তোমাকে আমরা কেমনে বুঝিব? তুমি কে, কেমনে জানিব? অন্ধ যেরূপ মানব দৃষ্ট পদার্থ বুঝিতে অক্ষম, তদ্রূপ আমরাও তৃতীয়-নয়নবিহীন অজ্ঞান ব্যক্তি, ত্রিনেত্রের দ্রষ্টব্য—তোমার অনন্ত মূর্ত্তি অবলোকনে অক্ষম হইয়া তোমার লীলা-খেলা কিছুই বুঝিতে পারি না। তোমার দ্রষ্টব্য, তোমার কর্ত্তব্য তুমিই বুঝিতে পার, তোমার কর্ম্ম তুমিই কর, তোমার দৃশ্য তুমিই দেখ। তাই তোমারই "আর্য্য-গৌরব"কে তোমারই পবিত্র চরণে সমর্পণ করিয়া শত কোটি প্রণিপাতপূর্ব্বক ইহার মঙ্গল কামনা করিতেছি; তুমিই ইহার প্রাণদান করিয়া ইহাকে দীর্ঘজীবী ও কীর্ত্তিশালী করিতে শক্তি বিতরণ কর।

প্রণত সেবক

সম্পাদক।

"সুবচনশতকম্।"

(১)

নারী ন তৃপ্তা বহুভূষণেন
লতা ন তৃপ্তা বহুবেষ্টনেন।
বালকস্তৃপ্যতি ন কৌতুকেন
তৃপ্তো ন দুষ্টঃ পরনিন্দনেন॥

বিচিত্র বসনে, বিবিধ ভূষণে
নারী কভু তৃপ্ত নয়,
যত কর দান, তত অভিমান,
যত পায় তত লয়।
লতার কারণ, করিয়া যতন,
দিলে বহুবিধাশ্রয়,
ধীরে ধীরে ধীরে, চারিদিক্ ফিরে,
বেষ্টন করিয়া লয়।
বালকনিচয়, কভু তৃপ্ত নয়,
ক্রীড়া করে সর্ব্বক্ষণে,
তৃপ্ত দুষ্টজন, নহে কদাচন,
নিন্দা করে সাধুজনে।

(২)

দারিদ্র্যং বিষমো রোগঃ সর্ব্বদুঃখসমন্বিতঃ।
দারিদ্র্যাচ্ছববল্লোকে সজীবোঽপি ভবেন্নরঃ॥

দারিদ্র্য বিষম রোগ সর্ব্বদুঃখময়।
অন্য রোগে মৃত্যুপরে,
শবদেহ ঘৃণা করে,
জীবিত দরিদ্রে ত্যজে মানবনিচয়।

(৩)

হিংসা সুকঠিনা পীড়া মৃতসঞ্জীবনী দয়া।
বিদ্যা মুক্তিপ্রদা শক্তিঃ কবিতা শান্তিরুত্তমা।
হিংসা মহাব্যাধি দয়া মৃতসঞ্জীবনী,
শান্তিদা কবিতা বিদ্যা মুক্তিপ্রদায়িনী।

(৪)

শল্যঞ্চ খল-পারুষ্যং শল্যং পরান্নভোজনম্।
শল্যঞ্চ ঋণদায়িত্বং মিত্রঞ্চ ধনগর্ব্বিতম্॥
খলের পারুষ্য বাজে শেলের সমান,
পরান্নভোজন-শেলে যায় যায় প্রাণ।
ঋণদায় মহাশেলে ক্ষীণ হয় নর,
ধনাঢ্য গর্ব্বিত মিত্র শেল সুদুষ্কর।

(৫)

পাপাদেব বিভেত্যার্য্য আর্য্যনারী পতিব্রতা।
আর্য্যশাস্ত্রং জগৎপূজ্যমতুল্যমার্য্যগৌরবম্॥
দারুণ পাপের ভয় আর্য্যজন-মনে,
আর্য্যনারী পতিব্রতা বিখ্যাত ভুবনে;
আর্য্যশাস্ত্র জগৎপূজ্য নানা জ্ঞানময়,
আর্য্যের গৌরব ভবে অতুল নিশ্চয়।

(৬)

শ্রমিণাং সুলভা সম্পৎ পথ্যাশিনামরোগিতা।
বিদুষাং সুলভো মানো ধর্ম্মশ্চ সত্যবাদিনাম্॥

পরিশ্রমী মানবের বিত্তলাভ হয়,
পথ্যাশী জনের নাহি থাকে রোগভয়।
বিদ্বানের সহজেই বাড়ে সদা মান,
সত্যবাদী মানবের হয় ধর্ম্মজ্ঞান।

ক্রমশঃ।

হেঁয়ালী।

(১)

দুই বর্ণে নাম মম অতি মনোহর,
রূপে গুণে মুগ্ধ করি বিশ্ব চরাচর;
আদি বর্ণ নিয়ে কর্ম্ম করে কর্ম্মকার,
শ্বেতকায়, শেষ বর্ণে করে সুবিচার।

(২)

তিন বর্ণে নাম মম সদাই নূতন,
চিনি মণ্ডা ক্ষীর সরে আমার ভোজন;
আদি অন্ত মিলে করি শস্যনিষ্পীড়ন,
জননী, প্রথম ছেড়ে জান সর্ব্বজন;
বড়ই আদর করে কুলনারীগণ,
কি নাম আমার তাহা বল বিচক্ষণ।

চতুরানন্দ।

আমি স্বর্গে গিয়াছি, আবার তোমরা কেন ডাক্‌চ? এখন কি আর এত বড় "পঞ্চানন্দ" ডাক ডাক্‌তে হয়? আমি তোমাদের জন্য আস্‌লেই সমূলে আস্‌তে পারি কই? তাই একটী আনন্দ এখানে রাখিয়া গেলাম। তোমরাও ছোট হও ৪৯টী বর্ণমালার অর্দ্ধেক কর, তবেই সমাজে চলিতে সহজ হইবে, আমাকে ডাক্‌তে হবে না। এ বৃদ্ধের কথা রাখিও, তোমাদের "কবিরাজ" যে সূত্র লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়াছ কি? যেমন "বাঙ্গালা" রবিসূত্রের প্রবাসখণ্ডমতে "ঙ" স্থানে ং অনুস্বার এবং "গ" লোপ পাইয়া "বাংল" হয়, তদ্রূপ "বঙ্গদেশ" স্থলে "বং-দেশ" বাঙ্গালী স্থলে "বাং-আলী" (অর্থাৎ বাক্যই যাহার আলি রক্ষক) বঙ্গভাষাস্থলে "বং-ভাষা" লিখ্‌বে তো তাহলে আমায় পাবে, নতুবা এই শেষ আসা।

আর একটী কথা রেখ, যাহা লোকে বলে তাহাই লিখিত ভাষা কর্‌বে তো? তাহলেই এই সূত্রটী বেশ মনে রাখ্‌বে "অ"কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংলিঙ্গে "আ" হইবে, যথা—রূপ—রূপা, শিব—শিবা, হর—হরা, কুল—কুলা অর্থাৎ শিবদাসী (ঝী) শিবা—দাস (চাকর) বুঝ্‌লেত? কাল-বিবি কালা-সেখ ইত্যাদি।

———

পতিব্রতা। *

পতিব্রতা।—ইনি কৌশিকপত্নী মহাসাধ্বী ; ইঁহার সতীত্ববলে মৃত পতিও জীবিত হইয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠান নগরে কৌশিক-বংশজাত এক পাপাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি তাঁহারই পত্নী, ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপবশতঃ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন, কিন্তু ইনি সেই কুষ্ঠরোগী স্বামীর চরণে তৈল মর্দ্দন, অঙ্গ সংবাহন, স্নান, গ্রাসাচ্ছাদন, শ্লেষ্মা মলমূত্র ও রক্ত প্রবাহ পরিষ্কালন, নিজনে হিতকথা ও প্রিয় সম্ভাষণাদি দ্বারা দেবনির্ব্বিশেষে তাঁহার পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পতি নিতান্ত রুগ্ন, কোপন স্বভাব ও নিষ্ঠুর বলিয়া বিনীতা পত্নী দ্বারা নিরন্তর পূজিত হইয়াও তাঁহাকে সর্ব্বদা ভর্ৎসনা করিতেন। তথাপি সেই প্রণতা ভার্য্যা সেই বীভৎস পতিকে দেবতার ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। পতির চলিবার শক্তি ছিল না, তথাপি পাপ প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। একদা পত্নীকে আদেশ করিলেন, "আমি যে এক পরম রূপবতী বেশ্যাকে দেখিয়াছি, সে যে রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বাস করে, তুমি আমায় সেই মনোহারিণী বেশ্যার আলয়ে লইয়া চল। হে ধর্ম্মজ্ঞে! সেইই আমার হৃদয় মাঝারে বর্ত্তমান রহিয়াছে ; অতএব আমাকে তাহার নিকট সত্বরে লইয়া চল ; আমি প্রাতঃকালে সেই সুরূপা বালাকে দেখিয়াছি, এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে, তথাপি সে আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে না। যদি সেই ভুবনমোহিনী পীনশ্রোণী পয়োধরা তন্বঙ্গী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকা আমাকে আলিঙ্গন না করে, তবে দেখিবে যে নিশ্চয়ই আমার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। দেখ, একেত কন্দর্প মনুষ্যের প্রতিকূল, তাহাতে অনেক লোক তাহার প্রার্থী ;

* সতী শতক হইতে উদ্ধৃত।

আবার আমার দারিদ্র্য ও চলিবার শক্তি নাই, সুতরাং আমার পক্ষে বিষম সঙ্কট হইতেছে।” পতিব্রতা কামাতুর স্বামীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকার্য্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। এবং ভিক্ষা করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। পরে স্বামীকে স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করাইয়া মৃদুমন্দগতিতে যাইতে লাগিলেন। একে রাত্রিকাল তাহাতে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সুতরাং সেই স্বামীর প্রিয়কারিণী সৎকুল-সম্ভূতা মহাভাগা দ্বিজাঙ্গনা চঞ্চল বিদ্যুৎ আলোকে ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প দর্শন করিয়া রাজপথের দিকে যাইতে লাগিলেন। তখন মাণ্ডব্য মুনি চোর না হইয়াও চোরসন্দেহে শূল প্রোথিত হইয়া পথিমধ্যে অন্ধকারে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন। হঠাৎ সেই পত্নী-স্কন্ধ-সমারূঢ় কৌশিক ব্রাহ্মণের পদ সঞ্চালিত হইয়া মুনিবর মাণ্ডব্যের শরীর স্পর্শ করিল; পদাঘাতে ঋষিবর মাণ্ডব্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “যে ব্যক্তি পদচালনা করিয়া আমাকে অধিকতর ব্যথিত করিল, সূর্য্যোদয় হইলেই সেই ক্রূর পাপাত্মা নরাধম অসহ্য যন্ত্রণা ভোগে প্রাণত্যাগ করিবে।”

অনন্তর পতিপরায়ণা পতিব্রতা মুনিবরের এই নিদারুণ শাপ শ্রবণ করত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন “সূর্য্য আর উদিত হইবে না।” তদনন্তর সেই পতিশোকাকুলা ব্রাহ্মণপত্নীর আদেশে সূর্য্যদেবের অনুদয়ে রাত্রিই রহিল। এইরূপে বহু দিন পরিমাণে রাত্রি অতীত হইলে দেব-তারা ভয় পাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, সূর্য্যোদয় ভিন্ন জগতের রক্ষার আর উপায় নাই, এক্ষণে কি প্রকারে সৃষ্টি রক্ষা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন “তেজ দ্বারা তেজঃ ও তপ দ্বারা তপের বিনাশ হয়। পতি-ব্রতার সতীত্বমাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না। সূর্য্যোদয়ের অভাবে তোমাদিগের ও মর্ত্ত্যগণের অত্যন্ত হানি হইতেছে, অতএব

যদি তোমরা সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিপত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর।" অনন্তর অনসূয়া দেবগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া কহিলেন, "তোমাদের অভিলষিত বিষয় বল।" দেবতারা কহিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় দিবা রাত্রি হইতে থাকুক।" অনসূয়া কহিলেন, "পতিব্রতার কথা মিথ্যা হইবার নহে। যাহা হউক, যাহাতে পুনরায় অহোরাত্রের সংস্থাপন হয় এবং সেই সাধ্বীরও স্বামি-বিনাশ সংঘটন না হয়, সেইরূপে পুনরায় দিবসের সৃষ্টি করিব।" অনসূয়া এই বলিয়া সেই সতীর আলয়ে গমন করিলেন। তৎপর পতিব্রতাকে নানাবিধ বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, "কল্যাণি! তুমি তো স্বামীর মুখদর্শনে আহ্লাদিত হইতেছ এবং সকল দেবতা হইতে স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছ! দেখ, আমিও কেবল পতি-শুশ্রূষার দ্বারাই মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধিহেতু বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক সকল তিরোহিত হইয়াছে। হে সাধ্বি! পুরুষগণ সর্ব্বদা পঞ্চ প্রকার ঋণ শোধ করিবে:—স্বীয় বর্ণের ধর্ম্মানুসারে ধন সঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত অর্থ উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিবে। আর সর্ব্বদা সত্য, সরলতা, তপঃ, দান ও দয়াপর হইবে এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে অনুরাগসহ দ্বেষবিবর্জ্জিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সকলের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে। পতিব্রতে! পুরুষগণ এইরূপ মহাক্লেশে স্বজাতিবিহিত লোক সকল প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোক সকলেও গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীগণ একমাত্র পতিসেবা দ্বারাই পুরুষের বহুকষ্টার্জ্জিত ঐ পুণ্য সকলের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে যজ্ঞ বা উপবাসের কোনও পৃথক্ বিধান নাই, কেবলমাত্র স্বামিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম, কারণ স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম গতি। দেখ পুরুষেরা দেবতা, অতিথি বা পিতৃগণের প্রতি সৎক্রিয়া অনুসারে যে

পূজাদি প্রদান করেন, অনন্যমানসা নারী কেবল পতিশুশ্রূষা দ্বারাই তাহার অর্দ্ধাংশ ভোগ করিয়া থাকেন।"

পতিব্রতা দেবী অনসূয়ার বাক্য শ্রবণে সমাদরসহকারে তাঁহার প্রতি পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে স্বভাব-শুভদায়িনি! অদ্য আমি ধন্যা ও অনুগৃহীতা হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে দেবগণও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আপনি আজ আমার স্বামিভক্তির সংবর্দ্ধন করিলেন। আমি জানি যে নারীদিগের পতির তুল্য আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি প্রসন্ন থাকিলেই ইহলোকে ও পরলোকে মহোপকার সাধিত হয়। হে যশস্বিনি দেবি! একমাত্র পতির প্রসাদেই নারীগণ ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখ ভোগ করে, কারণ ভর্ত্তাই রমণীদিগের একমাত্র দেবতা। হে শুভে! হে মাননীয়ে! আপনি যখন আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন, তখন আমাকে অথবা আমার স্বামীকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন্; যথাসাধ্য আপনার বাক্য প্রতিপালিত হইবে।" অনসূয়া কহিলেন, "সাধ্বি! তোমার বাক্যানুসারে দিবা রজনী অপাস্ত হওয়ায় সৎক্রিয়া সকল বিনষ্ট হইয়াছে—জগৎ ধ্বংসের উপক্রম হইয়াছে। সেই জন্যই দেবগণ আমার নিকট দিনযামিনী পূর্ব্বের ন্যায় সংস্থাপন প্রার্থনা করায় আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। হে তপস্বিনি! দিনের অভাবে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইতেছে, এই মহৎ আপদ্ হইতে যদি জগৎকে রক্ষা করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তবে হে সাধ্বি, তুমি সর্ব্বজীবের প্রতি প্রসন্না হও, সূর্য্যদেব পূর্ব্বের ন্যায় উদিত হউন।" পতিব্রতা কহিলেন, "মাণ্ডব্য মুনি অত্যন্ত ক্রোধভরে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন, 'সূর্য্য উদিত হইলেই তোমার প্রাণত্যাগ হইবে'।" অনসূয়া কহিলেন "যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিব, এবং তিনি নব কলেবর প্রাপ্ত

হইবেন। হে বরবর্ণিনি! পতিব্রতা রমণীর মহিমা সর্ব্বতোভাবে আমার আরাধনীয়া, সুতরাং আমি তোমার সম্মাননা করি।” পতি-ব্রতা ‘তথাস্তু’ বলিলে সূর্য্যদেব উদিত হইয়া জগৎকে নব জীবন প্রদান ও কৌশিকের প্রাণ হরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ যেমনি প্রাণত্যাগ করিয়া ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন, অমনি তৎপত্নী পতিব্রতা মহাশোকে চীৎকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনসূয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, “ভদ্রে, পতিগতপ্রাণে! তুমি বিষণ্ণা বা ব্যাকুলা হইও না, পতিব্রতা বিধবা হইতে পারে না। আমি পতিসেবার দ্বারা যে তপোবল লাভ করিয়াছি, অচিরেই তাহা তোমার নয়নগোচর হইবে। রূপ, শীল, বুদ্ধি, বাক্য ও মধুরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দ্বারা কখনও কোনও পুরুষকে যদি স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে আজ এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত যুবা হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করত পত্নীর সহিত শত বর্ষ জীবিত থাকুন্। আমি যদি অন্য দেবতাকে স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই সত্য দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ নিরাময় হইয়া পুনর্ব্বার জীবিত হউন। কায়-মনোবাক্যে যদি স্বামীরই আরাধনায় আমার উত্তম থাকে, তবে এই দ্বিজবর জীবিত হউন।” তদনন্তর দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া যুব-কলেবরে অজর অমরের ন্যায় দেহপ্রভায় স্বীয় নিকেতন উজ্জ্বল করত সমুত্থিত হইলেন। তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। অনসূয়া বিদায় লইলেন, পতিব্রতাও নীরোগ তরুণ স্বামী লাভ করিয়া মনের সুখে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পতিস্তোত্রম্ ।

নমঃ কান্তায় ভর্ত্রে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে ।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ ॥
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ ॥
পঞ্চ প্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দদায়িনে ॥
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপো নমোঽস্তু তে ॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সৃষ্ট্যাদ্যৌ পদ্মযা কৃতম্ ।
সরস্বত্যা চ ধরয়া গঙ্গয়া চ পুরা ব্রজ ॥
সাবিত্র্যা চ কৃতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণে চাপি নিত্যসঃ ।
পার্ব্বত্যা চ কৃতং ভক্ত্যা কৈলাসে শঙ্করায় চ ॥
মুনীনাঞ্চ সুরাণাঞ্চ পত্নীভিশ্চ কৃতং পুরা ।
পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং স্তোত্রমেতৎ শুভাবহম্ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যা শৃণোতি পতিব্রতা ।
নরো বাপি চ নারী বা লভতে সর্ব্ববাঞ্ছিতম্ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনো লভতে ধনম্ ।
রোগী চ মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
পতিব্রতা চ স্তুত্বা চ তীর্থস্নানং ফলং লভেৎ ।
ইদং স্তুত্বা সতী ভক্ত্যা ভুঙ্‌ক্তে সা তদনুজ্ঞয়া ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৮৩ অধ্যায়ঃ ।

নমঃ নমঃ পতিদেব তোমার চরণে,
তুমি শিব-চন্দ্ররূপী বিদিত ভুবনে।
নমঃ কান্ত নমঃ শান্ত সর্ব্বদেবাশ্রয়।
তুমি ব্রহ্ম তুমি ধর্ম্ম সতীপ্রাণময়॥
হৃদয়ের দেব তুমি পঞ্চপ্রাণেশ্বর।
চক্ষুর তারকা তুমি পূজ্য জ্ঞান-ধর॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
নির্গুণ সগুণ তুমি ব্রহ্মরূপান্তর।
ক্ষমা কর ভগবন্! দাসীদোষচয়,
পত্নী-বন্ধো! দয়াসিন্ধো! দেও পদাশ্রয়।
পদ্মা এই স্তোত্রে পূজে বিষ্ণুর চরণ,
গঙ্গা, সরস্বতী, ধরা জপে অনুক্ষণ।
সাবিত্রী পার্ব্বতী ইহা করিয়া পঠন,
ব্রহ্মা মহেশ্বরে নিত্য করেন অর্চ্চন।
সুর-মুনি-পত্নী যত সতীস্ত্রী সকলে,
স্বীয় স্বীয় স্বামী পূজে এই মন্ত্রবলে।
যেই জন শুনে এই স্তোত্র পুণ্যময়,
নর নারী সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
অপুত্রের পুত্রলাভ নির্ধনের ধন,
রোগী রোগমুক্ত হয় বদ্ধের বন্ধন।
স্বামী পূজে তদাজ্ঞায় করিয়া ভোজন,
তীর্থস্নান ফল পায় পতিব্রতাগণ। *

---

* সতীশতক হইতে উদ্ধৃত।

বঙ্গবধূর কর্ত্তব্য।

আমি স্বয়ং বঙ্গবধূ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি এক্ষণে কালিকা দেবীর ন্যায় সুশিক্ষিতা দেবীমূর্ত্তি আমাদিগকে রক্ষা না করিলে আমাদের নারীত্ব লোপ হইবে; আমরা আর কখন আয়ুষ্মান্ সন্তান উৎপাদন করিতে পারিব না, আমরা ইহকালে পরকালে নরকে পঁচিয়া মরিব।

যে প্রকার এক দেশের আব হাওয়া অন্য দেশের বৃক্ষাদির শরীরেও সহ্য হয় না, সেই প্রকার এক দেশের আচার ব্যবহারও অন্য দেশের সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লোক শীতকালেও অবগাহন করিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া থাকেন, বিলাতের লোক তাহা না দেখিলে কখনই বিশ্বাস করিবে না। একের যাহা ব্যবহার্য্য অন্যের তাহা স্পর্শনীয়ও না হইতে পারে। মল মানবের খাদ্য নয় ইহা স্বীকার্য্য হইলেও দেশবিশেষে তাহা আহার করিয়া থাকে। আমরা নারী, আমাদের ব্যবহার, কর্ত্তব্য, ঠিক পুরুষের ন্যায় হইতে পারে না; আমরা পেটের ভিতর সন্তান ধারণ করিতে পারি, কিন্তু হউক শত বিদ্বান্, হউক কৌশলী, কোনও পুরুষের তাহা সাধ্য কি?

আমাদিগকেও পুরুষের ন্যায় হ্যাটকোট বুটধারী হইয়া বাবু সাজিলে চলিবে না; ইহা মাত্র বহুরূপীর প্রহসন মধ্যেই গণ্য হইবে। আমরা বঙ্গ নারী—বিশেষতঃ হিন্দুনারী, আমরা গৃহিণী—আমরাই প্রকৃতপক্ষে গৃহের কর্ত্তা—রাজা—সম্রাট্; হায়! আমরা এ সুখের রাজত্ব ছাড়িয়া চাকর বা পাচকের হাতে বানরের গলায় মুক্তার মালা পরাইয়া দিয়া বাহিরে চাকুরী খুঁজিতেছি! ধিক্ আমাদের জীবনে! ধিক্ আমাদের শিক্ষায়! ধিক্ আমাদের নব্যাচারে! বঙ্গনারীদের যত সুখ শান্তি তাহা

গৃহেই নিবদ্ধ আছে, এ সুখ অন্যে বুঝিবে না; যখন ৺শ্রীশ্রী মায়ের পূজায় শত শত লোককে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে থাকি, সে সুখ সে শান্তির উপমা কোথায়? যাঁহারা গৃহকর্ম্মে দক্ষা—গৃহস্থালী কার্য্যে নিরতা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। অলসপরায়ণা বাহিরমুখী বিলাসিনীদের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। আমার অশীতিপরা বৃদ্ধা শাশুড়ীদেবী মনের আনন্দে নদীতে স্নান করিয়া কলসী ভরিয়া জল আনেন, স্বহস্তে অমৃতোপম রন্ধন করেন, সূচিতে সূতা গাঁথিয়া কাঁথা সেলাই করেন, কখন কখন নিজের আতপ চা'ল বা চিড়ে নিজেই ধান ভাঙ্গিয়া লন, তাহাতেই তিনি অপূর্ব্ব সুখ পান, যাঁহারা কর্ম্মজীবিনী তাঁহারা কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না। অথচ তাঁহার চিকিৎসার জন্য ৫ ্ টাকার ঔষধও প্রয়োজন হয় নাই। আর আজ আমরা পনেরতেই পড়িয়া যাই, ডাক্তার না আনিলে প্রসব করাণ ত দায়ই হয়, অনেক সময় ডাক্তার আসিয়া বাহ্যে করাইয়া থাকেন। সেকাল আর একাল কত প্রভেদ। কেন এসব হয় তাহার কারণ আমি স্ত্রীলোক, আমি সব জানি, তোমাদের অলসতা, অনাচার, সুগন্ধি সাবান ব্যবহার, অন্যায় পতি আব্দার, পতি-সংসর্গের নিয়মহীনতা, অখাদ্য ভোজন, দিবা নিদ্রা, পরনিন্দা, পাড়া ভ্রমণ, প্রতিবাসীর কুৎসা রটান, গুরুজনে অশ্রদ্ধা, সর্ব্বদা বক্রচক্ষুতা, সন্তানে অযত্ন, নিজের পোষাক-সর্ব্বস্বতা এবং কুৎসিত ব্যবহার আমি সব জানি, এসবই কুচিন্তার মূল এবং দুর্ব্বলতা ও অকাল মৃত্যুর কারণ। আমি ক্রমে তাহা প্রকাশ করিব, ভয় নাই ভগিনীগণ! তোমাদের নির্দ্দিষ্ট নাম দিব না কিন্তু প্রকৃত কার্য্যগুলি যথার্থ মতে লিখিব। দেখ যাহাদিগকে অত্যন্ত অসভ্য মনে কর, তাহারা কত সুখী, কত স্বাস্থ্যবতী, কত পবিত্রহৃদয়বতী। আমি একদা নীলাচলে গিয়াছিলাম, কয়েকটী দিগম্বরী পাহাড়ে মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়, তাহারা বঙ্গদেশের ঘোটকী

হইতেও বলবতী, প্রত্যহ পৃষ্ঠে সন্তান বাঁধিয়া মাথায় বোঝা লইয়া চারি মাইল উৰ্দ্ধ হইতে নীচে নামে এবং উঠে, আর আমরা দ্বিতালায় উঠিতেই হিষ্টিরিয়ার আশ্রয় করি, তাহারা নির্ব্বসন হইয়া মলত্যাগ করে এবং স্নান করে, মাসে অশুচি হইলে যেস্থানে বসে তথায় গোময় দেয় এবং গোমূত্র পান করে। কোন পুরুষ দর্শনও করে না; নিজের কৌপীন নিজে প্রস্তুত করে, তাহাদের সাত পুরুষেও লেখাপড়া জানে না। আমার নিকট কোন বিষয় চাহিলে আমি লিখিয়া দিয়া দূর হইতে আনাইয়া ছিলাম, তাহারা তাহা বিশ্বাস করেনা যে কথা আবার কিরূপে ধরা যায়? অর্থাৎ তাহারা বলিল আমি লিখিলাম, তাহা তাহারা বুঝে না তাহারা ফনোগ্রামের গান ধরার মত কথা ধরাকে আশ্চর্য্য মনে করে; এরূপ যে অতীব মূর্খ তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে ছোট ছোট তাত আছে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা সব করে। আর আমরা করি কেবল নিন্দা এবং ঝগড়া।

এক দিবস আমাদের বাড়ীতে (বাসা বাড়ীতে) কয়েকজন ধনাঢ্যা মেয়েরা নিমন্ত্রিতা হন, সর্ব্বদা আমিই পাক করিয়া থাকি। তাঁহারা আহারে বসিলে যখন ব্যঞ্জনগুলি নূতন ধরণের এবং সুস্বাদু বোধ করিলেন, তখন বলিলেন "ইহা কি পুরুষলোকে পাক করিয়াছেন? আপনার কর্ত্তাতো বেশ পাক করিতে পারেন"। আমি বলিলাম "বেশ! (তখন রাত্রি ১১ ঘটিকা হইবে, একজন বিচারক ১২ ঘটিকাও কাছারী করিতেন) কর্ত্তা কাছারীতে থাকিয়াই প্রশংসা নিলেন, তিনি আপনাদের খাওয়ার কথা বোধ হয় জানেনও না।" তাঁহারা আমাকে বলিলেন, "স্ত্রীলোকে এরূপ পাক করিতে পারে তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।" আমার একটী জা (কোনও অনারেরী মাজিষ্টেটের স্ত্রী) বলিলেন, আমি ত ১৭।১৮ বৎসর যাবৎ পাকস্পর্শও করি না, অন্যেরাও কেহ ৮।১০ বৎসর কেহ ৬।৭ বৎসর পাকস্পর্শ করেন

না বলিলেন এবং আমাকেও পাক করা অতি জঘন্য কার্য্য পরিত্যাগের সদুপদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই নানারূপ পীড়াক্রান্ত, ভগবানের কৃপায় আমি কোনও রূপ পীড়া ভোগ করি নাই।" হায়! হায়! নারীগণ এই কি তোমাদের পরিণাম, তোমরা পাকস্পর্শকেও লজ্জাকর মনে কর। এই কি তোমাদের শিক্ষা, এই কি তোমাদের পরিণাম! আর আমাদেরই দোষ কি? পুরুষেরাও সম্পূর্ণ বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়াছে। বহিভাষাবিৎ বড় বড় কবিগণও কৃত্তিবাস, কাশীদাসের ন্যায় খাটি বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে অক্ষম হইয়া অব্যক্তভাব বিলাতি ভাষা মিশ্রিত খট মট কবিতা লিখিয়া থাকেন; যাহা মূর্খ, পণ্ডিত সমস্ত নরনারী না বুঝে তাহা যথার্থ কবিতা নহে।

(ক্রমশঃ)

দেবী-ভাগবত।

(মূল গ্রন্থের পদ্যানুবাদ)

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

প্রথম অধ্যায়।

শৌনক বলেন শুন মহাভাগ সূত!
বলেছ পুরাণ কথা বড়ই অদ্ভুত।
সুধারাশি পানে আশা মিটেনা যেমন,
পুরাণ শ্রবণে তৃপ্তি পাইনা তেমন।

যত শুনি তত বাঞ্ছা বাড়ে প্রতিক্ষণ,
বলিয়া পবিত্র কথা জুড়াও জীবন।
সংক্ষেপে বলেছ পূর্ব্বে পুরাণের সার,
বিস্তার করিয়া মুনে কহ পুনর্ব্বার।
সর্ব্ব পুরাণের শ্রেষ্ঠ দেবীভাগবত,
শ্রবণে যাহার কথা পবিত্র জগত।
অমৃত হইতে শ্রেষ্ঠ পবিত্র পুরাণ,
যাহার শ্রবণে পাপী পায় পরিত্রাণ।
বেদ সম শুদ্ধ এই পঞ্চম পুরাণ,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মুক্তি করে দান।
সমাগত মুনিগণ শ্রবণের তরে,
পুরাণ সংহিতা কথা বল সবিস্তরে।
যে কোন উপায়ে কাল কাটে নরগণ,
বিবাদে ক্রীড়ায় মূর্খ করে উদ্‌যাপন।
পণ্ডিতের একমাত্র শাস্ত্র চিন্তা সার,
যাহার প্রসাদে তরে ভব-পারাবার।
করেছ যে সব শাস্ত্র তুমি অধ্যয়ন,
সে সব মুনীন্দ্রগণে করাও শ্রবণ।
মোদের সময় যেন বৃথা নাহি যায়,
শুনিব পবিত্র কথা তোমার কৃপায়।
সূত কন ধন্য আমি বড় ভাগ্যবান্,
মহাত্মগণের স্থানে পাইনু সম্মান।
পবিত্র পুরাণকথা করিতে শ্রবণ,
বিশ্বসন ক্ষেত্রে সবে সমাগত হন।

ধন্য আমি ধন্য মম ক্ষুদ্র তপোবন,
দেবী-ভাগবত গাঁথা করিব কীর্ত্তন।
যে পদ স্মরেণ ব্রহ্মা আদি দেবগণ,
যাঁহার চরণ ধ্যানে মগ্ন মুনিজন।
সে দেবীর মুক্তিপ্রদ পবিত্র চরণে,
কোটি কোটি প্রণিপাত করি কায়মনে।
যেই আদ্যাশক্তি বেদে বিদ্যা অভিহিতা,
সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে যিনি অবস্থিতা।
যে অন্তর্যামিনী শক্তি দুরাত্মা নাশিনী,
সর্ব্বজ্ঞা সকলেষ্টদা মুক্তি প্রদায়িনী,
সকলের মাতা যিনি পতিত পাবনী,
দারিদ্র্যনাশিনী যিনি জীবন পোষণী।
সেই ভগবতী পদে লইয়া স্মরণ,
দেবী-ভাগবত কথা করিব কীর্ত্তন।
বড়ই উত্তম ইহা পবিত্র পুরাণ,
আঠার হাজার শ্লোক আছে বিদ্যমান।
দ্বাদশ খণ্ডেতে ইহা হয়েছে পূরণ,
অদ্ভুত অদ্ভুত বহু আছে বিবরণ।
সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশাবলী মন্বন্তর,
মন্বাদি রাজার কীর্ত্তি যাহে বহুতর।
তাহাই পুরাণ নামে অভিহিত হয়,
পুরাণলক্ষণ এই জানিবে নিশ্চয়।
ভারত পঞ্চম বেদ মধুর যেমন,
পঞ্চম পুরাণ ইহা পবিত্র তেমন।

ব্যাসের রচিত এই অমূল্য পুরাণ,
পুরাণের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবান্।
শৌনক বলেন সূত! করি নিবেদন,
পুরাণের সংখ্যা কত করহ বর্ণন।
নৈমিষ অরণ্যবাসী এই মুনিচয়,
দিলাম তোমাকে মোরা আত্মপরিচয়।
এই সে পবিত্র ক্ষেত্র নৈমিষকানন,
কলিযুগে হেন স্থান মিলে না কখন।
কলিভয়ে ভীত হয়ে মোরা মুনিগণে,
একদা গেলাম সবে ব্রহ্মার-সদনে।
মনোময় চক্র ব্রহ্মা করিয়া নির্ম্মাণ,
চক্রের পশ্চাতে যেতে করিলা বিধান।
যেখানে চক্রের গতি হবে গতিহীন,
সেদেশ পবিত্র তথা রবে চিরদিন।
আমার আদেশ ইহা শুন মুনিগণ,
তথায় কলির ভয় হবে না কখন।
যতকাল সত্যযুগ আবার না আসে,
ততকাল থাক তথা সবে অনায়াসে।
প্রবৃত্ত হ'লেম মোরা চক্রচালনায়,
পৃথিবী ঘুরিল চক্র তাঁহার আজ্ঞায়।
হেথা আসি চক্রনেমি হ'ল বিশীরণ,
নৈমিষ অরণ্য নাম হ'ল সে কারণ।
কলির প্রবেশ হেথা হয় না কখন,
এস্থানে আশ্রয় লন সিদ্ধ মুনিগণ।

যতদিন সত্যযুগ না হয় আবার,
ততদিন রব হেথা ইচ্ছা সবাকার।
আমাদের বড় ভাগ্য তোমার দর্শনে,
সুপবিত্র কর তুমি পুরাণ কীর্ত্তনে।
দীর্ঘজীবী হও তুমি কল্যাণভাজন,
বাহ্য আন্তরিক দুঃখ নহে যে কখন।
দৈব উপদ্রব যেন না হয় তোমার,
এই আশীর্ব্বাদ মোরা করি অনিবার।
দেবী-ভাগবতকথা অতি সুমধুর,
শুনিলে কলুষ নাশ দুঃখ যায় দূর।

(ক্রমশঃ)

সংযম।

"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ। পাতঞ্জল দর্শন। বিভূতি পাদ, ৪ সূত্র।
একস্মিন্ বিষয়ে ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়ং প্রবর্ত্তমানং সংযমসংজ্ঞয়া
শাস্ত্রে ব্যবহ্রিয়তে। ভোজবৃত্তিঃ।

একবিষয়ে যখন ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী থাকে, তখন তাহাকে "সংযম" কহে। অর্থাৎ ধারণা দ্বারা চিত্তকে বদ্ধ করিবে। ধ্যান দ্বারা ধৃত চিত্তের একতানতা সম্পাদন করিবে। তৎপর সমাধি দ্বারা বিষয়ান্তর-দৃষ্টি পরিশূন্য নির্ব্বাতবাতবৎ চিত্ত যখন একটী মাত্র বিষয়ে স্থির থাকিবে, তখন প্রকৃত সংযম হইয়াছে বুঝিবে। বস্তুতঃ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়গুলি স্থির চিত্তে বিলিন হইয়া, নির্ব্বাত-বাতবৎচিত্ত যখন

একটীমাত্র বিষয়কে লক্ষ্য করিবে, তখন তাহা "সংযম" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।"

—সেই সংযমের জয়ে জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হয়।

"তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।"

—সেই সংযম প্রথমতঃ স্থূল বিষয়াবলম্বী চিত্তে, অতপর সূক্ষ্ম বিষয়াবলম্বী চিত্তে প্রয়োগ করিবে।

"সংযম" মানবাত্মার উন্নতি বিধানে অদ্বিতীয়। সংযম ব্যতীত মানুষ উন্নতি-শৈল-শিখরে আরোহণ করিতে পারে না। সংযম মানবের মানবত্ব পরিচায়ক, পশুত্ব বিমোচক, দেবত্ব খ্যাপক, দেহের দার্ঢ্য সম্পাদক, আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধি-দৈবিক তাপ সংহারক, আয়ুঃ সংস্থাপক ও ব্রহ্মপ্রাপক। একদিকে সংযম দ্বারা যেমন মানুষ অমরত্ব লাভ করে, অপরদিকে আবার সংযম-বিহীন নর ক্ষীণায়ুঃ সমপন্ন হয়।

সংযমাভাবে মানুষ পশুসদৃশ হইয়া পড়ে। কেনন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ অসংযমীর হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া প্রেম, ভক্তি, দয়া, জ্ঞান প্রভৃতি অমূল্য রত্নগুলি নিঃশেষে অপহরণ করিয়া ফেলে। কাজেই সে তখন মানবনাম গ্রহণের সম্পূণ অনধিকারী হইয়া "পশু" নাম গ্রহণ করে।

ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি নিরন্তর তত্ত্ব-জ্ঞানপন্থায় পরিভ্রমণশীল মানবের পথ প্রতিরোধক। অপিচ, বলপূর্ব্বক মানুষকে অজ্ঞানান্ধকার পথে প্রেরণ করে। ঘনান্ধকারে নিপতিত মানব, কাজে কাজেই সুপথ চিনিয়া লইতে নাপারিয়া, কুপথে পরিচালিত হয়। আঁধারে থাকিতে থাকিতে এমনি একটা অভ্যাস হইয়া উঠে যে, কিছুতেই আর তাহার আলোক দর্শনে ইচ্ছা জন্মে না। অসংযমী মানব, এই ভাবেই আঁধারের প্রাণী হইয়া, পশুপক্ষ্যাদি প্রাণী হইতেও হীন অবস্থাপন্ন হয়।

তুমি যদি কামেন্দ্রিয়ের পরিচালনায় সতত রত থাক, ক্রোধাদি রিপুগণ যদি তোমার চিত্ত-ভূমিতে নিরন্তর বাস করিবার অবসর পায়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যদি তোমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া ফেলে, তবে তুমি পশুতুল্য কেন, তদপেক্ষায়ও কি হীন নহ? তুমি সংযমী হও—"সংযমই" তোমার নরত্ব প্রকাশ করিবে।

একদিন সংযমের জন্যই ভারত-বাসী ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজাতির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অবনতমস্তকে সর্ব্ব-জাতি ব্রাহ্মণগণের নিদেশ প্রতিপালন করিতেন। ব্রাহ্মণ, সর্ব্বজাতির পবিত্র হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়া পূজা পাইতেন। "ভূদেব" বলিয়া ব্রাহ্মণের অপর সংজ্ঞা তখন ছিল। আর এখন?—এখন সেই সংযম নাই—সংযমাভাবে বিষহীন বিষধরের ন্যায় অসংযমী দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতির পদ-লেহনে ব্যস্ত। হায় দুর্ভাগ্য!

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ-
স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে
লোকস্তদনুবর্ত্ততে।" শ্রীগীতা।

আদর্শ ব্রাহ্মণের অসংযমিতা-নিবন্ধন অধঃপতনে, তদিতর জাতিও আজি অসংযমী ও অধঃপতিত। পূর্ব্বে—ধর্ম্ম-রাজ্যের সম্রাট্ ব্রাহ্মণ, সদাচার-নিরত ছিলেন বলিয়া, কায়স্থ-বৈশ্য-বৈদ্যাদিও তদবলম্বিত পন্থারই অনুসরণ করিতেন। ভয়—স্বেচ্ছাচারিতায় পাছে, দ্বিজ-কুলাবধারিত কঠোর দণ্ড ভুগিতে হয়। আর এখন সর্ব্ব-জাতিই স্বেচ্ছাচার-সম্পন্ন। কেহ কাহারও অধীন হইতে সর্ব্বথা অনিচ্ছুক। ইহার একমাত্র কারণ "অসংযমিতা।" যদি ব্রাহ্মণের সংযম থাকিত, ব্রাহ্মণ যদি বেদাচার-বহির্ভূত না হইতেন, তবে তদিতর জাতি পাপ-বহ্নিতে দগ্ধ হইত না।

হায় ব্রাহ্মণ! তুমি যে অসংযমানলে জীবনাহুতি দিয়া নিজে মরিলে ও সকল জাতিকেই বধ করিলে! এখনও বলি, তুমি "সংযম-হিমকরের আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমার শীতল সংস্পর্শে সর্ব্ব জাতির দগ্ধ প্রাণ সুশীতল হউক। তুমি অসংযমী বলিয়া জগৎ ধ্বংস হইতে চলিল, আর তুমি সুখে নিদ্রা যাইতেছ? ধিক্ তোমায়!"

"সংযম" জ্ঞান-প্রসূ। একমাত্র সংযমই দয়া, তিতিক্ষা, উপচিকীর্ষা, অহিংসা, ঋজুতা প্রভৃতি অন্তঃকরণবৃত্তির পরিস্ফুরণে সক্ষম। সংযম সর্ব্ববিধ পাপ-প্রণাশন। কোন বৃত্তি-বিশেষ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানুষ যখন মাতৃরূপা সতীর সতীত্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হয়, তখন একমাত্র সংযমই তাহাকে সেই ঘোর পাতক হইতে নিবৃত্ত করে। অধিক কি, "সংযম" পরম হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় অভয় করদ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অনর্থ পাতের মধ্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, এবং কি জানি কি এক অভিনব ভাবের অভ্যুদয় দ্বারা আমাদিগের দেবত্ব প্রকাশ করে। আমাদিগের সংযমিতা দেখিয়া, দেব-নর-গন্ধর্ব্ব স্তম্ভিত হয়, হিংস্র জন্তু হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়। বসুন্ধরা হেন সুসন্তান লাভ করিয়া, গৌরবিণী ও আনন্দিতা হন। হায়! সে পরম-পবিত্র "সংযম" কি আর আমরা গ্রহণ করিতে পারিব?

সংযমের অভাবে আমাদের বাক্য নিষ্ফল—প্রাণহীন। যে সংযমী আর্য্যজাতির প্রত্যেক বাক্য সফল হইত, আজি সেই আর্য্যজাতি নিষ্ফল-ভাষী—প্রলাপী। পুরাকালে যে আর্য্যরমণীগণ তেজস্বী ও ধার্ম্মিক পুত্র প্রসব করিতেন, অসংযমিতা-নিবন্ধন সেই আর্য্যরমণীগণ আজি হীন-তেজা ও অধার্ম্মিক সন্তান প্রসব করিয়া ধন্য হইতেছেন। অয়ি মাতরার্য্য-ললনে! তোমরা যে অনন্তরত্নপ্রভবা। তবে কেন নিরন্তর আর্য্যকুল-গ্লানি-তনয়প্রসবিনী হইলে! হিন্দু-ধর্ম্মের এ ঘোর অবনতির দিনে

তোমরা এরূপ স্বেচ্ছাচারিণী হইলে চলিবে কেন মা! তোমরা প্রকৃত সংযমাবলম্বিনী হও, তোমাদিগকে দেখিয়া, সন্তানগণ সংযমী হউক।

দ্বিজগণ! তোমরা সর্ব্ববেদাধিকারী হইয়া, ইন্দ্রিয় সংযম করিতে শিখ, এবং আপন আপন সন্তানগণকে সংযম শিক্ষা দাও। যৎপ্রভাবে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে রাখিও ভূদেব! তোমার স্বেচ্ছাচারিতায় হিন্দু-ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, এবং তোমারই সংযমিতায় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ সংস্থিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

ঠাকুর শ্রীসতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

সংস্কৃত কালেজ।

কিশোরগঞ্জ বেদ-বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্‌টার পবিত্রচেতা শীতলচন্দ্র সেন মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় অত্রস্থ সুবিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারিগণের ও স্থানীয় কতিপয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহদ্‌ব্যক্তির অভ্যাগ্রহে ১৩১৮ সনের ১৩ শে জ্যৈষ্ঠ অত্রস্থ ৺ শ্যামসুন্দ-রের আখড়ায় হিন্দুজন-সাধারণের একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়া "কিশোরগঞ্জ সংস্কৃত-কলেজ ও বেদবিদ্যালয়" স্থাপন করা স্থিরী-কৃত হয়।

তৎপর বিগত বৎসর মধ্যে মধ্যে সভাদি হইয়া প্রস্তাবকে দৃঢ়ীভূত করা হয় এবং চাঁদা সংগ্রহের জন্য বিশেষরূপে সভ্যগণের চিত্তাকর্ষণ করা হয়। প্রথম সভার দিন একটী সভ্য একটী টাকা দিয়া পুণ্যাহ করিয়া-ছিলেন। এপর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে চারিশত টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। ইতি মধ্যে মহাত্মা শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় এখানকার সব ডিভি-

সন্ অফিসার হইয়া আসিয়াই এই সুমহৎ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহার এই প্রকার সদুদ্যমে এবং স্থানীয় ৺শ্যামসুন্দরের আথড়ার মোহান্ত শ্রীযুক্ত দয়ালগোবিন্দ অধিকারী মহাশয় তাঁহার ত্রিতল বাটীতে বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনজন্য স্থান দেওয়ায় ১৩১৯ সনের ১৬ই ভাদ্র ইং ১৯১২ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে "কিশোরগঞ্জ বেদ-বিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজ" স্থাপন করা গিয়াছে। তৎপর মুক্তাগাছার রাজর্ষিকল্প শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুর অত্র টাউনে আগমনপূর্ব্বক বেদ-বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করেন। তাঁহার শুভাগমনে জনসাধারণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া যে 'অভিনন্দনপত্রম্' দিয়াছেন তাহাও বিদিত করা গেল। এপর্য্যন্ত চারিজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। ১ম শ্রীযুক্ত বনমালী সাংখ্যতীর্থ, ২য় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, ৩য় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ এবং আয়ুর্ব্বেদ-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সেন ব্যাকরণ-তীর্থ ও কাব্যতীর্থ।

"অভিনন্দনপত্রম্"

অশেষসদ্গুণালঙ্কৃত-বদান্যবর—

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুর

সদাশয়েষু—

শিবমনুদিনমার্য্যাচাররক্ষাব্রতস্য
বিপুলবিভবভাজঃ সাধুকার্য্যে রতস্য!
শশিকর-সমকীর্ত্তেঃ পূতনাম্নোঽস্য রাজন্
ভবতু ভুবনপাতুস্তে শিবস্য প্রসাদাৎ॥ ১
চরতি জনসমূহঃ সর্ব্বকার্য্যং সুখার্থং
ন খলু ভবতি লাভস্তস্য ধর্ম্মাদৃতে তু।

পরমঋষিভিরুক্তং কর্ম্মবেদোদিতং যৎ
তদিহমনুজধর্ম্মস্তৎ পরঃ স্যাৎ সুখীতি॥ ২
স ভবতি জনয়স্তা বেদ যো বেদতত্ত্বং
প্রভবতি পুরুষার্থঞ্চাপ্তুমেবাত্তসত্ত্বঃ।
সচ সুবিমলকীর্ত্তির্লোকমান্যো মনস্বী
ভবতি চ জনজাতঃ তাদৃশং প্রাপ্য পূতং॥ ৩
জননমিহ তু লব্ধ্বা বঙ্গদেশে সুভিক্ষে
ভুবনবিদিত-বংশে বেদবিদ্যাপরাণাম্।
বত হত-বিধিযোগাৎ ভ্রষ্টবেদা ইদানীং
বিহিত-বিধিবিলোপাদ্দূয়মানা ভবামঃ॥ ৪
ইদমভিলষিতং নো যাস্তু বিদ্যা জনৌঘাঃ
স্থিতিমধিলভতাং ভো বেদবিদ্যালয়োঽত্র।
নৃপতিজনললাম! প্রার্থয়ামো ভবন্তং
শতমথসমবীর্য্যং সুন্তরূপং নৃপেন্দ্রং॥ ৫
ইষ্টং বিদ্যালয়াব্জং নো বিকাশে নৃপভাস্করম্।
ত্বামেবাপেক্ষতে ভদ্রো! উদ্ঘাটয় কৃপাকর॥ ৬
কৃত্বা কিশোরগঞ্জাখ্যে নগরে শ্রীপদার্পণং।
ত্বয়াধন্যং কৃতং স্থানং রাজন্ ধন্যাঃ কৃতা বয়ং॥ ৭
শশধরকরকান্তাং কান্তকুন্দাবদাতা-
মনিশমমলকীর্ত্তিং তে বুধাঃ কীর্ত্তয়ন্তু।
শতপরিমিতমায়ুর্যা হি শান্তিং নৃপেন্দ্র!
ত্বয়ি বিতরতু ভদ্রং সর্ব্বদঃ সর্ব্বদেশঃ॥ ৮

একান্ত অনুগত—

বেদবিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজ-সভ্যবৃন্দানাম্।

বঙ্গানুবাদ।

(১)

আর্য্যাচারপরায়ণ পবিত্র রাজন্!
সাধু-সদাচারে পূর্ণ তোমার জীবন
শশিকর সমযশঃ
করেছে ভুবন বশ,
জগদীশ শিব তব করুন্ মঙ্গল
আমাদের এই আশা হউক সফল।

(২)

যত কিছু করে নর সুখের কারণ
ধর্ম্মবিনে সুখলাভ হয়না কখন;
ধর্ম্মই সুখের সার,
ধর্ম্মবিনে হাহাকার,
"বেদোদিত কর্ম্মবিনে ধর্ম্ম নাহি হয়."
ঋষিদের এইবাক্য কিথ্যা কভু নয়।

(৩)

সত্ত্বগুণসমন্বিত দেবজ্ঞ সুজন
পরমার্থ লাভে সদা শান্তিপূর্ণ মন
বেদজ্ঞ পণ্ডিত জন,
শাসনে সমর্থ হন,
পবিত্র তাঁহার স্পর্শে হয় সর্ব্বজন
বেদশাস্ত্রপারগের সার্থক জীবন।

(৪)

বেদবিদ্যাপরবংশে লইয়া জনম
বিধিবশে বেদশাস্ত্রে হয়েছি অক্ষম ;
শস্যপূর্ণ বঙ্গদেশ,
তবু নাহি যায় ক্লেশ,
বেদ বিনা সদাচার হয়েছে বিলোপ
পরিতপ্ত হয়ে মোরা হয়েছি বিরূপ।

(৫)

নরপতি-কুলমণি পবিত্রহৃদয় !
তোমার কৃপায় এই বেদবিদ্যালয়
বেদ শিক্ষা লাভ তরে
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
যে বাসনা আমাদের বলিবার নয়
একমাত্র তুমি নৃপ মোদের আশ্রয়।

(৬)

ফুটিয়া না ফুটে পদ্ম না পেয়ে তপন
বেদবিদ্যালয়-পদ্ম উন্মুখ তেমন
শুধু অপেক্ষায় তব
এ পঙ্কজ অভিনব
চাহিতেছে কৃপাকর দেবতা তোমার
বিকশিত কর পদ্ম ওহে কৃপাধার।

(৭)

আজি তব শুভাগমে সফল এ স্থান,
ধন্য মোরা ধন্য তুমি কর শিক্ষাদান।

এই বাঞ্ছা করি মোরা ঈশ্বর সদন
তোমার অমল কীর্ত্তি গায় বুধগণ
সর্ব্বদা সর্ব্বদ ঈশ করুন কল্যাণ
শতাধিক বর্ষআয়ু দিন্ ভগবান্।

একান্ত অনুগত—
বেদবিদ্যালয়ের সভ্যগণ।

কিশোরগঞ্জ বেদ-বিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজ
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে—

গীত।

রবিবার, ১৬ই ভাদ্র ১৩১৯ সন।

(১)

আলাইয়া।

(আজি) শুভদিনে একমনে
ডাক সবে তাঁরে॥
কৃপায় যাঁহার মোরা, মিলেছি এ পুরে॥ (২)
আঁধারে জ্বালিতে আলো
এত দিনে কৃপা হলো,
(আজি) মেলো সবে আঁখি মেলো।
হরষ অন্তরে॥ (৩)

(মোরা) আবেগে অধির আজ,
নাহি ভয়, নাহি লাজ,
জননী চাহিলে কাজ,
কে রহিবে দূরে॥ (৪)
অনন্ত জ্ঞানরূপিণী,
বেদে প্রকাশিতা যিনি,
সিদ্ধি ঋদ্ধি দিলে তিনি
(সব) পাপ তাপ যাবে দূরে॥ (৫)

(২)

(মিশ্র আলাইয়া।)

(আজি) আঁধার ভারতে, এস মা ভারতি
জ্বালগো জ্ঞানের জ্যোতি।
দীন অভাজন, পতিত এখন, ভুলেছি ভজন স্তুতি॥ ১
নাহি সে সাধনা, নাহি মা সে ত্যাগ,
পরাণে আবেগ নাহি অনুরাগ,
নাহি সে সংযম, আরাধনা যাগ (মোদের) কলুষে মলিন মতি—মা॥ ২
উর গো জননী পতিত পাবনী, নাশ ভেদ বুদ্ধি বাধা অনীকিনী,
আশার আলোকে নাচুক ধমনী, নবীন আবেগে মাতি—মা॥ ৩
জেগেছিল যারা সকলের আগে, এবে তারা ঘুমে কেহ নাহি জেগে
ভুলে মা তোমারে মোহের আবেগে দুখে দহে দিবা রাতি—মা॥ ৪
নব যগে আজি, জ্বালি জ্ঞানানল ভস্ম কর মোহ অজ্ঞান গরল,
দাও শ্রদ্ধা ভক্তি, ব্রহ্মচর্য্য বল (পুনঃ) গঠ মা নূতন জাতি—মা॥

বিজ্ঞাপন।

কিশোরগঞ্জ বেদ-বিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজের জন্য একজন বেদজ্ঞ অধ্যাপকের আবশ্যক, যিনি ঋক্ যজু এবং সামবেদ পড়াইতে পারেন তাঁহারই আবেদন মুখ্য হইতে পারে, কিন্তু এক বেদ কি দুই বেদে কৃত-বিদ্য পণ্ডিতেরও আবেদন গ্রহণীয়।

কিশোরগঞ্জ বেদবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী—
শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—
উকিল।

সতী-শতক।

১ম খণ্ড ॥০ আনা, ২য় খণ্ড ১৲ টাকা। হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বাবু, বঙ্গবাসী, যুগান্তর, এডুকেশনগেজেট, বামাবোধিনী প্রভৃতি দ্বারা মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসিত—এরূপ একাধারে সর্ব্ব শাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়া প্রাচীন সতী-জীবনী আর বাহির হয় নাই।

আর্য্যগৌরব-কার্য্যালয় কিশোরগঞ্জ।

আর্য্য-গৌরবের নিয়মাবলী।

১। ইহার বার্ষিক মূল্য সদরে মফঃস্বলে সর্ব্বত্র ১॥০ টাকা মাত্র।

২। যিনি "বেদ-বিদ্যালয়ে" এককালীন ২৫৲ টাকা দান করিবেন, তিনি বিনামূল্যে একখণ্ড আর্য্য-গৌরব পাইবেন।

৩। যিনি বেদ-বিদ্যালয়ে ১০০৲ টাকা বা ততোধিক দান করিবেন,

তিনি একখণ্ড আর্য্য-গৌরব পাইবেনই, অধিকন্তু তাঁহার পারিবারিক কোনও আবশ্যকীয় সংবাদ অর্থাৎ ছেলেদের জন্ম ঠিকুজী ইত্যাদি বৎসরে একবার প্রচার করিতে পারিবেন। কিন্তু ৩৬০ শব্দের অধিক যেন না হয়।

৪। যিনি মাসিক ২৲ টাকা বা ততোধিক চাঁদা দান করিবেন, তিনিও একখানা পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৫। কাহারও কোনও জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিলে তিনি রিপ্লাই সহ পরিস্কার ঠিকানা দিবেন।

৬। আর্য্যগৌরবের জন্য প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এবং টাকা কড়ি চাঁদাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

৭। আর্য্য-গৌরবের মূল্যাদির ছাপা রসিদ গ্রাহকগণ পাইবেন।

৮। ইহার এক পেজ বিজ্ঞাপনের মাসিক ৪৲ টাকা এবং চতুর্থাংশ ১৷৷০ টাকা এবং প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে লাগিবে বার্ষিক বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

"আর্য্যগৌরব কার্য্যালয়" কিশোরগঞ্জ।

গল্পগুচ্ছ

দেবীদীন।

অযোধ্যার অন্তঃপাতি রায়বরেলী জিলার বকুলিয়া নামক গণ্ডগ্রামে আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের নায়ক শ্রীমান্ দেবীদীন মিছির জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায় বাক্যবীর ছিল।

ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈচিত্রময়ী। দেবীদীন দীর্ঘাকার পুরুষ হইলেও তাহার হস্তের কনুই হইতে কব্জা পর্য্যন্ত অংশ অতি অস্বাভাবিকভাবে হ্রস্ব ছিল। তাহার হস্ত দুইখানি কেঙ্গারুর হস্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। দেবীদীনের চলিবার সময় হস্ত দুইখানা সর্ব্বদা দোদুল্যমান হইত।

দেবীদীনের এই অনন্যসাধারণ আকৃতি তাহার প্রকৃতিকেও অনন্য-সাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল।

দেবীদীনের রসনা বাক্যব্যয়ে ও ভোজন-ব্যাপারে সর্ব্বদা গতিশীল ছিল।

এহেন দেবীদীন শুষ্ক অযোধ্যা প্রদেশে থাকা অসুবিধাজনক মনে স্থির করিল। দেবীদীনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বামাধার মিছির ময়মনসিংহ জিলার কোন বাবুর বাড়ীতে দরওয়ান ছিল। দেবীদীন এক লোটা, এক কম্বল ও এক বংশদণ্ডের সহায়ে ভ্রাতার নিকট আসিয়া হাজির হইল।

বাঙ্গালা মুলুকে আসিয়া এদেশের হাবভাব বুঝিয়া লইতে দেবীদীনের অধিক সময় ব্যয়িত হইল না।

শুষ্ক রুটি চর্ব্বণ অপেক্ষা রসাল আতপ-তণ্ডুলের রাশি ধ্বংশ করা দেবীদীন সুবিধাজনক মনে করিতে লাগিল। দেবীদীন "অশক্তঃ সর্ব্ব-কর্ম্মষু ভোজনে চ বৃকোদরঃ।" কর্ম্মষু অশক্ত হইলেও দেবীদীন গল্প করিতে অশক্ত ছিল না।

দেবীদীনের জিহ্বা উন্মাদ বন্যহস্তীর ন্যায় নিরঙ্কুশভাবে চলিতে থাকিত।

দেবীদীনের চতুষ্পার্শ্বে বাবুদের বাড়ীর ও পল্লী-বালকদলের এক বিশেষ সমিতি সর্ব্বদা বিরাজিত ছিল।

দেবীদীন স্বদেশে থাকাকালে যে সকল সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি বন্দুক দ্বারা শিকার করিয়াছে, ঐ সকল শিকার-কাহিনী বলিয়াই দেবীদীন

সারা দিন রাত কাটাইত। কখনও কখনও দেবীদীন Gladiator (গ্লেডিয়েটার) দিগের ন্যায়—সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিত। দেবীদীনের কথার প্রতিবাদ করিবার কেহ ছিল না। দেবীদীনের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বালদল সকলে উৎকণ্ঠ ও উদ্‌গ্রীব হইয়া দেবীদীনের অমানুষিক কাহিনী শ্রবণ করিত।

দেবীদীন তাহার স্বভাবদত্ত হস্তের খর্ব্বতা তাহার বীরত্বের গণ্ডীর ভিতর ফেলিয়া দিল। দেবীদীন বলিত, সে তাহার স্বদেশে বয়েন-ওয়ারায় রাণা শঙ্করবক্স সিংহের ধৃত বন্য সিংহের সহিত মল্লযুদ্ধে সিংহকে পরাজিত করিয়াছিল; কিন্তু সিংহের আক্রমণে তাহার হস্ত দুইটির কতকাংশের অভাব হইয়াছিল।

দেবীদীন প্রাতে উঠিয়া তাহার ক্ষুদ্র হস্তে বৃহৎ এক ঘটিপূর্ণ ভাঙ্গ প্রস্তুত করিয়া ঐ ভাঙ্গ আকণ্ঠ পান করত রসনাকে শানাইয়া লইত। তারপর ক্রমে পল্লী-বালদল দেবীদীনের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া লইত।

দেবীদীনের অনর্গল রসনা বাক্যলহরী বিস্তার করিতে আরম্ভ করিত। বাক্যলহরীর অধিকাংশের সার মর্ম্ম, আমি অর্থাৎ দেবীদীন উত্তম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ, অন্যান্য সকল ব্যক্তি নামে মাত্র পুরুষ। শ্রোত্রী বালবৃন্দ উৎকর্ণ—উদ্‌গ্রীব হইয়া দেবীদীনের অসীম বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিত ও মনে মনে দেবীদীনকেই আদর্শ পুরুষ কল্পনা করিয়া লইত।

বালকদলের মধ্যে কে দেবীদীনের অধিক প্রিয় হইবে, তাহার প্রতি-যোগিতা হইত। দেবীদীন যাহার মুখের দিকে চাহিয়া যে দিন কথা কহিত, সেদিন সে বালক নিজেকে ধন্য মনে করিত। বালকগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে দেবীদীনের জন্য ফলমূল ও খাবার যোগাইত।

এই ভাবে দেবীদীনের দিন কাটিতে লাগিল। কেহ দেবীদীনকে এদেশে থাকিয়া কি করিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে, দেবীদীন অম্লানবদনে

বলিত, "হাম্‌লোক সিপাহি বাবুকা দেহুড়ীমে রহতা, আউর বাবুকা বাড়ী পাহারা দেতা।" প্রকৃত কথা বলিতে গেলে দেবীদীন রাত্রিতে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিত, প্রাতে ৪ দণ্ড বেলায় শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিত।

এ হেন দেবীদীন সুখের সমুদ্রে আমোদের তরণী ভাসাইয়া বাঙ্গালা মুলুকে বাবুদের বাড়ীতে বাস করিতেছিল। এমন সময় একটী ক্ষুদ্র কাল মেঘ দেখা দিল। বাবুদের বাড়ীর ছোটবাবু কলিকাতা হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি দেবীদীনের কীর্ত্তিকাহিনী নীরবে শ্রবণ করিয়া দেবীদীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবীদীন, হাতী চড়িতে পার?" দেবীদীন বলিল, সে রাণা শঙ্করবক্সের ঐরাবততুল্য হাতীতে আরোহণ করিয়া ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছে। মাহুতের কোন প্রয়োজন হয় নাই।

ছোটবাবুর ইঙ্গিত মত বাবুদের বাড়ীর একটি হস্তী দেবীদীনের সম্মুখে উপনীত হইল। হস্তীটি রাণা শঙ্করবক্সের বাড়ীর হস্তীর মত কি না, জিজ্ঞাসা করায় দেবীদীন বলিল, "এটি ঐ হাতীর বাচ্চার মত।"

এই কথা বলামাত্র দেবীদীনকে ছোটবাবু একবার এই হাতীতে উঠিতে বলিলেন; কিন্তু ভক্ত বালকবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেবীদীন না কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। দেবীদীনের সম্মুখে হস্তীটি বসিয়া পড়িল। দেবীদীন বধ্যভূমিতে নীত অপরাধীর ন্যায় কম্পিত কলেবরে হাতীতে উঠিল। ভক্ত বালকবৃন্দ করতালি দিয়া উঠিল। হস্তী চলিতে আরম্ভ করিল। কি জানি কোন্ ইঙ্গিতবলে হাতীর মাহুত হস্তী হইতে নামিয়া পড়িল। দেবীদীন একাকী হস্তিপৃষ্ঠে রহিল। দেবীদীন হাতার গ-া জড়াইয়া ধা ধা? হাতী নিরঙ্কুশভাবে আহারান্বেষণে ছুটিল। নিকটবর্ত্তী এক মন্দার বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিয়া হস্তী নিজ পৃষ্ঠে আছড়াইতে লাগিল। মন্দার-শাখার কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া দেবীদীন জর্জরিত হইল এবং বালকবৃন্দের করতালি-

ধ্বনিও দেবীদীনের কর্ণে নিনাদিত হইয়া কণ্টকবিদ্ধের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু যখন হস্তী মস্তক অবনত করিয়া মান্দারের ডাল ভাঙ্গিতে লাগিল, তখন দেবীদীনের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। দেবীদীনের আত্মাভিমানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, দেবীদীন অজ্ঞান মূর্খ হস্তীর নিকট প্রাণভিক্ষা করিল, হস্তীকে ব্রহ্মবধের ভয় দেখাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দেবী-দীন চক্ষে সর্ষপফুল দেখিতে লাগিল। দেবীদীনের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, দেবীদীন অজ্ঞান হইয়া জড়পিণ্ডবৎ ভূপতিত হইল।

দেবীদীনের যখন চৈতন্য হইল, দেবীদীন তখন দেখিল, তাহার ভ্রাতার খাটিয়ার উপর সে শায়িত আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ও কণ্টকবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা। কিন্তু দেবীদীনের ইত্যধিক ব্যথা ও যন্ত্রণা হইয়াছিল তাহার দূরবর্ত্তী ভক্তবৃন্দের অঙ্গুলিনির্দ্দিশ ও ব্যঙ্গ-হাসিমিশ্র করতালিধ্বনি।

দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে, দেবীদীন এই মরজগৎ পরিত্যাগ করি-য়াছে; কিন্তু বঙ্গের গৃহে গৃহে করতালিধ্বনিতে উৎফুল্ল কর্ম্মকুণ্ঠ বাক্য-বাগীশ দেবীদীন বিরাজ করিতেছে। ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়ের তালিকা।

যাহার মারফত যতজমা

১।	ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী	১৲
২।	ভারত চন্দ্র রায়	১০০৲
৩।	ভগবান্ চন্দ্র দে	২৫৲
৪।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৲
	গঙ্গাদাস রায়	৪৲
	মহিম চন্দ্র বণিক্য	৮৲
	রাম চন্দ্র বণিক্য	৬৲
	বিশ্বনাথ নাথ	১৲
	রূপেশ্বর নাথ	১৲
৫।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৬০৲
৬।	ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী	৪০৲
৭।	অমৃতময়ী দেবী	৫৲
৮।	বিন্দুবাসিনী দেবী	৫৲
৯।	নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী	১০৲
১।	হরনাথ দত্ত	৵০
২।	চন্দ্র মোহন রায়	।০
৩।	কৃষ্ণ চন্দ্র নাথ	।০
৪।	দামোদর দাস	৫৲
৫।	রজনী কান্ত বসু	৫৲
		২৭৭।৵০

যে প্রকারে যত খরচ।

১।	বিল খাতা খরিদ	॥৴৬
২।	বিল শীলমোহর	২৲
৩।	বিল বিজ্ঞাপন এবং চেক বই ছাপান খরচ	৭৩৸০
৪।	ঐ পার্শেল আনার খরচ	২।৵০
	খাতা খরিদ	॥৴৬
		৭৯৴০
	নোটীশ ছাপান খরচ	১৸০
		৮১৴০
৫।	বিল ৺ সরস্বতী পূজার খরচ	২৬৴০
৬।	বিল চিঠি ছাপান খরচ	২।০
৭।	চিঠির কাগজ এবং খাম	৩।৵০
৮।	বিল পণ্ডিতদের অগ্রিম বেতন	১৫৲
৯।	বিল ষ্ট্রাঙ্ক ২টী	৪৲
১০।	বিল মিছিলের নিশানের খরচ	১৸০
		১৩৩॥০

যাহার মারফত যত জমা	
জের জমা—২৭৭॥৶০	
৬। প্রিয়নাথ মিত্র	৩৲
৭। করুণা কান্ত পাল	৩৲
৮। বৈষ্ণব চরণ সাহা	১০৲
৯। হরিশ্চন্দ্র নাথ	১০৲
১০। বাঁশিনাথ পোদ্দার	৫০৲
১১। জগৎ চন্দ্র সাহা	১০৲
১২। চন্দ্রকিশোর মোদক	১০৲
১৩। শরৎ কুমার মুন্‌সী (করণেশনের উদ্বৃত্ত)	৭৫৲
১১। গিরিবালা মজুমদার	৫৲
১২। শ্যামাচরণ মজুমদার	২৲
মোট—	৪৫৫॥৶০
বাদ খরচ –	১৭২ ৶০
	২৮৩।৶০ তহবীল

যে প্রকারে যত খরচ।	
জের খরচ—১৩৩॥৶৫	
১০। বিল নাটকগৃহ সভার জন্য সাজান খরচ	৭।০
১২। মঠখলা যাওয়ার নৌকাভাড়া	৪৵০
১৩। বিল ৪০০ চিঠির কার্ডের মূল্য	১।০
ঐ কার্ড ছাপান	১৸০
১৫। গানছাপান	১।০
১৬। অভিনন্দন পত্র ছাপান খরচ	৩৲
১৭। গাড়ী ভাড়া	॥০
১৮। গাড়ী ভাড়া রাজার জন্য	২৲
১৯। গাড়ী ভাড়া ,,	২৲
২০। পত্রিকার সংবাদ প্রেরণ খরচ	২৲
	১৫৮৸০
২১। বিল দালান মেরামত খরচ	৫৲
২২। বিল পাতুয়াইর যাও যার নৌকাভাড়া	১৸০
২৩। বিল টেলিগ্রাম এবং টিকিট খরচ এবং মঠখলার গাড়ীভাড়া	৵ ॥২৩০
২৪। বিল মঠখলা যাওয়ার অবশিষ্ট গাড়ীভাড়া	৪৲
	১৭২৶০

একশত বাহাত্তর টাকা তিন আনা মাত্র

সহকারি সম্পাদক

আর্য্য-গৌরব।

ভারতী।

ভারতী জননী ভারত সন্তানে,
শিখাও আবার সংযম সাধনা,—
হর মা জননী বেদ বিদ্যাদানে
অজ্ঞান কলুষ ভেদ প্রবঞ্চনা।
আবার ভারত জাগিয়া উঠুক
শুনিয়া তোমার সাম-স্তুতি-গান,
আবার ধর্ম্মের, বিপ্লব ছুটুক
আর্য্য-ধর্ম্মে মাতি সকল পরাণ।
সুরধুনী তীরে পর্ব্বত-শিখরে,
পুনঃ ঋষিদের হউক আশ্রম,—
আবার ভারতে মা তোমার বরে
হউক স্বর্গের শোভা অনুপম।
ভাই ভাই বলি বিশ্ব-প্রেমে গলি,
উঠুক মাতিয়া আর্য্যের পরাণ,—
এক ভাষা-ভাবে একপ্রেমে ঢলি
বাড়িয়া উঠুক আর্য্য-ভূমি-মান।

মানব।

'মানব' এ মধুর এ দুর্লভ বাক্যটী বড়ই প্রিয়, বড়ই অমূল্য ; এরূপ শব্দ আর জগৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বহু পুণ্যফলে, বহু কাল পরে মানব জন্ম লাভ করিতে হয়। এজন্মের তুলনা নাই ; এই সুদুর্লভ মানব-জন্ম লইয়া সবই করা যায় ; মন্ ধাতু হইতে 'মনু' হয়, মনু শব্দ হইতেই মানব শব্দের উৎপত্তি। মন্ ধাতুর অর্থ কর্ম্ম। আমরা কর্ম্ম করিবার জন্যই মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। মানবের কর্ম্মদ্বারা সবই হইতে পারে। দেবত্ব-ইন্দ্রত্ব-ব্রহ্মত্ব এমন কি ঈশ্বরত্বও কর্ম্মদ্বারা মানবগণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাই শাস্ত্র লিখিয়াছেন—

"সুখং দুঃখং ভয়ং শোকো হর্ষো মঙ্গলমেবচ।
সম্পত্তিশ্চ বিপত্তিশ্চ সর্ব্বং ভবতি কর্ম্মণা॥"

মানব! কর্ম্মকে ভয় করিলে চলিবে না, মানবকে অসংখ্য কর্ম্ম করিতে হইবে, সংসারে কর্ম্মের জন্যই জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যিনি যত টুকু কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহাকেই তত টুকু উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই। ক্ষত্রিয় বীর বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যারূপ কঠিন কর্ম্মবলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

শচীপতি ইন্দ্রও কঠোর তপস্যা করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। আর্য্য ঋষিদের বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস, জনক, শুকদেব, নারদ ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি বড় বড় ঋষি-গণ কর্ম্মরূপ কঠোর তপস্যা দ্বারাই মহোন্নতি লাভ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহের যত্ন মমতা ভুলিয়া গিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ফলমূলাহারে বা অনাহারে কঠোর সাধনা তপস্যা সাধন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। হায়! আর আজ আমরা একদিন উপবাস থাকিলে মরিয়া যাই! তবু আমরা সেই মনুর সেই আর্য্য ঋষির বংশধর বলিতে লজ্জিত হই না। এখনও ইয়ুরূপ, আমেরিকা ও জাপানের কর্ম্মবীরগণকে দেখিলে অবাক্ হইতে হয়; তাঁহারা কর্ম্মের জন্য দেহকে খণ্ড খণ্ড করিতেও ভয় পান না। এইত সেদিন জাপানযোদ্ধা মহা-মনস্বী নগি নির্ভয়ে সদানন্দমনে সম্রাটের সহ-মৃত হইলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশেও সহমরণ প্রথা কম ছিল না। এখন তাহা অবিশ্বাস্য গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে পার, কিন্তু ঘরে ঘরে প্রত্যেক আর্য্যপরিবারেই অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী বা তন্মাতা অবিমর্ষ অন্তরে স্বামী সহ শ্মশানের জ্বলন্ত চিতায় আত্মজীবন বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত হইতেন না।

সেই পতিপ্রেমানুরাগ, সেই সাহস, সেই দৃঢ়তা, সেই পবিত্র ধর্ম্মসাধনা, সেই অসীম সহিষ্ণুতা, সেই যোগারাধনা এখন কোথায়? হে নরনারীগণ! যদি তোমরা সুদুর্লভ মানব জন্মের সফলতা করিতে চাও, তবে পবিত্র ধর্ম্মসাধনা, সদাচার-নির্ভীকতা, অসীম সহিষ্ণুতা ও কঠোর যোগারাধনার আশ্রয় গ্রহণ কর। যত দিন সংযম সহিষ্ণুতার পবিত্র কোলে বিশ্রাম করিতে অক্ষম থাকিবে, ততদিন তোমার মানবজন্ম বিফল জানিবে; চির অশান্তির উষ্ণ বায়ু তোমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিবে, মানবতার মধুরতা কিছুই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেনা। কিন্তু হে মানব! তুমি সামান্য জীব নহ, তুমি দেবতার অংশ, তুমি ইচ্ছা করিলেই দেবত্ব লাভ করিয়া সুখের অমৃতভাণ্ডার উপভোগ করিতে পার। মোক্ষ লাভ বা নির্ব্বাণ মুক্তিও তোমার করায়ত্ত বটে। তুমি সাধনায় অগ্রসর হইলে তোমার অসাধ্য কিছুই থাকিতে পারেনা; তুমি ভীষ্ম দেবের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যুত্ব লাভ করিতে পার; তুমি দেবর্ষিদের ন্যায় মুহূর্ত্তে ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনে সক্ষম হইতে পার; বিহঙ্গমের ন্যায় আকাশ ভ্রমণে, জল-জন্তুর ন্যায় জলনিমজ্জনে, তোমার কিছুই আয়াস হইতে পারে না। তুমি তাড়িদ্-

বেগে গমন করিতে পার, তুমি শত যোজনের বাক্য শুনিতে পার, তোমার মানবীয় ইন্দ্রিয় শক্তির অসীমতা জন্মিতে পারে, কিন্তু তোমাকে প্রকৃত মানব হইতে হইবে—তোমাকে চির ব্রহ্মচারী থাকিতে হইবে—তোমাকে সত্যপথে সত্যব্রতের ন্যায় অচল অটল হইতে হইবে—তোমাকে গিরিরাজের ন্যায় সংসারের দুঃখরূপ ঝড় তুফান সহ্য করিয়া সংযমের পরাকাষ্ঠার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—আর তোমাকে করিতে হইবে কায়-মনোবাক্যে ঈশ্বরসাধনা !!

ক্রমশ।

গো-রক্ষণ।

মানব-জীবনে প্রথম ক্ষুণ্ণিবৃত্তির উপাদান গোদুগ্ধ; মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃ-স্তন্য পান করিবার পূর্ব্বেই সূত্র-ময়ী দশাদ্বারা গোদুগ্ধ পান করিয়া তৃপ্ত হয়। মাতৃ-স্তন্যের উপরেও যাহার প্রাধান্য সেই অমৃতোপম গোদুগ্ধের পবিত্রতা ও বৃদ্ধি দেশের শ্রীবৃদ্ধির জননী; আবার গোদুগ্ধ ও গোঘৃত হিন্দু জাতির সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্মের ভিত্তি।

"গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধন্যমূদ্গাস্তিলা যবাঃ।"

গোক্ষীর ও গোঘৃত হিন্দুর হবিষ্যান্নের সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। হবিষ্য ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান উপকরণ, ব্রহ্মচর্য্য হিন্দু ধর্ম্মের মেরুদণ্ড।

"যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ"

যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন উদ্ভব হয়। সেই যজ্ঞও ঘৃতমূলক, হবিবিহীন যজ্ঞ অসম্ভব। হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপাদান গোদুগ্ধ ও গোঘৃত। হিন্দুর শুদ্ধি কার্য্যেও পঞ্চগব্যের প্রয়োজন, তাহা সমস্তই গো-সম্ভূত। সুতরাং গোজাতির রক্ষা, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও গোদুগ্ধ-বৃদ্ধি যাহাতে হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি করা হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহাভারত ও পুরাণাদিতে ব্রাহ্মণ ও রাজন্যবর্গের সহস্র সহস্র গোপালনের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটী গো লইয়া তুমুল যুদ্ধ হইয়াছে। শত শত যোদ্ধা প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাও দৃষ্ট হয়। বিরাট রাজের উত্তর গো-গৃহে গোরক্ষা ও গোচারণ হইত, ধনের মধ্যে গো একটী প্রধান ধন বলিয়া পরিগণিত ছিল। যে ভারতে স্বয়ং রাজারা গো-পালনে মনোনিবেশ করিতেন, পুত্রলাভের কামনায় গো-মাতাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা

করিতেন, ব্রাহ্মণগণ গো-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেন, ব্রাহ্মণ-বালকের প্রথম শিক্ষা গো-পালনে আরম্ভ হইত, যে দেশের স্বয়ং ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোরক্ষণ ও গোপালন করিতেন; হায় সেই ভারত কোথায়, সেই উত্তর গো-গৃহ কোথায়, শ্রীকৃষ্ণের সেই গোচারণ-ক্ষেত্র, সেই বৃন্দাবন, সেই গোবর্দ্ধন কোথায় !!

সেই ভারতে এখন গোপগণও গো-রক্ষণ করিতে ঘৃণা বোধ করে, নিজকে 'গোপ' বলিতে লজ্জা বোধ করে। গোপালন গো-সেবা ভারত হইতে দূরীভূত হইয়াছে, গোধন-বহুলা সোণার ভারত ভূমি গোহীন চিতা-ভস্মময়ী শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। দেশ হইতে গো-গণ তাড়িত হইতেছে এমন কি গো-অস্থি গো-চর্ম্ম পর্য্যন্ত ঝাঁট দিয়া বিদেশে লইয়া যাইতেছে। এখন এ দেশের কতক মনুষ্যও গো-রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইয়াছে! হায় এক্ষণে আর বৃষোৎসর্গে উৎসর্গীকৃত বিশালবপু ধর্ম্মের ষাঁড়ের আর সেই বিশালত্ব নাই, তাহাদের আর সেই অবাাহত গতি নাই।

ক্রমশ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

——

দেবী-ভাগবত।

(মূলের পদ্যানুবাদ ২১ পৃষ্ঠার পর)

ধর্ম্মার্থ কামের কথা আছে ভাগবতে,
তাতেও মনের তৃপ্তি নহে কোন মতে।
ভগবতী লীলা কথা করিয়া প্রকাশ,
মনের কলুষ রাশি করহ বিনাশ।
সূত কহে মুনিগণ করি নিবেদন,
বেদব্যাস হ'তে যাহা করেছি শ্রবণ।
আঠার পুরাণ আছে বেদে নিরূপণ,
সে সবার নাম এবে শুন দিয়া মন।
ভবিষ্য, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম, গরুড়, বামন,
বরাহ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত, নারদ, পবন (বায়ু)
বিষ্ণু, লিঙ্গ, মৎস্য, কূর্ম্ম, পদ্ম, ভাগবত,
অগ্নি, স্কন্দ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ মহৎ।
তা'ছাড়া অনেক আছে সে উপপুরাণ,
দেবী ভাগবত তাহে সবের প্রধান।
ইহা ছাড়া বেদব্যাস রচিলা ভারত,
পঞ্চম বেদের সম বিখ্যাত ভারত।

ধর্ম্মরক্ষাকারী ব্যাস প্রতি মন্বন্তরে,
প্রকাশে পুরাণরাশি দ্বাপরে দ্বাপরে।
অন্য কেহ নহে ব্যাস বিষ্ণু অবতার,
করিলা পুরাণরূপে বেদের প্রচার।
কলিতে অল্পায়ু বিপ্র অল্প মতিমান্,
অসমর্থ বেদ-পাঠে নাহি সেই জ্ঞান।
নারী শূদ্র বেদপাঠে সক্ষম না হয়,
তাই প্রচারিলা মুনি পুরাণ-নিচয়।
পুরাণে বেদের মর্ম্ম আছে স্তরে স্তরে,
মহাজ্ঞান লভে নর তাহা পাঠ ক'রে।
বৈবস্বত মন্বন্তর যায় এইক্ষণ,
অষ্টাবিংশ দ্বাপরের ব্যাস "দ্বৈপায়ন"।
মম গুরু ব্যাস সত্যবতীর নন্দন,
পরে দ্রোণপুত্র ব্যাস হবে অন্যজন।
মুনিগণ কহে শুন ওহে তপোধন,
কেবা কবে ব্যাস হয় কহ বিবরণ।
সূত কন শুন সবে আমার বচন,
বলিতেছি অষ্টাবিংশ ব্যাস-বিবরণ।
প্রথম দ্বাপরে ব্রহ্মা, পরে প্রজাপতি,
তৃতীয়ে উশনা, চতুর্থেতে বৃহস্পতি।

পঞ্চম দ্বাপরে সূর্য্য, ষষ্ঠে মৃত্যুরাজ,
সপ্তম দ্বাপরে ব্যাস ইন্দ্র দেবরাজ।
অষ্টমে বশিষ্ঠ, নবমেতে সারস্বত,
দশমে ত্রিধামা, পরে ত্রিবৃষ মহত।
ক্রমে ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ ত্রয়োদশে,
ধর্ম্ম, এয্যারুণি, ধনঞ্জয় সে ষোড়শে।
সপ্তদশে মেধাতিথি অষ্টাদশে ব্রতী,
ঊনবিংশে অত্রি, বিংশে গৌতম সুযতী।
হর্য্যাত্মা, উত্তম ক্রমে বেণ অতঃপর,
চতুর্ব্বিংশে তৃণবিন্দ, ভার্গব তৎপর।
শক্তি, জাতুকণ্য ক্রমে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
এই অষ্টাবিংশ ব্যাস শুন মুনিগণ।
দেবী-ভাগবত কথা অমৃতলহরী,
দেবীভক্ত দাস কহে স্মরিয়া শ্রীহরি।
সর্ব্ব কামপ্রদ ইহা মোক্ষ করে দান,
বেদ-সার পূর্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রধান;
ব্যাসদেব এ নিগূঢ় পুরাণ আখ্যান,
বলেছিলা স্বীয় পুত্র শুকদেব স্থান।
সে সব বৃত্তান্ত আমি করেছি শ্রবণ,
কলিকাল-ভয়-নাশি পবিত্র ঘটন।

শুনে যদি মহাপাপী হয়ে এক মন,
বিপুল-সম্পত্তি হয় পাপ বিমোচন।
দেবের আরাধ্যা যিনি দেবী ভগবতী,
সদা পরিতুষ্ট হন পাঠকের প্রতি।
দুর্লভ মানব জন্ম হইবে না আর,
পবিত্র পুরাণ কথা শুন অনিবার।
যে জন না শুনে এই অমৃত বচন,
বৃথা সে জনম তার বৃথা সে জীবন।
পরনিন্দা শুনিবারে কেন দেও মন,
বারেক পুরাণ কথা করহ শ্রবণ।
দেবীভাগবত কথা বড়ই মধুর,
শ্রবণে কলুষ-নাশে দুঃখ যায় দূর।
ঋষিগণ কহে সৌম্য করি নিবেদন,
বিস্তার করিয়া কহ অপূর্ব্ব কথন।
শুনিয়াছি শুকদেব অযোনী-সম্ভূত,
ব্যাসের পত্নীতে জন্ম এ বড় অদ্ভুত।
গর্ভাবস্থা হ'তে করে বেদ অধ্যয়ন,
এ কেমন কথা সব বিচিত্র ঘটন;
বিস্তারিয়া কহ মুনি মূল বিবরণ,
মনের সন্দেহরাশি কর নিবারণ।

সূত কন শুন সবে অপূর্ব্ব কথন,
যেরূপ জন্মিলা শুকদেব তপোধন।
সরস্বতী তীরে ছিল ব্যাসের আশ্রম,
সর্ব্বজীবে ছিল তথা পরম সংযম।
একদা দেখিলা ব্যাস সত্যবতীর নন্দন,
বিহঙ্গম চটকের দাম্পত্য-মিলন।
পুনঃ বৎস-প্রেম মুনি করিয়া দর্শন,
মনে মনে নানারূপ করিলা চিন্তন।
চটকের পুত্র প্রতি বাৎসল্য যেরূপ,
ফলাকাঙ্ক্ষী মানবের না জানি কিরূপ।
মানব পুত্রের মুখ করিয়া দর্শন,
অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করে অনুক্ষণ।
চটকের পুত্র স্নেহ শুধু অকারণ,
করে না তাহারা কভু ভরণ-পোষণ।
করে না পিতার শ্রাদ্ধ করে না তর্পণ,
করে না ঐহিক পিতামাতার সেবন।
গয়া-শ্রাদ্ধ বৃষোৎসর্গ করে না কখন,
তথাপি পাগল পাখী পুত্রের কারণ।
মানবের পুত্ররত্ন সেরূপ ত নয়,
পুত্রসম উপকারী আর কেবা হয়?

পুত্র-দেহ-স্পর্শ-সম সুখ নাহি আর,
পুত্রের পালনসুখ অসীম অপার।
অপুত্রের গতি নাই স্বর্গ নাহি হয়,
পরলোকে উপকারী পুত্রই নিশ্চয়।
পুত্রবান্ স্বর্গ পায় পুত্রের কারণ,
অপুত্রক স্বর্গে যেতে পারে না কখন।
চক্ষুর উপরে দেখ পুত্রবান্ জন,
কত সুখ পায় সদা স্বর্গের মতন।
অপুত্রক পুত্রবানে কি প্রভেদ ভবে,
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও প্রমাণ কি তবে।
মৃত্যুকালে অপুত্রক হইয়া কাতর,
এইরূপ চিন্তা মনে করে নিরন্তর।
আমার অতুল ধন হর্ম্ম্য মনোহর,
নানাবিধ ভোগ্য দ্রব্য বিস্তর বিস্তর।
কে করিবে ভোগ হায়! কারে করি দান,
এইরূপ দুশ্চিন্তায় স্থির নহে প্রাণ।
এই সব দুঃখ যার মৃত্যুকালে হয়,
তাহার সদ্গতিলাভ সম্ভব ত নয়।
মৃত্যুকালে চিত্ত যার প্রশান্ত না রয়,
অবশ্য দুর্গতি তার জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপ চিন্তা করে ব্যাস তপোধন,
চলিলা বিমনা হয়ে সুমেরু সদন।
ভাবিলেন ব্যাস মুনি পূজিব কাহায় ?
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবদুর্গা কে তুষ্ট ত্বরায় ?

ক্রমশ।

আমি।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীতা মা গৃধঃকস্যস্বিদ্ধনম্ ॥"

ঈশোপনিষৎ।

জগতের জ্ঞানরাশি একত্র করিলে দেখিতে পাই প্রত্যেকের ভিতর আমি বর্ত্তমান। সেই আমি কে ? আবহমান কাল এই প্রশ্ন মনে উদয় হইতেছে, এবং এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মানব-মন জগতের শাস্ত্ররাশি প্রসব করিয়াছে। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞানের উপলব্ধি কে করিবে ? জ্ঞাতার অভাবে জ্ঞানের কোন অস্তিত্ব সম্ভবে না, এই জ্ঞাতা ও জ্ঞানের ভিতরও 'আমি কে' দেখিতে পারিবে এবং একটুকু এগিয়ে গেলে দেখিবে

দুইই জমাট বাঁধিয়া এক হইয়া গিয়াছে, তখন আর জ্ঞাতা হইতে জ্ঞানকে অথবা জ্ঞান হইতে জ্ঞাতাকে পৃথক্ করিতে পারিবে না।

কোন পথিক যাইতেছে, তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর আপনি কে ? পথিক অমনি বলিয়া উঠিবে আমি অমুক। কেহ মাঠে কাজ করিতেছে, কেহ গরু চরাইতেছে, কেহ আপন মনে গান করিতেছে, কেহ অধ্যয়ন করি-তেছে, কেহ বা অধ্যাপনা করাইতেছে, তাহার যাহাকে জিজ্ঞাসা কর আপনি কে ? অমনি বলিবে আমি অমুক। এই "আমিটী" সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি, আমি অমুক ভট্টাচার্য্য, আমি অমুক ন্যায়ালঙ্কার, আমি অমুক শিরো-মণি ইত্যাদি ; কিন্তু এই নানা উপাধিগুলি বাদ দিয়া যদি তাহাদের প্রত্যেকের "আমি"র অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে প্রায় প্রত্যেকেই বলিবে "মহাশয় আমি কে তাহা জানি না", এই উত্তরই দিতে হইবে। কেন এরূপ হয় ? কেনই বা আমরা এই আমির জন্য সন্ধান করিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসি ? এই বিষয় অনু-সন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাইব যে আমাদের চিন্তার পথে বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত। সুতরাং আমার লক্ষ্যস্থানে পৌছিতে পারি না। শাস্ত্রকারেরা

এই বাধাকেই "মায়া" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইনি বড় সুরসিকা, মানুষকে বিপথে চালাইয়া দিয়া আমোদ দেখাই ইহাঁর কার্য্য, তবে ইনি নির্দ্দয়া নন। পথভ্রান্তি বশতঃ শান্তি চাহিলে, এবং খাঁটি পথের সন্ধান করিবার জন্য কেহ প্রকৃতরূপে ব্যস্ত হইলে ইনি আবার মনুষ্যকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিয়া শান্তিধামে লইয়া যান। কিন্তু হায়! দুঃখ-যন্ত্রণাময় এই সংসারে কয়জন শান্তি বোধ করেন? অহরহঃ দুঃখ-যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি। দুঃখের পর দুঃখ আসিতেছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, তবু সুখ পাইব এই আশায় বুক বাঁধিয়া উহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি। যাই কোথায়? কোন্ সুখের খোঁজে? কে জগতে সুখী হইতে চায় না? কে আরামে গা ঢালিয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে না চায়? কিন্তু আরাম মিলে কই? কুহকিনী সুখাশা মানুষকে সুখ দিবে বলিয়া লইয়া গিয়া দিবানিশি কতই না যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছে এবং প্রকৃত আমি কে ভুলাইয়া লইয়া এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহময় প্রাণকে আমি বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইতেছে। যাহারা কুহকিনীকে না চিনে তাহারা তাহা দ্বারা প্রতারিত হইয়া অকালে দেবদুর্ল্লভ মানব-জীবনকে পশুজীবনে পরিণত করিতেছে। আর যাহারা

তাহাকে চিনিয়াছে তাহারা সাবধান হইয়া বিপক্ষগামী পথিককে তারস্বরে সাবধান করিতেছে। তাই ভাগবত-কার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং"।

ক্রমশঃ।

বঙ্গবধূর কর্ত্তব্য। (১)

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

যথার্থ বাঙ্গালীর ভাষা নহে, কাজেই লেখককেও যথার্থ বাঙ্গালী নহেন বলিতে পারি, লেখকের সহধর্ম্মিণীও প্রকৃত বঙ্গরমণী না হইয়া কতকটা বাবু-ভাবাপন্না হওয়া সম্ভবপরই বটে। এই প্রকার ভাষার ন্যায় আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শয়ন ভ্রমণ, আরাধনা উপাসনা ও ভোজন ভজনাদিও বাবুদের সকলই উল্টাইয়া গিয়াছে। তাঁহারা পথভ্রষ্ট হইয়া আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে-ছেন, আমাদের ব্রত উপাসনায়, আচার-ব্যবহারে, ধর্ম্ম-কর্ম্মেও বাধা দিয়া যাহা আমরা ভালবাসিনা,

(১) ভ্রম সংশোধন—কার্ত্তিকের প্রবন্ধে 'জা' শব্দ স্থলে "ভ্রাতৃ-জায়া" এবং 'অনারেরি' স্থলে "ডিপুটী" হইবে। আঃ গৌঃ সম্পাদক।

তাঁহারা জোর করিয়া তাহা করাইয়া লইতেছেন, কাজেই আমরাও বিগড়িয়া যাইতেছি, কিন্তু আমরা বিগড়িলে বঙ্গ গৃহও বিগড়িবে; আমরাই প্রকৃত গৃহ, কিছুকাল পূর্ব্বেও আমাদের গৃহে (অন্তঃপুরে) কর্ত্তারা প্রায় প্রবেশ করিতেন না, দিবাতে একবার মাত্র ভোজন সময়ে আসিতেও বিশেষ সতর্ক করিয়া আসিতেন, এবং আমাদের কোনও কাজে হাত দিতেন না। আমরা স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজেদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ব্রতানুষ্ঠান, স্নান সন্ধ্যা ও গৃহ-কর্ম্মাদি অকুতোভয়ে করিয়া নিতাম। আমাদের বাধা দিবার কেহই ছিলনা, এমন কি আমাদের চিকিৎসাও আমরাই করিতাম, তখন আমাদের কঠিন রোগ বা সন্তানাদি প্রসূত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাহির বাটীতে সংবাদ যাইত না; প্রসববেদনা সংগোপন রাখাই একটী উত্তম ও প্রধান নিয়ম ছিল। তাই বলিয়া তখন প্রতি লক্ষেও একটী সন্তান নষ্ট হওয়া শুনিতে পাই নাই। আমাদের সতর্কতা, পবিত্রতা এবং আত্মনির্ভরতা আমরাই প্রাণ-পণে রক্ষা করিতাম। আমরা প্রাতঃস্নানাদি করিয়া অতি পবিত্র ভাবে রন্ধনাদি দ্বারা আহার্য্য প্রস্তুত করিতাম। আমরা অপবিত্র বা অভক্ষ্য জিনিস তুচ্ছ ভাবিয়া ফেলিয়া

দিতাম। আমাদের কাজের প্রতিবাদ বা বিচার ছিল না। আমরা মুড়ি মুড়কি, চালভাজা, চিড়েভাজা, নারীকেল সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ষোড়শ পোয়া তিলের লাড়ু, সর-ভাজা, নিত্য নূতন ডালডাল্‌না, শাক, টক, দধি ঘোল যাহা প্রস্তুত করিয়া দিতাম, তাহাই কর্ত্তারা সাদরে গ্রহণ করিতেন।

আর আজ আমাদের অন্তঃপুরী যেন ছেলে বাবুদের আড্ডার আড়গড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের চুলোর পাড়ে বাবুরা বসিয়া পাক দেখাইয়া দিতেছেন, আম-মাংস কিংবা অর্দ্ধসিদ্ধ মাংসই শ্রেয়ঃ বলিয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছেন; স্বেচ্ছায় আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না, ব্রত নিয়ম পূজা উপবাস পারণ করিতে বাধা দিতেছেন, ইহারই নাম আবার স্ত্রীস্বাধীনতা! বাস্তবিক বিলাতি রামপুরী চাদর বই কিছু নয়। আমরা এক্ষণে কিছুতেই হাত দিতে পারি না, আমাদের গৃহপ্রস্তুত শঙ্খ-নাড়া নিত্য নূতন ধরণের খাদ্যগুলি বাবুরা রহিত করিয়া অজ্ঞাত কুলাচারবিশিষ্ট ধন-লোলুপ ভেজাল-পারদর্শী ময়রার বিষাক্ত চর্ব্বি-মিশ্রিত মেথর-উচ্ছিষ্ট গ্রহণে লালায়িত হইয়া নিত্য নূতন পীড়ার সৃষ্টি করিতেছেন। হায়! তথাপি স্বদেশ প্রিয়তা জন্মিতেছে

না। যাহা হউক তাঁহাদের কথা বলিবার আমাদের আবশ্যক নাই। আমরা আমাদিগকে ঠিক রাখিতে চেষ্টা করিব, আমরা বিচলিত হইলে চলিবে না; আমরাই বাঙ্গালীর মা—জননী—সৃষ্টিকর্ত্রী;—আমাদিগকে বহু সাবধান হইতে হইবে। আমরা ভ্রষ্টা বা নষ্টা হইলে, আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের ন্যায় বাঙ্গালী জাতি বিলুপ্ত হইবে। মার ন্যায় জগতে আর কাহারও সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে পারে না। মার দেহের অংশ-বিশেষের নামই আত্মজ বা পুত্র, মার রক্ত-মাংসাদিতেই সন্তান। পিতা কুপথ্য করিলেও দুগ্ধ পোষ্য শিশুর কিছু হইবে না, কিন্তু মা একটুকরা লঙ্কা সেবন করিলেই সন্তানের পেট জ্বলিয়া যায়। মাকে যত সাবধান থাকিতে হয়, আর কাহাকেও তত সাবধান হইবার আবশ্যক করে না। পুত্রোৎপাদনে বা শিক্ষার সময় পিতাকেও অতি পবিত্র ও সাবধানে থাকিতে হয়। পিতার অন্যায়াচারে বা কুশিক্ষায় পুত্র চিররুগ্ণ, মূর্খ বা অসদাচারসম্পন্ন হইয়া পড়ে। পরিশেষে আর তাহার প্রতীকারও হয় না, আজীবন দুঃখই ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মাকে যে কত কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তাহার ইয়ত্বা নাই। সন্তান ধারণের পূর্ব্ব হইতেই মাকে বিশেষ

নিয়মাধীন হইতে হইবে এবং ধারণাবধি বহুবিধ শাস্ত্রীয় বিধি পালন করিলে আর রুগ্‌ণ বা কুপুত্র জন্মিতে পারে না। মার সামান্য অনিয়মে গর্ভস্থ শিশুর নিধন হইতে পারে। মার জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত কার্য্যে সন্তান নষ্ট করায় ভ্রূণ-হত্যা পাপ জন্মিতে পারে। এক্ষণে ভাব দেখি, মাকে কিরূপ সাবধান হইতে হইবে? এই জন্য বলি, বঙ্গ রমণীকে অতি সদাচারব্রতী হওয়া আবশ্যক। সদাচারব্রত পালন করিতে দেহ ও মনকে অতি পবিত্র ও সুস্থ রাখিতে হইবে। পূর্ব্বকার সুগৃহিণীদিগের মন সর্ব্বদাই চিন্তাহীন ও পবিত্র ছিল, তাঁহারা সংসারের ভাবনা কিছুই ভাবিতেন না; কেবল গৃহ-কন্না, অতিথি ও দেব-ব্রাহ্মণ সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা বাচিক, কায়িক বা মানসিক পাপ হইতে সহজেই দূরে থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিয়া পরনিন্দা করিয়া আত্মগোপনের চেষ্টা জানিতেন না, পরকে রূঢ় বাক্য বলিয়া কষ্ট দিতেন না; আত্মাভিমান বা অহ-ঙ্কার তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না, তাঁহারা পরকেও পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। প্রাণান্তেও পরদ্রব্য গ্রহণ করিতেন না, অন্য দ্বারা নিজের কাজ করাইতে জানিতেন না, তাই দৈহিক পাপ হইতে মুক্ত থাকিতেন।

তাঁহারা সর্ব্বদা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া পরের মঙ্গল কামনা করিতেন। পরানিষ্ট, পরদ্বেষ, পরদ্রব্যে লোভ বা পাপ লালসা তাঁহাদের একেবারেই ছিল না; সেই সব পুণ্যবতী, চিরশান্তিময়ী সুদীর্ঘ জীবিনী, সর্ব্বজীবে সমদর্শিনী, দেবতা-রূপিণী বঙ্গ রমণীদের এখনও অভাব হয় নাই। ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে এখনও অশীতিপরা দুই চারিটী বৃদ্ধা রমণী জীবিতা থাকিয়া বঙ্গদেশ ধন্য করিতে-ছেন। তাঁহারা লজ্জায় লজ্জাবর্তী হইতেও জড়িত হইয়া পুত্র দর্শনেও অবগুণ্ঠন টানিয়া লন; কিন্তু তাঁহাদের মন মেঘবিমুক্ত শশীর ন্যায় নির্ম্মল নিষ্পাপ, তাঁহাদের গুণ অসীম অনন্ত, তাঁহাদের জ্ঞান অনন্ত। আমরা অন্ধ, তাই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি না. তাঁহাদের মৃদু মধুর বাক্য লঙ্ঘন করিয়া চটিয়া উঠি; বুঝিনা, বাহিরে নারীকেল ফলের ন্যায় ছোলাময় হইলেও ভিতরে বহু সার বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের সামান্য সামান্য কার্য্যগুলি ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছে তাহা বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের হাতা দিয়া পরিবেশন, আহারের স্থানে জলের ছিটা দেওয়া, আহারের পূর্ব্বে পাদ প্রক্ষালন, পাকের বসন পরিবর্ত্তন, প্রাতে গোবর ছিটা দেওয়া, সন্ধ্যায় ধূপদান করা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলির ভিতর কত জ্ঞান কত বিজ্ঞান

বিদ্যমান তাহা আমরা বুঝি না। কালে যদি কেহ বুঝেন, তিনিই তাহার ব্যাখ্যা করিবেন; কিন্তু আমি বলি এগুলিও আমাদের পালন করা আবশ্যক।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-স্তোত্রম্।

(৩রা অগ্রহায়ণ সোমবার পূজা)

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদি-স্বরূপিণি।
স্থূলাতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
সূক্ষ্মাদি-সূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি।
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে।
প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

অগম্যে জগতামাদ্যে মাহেশ্বরি বরাঙ্গনে।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
দ্বিসপ্ত-কোটি-মন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি।
সর্ব্ব-শক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
তীর্থ-যজ্ঞ-তপোদান-যোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচিনি।
সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
অগম্য-ধাম-ধামস্থে মহা-যোগীশ-হৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

ইতি জগদ্ধাত্রীকল্পে।

শ্রীশ্রীমদ্রাধাশ্যামসুন্দরদেবো জয়তি।

কিশোরগঞ্জ ৺শ্যামসুন্দর দেবের আখড়ার ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিম্ব বৃক্ষ।

আখড়ার ইতিহাস লিখিতে বসিয়াই আমি প্রথমতঃ স্থানীয় অবস্থা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইব। তাহাতে অনেক অনাবশ্যক ও অরুচিকর কথা সন্নিবেশিত হওয়ায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা। সুতরাং সহৃদয় পাঠকবর্গ সমীপে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এ ক্ষুদ্র লেখকের অবান্তর কথায় অসন্তুষ্ট না হন।

আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই দেশের অথবা স্থানীয় অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অনেক প্রভিন্ন দৃষ্ট হইবে। তখনকার লোকের রুচির সঙ্গে আধুনিক জনগণের রুচির তুলনা করিলে বোধ হয় যে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল সংসারের এই পরিবর্ত্তন ভাব নৈসর্গিক। এই পরিবর্ত্তন ভাবই সংসার-সৌন্দর্য্যের হেতুভূত। ইহাই সৃষ্টির চমৎ-

কারিত্ব। দার্শনিক এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ হইয়া—“নেতি নেতি” বলেন ভক্তগণ ভগবান্‌কে দেহী বোধে পূজা করেন। যিনি সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সম্যক্ উপলব্ধি করেন, তিনিই প্রকৃত মানব নামের যোগ্য।

যে স্থানে শ্যামসুন্দর দেবের আখড়া বিরাজিত, সে স্থান এক দিন প্রকৃতির লীলা ক্ষেত্র ছিল। যেন মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি দেবী এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন।

বর্ত্তমানে যে স্থানে কিশোরগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত তাহা এবং তাহার পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ চরশোলাকিয়া, চর গাইটাল গ্রাম প্রভৃতি নরশুন্দা নদীর গর্ব্ভে ছিল। মৃতকায়া নরশুন্দা নদী তখন প্রবল বেগে প্রবাহিতা হইত। নদীর দক্ষিণ পাড়ে যেখানে ৺শ্যামসুন্দর দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেখানে একটী ক্ষুদ্র বিল ছিল। বিলের পূর্ব্বে দীর্ঘস্থানব্যাপী ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি, তৎপর শ্যামল তৃণপূর্ণ মাঠ, তৎপর মাঝে মাঝে জন-বসতি। কিশোরগঞ্জের বাজারের পূর্ব্বে এখন যে নদী প্রবাহিতা, তখন তাহার অস্তিত্বই ছিল না। ইহা পরামাণিকদের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কৃষ্ণদাস দাস কাটাইয়া দেন, তদবধি ঐ স্থানের নাম কাটাখালী হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরামাণিকদের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। বিলের দক্ষিণাংশে জলাকীর্ণ

ভূমি, মাঝে মাঝে তৃণপূর্ণ খণ্ড খণ্ড উচ্চ ভূমি। উত্তরাংশ তাল, তমাল, বাদাম, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে পরি-ব্যাপ্ত। প্রান্তবর্ত্তিনী খরস্রোতা তরঙ্গময়ী নরশুন্দা নদী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিতা। বিলের পশ্চিম পাড়ে নাগেশ্বর, নিম্ব, দেবদারু, চম্পক, বাদাম, কালাউঝা, খরচনা প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী। কোন একটী নিম্ব বৃক্ষমূল মৃৎ-নির্ম্মিত বেদী পরিবেষ্টিত ছিল। কথিত আছে রাখাল বালকগণ গো চারণ সময়ে বিশ্রামার্থ ঐ বেদী নির্ম্মাণ করে। বালকগণ ঐ বেদিতে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিত, মুক্ত গো সমূহ বিলের জল পান করিয়া বিস্তৃত প্রদেশের শষ্প ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। সায়ং সময়ে গোপালগণ গো-পাল লইয়া বাড়ী যাইত। রাখালেরা বেদা নির্ম্মাণ করিয়াছে বলিয়া তৎ-সাময়িক জনসাধারণের নিকট ঐ নিম্ববৃক্ষ "রাখাল-বৃক্ষ" বলিয়া খ্যাত ছিল। রাখালবৃক্ষের পশ্চিমে অনতি দূরে উমর খাঁর পর্ণ কুটীর, ঐ কুটীরের পশ্চিমে একটী রাস্তা দক্ষিণ হইতে আসিয়া উত্তরে নদীর পর পাড় পর্য্যন্ত গিয়াছিল। নদী পারাপারের ঐ স্থানে খেয়াঘাট ছিল। দিবসে নৌকা মাত্র চারি পাঁচবার আসা যাওয়া করিত। এখন যেমন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য সদাশয়

গবর্ণমেণ্ট রাস্তা করিয়া দিয়াছেন, তখন লোকের বাড়ীর উপর দিয়া, মাঠের উপর দিয়া, ক্ষেতের আইলের উপর দিয়া লোক যাতায়াত করিত। পথে ঘাটে দস্যু তস্করের উপদ্রবছিল, মাঠের মধ্যে গাছের আড়ালে দস্যুগণ আড্ডা করিয়া বসিয়া থাকিত; অসহায় দেখিলে পথিকগণকে মারিয়া তাহাদের সঙ্গে যাহা কিছু পাইত লইয়া যাইত। দলবদ্ধ ভিন্ন কেহ একাকী দূরদেশে গমনাগমন করিত না। উমর খাঁ বৃদ্ধ; সংসারে সে ভিন্ন তাহার অন্য কেহ আত্মীয় স্বজন ছিল না। সে ঐ নিবিড় অরণ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। দিবসে সে রাখালগণের সঙ্গে নানাবিধ গল্প করিয়া ছেলে পিলের সাধ মিটাইত। রাত্রি কাল ঈশ্বরোপাসনায় কাটাইত। উমর খাঁ একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া তৎকালিক লোকের বিশ্বাস ছিল। পথিকগণ উমর খাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াই হউক কিংবা দরিদ্র বলিয়াই হউক কিছু কিছু দান করিত; তাহাতেই উমর খাঁর চলিত। ছোট বড় সকলেরই অল্পাধিক জমি নিজের চাষে চিল। জমির ধান, কলাই, সরিষা, শাক সব্জি, বেগুণ, ছিম, লাউ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দ্বারা চলিত; গাভার দুগ্ধ, খাল বিল নদীর মাছ মারিয়া লইত, চাষের সরিষা কলুকে দিয়া তৈল লইত, জিনিষ অদল

বদল করিয়াই কারবার চলিত; টাকা পয়সার খরিদ বিক্রী খুব কম ছিল; ধান্যের পরিবর্ত্তে সব জিনিষ মিলিত; অপর্য্যাপ্ত ধান জমিতে উৎপন্ন হইত, টাকায় দুই মণ তিন মণ চাউল পাওয়া যাইত; চারি আনা পাঁচ আনা ডাইলের মণ ছিল। বাড়ীতে বাড়ীতে প্রত্যেক রমণী চড়কায় সূতা কাটিয়া তন্তুবায়কে মজুরী দিয়া কাপড় বুনাইয়া লইতেন, তাহাতেই সকল পরিবারের পরিধেয় বসনের কার্য্য চলিত। শীতকালে দুছা, গিলাপ প্রভৃতি কাপড় চড়কার সূতায় প্রস্তুত হইত। ধনী গৃহস্থ বনাত ব্যবহার করিতেন। চৈত্র বৈশাখের খর রৌদ্রে গামছা মাথায় দিয়া সকলই ৬।৭ ক্রোশ পথ চলিয়া যাইতে পারিত; জুতা ছাতার দরকার হইত না। বৃষ্টির সময়ে পাত্‌লা নামক বাঁশের তৈয়ারি তালপাতার ছাউনীর ছাতা ব্যবহার করিত; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐ পাত্‌লা ছাতায় বাঁশের ডাঁটা লাগাইয়া ব্যবহার করিতেন। কবজ, বাউটী, খারু অঙ্গনাগণের অঙ্গভূষণ ছিল। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ভদ্র লোকের বাড়ী হইতে ছিন্ন বসন মাগিয়া ব্যবহার করিত। পাথরের থালা সেকালে পবিত্র ভোজনপাত্র ছিল। অবশ্য সেকালে মাত্র জমিদারদিগের গৃহে সোণা রূপার পান ও ভোজনপাত্র দেখা

যাইত। নলের মলুয়া, বাঁশের চাটাই গৃহস্থের ব্যবহার্য্য ছিল; অবস্থাপন্ন ব্যক্তি পাটী ও মাদুর ব্যবহার করিতেন; লেপ কন্থার প্রস্তুত প্রণালী গৃহস্থেরা নিজেই জানিতেন, সকলেই সুস্থ এবং বলবান্ ছিলেন, অধিকাংশ লোকই শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিতেন। আজ কালের মত অকালমৃত্যু ছিল না। অতিথি-সেবা সকলেরই কর্ত্তব্য ছিল, সেই জন্যই কাহারও পথ খরচ লাগিত না; হিন্দু মাত্রেরই বাড়ীতে তুলসী বৃক্ষ ছিল, প্রাতে এবং সন্ধ্যার সময় বৃক্ষের নিকট ধূপ দীপ প্রদান করিয়া ভক্তি ভরে প্রণাম ও সন্ধ্যা উপাসনা করিতেন। গন্ধক দ্বারা "ভাত শোলাতে" দেশলাই প্রস্তুত করিয়া সকলেই ব্যবহার করিতেন। পরামাণিকের সময় হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে কিশোর গঞ্জ, পূর্ব্বে নাম ছিল "ভিন্ন গ্রাম"।

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

"আবাহন"—শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার রায় প্রণীত ও প্রকাশিত মূল্য ।০ আনা। ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থ, ভারতসম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর অভিষেক উৎসবে লিখিত। বিষয় ভাল, উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়, কবিতা স্ফুটনোন্মুখ, ভাষা ও ভাব মন্দ নহে।

কিশোরগঞ্জ বেদবিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী।

এবার বেদের পণ্ডিত পরম পবিত্রচেতা নিষ্ঠাবান্ সদাচারব্রত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী উপাধ্যায় মহোদয় নিযুক্ত হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ভগবান্ আমাদের বেদ শিশুকে বর্দ্ধিত করুন্। এপর্য্যন্ত প্রায় নয় শত টাকা সাহায্য আদায় হইয়াছে এবং কিঞ্চিদধিক তিন শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই তহবিল হইতেই "আর্য্য-গৌরব" বাহির হইতেছে, ইহার আয় ব্যয় সমস্তই বেদ-বিদ্যালয়ের। ইহাতে ব্যক্তিগত কাহারও নিজের কিছু স্বত্ব স্বামিত্ব নাই। নিম্নে হিসাব প্রদত্ত হইল।

জমা		খরচ	
পূর্ব্ব জমা	৪৫৫৷৵০	পূর্ব্ব খরচ--	১৭২৶০
১৩। কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক আদায় (করিমগঞ্জের বাজার হইতে)	৮২৲	২৫ নং বিল দপ্তরীর সেপ্টেম্বর মাসের বেতন মধ্যে অগ্রিম	১৲
সতী-শতক বিক্রয়লভ্য	৩৷০	২৬ নং বিল পণ্ডিতদের সেপ্টেম্বর মাসের অবশিষ্ট বেতন	৪৫৲
১৪। শীতলচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক আদায়	২৪৫৲		
	৭৮৬৵০		২১৮৶০

জের জমা— ৭৮৬৶০

(চাঁদা দাতাগণের নাম নিম্নে লেখা গেল)

সতী-শতক বিক্রয়লভ্য	৬৲
১। পরাণচন্দ্র মালী	৫৲
২। ভৈরবচন্দ্র দে	৩৲
৩। উমানাথ মজুমদার	১৫৲
৪। শচীন্দ্রচন্দ্র মজুমার	১২৲
৫। উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার	২৫৲
৬। গগনচন্দ্র মজুমদার	৯৲
৭। প্রকাশচন্দ্র মজুমদার	১০৲
৮। গৌরকিশোর ভৌমিক	৫১৲
৯। দুর্য্যোধন কৈবর্ত্ত দাস	৪৲
১০। ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস	২৲
১১। কৃষ্ণসুন্দর কপালী	১১৲
১২। পীতাম্বর কপালী	১১৲
১৩। গোলোক কপালী	৬৲
১৪। কৈলাস কপালী	৪৲
১৫। শ্যামসুন্দর কপালী	৩৲
১৬। ভগবান্‌চন্দ্র মিস্ত্রী	৩৲
১৭। মাখনলাল অধিকারী	১০৲
১৮। দানব সিংহ	১৲

জের খরচ— ২১৮৴০

২৭ নং বিল "আর্য্যগৌরব" ছাপান জন্য খরচ মায় বুকপোষ্টাদি	৩২॥/০
২৮ নং বিল পত্র এবং বিজ্ঞাপন প্রেরণ জন্য ডাক টিকিট	১৲
২৯নং বিল রাজাবাহাদুরকে আনার গাড়ী ভাড়া মধ্যে	১৲
৩০ নং বিল দপ্তরীর সেপ্টেম্বর মাসের বেতন মধ্যে পূর্ব্ব নেওয়া বাদে	১৲
৩১ নং বিল পত্রিকা রেজিষ্টরী সংবাদ জন্য টেলিগ্রাম	১৲
৩২ নং বিল রাজাবাহাদুরকে আনার গাড়ীভাড়া মাঃ উমেদ সেখ	২৲
৩৩ নং বিল রাজাবাহাদুরকে দিয়া আসার গাড়ীভাড়া মাঃ ফটিকের বাপ	২৲
	২৫৮৸০

জের জমা — ৭৮৬৵০

১৯। কুলচন্দ্র নাথ ১৲
২০। আকালী কৈবর্ত্ত দাস ২৲
২১। নদেরচাঁদ কৈবর্ত্ত দাস ১৲
২২। রামকুমার পাণ্ডব সাহা ২০৲
২৩। হরকুমার শীল ১৲
২৪। রাজেন্দ্রকুমার দত্ত রায় ১৫৲
২৫। বাঁশীরাম মাঝী ১৲
২৬। ধনঞ্জয় কর্ম্মকার ১৲
২৭। দ্বারকানাথ শীল ১৲
২৮। চন্দ্রকিশোর দে ১৲
২৯। প্যারীমোহন দাস চৌধুরী ২৲
৩০। রামনারায়ণ দাস চৌধুরী ২৲
৩১। গৌরচাঁদ দাস চৌধুরী ১৲
৩২। মথুরচাঁদ দাস চৌধুরী ১৲
৩৩। শ্রীকৃষ্ণ দাস ১৲
৩৪। গোপীচাঁদ মাল ১৲

১৪৫৲

১৫ নং শীতলচন্দ্র সেন
কর্ত্তৃক আদায় ৯৭৵০

জের খরচ — ২৫৮৶০

৩৪ নং বিল 'আর্য্য-গৌরব'
গরুর গাও হইতে আনিবার
খরচ নয় রেলভাড়া ৩৲
৩৫ নং বিল পত্রিকা পাঠান জন্য
টিকিট খরচ ৩৷০
৩৬ নং বিলে বেদবিদ্যালয়ের
বহি কাগজাদি খরিদ ৯/০
৩৭ নং বিলে পত্রিকা ছাপান
খরচ পূর্ব্ব দেওয়া বাদ
অবশিষ্ট খরচ ৮।/০

২৭৭৷৵০

চাঁদা দাতার নাম।

১। আনন্দ কিশোর রায় ১৲৫
২। গগনচন্দ্র রায় ৫৲

৩। বৈকুণ্ঠনাথ রায় ১৲
৪। গোবিন্দচন্দ্র রায় ১৲
৫। মহেশচন্দ্র রায় ১৲
৬। দেবেন্দ্রলাল রায় ৫৲
৭। কুঞ্জকিশোর সাহা ২৲
৮। জলধর রায় ১৲
৯। নবীনচন্দ্র সাহা ১৲
১০। গিরিধন সাহা ৵৹
১১। রায়চাঁদ সাহা ॥৹
১২। শরৎচন্দ্র সাহা ।৹
১৩। প্রকাশচন্দ্র সাহা ॥৹
১৪। ভারতচন্দ্র রায় ১৲
১৫। নরসিংহ রায় ৫৲
১৬। হৃদয়চন্দ্র রায় ২৲
১৭। কৈলাসচন্দ্র সাহা ॥৹
১৮। নবীন, অধর সাহা ॥৹
১৯। রামদয়াল ভৌমিক ১০৲
২০। অমরচাঁদ সরদার ৫৲
২১। ভোলানাথ সরদার ১৲
২২। রামকুমার চক্রবর্ত্তী ১৲
২৩। গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক ১৲
২৪। মহিমচন্দ্র ভৌমিক ১৲
২৫। কিঙ্কুরাম দাস ১৲
২৬। মহেন্দ্র নাথ বসাক ৫৲

২৭। বিপিনবিহারী বাড়রি ৫৲
২৮। শিবচন্দ্র সাহা ১৲
২৯। পীতাম্বর সাহা ১৲
৩০। দ্বারকানাথ মল্ল বর্ম্মন্ ২৲
৩১। রামমোহন নাথ ৷৹
৩২। দীননাথ মল্ল বর্ম্মন্ ১
৩৩। গগনচন্দ্র ধূপী ৹
৩৪। কৈলাসচন্দ্র ভৌমিক ৫৲
৩৫। নবদ্বীপচন্দ্র মজুমদার ২৲
৩৬। সাধুচরণ সাহা ২৲
৩৭। গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক ।০

৯৭৵০

"সুবচন-শতকম্"

(৫ পৃষ্ঠার পর)

(৭)

বালকস্য মনোভাবঃ শ্রাবণস্য যথা রবিঃ।
ভালবাসা হ্যবিদ্যানামস্তোদয়ৌ ক্ষণে ক্ষণে ॥

বালকের মনোভাব রবি বরষার,
অবিদ্যার ভালবাসা,
এ সবার বৃথা আশা,
ক্ষণে অস্ত ক্ষণে'দয় চঞ্চলতা সার।

(৮)

প্রাণ বিনাশকো রোগঃ কামো ধর্ম্ম-বিনাশকঃ।
প্রীতি-বিনাশকং শাঠ্যং মূর্খত্বং সর্ব্ব নাশকম্ ॥

রোগে করে প্রাণনাশ, কামে ধর্ম্ম-ক্ষয়,
শাঠ্যে প্রেম, মূর্খতায় সর্ব্ব নষ্ট হয়।

(৯)

যথাহি কূপমণ্ডূকঃ শঙ্কিতো জ্যোতিরীক্ষণাৎ।
তথাহি শঙ্কিতো দোষী সাধুজন-সমাগমাৎ ॥

জ্যোতি দেখে ভেক যথা আশঙ্কিত হয়,
সাধু দেখে তথা দোষী শঙ্কিত নিশ্চয়।

(১০)

মাতা সর্ব্বত্র পূজেতি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মাতৃ-দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥

বিচারের পরে স্থির হ'য়েছে নিশ্চয়,
মায়ের মতন পূজা আর কেহ নয়,
মঙ্গল পাইতে যদি বাসনা তোমার,
মায়ের চরণ পূজা কর অনিবার।

(১১)

গেহং শূন্যমনৈক্যেন ধনং শূন্যং কুকর্ম্মণা।
পাপেন জীবনং শূন্যং সুখশূন্যং কুভার্য্যয়া ॥

অনৈক্যেই গৃহশূন্য কুকার্য্যেই ধন,
পাতকে জীবন শূন্য অনুক্ষণ,
কুভার্য্যায় সুখ শান্তি-হীন নরগণ।

(১২)

কৃষকস্য প্রিয়ং শস্যং স্ত্রীণাং প্রিয়ং সুভূষণম্।
পণ্ডিতানাং প্রিয়ং কাব্যং সর্ব্বেষাং নন্দনঃ প্রিয়ং ॥

কৃষকের অতি প্রিয় সদা শস্যচয়,
বিভূষণ রমণীর প্রিয় অতিশয় ;
পণ্ডিতগণের কাব্য অতি প্রিয় হয়,
সবের, নন্দন-তুল্য প্রিয় কিছু নয়।

(১৩)

শুধ্যতি বৃষ্টিভির্বায়ুঃ প্রাঙ্গণং গোময়েন চ।
শুধ্যতি সলিলৈর্দ্দেহো মনঃ শুধ্যত্যহিংসয়া ॥
বৃষ্টিতে বিশুদ্ধ বায়ু, গোময়ে প্রাঙ্গণ,
সলিলে বিশুদ্ধ দেহ, অহিংসায় মন।

(১৪)

বিষং হি তনয়োঽবাধ্যো বিষং মিত্রং কুশিক্ষিতম্।
বিষমৃণং দরিদ্রস্য বিষং ভার্য্যা পরাশ্রিতা ॥
অশিক্ষিত মিত্র বিষ, অবাধ্য তনয়,
দরিদ্রের ঋণ, ভার্য্যা দুষ্টা বিষ হয়।

(১৫)

বিষং দুর্জ্জন-সংসর্গো বিষং দুর্গন্ধ-সেবনম্।
বিবাদো বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বিষঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
দুর্জ্জন লোকের সঙ্গ বিষের সমান,
দুর্গন্ধ দারুণ বিষ যাতে যায় প্রাণ,
বিবাদ বন্ধুর সহ বিষ সুনিশ্চয়,
এ সবে বলেন বিষ পণ্ডিতনিচয়।

(১৬)

ধনার্থং যানি দুঃখানি করোতি মানবঃ সদা।
জ্ঞানার্থং যদি তৎপাদং কুর্য্যাদ্দুঃখং কুতস্তদা ॥

ধনের কারণ, সদা সর্ব্বক্ষণ,
যত কষ্ট করে নর,
জ্ঞানের কারণ, কভু কোন জন,
যদি হয় যত্নপর ;
তবে কি তাহার দুঃখ রহে আর,
দুঃখজ্বালা দূরে যায়,
শুন বন্ধুগণ, কর জ্ঞানার্জ্জন,
সময় চপলা-প্রায়।

(১৭)

উদ্যমাল্লভতে লক্ষ্মীং নিরুদ্যমেন দীনতাম্।
অসত্যাল্লভতে পাপং সত্যেন পরমং সুখম্॥

নিরুদ্যমে দৈন্য, লক্ষ্মী উদ্যমেই হয়,
অসত্যেই পাপ, সত্যে সুখের উদয়।

(১৮)

বিনিন্দন্তি শঠাঃ সাধুং নাস্তিকা ইষ্ট-দেবতাম্।
নব্য-বাবুঃ কুলাচারং তত্র স্বভাব-কারণম্॥

শঠের স্বভাব এই সাধুর নিন্দন,
নাস্তিকেরা ইষ্টদেবে নিন্দে অনুক্ষণ,
নব্য বাবু নিন্দা করে স্বীয় কুলাচারে
স্বাভাবিক গুণ ইহা বিদিত সংসারে।

(১৯)

জীবিতস্য সুচিহ্নং শ্রীঃ শ্রীশূন্যং মৃত-লক্ষণম্।
প্রাণা ইব সদৈব শ্রীঃ শ্রীরিব নাস্তি চাপরা॥

জীবিত নরের চিহ্ন শ্রীই ত প্রধান,
শ্রী না থাকিলে হয় মৃতের সমান;
শ্রীই ত ধনের নাম সর্ব্ব মূলাধার,
ধনের সমান নাই ভবে কিছু আর।

(২০)

খলস্য চ প্রিয়া নিন্দা বাবুনাঞ্চ বিলাসিতা।
বিদুষাং সুপ্রিয়া বিদ্যা সংকীর্ত্তির্মহতাং প্রিয়া॥

খলের পরম প্রিয় পরনিন্দাচয়,
বাবুদের বিলাসিতা প্রিয় সুনিশ্চয়।
বিদ্বান্‌গণের বিদ্যা প্রিয় অতিশয়,
মহৎ লোকের প্রিয় সুখ্যাতিনিচয়।

(২১)

লুব্ধঃ পুরোহিতো বন্ধুশ্চাসংযতা চ সন্ততিঃ।
চৌরো ভৃত্যো গৃহং ভগ্নং দুরদৃষ্টস্য লক্ষণম্॥

লুব্ধ পুরোহিত বন্ধু পুত্র অসংযত,
চোর ভৃত্য ভগ্ন গৃহ দুর্ভাগ্যে নিয়ত।

(২২)

অলুব্ধো ব্রাহ্মণো বন্ধুঃ সুসংযতা চ সন্ততিঃ।
সদৈবানুগতো ভৃত্যো নৃণাং সৌভাগ্য-লক্ষণম্‌॥

অলুব্ধ ব্রাহ্মণ বন্ধু সংযত সন্তান,
অনুগত ভৃত্য যার সেই ভাগ্যবান্‌।

(২৩)

বারাঙ্গনা কুরূপা চেন্মুখরা বা কুলাঙ্গনা।
বীরাঙ্গনা চ যা ভীতা ন সাদৃতা জনৈর্ভবেৎ॥

কুলস্ত্রী মুখরা যদি কুরূপা গণিকা,
বীরাঙ্গনা ভীরু হ'লে নহে সুরঞ্জিকা।

(২৪)

দুষ্টস্ত্রী-সহবাসেন পর্য্যুষিতান্ন-ভোজনৈঃ।
দুর্জ্জনৈঃ সহ সম্প্রীত্যা মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

দুষ্টা স্ত্রীর সহবাস উচ্ছিষ্ট ভোজন,
দুর্জ্জনের সম্প্রীতিতে মৃত্যু সংঘটন।

(২৫)

প্রকাশতে হি পূর্ব্বাহ্ণে শুভস্য শুভ-লক্ষণম্‌।
বিকশন্তি বসন্তাদৌ কাননে কুসুমাদয়ঃ॥

মঙ্গল কার্য্যের শুভ লক্ষণ প্রকাশে,
বসন্ত দর্শনে বনে কুসুম বিকাশে।

(২৬)

সত্যেন শোধ্যতে বাণী পাতিব্রত্যেন ভামিনী।
অগ্নিনা শোধ্যতে স্বর্ণং নরঃ পুণ্যেন শোধ্যতে ॥
সতীত্বে কামিনী, সত্যে শুদ্ধ হয় কথা,
অগ্নিতে সুবর্ণ শুদ্ধ, নর পুণ্যে তথা।

(২৭)

শাস্ত্রেণ শোধ্যতে জ্ঞানং বাক্যং ব্যাকরণেন চ।
জলেন শোধ্যতে বস্ত্রং সদাচারেণ মানবঃ ॥
শাস্ত্রে শুদ্ধ জ্ঞান, বাক্য শুদ্ধ ব্যাকরণে,
জলে শুদ্ধ করে বস্ত্র, সদাচারে জনে।

(২৮)

সাধু-সমাগমৈর্গেহং পুত্রঃ পিত্রোশ্চ সেবয়া।
পবিত্রং পূজয়া পুষ্পং বদনং সত্য-ভাষণৈঃ ॥
সজ্জনের সমাগমে পবিত্র আলয়,
পিতৃপদ পূজে পুত্র সু-পবিত্র হয়;
কুসুম পবিত্র শুধু দেবতা পূজনে,
বদন পবিত্র হয় সুনৃত বচনে।

(২৯)

সার্থকং মরণং তীর্থে জীবনঞ্চ সুশিক্ষয়া।
সত্যেন সার্থকং বাক্যং দানেন সার্থকং ধনম্ ॥

মরণ সফল তীর্থে, শিক্ষায় জীবন,
সত্যেই সফল বাক্য, বিতরণে ধন।

(৩০)

অহিফেনে তথা মদ্যে গঞ্জিকাতাম্রকূটয়োঃ।
আসক্তির্দ্রবিণে গম্নে যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

গাঁজা মদ্যাদিতে গম্নে তামাকে দ্রবিণে,
কদাপিও অত্যাসক্তি করে না প্রবীণে।

(৩১)

মূর্খেষু প্রখরঃ ক্রোধো নির্জ্জনেষু চ তস্করঃ।
দুর্জ্জনে প্রখরং বাক্যং নির্ধনে প্রখরং ভয়ম্ ॥

প্রখর মূর্খের ক্রোধ, নির্জ্জনে তস্কর,
দুর্জ্জনের বাক্য, ভয় নির্ধনে প্রখর।

(৩২)

বাণীষু ভীষণা মিথ্যা পীড়াসু চ বিসূচিকা।
সরিতাং ভীষণা পদ্মা নারীষু ভীষণাঽসতী ॥

ভীষণা অনৃতা বাণী, পদ্মা স্রোতস্বতী।
ভীষণা সে বিসূচিকা, রমণী অসতী ॥

(৩৩)

নারীণামুত্তমা সাধ্বী নদীনাং জাহ্নবী তথা।
বাণীনাং সুনৃতা বাণী লতিকানাঞ্চ মালতী।

নদীতে উত্তমা গঙ্গা, নারী মধ্যে সতী,
উত্তমা সুনৃতা বাণী, লতায় মালতী।

(৩৪)

জ্ঞানং দানং দয়া ধর্ম্মঃ সত্যং বিদ্যা তপস্তথা।
সপ্তৈতানি সুবৃত্তানি পরমাণি ধনানি চ॥

দয়া, ধর্ম্ম, সত্য, বিদ্যা, তপ, জ্ঞান, দান,
এ সপ্ত সদ্‌গুণ বটে ধনে সুপ্রধান।

(৩৫)

পরো ধর্ম্মঃ কুলাচার আতিথ্যং সত্য-পালনম্।
অনুরক্তিঃ স্বভার্য্যায়াং দেবতা-গুরু-পূজনম্॥

কুলাচার সত্য বাক্য দেবতা পূজন,
স্বভার্য্যায় অনুরক্তি ধর্ম্মের লক্ষণ।

(৩৬)

রূপেণ বাধ্যতে বালা শাস্ত্রেণ শত্রবস্তথা।
ভক্ত্যা চ দেবতা বাধ্যা শাস্ত্রেণ পণ্ডিতো জনঃ॥

সুরূপে বিমুগ্ধা নারী, অস্ত্রে শত্রুগণ,
ভক্তিতে দেবতা বাধ্য, শাস্ত্রে বিজ্ঞজন।

(৩৭)

নশ্যতি চানৃতাদ্ধর্ম্মঃ কার্পণ্যেন চ বন্ধুতা।
হিংসয়া নশ্যতি জ্ঞানং শীলমসৎসমাগমাৎ॥

মিথ্যায় ধর্ম্মের নাশ, কার্পণ্যে মিত্রতা,
হিংসায় সদ্‌জ্ঞান নষ্ট, কুসঙ্গে শীলতা।

(৩৮)

সাধুঃ সাধূপমং পশ্যেদদুর্জ্জনো দুর্জ্জনোপমম্।
চৌরবৎ পশ্যতে চৌরঃ পশ্যত্যাত্মোপমং জগৎ॥

সাধু সাধু-সম দেখে দুর্জ্জনে দুর্জ্জন,
চোরে চোর দেখে সবে নিজের মতন।

(৩৯)

দুহিতা মাতরং প্রাপ্য চাগতা শ্বশুরালয়াৎ।
প্রবাসী মোদতে তদ্বজ্জন্ম ভূমি-প্রদর্শনাৎ॥

শ্বশুর আলয় হ'তে ভাবিতে ভাবিতে,
বহুদিন পরে কন্যা আসিয়া বাড়ীতে,
মাতৃ-দরশনে যত সুখ পায় মনে,
প্রবাসীর তত সুখ জন্ম-ভূ-দর্শনে।

(৪০)

শিশূনাং জীবনং মাতা জন্তূনাং পবনো যথা।
নৃপতীনাং যথা রাজ্যং সর্ব্বেষাঞ্চ তথা ধনম্॥

শিশুর জীবন মাতা জন্তুর পবন,
নৃপতির রাজ্য সম সকলেরি ধন।

(৪১)

মূষিকস্য যথাভ্যাসো দ্রব্যাণাং পরিকর্ত্তনম্।
খলস্য চ তথাভ্যাসো নরাণাং দোষ-কীর্ত্তনম্॥
অভ্যাস ত ইন্দুরের দ্রব্যের কর্ত্তন,
খলের অভ্যাস পর-দোষের কীর্ত্তন।

(৪২)

সুশীলেন জয়েন্মিত্রং বিদ্যয়া পণ্ডিতং জয়েৎ।
সুপথ্যেন জয়েদ্রোগং সত্যেন পৃথিবীং জয়েৎ॥
বিজয় করিবে মিত্রে স্বীয় শীলতায়,
করিবে পণ্ডিত জনে বিজয় বিদ্যায়;
করিবে রোগের জয় সুপথ্য সেবনে
পৃথিবী করিবে জয় সুনৃত বচনে।

(৪৩)

পবিত্রং যশসা গোত্রমার্জ্জবেনৈব মানসম্।
ধনং দানেন দীনেভ্যো জীবনং পুণ্যকর্ম্মণা॥
পবিত্র সুযশে বংশ, দীনে দানে ধন,
সারল্যে হৃদয়, পুণ্যে পবিত্র জীবন।

(৪৪)

বসনং ভূষণং ভোজ্যং বিদ্যা ধর্ম্ম উপাসনম্।
স্বজাতীনাং সদা শস্তং বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥

বসন ভূষণ খাদ্য বিদ্যা ধর্ম্মাচার,
এই সব স্বজাতীয়,
অতিশয় প্রশংসীয়,
বিপরীতে বিপরীত অনিষ্ট অপার।

(৪৫)

আত্মবৎ পরসৌভাগ্যং পুত্রবৎ পরপোষণম্।
অহিমিব পরদ্রব্যং প্রপশ্যন্তি হি সজ্জনাঃ॥
পরের সৌভাগ্য দেখে হরষিত মন,
পুত্র সম অপরের করেন পোষণ;
সর্প সম পরদ্রব্য করেন বর্জ্জন,
মহতের এই সব অপূর্ব্ব লক্ষণ।

(৪৬)

কদাচিন্নৈব কর্ত্তব্যমৃণং শান্তি-বিনাশনম্।
বরমর্দ্ধাশনং নিত্যং বরং বস্ত্র-বিবর্জ্জনম্॥
শান্তি বিনাশক ঋণ করোনা কখন,
ভাল অর্দ্ধাশন কিংবা বস্ত্র-বিবর্জ্জন।

(৪৭)

প্রীতিপ্রদং সদাপত্যং প্রীতিপ্রদশ্চ চন্দ্রমাঃ।
প্রীতিপ্রদা সতী নারী প্রীতিদা কবিতা শুভা॥
বড় প্রীতিপ্রদ হয় আপন নন্দন,
প্রীতিপ্রদ পূর্ণশশী নয়ন রঞ্জন;

প্রীতিপ্রদা সতী নারী ভবে অতুলন,
প্রীতিদা কবিতা সদা অতি সুশোভন।

(৪৮)

নির্জ্জনে শোভতে যোগী ধ্যান-ব্রত-সমন্বিতঃ।
সর্ব্বত্র শোভতে বিদ্বান্ নগরে বিজনেঽপি বা॥

বিজনে যোগীর শোভা অতি মনোহর,
সর্ব্বত্র—বিজনে গ্রামে শোভে বিজ্ঞ নর।

(৪৯)

কুলস্ত্রী শোভতে গেহে লজ্জা-বস্ত্রাবৃতা শুভা।
গণিকা শোভতে হট্টে লজ্জাবগুণ্ঠনং বিনা॥

বস্ত্রাবৃতা লজ্জাবতী শোভে কুলনারী,
গণিকা বাজারে শোভে যাই বলিহারি।

(৫০)

বৃথা দানং বৃথা বাক্যং বৃথা হি জীব-হিংসনম্।
যত্নতো বর্জ্জয়েদ্ধীমান্ বার্দ্ধক্যে পাণিপীড়নম্॥

বৃথা দান বাক্য, বৃথা জীবের হিংসন,
বৃদ্ধ কালে পরিণয়,
কদাপি কর্ত্তব্য নয়,
বিজ্ঞজন যত্নে করে এ সব বর্জ্জন।

(৫১)

ন ভবেৎ সুন্দরো লোকো নানাভূষণ-ভূষিতঃ।
প্রকৃত্যা সুন্দরো বিদ্বান্ নানাশাস্ত্র-বিশারদঃ॥

নানা অলঙ্কারে লোক সুন্দর না হয়,
শাস্ত্র-বিশারদ ব্যক্তি সুন্দর নিশ্চয়

(৫২)

সেনানাং মন্দিরং ব্যূহং সলিলং মৎস্য-মন্দিরম্।
বিদুষাং মন্দিরং জ্ঞানং সত্যঞ্চ ধর্ম্ম-মন্দিরম্॥

সৈন্যের মন্দির ব্যূহ, মৎস্যাদির নীর,
বিদ্বানের জ্ঞান, সত্য ধর্ম্মের মন্দির।

(৫৩)

পাপভাবান্বিতা লোকা নিন্দিতাঃ পিতৃদেবতাঃ।
ঘৃণিতং সংস্কৃতং কাব্যং কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥

নিন্দিত দেবতা পিতা পাপাক্রান্ত জন,
ঘৃণিত সংস্কৃত কাব্য আশ্চয্য ঘটন।

(৫৪)

মনঃ-শান্তিকরং স্বাস্থ্যং তদেব সুখ-কারণম্
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্বাস্থ্যং রক্ষেদ্বিচক্ষণঃ॥

মন-সুখকর স্বাস্থ্য সুখের কারণ,
যত্নে স্বাস্থ্য রক্ষা করে সদা বিচক্ষণ।

(৫৫)

বিমর্ষো মলিনো দীনো ভীতভীতঃ সদাতুরঃ।
শ্রীহীনো মৃদুভাষী চ পরভৃত্যস্য লক্ষণম্ ॥

বিমর্ষ মলিন দীন সদা ভীত মন,
শ্রীহীন সুক্ষীণ স্বর ভৃত্যের লক্ষণ।

(৫৬)

তপসা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পণ্ডিতান্ বিনয়েন চ
বালাঃ সুমধুরৈর্ব্বাক্যৈর্বুদ্ধিমাননুরঞ্জয়েৎ ॥

দেবে তপস্যায় বিজ্ঞে বিনয়াচরণে,
নারীকে করিবে বাধ্য মধুর বচনে,

(৫৭)

অজ্ঞানান্ধঃ কুকর্ম্মা স্যাজ্‌জ্ঞানী রতঃ সুকর্ম্মণি।
লোকপীড়াকরো দুষ্টঃ স্বভাবশ্চাত্র কারণম্ ॥

অজ্ঞান কুকর্ম্মে, জ্ঞানী সুকর্ম্মে নিরত,
দুষ্ট পরে পীড়া দেয় স্বস্ব স্বভাবতঃ।

(৫৮)

কিং সুখং যৌবনৈ রূপৈঃ কিং রাজ্যেন ধনেন চ।
সুখার্থী চিন্তয়েন্নিত্যং কেশব-চরণাম্বুজম্ ॥

রূপ-যৌবনাদি-রাজ্যে কিবা সুখোদয়,
প্রকৃত সে সুখী যেবা বিষ্ণুভক্ত হয়।

(৫৯)

ভক্তি-বশ্যা ভবেদ্দেবা ধনেন বাধ্যতে জনঃ।
কুরঙ্গো বেণু-বাদ্যেন স্নেহৈর্ব্বশ্যং জগত্ত্রয়ম্॥

দেবতা ভক্তিতে বাধ্য ধনে বাধ্য জন,
কুরঙ্গ বংশীর রবে স্নেহে ত্রিভুবন।

(৬০)

পুণ্যং সুখকরং বিদ্ধি পাতকং দুঃখদায়কম্।
ভজনীয়ং সুখং লোকে সুকৃতঞ্চ সুখাবহম্॥

অতি সুখকর পুণ্য, পাপ দুঃখকর,
লোকে সুখ চায়, সুখ সুকৃতে বিস্তর।

(৬১)

সত্যেন ধ্রিয়তে ধর্ম্মশ্চান্নেন ধ্রিয়তে বলম্।
জ্ঞানেন ধ্রিয়তে শাস্ত্রং কর্ম্মণা ধ্রিয়তে সুখম্॥

সত্যে ধর্ম্ম, অন্নে হয় বলের সঞ্চয়,
জ্ঞানে শাস্ত্র কর্ম্মে সুখ জানিবে নিশ্চয়।

(৬২)

সেবাসু চাতিথেঃ সেবা ব্রতানাং সত্যমুত্তমম্।
খাদ্যানাং সাত্ত্বিকং খাদ্যং বলানামেকতা বলম্॥

সেবাতে অতিথি সেবা, ব্রতে সত্য বড়,
আহারে সাত্ত্বিক খাদ্য, বলে ঐক্য দড়।

(৬৩)

ত্যজেৎ পরাশ্রিতাং ভার্য্যাং মলযুক্তং বিভূষণম্ ।
ত্যজেন্মিত্রং শঠং চৌরং ত্যজেদন্নঞ্চ দোষজম্ ॥

ত্যজ পরাশ্রিতা ভার্য্যা, মলিন ভূষণ,
ত্যজ শঠ চোর মিত্র, ত্যজ কুভোজন ।

(৬৪)

বিজনেঽপি বরং বাসো ন দুষ্টৈঃ সহ সঙ্গতিঃ ।
কর্দ্দমৈঃ সহ সংযোগান্মলিনং নির্ম্মলং জলম্ ॥

দুর্জ্জন সংসর্গ হ'তে ভাল, বাস বনে ;
মলিন নির্ম্মল জল, কর্দ্দম মিলনে ।

(৬৫)

পরমং সুখদং শাস্ত্রং কামদং মোক্ষদং শুভম্ ।
শস্ত্রবৎ শত্রুহন্তা চ বিপদুদ্ধারকারণম্ ॥

কামদ মোক্ষদ শাস্ত্র সুখের কারণ,
অস্ত্র সম শত্রু নাশে বিপদ-বারণ

(৬৬)

কালেঽপি স্বজনঃ শত্রুঃ কালেঽপি চেষিকা শরঃ ।
কালেঽপি ধনিকো দীনঃ কালো হি প্রবলঃ সদা ॥

কালে মিত্র শত্রু হয় ঈষিকা কামান,
কালে ধনী দীন হয় কালই প্রধান ।

(৬৭)

নির্লজ্জাঃ কামুকাঃ সর্ব্বে নিন্দকাশ্চ ভয়প্রদাঃ।
বিনীতা আদৃতা লোকে সলজ্জা কুলকামিনী ॥

নির্লজ্জ কামুককুল সংসারে বিদিত,
সকল সমাজে সদা আদৃত বিনীত ;
দুরন্ত নিন্দকগণ অতি ভয়ঙ্কর,
লজ্জাবতী কুলনারী পায় সমাদর।

(৬৮)

নৃপাণাং "সপ্তমেড্ ওয়ার্ড্" তেজস্বিনাং বিভাবসুঃ।
দেশেষু ভারতঃ শ্রেষ্ঠো নানাশস্য-ধনান্বিতঃ ॥

ভূপালে সপ্তমেডোয়ার্ড্, তেজে দিবাকর,
দেশে এ ভারত শ্রেষ্ঠ শস্যরত্নাকর।

(৬৯)

মাতরি পুত্র-বাৎসল্যং খলে শাঠ্যং বিনিশ্চিতম্।
বালেষু মধুরং হাস্যং চারুত্বং কুসুমেষু চ ॥

সন্তানে মাতার স্নেহ থাকে অবিরত,
শঠতা দুর্জ্জন খলে থাকে সে নিয়ত ;
বালকে মধুর হাসি সদা মনোহর,
কুসুমে চারুতা মরি ! থাকে নিরন্তর।

(৭০)

ফলতি যৌবনে রূপং ফলতি বিদ্যয়া মতিঃ।
ফলতি কর্ম্ম কালেন কদাচিন্ন বিপর্য্যয়ঃ॥

মানবের রূপরাশি বিকাশে যৌবনে,
বিদ্যায় বিকাশে বুদ্ধি শাস্ত্র আলাপনে;
কালে কৃত কর্ম্ম সব হয় ফলবান্,
সকল কর্ম্মের মূলে সময় প্রধান।

(৭১)

প্রত্যূষে সরিতি স্নানং প্রদোষে বায়ু-সেবনম্।
এতদায়ুষ্করং নিত্যং বদন্তীতি বিচক্ষণাঃ॥

প্রত্যূষে নদীতে স্নান, প্রদোষে ভ্রমণ,
অতিশয় আয়ুষ্কর বলে বিজ্ঞগণ।

(৭২)

ত্যজেল্লক্ষ্মীঃ কদাচারাৎ স্বাস্থ্যং কুভোজনাদপি।
অনৃতেন ত্যজেদ্ধর্ম্মঃ সর্ব্বো দৈন্যেন হি ত্যজেৎ॥

কদাচারে লক্ষ্মীদেবী করেন প্রস্থান,
কুভোজনে স্বাস্থ্য নাহি থাকে বিদ্যমান;
মিথ্যাবাদী দেখে ধর্ম্ম করে পলায়ন,
সকলেই ত্যাগ করে হেরিয়ে নির্ধন।

(৭৩)

দুর্ব্বলস্য বৃথা গর্ব্বঃ শরদি মেঘ-গর্জ্জনম্‌।
কুলটানাং বৃথা প্রেম মূর্খস্য পুস্তকং বৃথা ॥

দুর্ব্বলের বৃথা গর্ব্ব শরদি গর্জ্জন,
বৃথা বেশ্যা-প্রেম, গ্রন্থ মূর্খের সদন।

(৭৪)

ভয়প্রদো যথা সর্পস্তথাহি দুর্জ্জনো জনঃ।
যথা বিসূচিকা লোকে তথা হি কুলটাঙ্গনা ॥

সর্পের মতন দুষ্ট ভয়ঙ্কর অতি,
বিসূচিকা সম নারী কুলটা অসতী।

(৭৫)

নাস্তি ধর্ম্মাৎ পরং মিত্রং নামিত্রং পাতকাৎ পরম্‌।
ন দ্বেষাদপরাহশান্তিঃ স্বাচারান্ন পরং সুখম্‌ ॥

ধর্ম্মের সমান মিত্র খুঁজিয়া না পাই,
পাপের সমান শত্রু ত্রিভুবনে নাই ;
অশান্তি হিংসার মত আর নাহি হয়,
সদাচার সম সুখ আর কিছু নয়।

(৭৬)

ভাবয়তি বুধঃ শাস্ত্রং পরানিষ্টঞ্চ দুর্জ্জনঃ।
মাতাপত্য-শুভং নিত্যং কামিনী কান্ত-মঙ্গলম্‌ ॥

পণ্ডিত সদাই করে শাস্ত্র বিচিন্তন,
পরানিষ্ট চিন্তা করে দুরন্ত দুর্জ্জন,
মাতা চিন্তা করে সদা পুত্রের কল্যাণ,
কান্তের মঙ্গল জন্য কামিনীর প্রাণ।

(৭৭)

বিবাদেন ক্ষয়ং যান্তি ধন-ধর্ম্ম-সুখানি চ।
অশান্তির্জায়তে নিত্যং ভয়ং মৃত্যুঃ পদে পদে ॥

ধন ধর্ম্ম সুখ নষ্ট বিবাদে নিশ্চয়,
অশান্তি উৎপাত সদা মৃত্যু দুঃখভয়।

(৭৮)

কল্যাণং পণ্ডিতৈর্মৈত্র্যং কল্যাণং সৎপথে গতিঃ।
কল্যাণং হি মনুষ্যাণাং সর্ব্বত্র সমদর্শনম্ ॥

মিত্রতা বিজ্ঞের সহ সৎপথে গমন,
সর্ব্বজীবে সমভাব কল্যাণ কারণ।

(৭৯)

নরেষু ধনিকঃ শ্রেষ্ঠো গ্রহেষু ভাস্করো যথা।
ব্রতেষু প্রবরং সত্যং নারীষু চ পতিব্রতা ॥

গ্রহে রবি, ব্রতে সত্য, নরে ধনবান্,
নারী মধ্যে পতিব্রতা রমণী প্রধান।

(৮০)

নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ সদৈব কুটিলা গতিঃ।
ক্রোধবাতাদিযোগেন ভীষণা সা কুলঙ্কসা॥

রমণী নদীর অতি কুটিল গমন,
ক্রোধ বাত যোগে সদা আবিল ভীষণ।

(৮১)

নিদ্রয়া লভতে স্বাস্থ্যং মুদ্রয়া লভতে সুখম্।
সংযমৈর্লভতে ধর্ম্মং বিদ্যয়া লভতেঽখিলম্॥

মুদ্রায় বিবিধ সুখ, স্বাস্থ্য সুনিদ্রায়,
সুসংযমে ধর্ম্ম, মিলে সর্ব্বস্ব বিদ্যায়।

(৮২)

দরিদ্রস্য বৃথা ক্রোধঃ কৃপণস্য ধনং বৃথা।
অন্ধস্য হি বৃথা রূপং রোগিণাং ভোজনং বৃথা॥

বৃথা ক্রোধ দরিদ্রের কৃপণের ধন,
অন্ধের স্বরূপ বৃথা, রোগীর ভোজন।

(৮৩)

অর্থাভাবেন যদ্দুঃখং তদ্দুঃখং নৈব বর্ত্ততে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধনং রক্ষেদ্বিচক্ষণঃ॥

অর্থাভাব সম দুঃখ নাহি এ সংসারে,
কিছুতে সেরূপ আর হইতে না পারে,

প্রাণপণ করে কর অর্থ উপার্জ্জন,
অর্থ রক্ষা তরে বিজ্ঞ করে সুযতন।

(৮৪)

আরোগ্যাল্লভতে কান্তিমারোগ্যাল্লভতে সুখম্।
আরোগ্যাল্লভতে শক্তিমারোগ্যং পরমং ধনম্॥

আরোগ্য সুখের মূল শক্তির কারণ,
আরোগ্যেই কান্তিলাভ, ধনে মহাধন।

(৮৫)

ভাবুকশ্চিন্তয়েন্নিত্যং প্রকৃতিং বহুরূপিণীম্।
কামুকশ্চিন্তয়েদন্যাং কামিনীং কামরূপিণীম্॥

ভাবুক প্রকৃতি রূপ ভাবে যেইরূপ,
ভাবে কামিনীর রূপ কামুক সেরূপ।

(৮৬)

প্রিয়বাক্ ব্যবহারজ্ঞো লোভ-হীনশ্চিকিৎসকঃ।
সত্যবাদী চ দৈবজ্ঞ উন্নতিং লভতে ধ্রুবম্॥

ব্যবহারজীবী যদি প্রিয়বাদী হয়,
অর্থ লিপ্সা যদি কভু বৈদ্যের না হয়,
সত্য যদি হয় সদা জ্যোতিষ বচন,
এদের উন্নতি ধ্রুব না হয় খণ্ডন।

(৮৭)

অঙ্গারেণ যথা বস্ত্রং কর্দ্দমেন যথা জলম্।
মালিন্যং ধারয়ত্যেব শঠৈঃ সার্দ্ধং তথা মহান্॥

মলিন অঙ্গার স্পর্শে নির্ম্মল বসন,
কর্দ্দমে নির্ম্মল জল মলিন যেমন;
শঠ সহ সাধু যদি সহবাস করে,
মালিন্য সঞ্চরে তার পবিত্র অন্তরে।

(৮৮)

দীপেনৈবোজ্জ্বলং গেহং মানবশ্চ সুশিক্ষয়া।
অনলেন যথাঙ্গারঃ সৎসঙ্গেন তথা মহান্।

দীপযোগে অন্ধকার গৃহ সমুজ্জ্বল,
সুশিক্ষায় মানবের চরিত্র নির্ম্মল,
অঙ্গার মলিন অতি কালিমা বরণ,
অনল সংযোগে হয় উজ্জ্বল যেমন;
অসাধুও সাধুসহ করিলে বসতি,
ধরে সে পবিত্র জ্যোতিঃ শুদ্ধ হয় মতি।

(৮৯)

সত্যেন লভতে ধর্ম্মং ধর্ম্মেণ লভতে দিবম্।
শাস্ত্রেণ লভতে জ্ঞানং জ্ঞানেন লভতে সুখম্॥

সত্যে ধর্ম্ম লাভ, ধর্ম্মে স্বর্গ লাভ হয়,
শাস্ত্রে জ্ঞান, জ্ঞানে সুখ জানিবে নিশ্চয়।

(৯০)

দারিদ্র্যান্ন পরং কষ্টং মরণান্ন পরং ভয়ম্‌।
ন পরং বন্ধনং স্নেহাদজ্ঞানান্ন পরো রিপুঃ ॥

দরিদ্রতা হ'তে কষ্ট দৃষ্ট নাহি হয়,
মরণ হইতে আর নাহি কিছু ভয় ;
স্নেহের সমান নাহি সুদৃঢ় বন্ধন,
অজ্ঞানের মত রিপু নহে কোনজন।

(৯১)

ভিক্ষা পাতয়তে মানং শিক্ষা পাতয়তে ভ্রমম্‌।
জ্ঞানং পাতয়তে দুঃখং কুখাদ্যং জীবনং বত ॥

ভিক্ষায় মানের হ্রাস অবিরত হয়,
সুশিক্ষা পাইলে কভু ভ্রম নাহি রয় ;
জ্ঞানে নষ্ট করে দুঃখ শাস্ত্রের বচন,
কুখাদ্যে বিনষ্ট হয় দুর্লভ জীবন।

(৯২)

তাড়নেন জয়েচ্চৌরং নালাপাদ্দুর্জ্জনং জনম্‌।
সংযমেন জয়েদ্দুঃখং সদালাপেন পণ্ডিতম্‌ ॥

দুরন্ত তস্করে জয় করিবে তাড়নে,
অনালাপে জয় কর দারুণ দুর্জ্জনে ;
নিদারুণ দুঃখ জয় করিবে সংযমে,
সদালাপে জয় কর বিজ্ঞ নরোত্তমে।

(৯৩)

নরাণাং ধার্ম্মিকঃ শ্রেষ্ঠো গৃহাণামিষ্টকালয়ঃ।
বিদ্যানাঞ্চ পরা বিদ্যা ভূমীনাং জন্মভূমিকা॥

নরে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশীল, গৃহে হর্ম্ম্যালয়,
বিদ্যায় সে পরা বিদ্যা শ্রেষ্ঠা অতিশয়;
স্বদেশে বিদেশে দেখ যত আছে স্থান,
জন্মভূমি সকলের মধ্যে সুপ্রধান।

(৯৪)

পরস্ত্রী-রত-মূর্খাণাং তথা পরোপতাপিনাম্।
পর-ধনোপলুব্ধানামভয়ং বিদ্যতে কুতঃ।

পরদার রত মূর্খ পর-প্রপীড়ক,
পরধন-লুব্ধ জন, ভীত থাকে সর্ব্বক্ষণ,
অভয় না পায় সেই অশান্তি-দায়ক।

(৯৫)

জ্ঞান-বিদ্যা-বিনীতানাং তথা পরোপকারিণাম্।
পাপ-পারুষ্য-হীনানাং ভয়ঞ্চ বিদ্যতে কুতঃ॥

জ্ঞান বিদ্যা সুবিনয় যার বিভূষণ,
পর উপকার ব্রত যার অনুক্ষণ;
পাতক পারুষ্যহীন যেই মহাজন,
পৃথিবীতে নাহি তার ভয়ের কারণ।

(৯৬)

চিন্তয়েদর্জ্জিতাং বিদ্যাং চিন্তয়েৎ স্বীয়দুষ্কৃতম্।
চিন্তয়েন্মহতাং বৃত্তিং চিন্তয়েদ্ভগবৎপদম্॥

অর্জ্জিত বিদ্যার চিন্তা কর বার বার,
স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফল চিন্ত অনিবার;
মহতের সদাচার কর বিচিন্তন,
কায়মনে ধ্যান কর ঈশ্বর-চরণ।

(৯৭)

নীতিমান্ লভতে ধর্ম্মং রক্ষতি নীতিমান্ ধনম্।
শাস্ত্যেব নীতিমান্ রাজ্যং নীতিমান্ পূজ্যতে সদা॥

নীতিমান্ লভে ধর্ম্ম রক্ষা করে ধন,
নীতিমানে লোকে পূজে সদা সর্ব্বক্ষণ।

(৯৮)

গৃহ্লীয়াদ্ভক্তিমার্ত্তস্য সংযমং যতিনামিব।
বৃদ্ধস্য চ সদাচারং সারল্যং বালকস্য হি॥

দুঃখিতের ভক্তি ভাব করিবে গ্রহণ,
সংযম যতীর ন্যায় করিবে ধারণ;
সাদরে গ্রহণ কর বৃদ্ধের আচার,
বালকের সরলতা ধর অনিবার।

(৯৯)

বিজাতিরেকোঽপি করোতি নষ্টং
সমেত্য ভূরীনপি দেশবন্ধূন্।
করী বিজাতিঃ করিণো নিহন্তি
ধীমান্নচান্যং বিভৃয়াৎ কদাচিৎ ॥

স্বজাতি বিজাতি ভাব করিলে ধারণ,
তখনি সযত্নে তারে করিবে বর্জ্জন,
বুদ্ধিমান্ জন, করে না পোষণ,
স্বজনও করে যদি বিধর্ম্ম গ্রহণ।
প্রমাণ তাহার, দেখ অনিবার,
স্বজাতীয় হস্তী যবে পরপোষ্য হয়,
সে এসে বিনাশ করে অন্য হস্তি-চয়।

শল্যং শূন্যফলং ক্ষেত্রং মিত্রং সত্য-বিবর্জ্জিতম্।
শল্যমরাজকং রাজ্যং ধনহীনঞ্চ জীবনম্ ॥

শল্য ফলশূন্যক্ষেত্র মিথ্যাবাদিজন,
অরাজক রাজ্য শল্য নির্ধন-জীবন।

সমাপ্তম্।

দারিদ্র্য-শতকম্‌।

(১)

নির্ধনং নিধনমেতয়োর্দ্বয়ো-

স্তারতম্য-বিধি-মুগ্ধচেতসাম্‌।

বোধনায় বিধিনা বিনির্ম্মিতো

রেফ এব জয়-বৈজয়ন্তিকা ॥

নির্ধনে নিধনে কেবা শ্রেষ্ঠতর হয়,

বোধনের তরে, নির্ধন-উপরে,

‘রেফ’ দিয়ে করেছেন বিধাতা নির্ণয়।

(২)

কিং চিত্রং যদি রাজনীতিকুশলো রাজা ভবেদ্ধার্ম্মিকঃ

কিং চিত্রং যদি বেদশাস্ত্র-নিপুণো বিপ্রো ভবেৎ পণ্ডিতঃ।

কিং চিত্রং যদি রূপ-যৌবনবতী সাধ্বী ভবেৎ কামিনী

তচ্চিত্রং যদি নির্ধনোঽপি পুরুষঃ পাপং ন কুর্য্যাৎ ক্বচিৎ ॥

বড়ই বিচিত্র বটে রাজনীতিবিৎ

নৃপতি-ধার্ম্মিক।

চিত্র বটে মনোহর,

বেদজ্ঞ সে বিপ্রবর,

সুন্দরী যুবতী সাধ্বী আশ্চর্য্যের হয়,

নিষ্পাপ-দরিদ্র সে যে অত্যাশ্চর্য্যময়!

(৩)

কান্তাবিয়োগঃ স্বজনাপমান
ঋণস্য শেষঃ কুজনস্য সেবা ।
দরিদ্রভাবাদ্বিমুখঞ্চ মিত্রং
বিনাগ্নিনা পঞ্চ দহন্তি তীব্রম্ ॥

ভার্য্যার বিয়োগ শোক, স্বজনাপমান,
ঋণ-অশোধন,
দুষ্টের সেবন,
দরিদ্রতা দোষ দেখে মিত্রের প্রস্থান,
এ পঞ্চ অগ্নির সম পুড়ে সদা প্রাণ ।

(৪)

ত্যজন্তি মিত্রাণি ধনৈর্বিহীনং
পুত্রাশ্চ দারাশ্চ সুহৃজ্জনাশ্চ ।
তে চার্থবন্তং পুনরাশ্রয়ন্তি
অর্থো হি লোকে পুরুষস্য বন্ধুঃ ॥

অর্থ যদি নাহি থাকে মানবের ঘরে,
পুত্র-মিত্র-ভার্য্যা সবে পরিত্যাগ করে ;
পুনরায় অর্থবান্ হইলে সে জন,
স্ত্রী পুত্র বান্ধব এসে করে আলিঙ্গন ;
মানব প্রকৃত মিত্র কভু নহে ভাই,
অর্থের সমান মিত্র ভবে আর নাই ।

(৫)

বরমসিধারা তরুতল-বাসো
বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে মরণং
ন চ ধনগর্ব্বিত-বান্ধব-শরণম্ ॥

অসিধারা-ব্রত ভাল তরুতলে বাস,
ধনাভাবে ভিক্ষা ভাল কিংবা উপবাস ;
নরকে বসতি মৃত্যু মঙ্গল কারণ,
ধনমত্ত বান্ধবের লবেনা শরণ।

(৬)

সুখং বাঞ্ছতি সর্ব্বো হি ধনাত্তস্য সমুদ্ভবঃ।
গৃহবাসঃ সুখার্থায় ধনমূলং গৃহে সুখম্ ॥

সবে সুখ চায় ধনে সেই সুখ হয়,
সুখ হেতু গৃহে বাস ধনে তা উদয়।

(৭)

ন ক্লেশেন বিনা দ্রব্যং দ্রব্যহীনে কুতঃ ক্রিয়া।
ক্রিয়াহীনে ন ধর্ম্মঃ স্যাদ্ধর্ম্মহীনে কুতঃ সুখম্ ॥

ক্লেশ বিনা ধন লাভ হয় কি কখন ?
ধন বিনা কোন ক্রিয়া নহে সম্পাদন,
ক্রিয়া বিনা নহে কভু ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
ধর্ম্ম বিনা সুখ লাভ নহে কদাচন।

(৯)

বরং বনং ব্যাঘ্র-গজেন্দ্রসেবিতং
দ্রুমালয়ঃ পত্রফলাম্বুভোজনম্।
তৃণানি শয্যা পরিধান-বল্কলং
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্॥

ভাল বনবাস যথা সিংহ ব্যাঘ্র রয়,
ভাল ফল-মূলাহার ভাল দ্রুমালয় ;
ভাল বটে তৃণশয্যা বল্কল ধারণ,
ভাল নয় নির্ধনের বন্ধু সম্মিলন।

(১০)

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তাপি নালিঙ্গতি।
অর্থপ্রার্থন-শঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয়স্ব নু সখে হ্যর্থস্য সর্ব্বে বশাঃ॥

মাতা নিন্দা করে পিতা না করে যতন,
ভ্রাতা না সম্ভাষ করে নারী আলিঙ্গন,
অর্থ প্রার্থনার ভয়ে না আসে স্বজন,
অর্থে সবে বশ, কর অর্থ উপার্জ্জন।

ক্রমশঃ।

———

আর্য্য-গৌরবের মূল্যপ্রাপ্তি।

সন ১৩১৯ সাল।

১। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
২। " কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
৩। শ্রীমতী সরোজিনী বিশ্বাস, ফরিদপুর।
৪। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য, যশোহর।
৫। শ্রীযুক্ত পরশুরাম হরিদাসদাস, কিশোরগঞ্জ।
৬। " রাসবিহারী সরকার, হোসেনপুর।
৭। " গঙ্গাদাস সরকার, কিশোরগঞ্জ।
৮। " তারাচাঁদ কুঞ্জবিহারী পাল, হোসেনপুর।
৯। " রাখালচন্দ্র সাহা, কিশোরগঞ্জ।
১০। " শশিমোহন সরকার, কিশোরগঞ্জ।
১১। " নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কিশোরগঞ্জ।
১২। " রামচন্দ্র সাহা, কালিয়াচাপড়া।

(ক্রমশঃ)।

আর্য্য-গৌরব।

নিবেদন।

ভগবন্! তোমারই সদিচ্ছায় এই বেদ-বিদ্যালয় এবং আর্য্য-গৌরবের দুই মাস নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, তৃতীয় মাস চলিতেছে; তুমিই ইহাদের জীবনদাতা এবং রক্ষাকর্ত্তা। আমাদের ভয় কি? এই বিদ্যালয় এবং এই অতি অকিঞ্চিৎকর পত্রিকার প্রতি তোমার অপরিসীম দয়া, অপূর্ব্ব স্নেহ, অযাচিত আশীর্ব্বাদ এবং অভাবিত অনুগ্রহ দেখিয়া আজ আমরা ভক্তিভরে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমায় কোটি কোটি প্রণিপাত করিতেছি, তুমিই আমাদের হৃদয়ে অদম্য উদ্যম, অচলা ভক্তি এবং সুসংস্কৃতা বুদ্ধি দাও, তোমারই কৃপায় আমরা রিক্তহস্তে এই সুমহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও আজ সহস্রাধিপতি হইয়াছি, তোমারই অজ্ঞাত প্রেরণামূলে আর্য্য-বংশীয় বহুব্যক্তি সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রায় দেড় হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আবার কোনও কোনও গ্রামবাসী তাঁহাদের দান

এখনও আনিতে যাই নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন! কোনও একটী গ্রাম হইতেই আট সহস্র টাকাও দিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা ছাড়াও কয়েক মহাত্মা প্রত্যেকে এক সহস্র বা ততোঽধিক দিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হে বিশ্বেশ্বর! হে বিভো! তোমার কি অপূর্ব্ব লীলা!! কি অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র খেলা!! কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি!! কি অপার মহিমা!!! এই ভক্তিবিহীন অজ্ঞান ব্যক্তিদের ঈপ্সিত "বেদ-বিদ্যালয়ের" প্রতি তোমার কি অপার করুণা! তোমার কৃপার পার নাই, তোমার অনুগ্রহের তুলনা নাই, তোমার অতুলনীয় অনুগ্রহেই জনসমূহের হৃদয়ে এই মহদ্‌বুদ্ধির উদ্‌ভাবনা জন্মিয়াছে; দয়াময়! প্রভো! তাই তোমাতেই আমাদের কাজ সমর্পণ করিয়া তোমার দয়া প্রার্থনা করিতেছি! আর পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী মহোদয়গণকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও ভক্তিভরে সম্ভাষণ করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্রতম অকিঞ্চিৎকর পত্রিকাখানি তাঁহাদের পবিত্র করে সমর্পণ করিলাম, তাঁহারা ইহার দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল কামনা করুন্। ইহার কলেবর বৃদ্ধির জন্য এবং উন্নতি কামনায় পবিত্র ও

সারগর্ভ প্রবন্ধাদি লিখিয়া আপনাদের বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়বর্গকে ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণে অনুরোধ করুন্, ইহার পরিপুষ্টি ও উন্নতিতেই বেদ-বিদ্যালয়ের পুষ্টি ও উন্নতি, সুতরাং ইহাকে সকলেই যত্ন করুন্।

বেদ-বিদ্যালয়ের কার্য্যতা পরিদর্শন করুন্। বেদের প্রধানতম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী উপাধ্যায় মহোদয়ের নিষ্ঠা, চির হবিষ্য, সদাচার, পবিত্রতা, বেদ-পাঠ ও ধর্ম্মষ্ঠান দর্শনে, সেই পূর্ব্ব কালের সেই অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের সুপ্রতিভা যেন হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে। অন্যান্য সুশিক্ষিত পণ্ডিত ও ছাত্রগণের প্রাতঃস্নান, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ধ্যা বন্দনা ও বেদস্তোত্র পাঠ প্রভৃতি পৌরাণিক ঋষিদের ন্যায় আচরণ দর্শন করিয়া মনে এক অপূর্ব্ব অব্যক্ত সুখানুভব হইতেছে। এমন কি জিলার মাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এইচ, ই, স্প্রাই, আই, সি, এস্ মহোদয় এই বেদ-বিদ্যালয় ও পত্রিকা পরিদর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহা অবিকল স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল। আজকাল সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণই একবাক্যে সংস্কৃত ভাষা ও বেদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, এ বিষয় আমরা "আর্য্য-সন্তান" হইয়া অন্যের প্রমাণ উদ্ধৃত

করিয়া দৃঢ়তার আবশ্যক মনে করি না। যাহা প্রকৃতই সুদৃঢ় তাহার আবার বন্ধনের আবশ্যক কি? বরং বন্ধন সংযোজনা করিলেই তাহার দৃঢ়তার খর্ব্বতাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আমরা হিন্দু-সন্তান, আমাদের অন্তরে বাহিরে সংস্কৃত ভাষা মাতৃস্তন্যের ন্যায় বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে; আমাদের ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই "ওঁ মা" বলিয়া অন্তরাত্মা ভগবান্ ও ভগবতীকে স্মরণ করিয়া থাকেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ সংস্কারে, পূজায়, ক্রিয়ায়, আরাধনায়, জপে স্তবে, ধ্যানে ধারণায়, তন্ত্রে মন্ত্রে, শিক্ষায় দীক্ষায়, ব্রতে যজ্ঞে, বিবাহে শ্রাদ্ধে, সন্ধ্যায় উপাসনায় সর্ব্বদাই আমরা সংস্কৃতের ব্যবহার করিয়া থাকি। সংস্কৃত ব্যতীত হিন্দুর হিন্দুত্বই রক্ষা হয় না। পল্লীগ্রামের চির-অবগুণ্ঠনবতী নিরক্ষরা হিন্দুকুল-নারীগণও "ভিক্ষাং দেহি" "দুগ্ধং দেহি" "নমো নমোহস্তুতে" প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ অক্লেশে বুঝিতে পারেন। আমরা আর্য্যসন্তান হইয়া যদি সংস্কৃতের আলোচনা না করি, যদি সংস্কৃত শিক্ষায় দীক্ষিত না হই, যদি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতে না পারি, ভগবদ্‌বাক্য বেদ কি, তাহা জানিবার বুঝি-বার চেষ্টা না করি, তবে আমাদের আর্য্য-সন্তানরূপে

পরিচয় দিবার আবশ্যক কি? তবে ভারতে হিন্দুকুলে জন্ম লইয়াই বা ফল কি? শাস্ত্র লিখিয়াছেন—

"শত জন্ম তপঃ কৃত্বা জন্মেদং ভারতে লভেৎ।"

কারণ ভারতে জন্ম লইয়াই মুনিগণ তপস্যা করেন, যাজ্ঞিকগণ হোম করেন এবং এই স্থানেই লোকে পর-লোকের জন্য আদর পূর্ব্বক দানাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকেন, অন্য স্থানে পারলৌকিক ক্রিয়ার আদর নাই, এ আমাদের কথা নয়, ভারত সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন ভারতবাসী দেবতার ন্যায় শ্রেষ্ঠ।

"চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ॥
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ॥"

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥"

একেত মানব জন্ম দুর্লভ, তদুপরি ভারতে জন্ম-গ্রহণ—বিশেষতঃ হিন্দূকুলে অতি সুদুর্লভ; কিন্তু সংস্কৃতের

সাধনা ব্যতীত আমাদের তপস্যা শিক্ষা দীক্ষা যোগারাধনা সকলই পণ্ড হইয়া আমাদের সুদুর্লভ জীবনকে পশু-জীবনে পরিণত করিতেছে, আমরা আর্য্যাচার—মানবাচার ভুলিয়া যাইতেছি, আমরা অতলে—অকূলে পড়িতেছি,আমাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমরা কেন্দ্র-স্থল ছাড়িয়া গিয়াছি, আমরা দেব-ভাষা হারাইয়াছি। তাই বলি ভাই সকল! বন্ধুসকল! হে আর্য্যসন্তান সকল! সকলে সমবেত হও। মাতৃভাষা সংস্কৃতের প্রচার কর। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হউক্। মা ভগবতী ভারতী জাগ্রতা হউন্। মা তোমার বীণাধ্বনিতে ভারত প্রতি-শব্দিত হউক। হে বেদজননী মা, তোমাকে প্রণাম করিয়া আজ বিশ্রাম লইলাম।

"ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে॥

প্রণত সেবক—
সম্পাদক।

———

দয়াময়।

(১)

তোমার দয়ার দেব নাহি পারাপার,
অন্তরে বাহিরে দয়া করেছ বিস্তার।
যখন যে দিকে চাই,
তখনি দেখিতে পাই,
একমাত্র তুমি বিভু দয়ার আধার।
জীবের জীবন তুমি জগতের সার।

(২)

কত যে করেছ তুমি দেব দয়াময়,
কেমনে বুঝিব মোরা দুর্ব্বলহৃদয়।
রাখিতে জীবের প্রাণ,
সৃজিয়াছ বিশ্বপ্রাণ,
অন্তরে বাহিরে যাঁর গতি বিশ্বময়,
জীবের জীবন যাঁর অভাবে বিলয়।

(৩)

তারি মত তুমি দেব চিরসহচর,
তব বলে বলীয়ান্ বিশ্বচরাচর ;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
প্রতি পরমাণু ধরে,

রক্ত মাংস যুড়ে তুমি আছ মহেশ্বর,
বুঝিয়া না বুঝি মোরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি নর।

(৪)

করেছ অনন্ত কোটি জীবের সৃজন,
সবে কর সমভাবে দয়া বিতরণ ;
যবে যাহা প্রয়োজন,
দিতেছ তা সেইক্ষণ,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব তায় নহে কদাচন,
অক্ষয় ভাণ্ডার তব মুক্ত সর্ব্বক্ষণ।

(৫)

অন্ধের নয়ন তুমি মৃতের জীবন,
সেবকের কল্পতরু পতিত পাবন ;
তুমি রবি, তুমি কবি,
তুমি জীব, তুমি ছবি,
তুমি জল, তুমি ফল, তুমি হুতাশন,
চন্দ্রমা নক্ষত্র তুমি নভঃ সমীরণ।

(৬)

তুমি যোগ, তুমি ভোগ, চিদানন্দময়,
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমিই আশ্রয়,

তুমি পিতা, তুমি মাতা,
তুমি প্রভু, তুমি দাতা,
তুমি রাজা, তুমি প্রজা, তুমি সর্ব্বময়,
স্থূল সূক্ষ্ম পরমাণু তুমিই নিশ্চয়।

(৭)

তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি সিদ্ধেশ্বর,
ভূধর কানন নদী পৃথিবী সাগর।
তোমারি এ লীলা খেলা,
তোমারি এ ভব-মেলা,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় তুমি সর্ব্বেশ্বর,
কারণ কারণ তুমি পর পরাৎপর।

(৮)

দয়াময় দয়ারূপে পুষ প্রতিক্ষণ,
চিনিতে তোমায় তবু পারি না কখন,
আছ তুমি দেহে প্রাণে,
আছ তুমি সর্ব্বস্থানে,
বিচিত্র এ লীলা তব বুঝি না কেমন,
দেখিতে চাহিলে কেন হও অদর্শন ?

শ্রী—

পৌরাণিক উপাখ্যান।

বীরবিক্রম।

"ধেনূনান্তু শতং দত্ত্বা যৎফলং লভতে নরঃ।
তস্মাৎ পুণ্যং কোটিগুণং প্রতিজ্ঞাপালনে দ্বিজঃ॥"
"পদ্মপুরাণম্ স্বর্গখণ্ডম্।"

কাঞ্চিপুরে বীরবিক্রম নামে শূদ্রজাতীয় এক মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি অতিশয় রূপবান্, সদ্‌বক্তা, দাতা, বলবান্, সত্যশীল, সর্ব্বজনপ্রিয়, বিদ্বান্, দেব-অতিথি-পূজক, পিতৃভক্ত, প্রতিজ্ঞা-পালক, সভ্য ও পুত্রবান্ ছিলেন, বিশেষতঃ সর্ব্বদাই তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন।

একদিন ছলক্রমে তরুণ ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করিয়া এক শ্বপচ (চণ্ডাল) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল; এবং তাহাকে বলিল 'হে বীর! হে প্রাজ্ঞ! আপনি আমার বাক্য শুনুন্। আমার গুণবতী শুভা ভার্য্যা মৃতা হইয়াছে, এক্ষণে আমি কি করি? কোথায় যাই? আপনি আমাকে অনুকম্পা করুন্। যে ব্যক্তি জনসাধারণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিবাহ করাইয়া দেয়, তাহার দান ব্রত অথবা অন্য যজ্ঞের কি প্রয়োজন?"

মহাত্মা বীরবিক্রম ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, "ব্রহ্মন্! আমার বাক্য শুন, আমার একটী স্বরূপ-সম্পন্না, সর্ব্বগুণান্বিতা বালা কন্যকা আছে। হে বিপ্র! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি বিধিপূর্ব্বক দান করিতে পারি, এই আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহা অন্যথা হইবে না।" ব্রাহ্মণ অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া বলিল, তুমি অতি সত্বর আমাকে তোমার শুভান্বিতা বালিকা কন্যা দান কর, কারণ—

"বিলম্বে বহুবিঘ্নস্যাদিতি শাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।"

বীরবিক্রম বলিলেন, "তোমাকে কল্য কন্যাদান করিব ইহার অন্যথা নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়া যে প্রতিজ্ঞা পালন না করে সে পুরুষাধম, তাহার নরকে যাইতে হয়।" বীরবিক্রম ইহা বলিয়া স্বীয় পুরোহিত কৃষ্ণ-শর্ম্মা ও মন্ত্রী এবং জ্ঞাতিবর্গকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। কৃষ্ণশর্ম্মা কহিলেন কি আশ্চর্য্য! তুমি কেমন করিয়া প্রাণাধিক-প্রিয় কন্যাকে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিতেছ? বিশেষরূপে না জানিয়া কখনও কন্যাদান করিও না। তাঁহার জ্ঞাতিগণ ও পিতৃপিতামহাদি সকলেই নানারূপে নিষেধ করিলেন, যাহার দেশ, গোত্র, ধন, শীল,

জাতি, বয়সাদি জানা নাই তাহাকে কখনই কন্যাদান করা যায় না, বিশেষতঃ কেহ কেহ তাহাকে শ্বপচ বলিয়াও পরিচয় দিয়া কন্যাদানের সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেন। কিন্তু সেই মহাত্মা বীরবিক্রম সকলকেই অনুনয় করিয়া বলিলেন, "আমি কখনও কথার অন্যথা করিতে পারিব না, আমি সর্ব্বপ্রকারে অশক্ত।

"কদাচিদন্যথা কর্ত্তুং ন শক্লোমি চ সর্ব্বথা।"

এই বলিয়া তিনি কন্যাদানে উপক্রম করিলেন, জ্ঞাতিগণ তাঁহার কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হইল। তাঁহার সত্য শুনিয়া স্বয়ং ভগবান্ তথায় আবির্ভূত হইলেন।

"সত্যং তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
আবির্বভূব সহসা চারুহ্য গরুড়ং মুনে॥"

ভগবান্ বলিলেন—

"ধন্য তে চ কুলং ধন্যো ধন্যস্তে জননী পিতা।
ধন্যং তে বচনং সত্যং ধন্যং তে দক্ষিণং করম্॥
ধন্যং কর্ম্ম চ তে জন্ম ত্রৈলোক্যে নৈব বিদ্যতে।
এবং তে কর্ম্মণা সাধো চোদ্ধারং কুরু মে কুলম্॥"

কি আশ্চর্য্য! কি অপার মাহাত্ম্য! সত্যবাদীর প্রতি ভগবানের কি অপূর্ব্ব দয়া, তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। তাঁহার কুল ধন্য, মাতা পিতা ধন্য, তাঁহার দানকারী দক্ষিণকর ধন্য, ত্রৈলোক্যে কেহ তাঁহার তুল্য নাই, তাঁহার জন্ম ধন্য বলিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার পারিবারিক সকলকে শ্বপচ জামাতা সহ গরুড়ধ্বজ বিমানে আরোহণ করাইয়া গোলোকে লইয়া গেলেন। দেখ ভগবানের মহিমা! দেখ সত্যবাদার প্রতি দয়া!

শ্রী—

পৌরাণিক উপাখ্যান।

বাহুরাজ-চরিত।

পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশ বৃকরাজার পুত্র বাহু নামে এক প্রজ্ঞাবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি সসাগরা পৃথিবী পালন করিতেন, তদীয় পালনগুণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অপরাপর জাতি স্ব স্ব বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপে সপ্ততি সংখ্যক অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন। তিনি নীতিশাস্ত্র-বিশারদ, শত্রুজয়ী ও পরোপকারী ছিলেন। তদীয়

সুশাসনবলে প্রজালোক বড়ই সুখে কালযাপন করিত। পৃথিবী ফলপুষ্পবতী ও সর্ব্বশস্যশালিনী হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যথাসময়ে বৃষ্টি করিতেন। প্রজা-লোকের পাপ বৃদ্ধি ছিল না, তপস্বিগণ নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করিতেন। এইরূপ শুভলক্ষণসম্পন্ন কৃতজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ সেই রাজা নবতিসহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু একদা হঠাৎ লোভ বশতঃ সেই পবিত্র রাজার মনে ঈর্ষার সহিত সর্ব্ব অনর্থের মূল প্রবল অহঙ্কার উদিত হইয়াছিল যে, আমি সমস্ত লোকের শাসনকর্ত্তা, রাজা ও বলবান্। আমি অসংখ্য যজ্ঞ করিয়াছি, আমা অপেক্ষা পূজ্য কে? আমিই জ্ঞানবান্, শ্রীমান্, সর্ব্বশত্রুজেতা, সমস্ত দ্বীপের অধিপতি, বিশ্বজয়ী, শিক্ষক, গুণবান্, বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, অজেয় ও অব্যাহতৈশ্বর্য্য—আমা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী আর কে আছে? সেই রাজার সর্ব্ব অনর্থের নিদান অজ্ঞান-নিবন্ধন এইরূপ অহঙ্কার উপস্থিত হইলে সেই সঙ্গে কামাদি রিপুও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্য নিশ্চিতই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যৌবনকাল, অর্থ সম্পদ্, প্রভুতা ও অবিমৃষ্যকারিতা—ইহাদিগের এক একটীই অনর্থের মূল, যে পুরুষে চারিটী বিদ্যমান, তথায়

বিষম অনর্থই ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বলোকবিরুদ্ধা, স্বদেহ-ক্ষয়কারিণী, সর্ব্বসম্পদ্‌নাশিনী পাপ অসূয়াও তদীয় হৃদয়ে প্রবল হইয়াছিল। অবিবেচক পুরুষের সম্পত্তি, শরৎ-কালের নদীর মত অতিশয় চঞ্চল জানিবে। অসূয়াবিষ্ট-চিত্ত লোকের সম্পদ্‌ তুষানলে বায়ু সংযোগের ন্যায় বিনশ্বর। অসূয়াবান্‌ দম্ভাচারী ও কর্কশভাষীদিগের ইহকালেও সুখ নাই এবং পরকালেও গতি নাই। বিশেষতঃ অসূয়াক্রান্ত চিত্ত ও নিষ্ঠুরভাষীদিগের প্রিয়জন পুত্র বা বান্ধব—সকলেই শত্রু হইয়া থাকে। (১) যে ব্যক্তি পরস্ত্রী দর্শনে নিত্য অসূয়া করে, সে নিজেরই

---

(১) অসূয়াবিষ্টমনসাং যদি সম্পৎ প্রবর্ত্ততে।
তুষাগ্নিবায়ুসংযোগমিব জানীধ্বমুত্তমাঃ॥
অসূয়োপেতমনসা দম্ভাচারবতাং তথা।
পরুষোক্তিরতানাঞ্চ সুখং নেহ পরত্র চ॥
অসূয়াবিষ্টমনসাং সদা নিষ্ঠুরভাষিণাম্‌।
প্রিয়া বা তনয়া বাপি বান্ধবা বাপ্যরাতয়ঃ॥
যোঽসূয়াং কুরুতে নিত্যং সমীক্ষ্য চ পরশ্রিয়ম্‌।
সর্ব্বস্বপক্ষচ্ছেদায় কুঠারো নাত্র সংশয়ঃ॥
মিত্রাপত্য-গৃহ-ক্ষেত্র-ধন-ধান্য-যশঃসু চ।
হানিমিচ্ছন্‌ নরঃ কুর্য্যাদসূয়া সততং দ্বিজাঃ॥
(বৃহন্নারদীয়পুরাণম্‌)

সর্ব্বস্বচ্ছেদনে কুঠার প্রয়োগ করিয়া থাকে। অসূয়া করিলে পুত্র, মিত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য ও যশের হানি হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিবে অসূয়া করিলে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবিনী। লক্ষ্মীপতি ভগবান্ তাহার প্রতি বিমুখ হন। তিনি অনুকূল থাকিলে যেরূপ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিমুখ হইলে পদে পদে অনর্থ ঘটিয়া থাকে। তাঁহার কৃপা-কটাক্ষ যতদিন থাকে, ততদিন পুত্র পৌত্র, ধন ধান্য ও গৃহাদি বিরাজমান থাকে। অধিক কি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি থাকিলে, মূর্খ, অন্ধ, বধির, জড়, দুর্ব্বল ও অবিবেচক—সকলেই শ্লাঘাস্পদ হয়। যাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি না থাকে, তাহার সৌভাগ্য হানি হয় এবং তৎসঙ্গে অসূয়াদি দোষ ও বিশেষতঃ প্রাণীদিগের প্রতি দ্বেষ আসিয়া পড়ে। যে কোন ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করিলে, অশেষ প্রকারে শুভ হানি হইয়া থাকে, যে পুরুষে অসূয়া বিদ্যমান তাহার প্রতি বিষ্ণু বিমুখ হইয়া থাকেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নিখিল কল্যাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অহঙ্কার বিবেক নষ্ট করে, অবিবেক অনুজীবীর হানি করে, ইহা হইতেই বিপত্তির উদ্ভব; অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবে, অসূয়াদি দোষ অহঙ্কারের অনুগামী, সুতরাং অহঙ্কার

হইলে অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অহঙ্কার ও অসূয়াক্রান্ত রাজা বাহুর হৈহয় ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি রাজগণ শত্রু হইয়া উঠিলেন, এক মাস উভয় পক্ষের ঘোর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে বাহুরাজ পরাস্ত হইয়া পত্নীর সহিত অরণ্য আশ্রয় করিলেন। এইরূপ অবস্থায়ও সেই রিপুগণ ভবিষ্যদ্ভয়ে তদীয় গর্ভবতী পত্নীর গর্ভ বিনাশের জন্য ঘোরতর বিষ প্রয়োগ করিল। রাজা বাহু তদায় গর্ভিণী পত্নীর সহিত স্বকর্ম্মের উদ্দেশে বিলাপ করত নিদাঘতাপে পদব্রজে যাইতে যাইতে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেন।

অকস্মাৎ সম্মুখে বৃহৎ সরোবর দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। অসূয়াবিষ্টচিত্ত রাজার ভাব দর্শনে সরোবর-বাসী পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে প্রবেশ করিয়া এইরূপে রাজার নিন্দা করিতে লাগিল। হায়! ধিক্, অসূয়া জগতের কি কষ্টকরী, এই পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, নিখিল গুণে অলঙ্কৃত, সকলের শ্লাঘনীয়, অশেষ সম্পত্তিশালী হইয়াও দোষান্বিত হইলে সকলেই নিন্দা করিয়া থাকে। ত্রিজগতে স্বকীর্ত্তির তুল্য মনুষ্যের মাতা নাই, আর অকীর্ত্তির তুল্য মৃত্যুও নাই। বাহু-রাজার বনগমন দেখিয়া নিজ রাজ্যবাসী সমস্ত লোকই

শত্রু নিধনের তুল্য সন্তোষ লাভ করিয়াছিল। অকীর্ত্তি কাহাকে না নষ্ট করিয়া থাকে? হায় অকীর্ত্তির সমান মৃত্যু, ক্রোধতুল্য শত্রু, নিন্দা সম পাপ ও মোহ-সদৃশ ভয় নাই। অসূয়ার সমান অকীর্ত্তি, কামের তুল্য অনল, বিষয় বাসনার সদৃশ বন্ধন ও সঙ্গ দোষের ন্যায় বিষও নাই।”(১)

রাজা বাহু এই প্রকার মনস্তাপে জরাগ্রস্ত হইয়া ঔর্ব্ব মুনির আশ্রম সমীপে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তদীয় গর্ভিণী ভার্য্যা বহু বিলাপ করত সহগমনে মানস করিলেন। স্বয়ং কাষ্ঠরাশি আনয়নপূর্ব্বক চিতা সজ্জিত করিয়া স্বামী সহ চিতারোহণে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে তেজোনিধি ঔর্ব্বমুনি ধ্যানবলে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া পতিব্রতা বাহু-মহিষীর সমীপে ঝটিতি সমাগত হইলেন। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া মুনি এই ধর্ম্মগর্ভ বাক্যগুলি বলিলেন,—“অয়ি কল্যাণি পতিব্রতে! ঈদৃশ অতি সাহসের কার্য্য করিও না; তোমার গর্ভে শত্রুহন্তা চক্রবর্ত্তী সন্তান অবস্থিতি করিতেছে। যাহাদিগের

(১) নাস্ত্যকীর্ত্তিসমো মৃত্যুর্নাস্তি ক্রোধসমো রিপুঃ।
নাস্তি নিন্দাসমং পাপং নাস্তি মোহসমং ভয়ম্॥
নাস্ত্যসূয়াসমাকীর্ত্তি র্নাস্তি কামসমোঽনলঃ।
নাস্তি রাগসমঃ পাশো নাস্তি সঙ্গসমং বিষম্॥

পুত্র বালক, যাহারা গর্ভবতী, যাহাদিগের রজোদর্শন হয় নাই এবং যাহারা রজস্বলা, তাহাদিগের সহগমন নিষিদ্ধ আছে। অয়ি সুব্রতে! ব্রহ্মহত্যাদি পাপের বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু দাম্ভিক, নিন্দক, ভ্রূণহত্যাকারী, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ধর্ম্মদ্বেষী ও বিশ্বাসঘাতকের নিষ্কৃতি নাই। অতএব এই ভ্রূণ-হত্যারূপ মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার সকল দুঃখ মোচন হইবে। (১)

মুনির বাক্য শ্রবণে পতিব্রতা রাজমহিষী তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মুনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—অয়ি! সুব্রতে! রোদন করিও না, তোমার অতঃপর শ্রীলাভ হইবে। রাজপুত্রি! অশ্রুমোচন করিও না, মুক্ত অশ্রু মৃত ব্যক্তিকে সত্যই দগ্ধ করিয়া থাকে; অতএব শোক পরিত্যাগ কর। "মা মুঞ্চাশ্রু মহাবুদ্ধে প্রেতং দহতি তত্ত্বতঃ।" এই বলিয়া মুনিবর পুনর্ব্বার বলিলেন,—

---

(১) ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং প্রোক্তা নিষ্কৃতিরুত্তমৈঃ
দম্ভস্য নিন্দকস্যাপি ভ্রূণঘ্নস্য ন নিষ্কৃতিঃ॥
নাস্তিকস্য কৃতঘ্নস্য ধর্ম্মোপেক্ষারতস্য চ।
বিশ্বাসঘাতকস্যাপি নিষ্কৃতি র্নাস্তি সুব্রতে॥

"পণ্ডিতে বাতিমূর্খে বা দরিদ্রে বা শ্রিয়ান্বিতে।
দুর্বৃত্তে বা যতৌ বাপি মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতা।"

দেখ কি পণ্ডিত, কি মুর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি যতী, কি দুর্বৃত্ত, মৃত্যুর কাছে সকলই সমান। নগরে, বনে, সমুদ্রে, পর্ব্বতে কর্ম্মানুসারে অবশ্যই জীবের ফল ভোগ হইবে। দুঃখ যেমন প্রার্থনা না করিলেও উপস্থিত হয়, সুখও সেরূপ আসে। এ বিষয়ে দৈবই প্রবল। ইহ-জীবনে প্রাক্তন কর্ম্মেরই ভোগ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে দৈবই কারণ, জীব কখনই কারণ নহে। হে কমলা-ননে! গর্ভ বা বাল্যকালে, যৌবনে বা বৃদ্ধাবস্থায় জীবকে মৃত্যুবশ হইতে হইবেই হইবে। ভগবান্ কর্ম্মাধীন জীবগণকে বিনাশ ও রক্ষা করেন, জীব হেতুমাত্র; অজ্ঞ লোকেরাই তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে থাকে। অতএব তুমি এই মহাদুঃখ ত্যাগ করিয়া সুখী হও, পতির কর্ম্ম কর এবং বিবেক বিষয়ে স্থির হও। এই শরীর অযুত অযুত দুঃখ ও ব্যাধিতে পূর্ণ এবং দুঃখ ভোগ মহা-ক্লেশ ও কর্ম্মপাশে বদ্ধ।" মহামতি ঔর্ব্বমুনি এইরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপ করাইলেন। রাজমহিষীও শোক ত্যাগ করিলেন! তখন তিনি অভিবাদনপূর্ব্বক মুনিবরকে কহিলেন,—

"মহাত্মারা যে পরার্থ ফল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা বিচিত্র নহে, বৃক্ষ কখন স্বকীয় ভোগের জন্য এই পৃথিবীতে ফল ধারণ করে না। যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ জ্ঞাত হইয়া সদ্বাক্যে সান্ত্বনা করেন, তাঁহাতে বৈষ্ণব ও সত্ত্বগুণ, বিরাজমান আছে,—যেহেতু সে সর্ব্বভূত-হিতাকাঙ্ক্ষী। "অন্যদুঃখেন যো দুঃখী যোঽন্যহর্ষেণ হর্ষিতঃ। স এব জগতামীশো নররূপধরো হরিঃ॥" যে অন্যের দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখিত হয়, সে ব্যক্তি নররূপধারী সাক্ষাৎ জগদীশ হরি। সুখ দুঃখ হইতে মুক্তির জন্য সজ্জনেরা শাস্ত্র শ্রবণ করেন, যদি তাঁহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তবে সকলেরই দুঃখ দূর হইয়া থাকে।

"যত্র সন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে তত্র দুঃখং ন বাধতে।
বর্ত্ততে যত্র মার্ত্তণ্ডঃ কথং তত্র তমো ভবেৎ॥"

সাধুগণ যেখানে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তথায় দুঃখ থাকে না, মার্ত্তণ্ড বর্ত্তমানে অন্ধকার কি দেখা দিতে পারে?

এইরূপ বলিয়া তিনি মুনিপ্রদিষ্ট প্রণালী ক্রমে নদীতীরে নিজ পতির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পবিত্রাত্মা মুনি সেই শব দর্শন করিবামাত্র দেবরাজের ন্যায় কোটি বিমানের অধিপতি হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। পুণ্যাত্মার দৃষ্টিতে সদ্গতি হয়।

"কলেবরং বা তদ্ভস্ম তদ্ধূমঞ্চাপি সত্তমাঃ।
যদি পশ্যতি পুণ্যাত্মা স যাতি পরমং পদম্॥"

স্বাধ্বী স্বামীর সদ্গতি দর্শনে প্রবুদ্ধ হইয়া ঔর্ব্ব-মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক সযত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। সেই পতিব্রতা ভক্তি-সহকারে প্রতিদিন তাঁহার সেবা করায় পাপ মুক্ত হইয়া শুভলগ্নে শত্রু-প্রদত্ত বিষের সহিত পুত্র প্রসব করিলেন! সাধুসঙ্গের কি অলৌকিক শক্তি! ইহাতে সকল বিষ নিবারণ হয় ও অশেষ কল্যাণ প্রসব করে। যথা—

"অহো সৎসঙ্গতি র্লোকে কিং বিষং ন নিবারয়েৎ।
ন দদাতি শুভং কিংবা নরাণাং মুনিরুত্তমাঃ॥"

মহাত্মাদিগের শুশ্রূষা জ্ঞানাজ্ঞানকৃতপাপ এবং শত্রু সকল বিনষ্ট করে। সৎসঙ্গে জড়ও পৃথিবীতলে পূজ্য হয়, তাই ভগবান্ শম্ভু কলামাত্র চন্দ্রকে ধারণ করিয়াছেন। সৎসঙ্গ মনুষ্যের ইহকালে ও পরকালে পরম সমৃদ্ধি প্রদান করে। 'সন্তঃ পূজ্যতমাস্ততঃ' সজ্জন অতীব পূজ্য। মহাত্মাদিগের গুণ ব্যাখ্যায় কে সমর্থ? দেখুন তদীয় গর্ভস্থিত বিষ সত্ত্বাশ্রিত হইলেও মুনির প্রসাদে বিনষ্ট হইয়া গেল। পরে তেজস্বী ঔর্ব্বমুনি গরের (বিষের) সহিত পুত্র দর্শনে জাতকর্ম্মাখ্য সংস্কার

সমাখ্যা করিয়া সগর নাম রাখিলেন। তপোবললব্ধ মধু ও ক্ষীরাদি দ্বারা তাঁহাকে পোষণ করিলেন এবং চূড়াকরণাদি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া রাজবিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন। পরে তাঁহাকে যুবা ও উপযুক্ত পাত্র দর্শনে স-মন্ত্র সমস্ত শস্ত্র প্রদান করিলেন। তখন সগর ঔর্ব্বমুনির নিকট যথাবিধি শিক্ষিত হইয়া বলবান্, গুণবান্, ধার্ম্মিক, শুচি, কৃতজ্ঞ ও ধনুর্দ্ধারীর অগ্রগণ্য হইলেন। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে মুনির জন্য সমিৎ কুশাদি আহরণ করিতেন। একদা স্বকীয় মাতাকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে বলিলেন—"মাতঃ! আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন? তাঁহার নাম কি? তিনি কে? এই সমস্ত অনুগ্রহ করিয়া বলুন্। জগতে পিতৃহীন লোকে জীবন্মৃতের তুল্য।" যথা—

"দরিদ্রোঽপি পিতা যস্য আস্তে স ধনদোপমঃ।
যস্য মাতা পিতা নাস্তি সুখং তস্য ন বিদ্যতে।
ধর্ম্মহীনো যথা মূর্খঃ পরত্রামুত্র সত্তমে॥"

যাহার দরিদ্র পিতাও বর্ত্তমান, সে ধনপতির সমান; যাহার পিতামাতা নাই, ধর্ম্মহীন মূর্খের ন্যায় তাহার ইহকালে ও পরকালে সুখ নাই।

শাস্ত্রই বলিতেছেন, যথা—

"মাতঃ পিতৃ-বিহীনস্যাপ্যজ্ঞস্যাপ্যবিবেকিনঃ।
অপুত্রস্য বৃথাজন্ম ঋণগ্রস্তস্য চৈব হি॥
চন্দ্রহীনা যথা রাত্রিঃ পদ্মহীনং যথা সরঃ।
পতিহীনা যথা নারী তথা পিতৃবিয়োজিতঃ॥
ধর্ম্মহীনো যথা জন্তু র্ধনহীনো যথা গৃহী।
শিশুহীনো যথা বেশ্ম তথা পিতৃ-বিয়োজিতঃ॥
হরিভক্তিবিহীনস্তু যথা ধর্ম্মো মুনীশ্বরাঃ।
ন ফলেত মনুষ্যাণাং তথাপিতৃকজীবনম্॥
অস্বাধ্যায় যথা বিপ্রোঽনাতিথেয়ো যথা গৃহী।
দানশূন্যং যথাদ্রব্যং তথা পিতৃ-বিয়োজিতঃ॥
সত্যহীনং যথা বাক্যং সদ্বিহীনা যথা সভা।
তপো যথা দয়াহীনং তথা পিতৃ-বিয়োজিতঃ॥
গুণহীনা যথা নারী জলহীনা যথা নদী।
অশান্তিদা যথা বিদ্যা তথাপিতৃকজীবনম্॥
যথা লঘুতরোলোকে মাতর্যাচ্ঞাপরো নরঃ।
তথা পিতৃ-বিহীনস্তু লঘু দুঃখশতান্বিতঃ॥" (১)

অতএব মাতঃ! আমার ন্যায় দুঃখী নাই, আমাকে

---

(১) ইহার সংস্কৃত এত সরল যে বঙ্গানুবাদ অনাবশ্যক।

সত্বর পিতৃতত্ত্ব অবগত করুন্। মাতা পুত্রের দুঃখে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আমূলাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া সগর কোপে আরক্ত-লোচন হইয়া শত্রুবধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন সত্যবাদী সগর জননীকে প্রণাম করিয়া মুনির নিকট বিদায় লইয়া কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া কুলগুরুকে প্রণাম করিলেন এবং গুরু জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সমস্ত জানিতে পারিলেও তিনি তাঁহাকে স্বকার্য্য নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ মুনিও তাঁহাকে ঐন্দ্র, বারুণ, ব্রাহ্ম, আগ্নেয় অস্ত্র এবং অজেয় খড়্গ ও অনুপম ধনু প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করি-লেন। একমাত্র ধনু দ্বারা পিতৃ-শত্রুদিগকে পুত্র, পৌত্র ও অনুচরবর্গের সহিত স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। কতি-পয় শত্রু তদীয় ধনুর্ম্মুক্ত সরানলের সন্তাপ হইতে পলায়ন করিল, কেহ বিকীর্ণ কেশে বল্মীকের উপরে অবস্থান করিল, কেহ তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল, কেহবা দিগম্বর হইয়া জলে প্রবেশ করিল। শক ও অপরাপর রাজবর্গ জীবনের আশায় তদীয় গুরু বশিষ্ঠ মুনির

শরণাগত হইল। এইরূপে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া গুরু সন্নিধানে আগমন করিলেন। বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে আগত দেখিয়া শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা ও শিষ্যের অভিমত কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়, ক্ষণমাত্র তদ্‌বিষয়ে বিবেচনা করিলেন। পরক্ষণেই কাহাকে মুণ্ডন এবং কাহাকে শ্মশ্রুল এবং কাহাকে বেদবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বশিষ্ঠ মুনি কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের হতপ্রায় অবস্থা দেখিয়া সগর তাঁহাকে বলিলেন,—"হে গুরুদেব! মদীয় রাজ্য-হরণোদ্যত এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে কেন বৃথা রক্ষা করিতেছেন; আমি সর্ব্বথা ইহাদিগকে বধ করিব। দেখুন, ধর্ম্মদ্বেষিগণকে দেখিয়া যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, সেই সর্ব্বনাশের মূল সন্দেহ নাই; দুর্জ্জনেরা প্রথমে মদমত্ত হইয়া সকল জগৎকে পীড়া দেয়, পরে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অত্যন্ত সাধুভাব ধারণ করে। মায়ার কি আশ্চর্য্য কার্য্য, পাপচিত্ত খলেরা যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন নিষ্ঠুরতা আচরণ করে। কল্যাণার্থী ব্যক্তি শত্রুগণের দাসত্ব, বারবণিতার সৌহার্দ্দ্য ও সর্পের সাধুতার প্রতি বিশ্বাস করেন না। খলেরা প্রথমে যে দন্ত প্রকাশ করিয়া হাস্য করে, নিজ সামর্থ্যক্ষয়ে তাহা শীঘ্র আর প্রকাশ করে না এবং যে জিহ্বায় পরুষ বাক্য উচ্চা-

রণ করিয়া ছিল, তাহাতেই অতি সকরুণ বাক্য বলিয়া থাকে। নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ নিজশুভার্থী লোক খলের সাধুত্বে বা দাসত্বে কখনই বিশ্বাস করিবে না। হে গুরো! আপনি প্রণত দুর্জ্জনের প্রতি মনের প্রীতি দেখাইবেন না; কারণ খলজন যাঁহাকে আশ্রয় করে, তাঁহারই জীবন হরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রণত দুর্জ্জন, কপট মিত্র ও দুষ্টা ভার্য্যাকে বিশ্বাস করে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব হে গুরুদেব! ব্যাঘ্রাচারী গোরূপধারা এই শত্রু-দিগকে রক্ষা করিবেন না, আপনার প্রসাদে ইহাদিগকে বধ করিয়া পৃথিবী ভোগ করিতে আমায় দিউন্।" বশিষ্ঠ দেব তাঁহার সারগর্ভ বাক্য শুনিয়া মনে মনে প্রীতি লাভ করিলেন ও কর দ্বারা সগরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—"হে মহাত্মন্! সাধু! সাধু!! সত্য বলিতেছ, সন্দেহ নাই; তথাপি আমার কথা শুনিয়া শান্তি লাভ কর। আমি তোমার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী ইহাদিগকে পূর্ব্বেই হতপ্রায় করিয়াছি, নিহত ব্যক্তির বধে তোমার কি প্রীতি হইবে? হে ভূপতে! সর্ব্বজন্তুই কর্ম্মপাশে নিয়ন্ত্রিত, তথাপি পাপ কর্ম্মে নিহত সেই জন্তুগণকে কেন তুমি বধ করিবে? এই দেহ পাপ-জনিত ও পাপেই হত, কিন্তু আত্মা পূর্ণতা বশতঃ অভেদ্য।

ইহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। জন্তুগণ নিজ নিজ কর্ম্ম-ফল ভোগের হেতুমাত্র; দৈবই কর্ম্মের মূল, এই জগৎ সেই দৈবের অধীন। অতএব সেই দৈবই শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন কর্ত্তা; পরতন্ত্র মনুষ্যের কার্য্য করিবার শক্তি কি আছে বল? শরীর যখন পাপোৎপন্ন ও পাপেই বর্দ্ধিত এবং পাপই উহার মূল, তখন জানিয়া শুনিয়া কেন তদ্বধে উদ্যত হইতেছ? হে রাজন্! আত্মা বিশুদ্ধ হইলেও পাপমূল দেহে থাকা প্রযুক্ত পণ্ডিতবর্গ উহাকে দেহী বলিয়া থাকেন। হে বাহুনন্দন! এই পাপমূল দেহবধে তোমার কিছুই কীর্ত্তি হইবে না, অতএব ইহাদিগকে বধ করিও না।" গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তিনি নিষ্কোপ হইলেন। তখন মুনি হস্ত দ্বারা মহাত্মা সগরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ মুনি তদীয় পিতা বাহুরাজের বিশাল রাজ্যে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন রাজা সগর পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

শ্রী —

দেবী ভাগবত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হেনকালে মহাবীণা করিয়া বাদন,
আসিলা নারদ ঋষি ব্যাসের সদন।
প্রীতি সহকারে মুনি করিয়া দর্শন,
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর পূজিলা চরণ।
নারদ ব্যাসের হেরি বিষণ্ণ বদন,
জিজ্ঞাসিলা কিবা চিন্তা কর তপোধন।
ত্বরা করে বল তাহা করো না গোপন,
তপস্বীর মনে কেন চিন্তা অকারণ।
ব্যাসদেব কহে শুন ব্রহ্মার তনয়,
'অপুত্রের গতি নাই' ভাবিয়া নিশ্চয় ;
পুত্র লাভ তরে মম আকুল অন্তর,
কার উপাসনা করি বল মুনিবর ?
ব্যাসের বচন শুনি' কহে দ্বিজবর,
যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি আমার গোচর,
এই প্রশ্ন পিতা মম ভেবে মনে মনে,
জিজ্ঞাসিয়া ছিলা পূর্ব্বে বিষ্ণুর সদনে।

প্রশ্ন শুনে ধ্যানে মগ্ন হন নারায়ণ,
ধ্যানস্থ দেবেশে পিতা করিলা স্তবন।
কহিলেন "তুমি দেব জগতের পতি,
কার ধ্যান কর তুমি অগতির গতি ?
তোমায় ধ্যানস্থ দেখে জন্মেছে বিস্ময়,
আমার বিস্ময় কভু অমূলক নয়।
দেব ! তব নাভিপদ্মে লইয়া জনম,
জগতের কর্ত্তা আমি বিশ্বে অনুপম।
জগতের প্রভু তুমি সৃষ্টির কারণ,
তুমিই সংহার কর ওহে জনার্দ্দন।
তোমার ইচ্ছায় হয় প্রলয় সৃজন,
রুদ্রও তোমার আজ্ঞা করেন পালন।
তোমার আদেশে উঠে তরুণ তপন,
তোমার আদেশে বহে পবিত্র পবন।
তোমার আদেশে তাপ দেয় হুতাশন,
তোমার আদেশে মেঘ করে বরষণ।
তবে তুমি কার ধ্যান কর নারায়ণ।
দয়া করে কহ মোরে অপূর্ব্ব কথন।"
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য কহিলা শ্রীপতি,
কহিতেছি, এক মনে শুন সে ভারতী।

"যদিও বা জানে দেব দৈত্য নরগণ,
তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি স্থিতির কারণ ;
সংহারের কর্ত্তা হন রুদ্র মহেশ্বর,
তথাপিও বেদেতার আছে মতান্তর।
বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ করেছে নির্ণয়,
তুমি, আমি, মহেশ্বর সবে শক্তিময়।
শক্তি-বলে কর তুমি বিশ্বের সৃজন,
শক্তি-বলে করি আমি জগৎ পালন।
শক্তি-বলে মহেশ্বর করেন সংহার,
শক্তি-বিনা কার্য্য করে হেন সাধ্য কার ?
তোমাতে রাজসী শক্তি সদা বিরাজিত,
আমাতে সাত্ত্বিকী শক্তি জানিবে নিহিত।
তামসী সংহারশক্তি রুদ্রে বর্ত্তমান,
শক্তির অভাবে মোরা অশক্ত অজ্ঞান।
শক্তির অধীন আমি আছি সর্ব্বক্ষণ,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার করহ শ্রবণ।
শক্তির ইচ্ছায় মম অনন্ত শয়ন,
শক্তির ইচ্ছায় মম পুনঃ জাগরণ।
সর্ব্বদাই আমি মহাশক্তির অধীন,
শক্তির ইচ্ছায় তপঃ করি বহুদিন।

শক্তির ইচ্ছায় করি লক্ষ্মীতে বিহার,
শক্তির ইচ্ছায় করি দানব সংহার।
জান ব্রহ্মা পূর্ব্বে পঞ্চ সহস্র বৎসর,
মধু-কৈটভের সঙ্গে ভীষণ সমর।
শক্তির প্রসাদে তারা হয়েছে নিধন,
শক্তি-ভিন্ন কোন কার্য্য নহে সম্পাদন।
এ সব ত নহে কভু তব অগোচর,
কেন পুনঃ জিজ্ঞাসিয়া চাহিছ উত্তর ?
আমার পুরুষ ভাব শক্তির ইচ্ছায়,
বিচরণ তাঁর তরে সমুদ্র শয্যায়।
বরাহ নৃসিংহ কূর্ম্ম বামনাবতার,
যুগে যুগে নানারূপ ইচ্ছায় তাঁহার।
তাঁরি লীলা তাঁরি খেলা সকল (ই) তাঁহার,
তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম প্রিয় হয় কার ?
পুনঃ পুনঃ জন্ম মম তাঁহারি কারণ,
স্বেচ্ছায় বিবিধ জন্ম করিনি গ্রহণ ?
গোলোকে লক্ষ্মীর সহ বিহার যাঁহার,
মৎস্যাদি জোনিতে জন্ম স্বেচ্ছায় কি তাঁর ?
স্বাধীনতা হীন আমি—চির পরাধীন,
তাই দৈত্য সঙ্গে যুদ্ধ করি বহু দিন।

শক্তির ইচ্ছায় ভাল মন্দ ক্ষণে ক্ষণে,
অবিরত ঘুরি আমি বিহঙ্গ-বাহনে।
তোমারি সমক্ষে পূর্ব্বে করহ স্মরণ,
স্খলিত হইল যবে ধনুক-বন্ধন,
মস্তক খসিয়া মম পড়িল কোথায়,
প্রাণপণে খুঁজে তাহা কেহ নাহি পায়।
কবন্ধ শরীর মম করিয়া দর্শন,
'হয়ে'র মস্তক আনি' করিলে যোজন।
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তোমার কৃপায়,
'হয়গ্রীবা' দিয়া পূর্ণ করিল আমায়।
তদবধি মম নাম, হয় "হয়গ্রীব"।
হে ব্রহ্মা স্বাধীন তবে বল কোন্ জীব ?
স্বাধীন হ'তেম যদি ওহে চতুর্ম্মুখ !
তবে কি হইত মম এই সব দুখ ?
অতএব জান আমি না হই স্বাধীন,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সব শক্তির অধীন।
শক্তিরূপা মহেশ্বরী আমার উপর,
সে শক্তির ধ্যান আমি করি নিরন্তর।
এ গূঢ় রহস্য শুনে বিষ্ণুর বদনে,
বলেছিলা পূর্ব্বে পিতা আমার সদনে।

অতঃপর ব্যাসদেবে কহিলা নারদ,
শক্তির সাধনা কর যাইবে আপদ্।
পুত্রের বাসনা যদি কর মুনিবর,
শক্তি পূজা কর ত্বরা পাবে পুত্র-বর।
নারদের বাক্য শুনে ব্যাস তপোধন,
কায়মনে শক্তিধ্যানে হইলা মগন।
দেবী ভাগবত গাথা অতীব মধুর।
শুনিলে পাতক খণ্ডে দুঃখ যায় দূর।

ক্রমশঃ

আমি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জগতের সৃষ্টপ্রাণী মধ্যে একমাত্র মনুষ্য জাতিই ভাষাদ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে। কেহ কেহ পশু পক্ষীর ভাষাও বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় নহে। মনুষ্য জাতির প্রত্যেকেই স্ত্রী পুরুষ ভেদে, আপনাকে আমি বলিয়া প্রকাশ করে; এই আমি স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির সাধারণ সংজ্ঞা।

স্থতরাং উহার কোন লিঙ্গ নাই। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ একই রূপ। আবার কি বড় কি ছোট, কি ধনী কি নির্ধন, কি রাজা কি প্রজা, পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য দীন দরিদ্র কুটীরবাসী পর্য্যন্ত আপনাকে আমি বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। সসাগরা ধরার সম্রাট্ আপনাকে আমি বলেন, স্থতরাং আমি দীন ভিখারী হইয়া আমিও আমাকে 'আমি' বলিব এইটী কি উচিত? এই প্রশ্ন কাহার মনে উদয় হয় না। সম্রাট্ ভিখারীকে 'আমি' বলিতে শুনিয়া ক্রুদ্ধ বা তাহার আমি বলার অধিকার কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টিত হন না; ভিখারী ও সম্রাট্ তাহার নিজেকে আমি বলেন; স্থতরাং সে তাহাকে কি প্রকার আমি বলিব এই কল্পনা মনে স্থান দেয় না। তবে কি ধনী কি নির্ধন, কি রাজা কি প্রজা, কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকলেরই একটি সাধারণ ভিত্তি ভূমি আছে, যেখানে অন্য প্রকার বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, মান, অপমান, অভিমান ও আভিজাত্য প্রভৃতির লীলাভূমি। এই ব্যবহারিক জগতে সকলে এক; তবে এইটি কি ভগবানের লীলা এবং এই লীলার ভিতরে কি বিশেষ কোন কৌশল নিহিত আছে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের

লোকও আপনাকে আমি বলে, আবার মুচি, মেথর পরিয়া প্রভৃতিও আপনাকে আমি বলে। এই আমিত্ব তবে কি অন্যায় নহে? জাতি, সমাজ ও বর্ণের সর্ব্বোচ্চ শিখরস্থিত ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্য গর্ব্বিত জনগণ তবে কি ভুলক্রমে এই একত্বটুকু রাখিয়া দিয়াছেন, না ইহা বিশ্ব-নিয়ন্তার ইঙ্গিতে মানবকে মোহ পথ দেখাইয়া দিয়া মানব-জীবন যে 'কর্ম্মভূমি' তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই রহিয়া গিয়াছে।

এই আমি কে? ইহার খোঁজ করিতে শিক্ষা দেও-য়ার জন্যই চারি বেদ, উপনিষদ্ সমূহ, ষড়্দর্শন, গীতা, ভাগবত, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ প্রভৃতির প্রকাশ বা প্রচার। ইহারই সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মহর্ষি জনক রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও সর্ব্বত্যাগী; ইহাকে পাইবার অথবা জগৎকে পাইবার উপায় নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইবার জন্যই অতি আদরে লালিত রাজার কুমার শাক্যসিংহ ভোগলালসা বিসর্জ্জন করিয়া কৌপীনধারী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন। ইহারই জন্য শুকদেব চিরবৈরাগী। ইহারই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মহাযোগী ঈশা নিজের প্রাণকে তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ করিয়া জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়াছিলেন।

এবং ইহার জন্য মহম্মদকে মক্কা হইতে তাড়িত হইয়া মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী, অন্যান্য দেশে দুই চারিটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতে পরিষ্কার মেঘশূন্য রজনীতে প্রকাশিত তারকাবলীর ন্যায় অতি পুরাকাল হইতে কত শত শত অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। বেদোক্ত ঋষি মধুচ্ছন্দ, মেধাতিথি, কাণ্ব, কপিল, পিপ্পলাদ, যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, গৌতম, কণাদ, পতঞ্জলি, জৈমিনী, ব্যাস, নানক প্রভৃতি আমাদের জন্য কি অমূল্যই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতা নরনারায়ণ অর্জ্জুনকে বলিয়া মুক্তির পথ কত সহজ করিয়া গিয়াছেন। ইহার সর্ব্বত্রই আমি কে তাহার খোঁজ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আমির খোঁজই অধ্যাত্ম বিদ্যা, তাই ভগবান্ "অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাম্" বলিয়া অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কালবশে ভারতের দুর্দ্দিন আসিল, অধ্যাত্ম বিদ্যার মহিমা ভুলিয়া ভারতবাসী ভোগসুখে মত্ত হইল। বেদ বেদাঙ্গ ও বেদান্তসমূহ বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গেল এবং

কামিনী ও কাঞ্চন অধ্যাত্ম বিদ্যার স্থান অধিকার করিল। দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করা দূরে থাকুক্, স্বয়ং ভগবান্ আছেন কি না এই সন্দেহে মানব-মন বিলোড়িত হইতে লাগিল; ধর্ম্মকথা ব্যঙ্গোক্তিতে পরিণত হইল, এমন সময় ভারতকে এই করাল অধর্ম্ম কালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কামারপুকুর নামক নগণ্য গ্রামে কালোচিত বিদ্যাবুদ্ধিহীন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুত্থান হইল। ভারতের চারিদ্দিকে শান্তি-বারি বর্ষিত হইল, তখনও বহু লোক পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ দেবদুর্লভ সর্ব্বজনারাধ্য পরম পবিত্র অমূল্য পরশমণিকে চিনিতে না পারিয়া আদর করিতে পারিল না। কেবল যাঁহারা বহু ভাগ্যবলে ও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশে তাঁহাকে চিনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন বা সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে চিনিয়া এবং তাঁহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলেন। চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাসী ভক্তগণ দেখিতে পাইলেন, জগতের কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্ররাশিকে সরল বিশ্বাসের মহাগ্নিতে গলাইয়া বহুকাল নিক্ষিপ্ত ময়লারাশি পরিষ্কার করত যেন পুনরায় জমাট করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শরীর গঠিত হইয়াছে। শাস্ত্রের অতি গভীর ও কঠিন তত্ত্ব সমূহ রামকৃষ্ণ জীবনে নিত্য

নৈমিত্তিক কার্য্যের ন্যায় সহজ হইয়া গিয়াছে। ত্যাগের অবতার ভগবান্ রামকৃষ্ণ কি প্রকারে আমি কে খোঁজ করিতে হয়, তাহা স্বীয় জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, এবং ঐ পথের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় কামিনী ও কাঞ্চন যে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, তাহাও জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই মহাপুরুষ জগৎ-সমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করত প্রচার করিলেন, আমরা যে আমি কে আমি বলি, তাহা প্রকৃত আমি নহে, উহা দেহাত্মবোধ মাত্র। ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সম্বলিত এই দেহকে আমি বলিয়া ধারণা করা এবং যাহাতে ইন্দ্রিয়গণ পরিতৃপ্ত থাকে, ও দেহ সুস্থ থাকে, ইহাই একমাত্র সাধনা—এই ধারণাই অবনতির, এমন কি বিনাশের অদ্বিতীয় হেতু। এই ধারণা হইতেই মানুষ এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য এত লালায়িত হয় এবং জগতের অকিঞ্চিৎকর সুখরাশি অর্জ্জন করিবার জন্য সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। হায়! এই ধারণার বশবর্ত্তী হইলেই মানবকে পরিণামে কি ভয়ানক দুর্গতিই না ভোগ করিতে হয়। বর্ত্তমান জগৎ অথবা কলিকালের কার্য্যপ্রণালী নিঃশব্দে এই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? যদি তাহাই না হইত তবে মানুষ অর্থের জন্য এত লালায়িত কেন?

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল অর্থ অর্থ বলিয়া দিন যাপন করিতেছে কেন? কিসে অর্থ সঞ্চিত হইবে, কি করিলে ধনাগমের পথ পরিষ্কার হইবে, কি উপায়ে কোষাগার পূর্ণ হইবে, দিবানিশি এই চিন্তায় মানবমন বিঘূর্ণিত হইতেছে কেন? কাহারও যেন শান্তি, বিশ্রাম করিবার অবসর নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, আছে কেবল দারুণ অর্থচিন্তা; যেখানে যাও, শুনিতে পাইবে এইটি করণীয় নহে, কারণ ইহা অর্থকরী নয়, এইটি স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ ইহাতে অর্থাগমের বন্দোবস্ত বা পন্থা নাই। অর্থকরী না হইলে সেটি যেন বিবেচ্য বিষয়ই নহে, কারণ অর্থই আমাদের প্রাণ, অর্থই আমাদের বাঁচিবার হেতু; অর্থ থাকিলে আমরা বাঁচিব, নতুবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব, এই ভাবনা কে আনিয়া দিল? ইহার মূলে কি দেহাত্ম বোধ দেখিতে পায় না?

কোন জিনিষের স্থায়িত্ব অর্থদ্বারা সূচিত হয়; যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকিলে, এই কার্য্য হইতে পারে, নতুবা ইহা কয়দিন টিকিবে, চিন্তাশীল পাঠক এই বিষয় একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি? কে অর্থকে এই সর্ব্বোচ্চস্থান প্রদান করিল? জিনিষের বা কোন বিষয়ের বা কোন কার্য্যের মূলভিত্তি অর্থ, এই ধারণা কে

জন্মাইল? মুখে আমরা সকলেই ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং তিনিই সকল করেন, ইহাও বলিয়া থাকি; বৈষয়িক কোনও কিছুর অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, ভগবানের নাম না করিয়া এবং তাঁহার অনুগ্রহ, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা না করিয়া অর্থের উপর এত জোর দেই কেন? এবং পরিমিত অর্থ সঞ্চিত হইলে, আর কোনও ভাবনা নাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হই কেন? পরিমিত অর্থ সঞ্চিত হইলে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলেন কি না, তাহার জন্য বড় বেশী অপেক্ষা করি না কেন? সত্য বটে আমরা পূর্ব্বের সংস্কার ও আচারের বশে প্রত্যেক কার্য্যে সর্ব্ব প্রথমে শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করি, কিন্তু প্রত্যেক আপন আপন মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি, মনের সর্ব্বোচ্চস্থান কে অধিকার করিয়াছে। অর্থ না ভগবান্? যদি শ্রীভগবান্ সর্ব্বোচ্চস্থানের অধিকারী হইতেন, তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া যদি আমরা কৃতার্থ হইতাম, তবে অর্থ না থাকিলে এইটি হইতে পারিবে না, এই চিন্তা আমাদের মনে স্থান পাইত না। মুখ ও মনকে এক করিয়া যখন চিন্তা করি, তখনই নিজের কার্য্য দেখিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হই। মুখে বলি ঈশ্বর সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার ইচ্ছা

ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না; কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারি কই? যদি পারিতাম, তবে অর্থ হইল না বলিয়া চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিত না। এই দেহাত্ম বোধ বা মিথ্যা আমিকে বর্জ্জন করিতে পারিলে মানুষ সুখী হইতে পারে এবং কোনও কার্য্য দেখিয়া আর সে ভয় পায় না। অথবা তাহার স্থায়িত্বে শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রার্থী হয় না। এই মিথ্যা আমিকে দূর করিয়া সতত আমির প্রতিষ্ঠা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। দিব্যজ্ঞানের বিকাশ ভিন্ন মিথ্যা আমিকে মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয় না। পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, দেহাত্মক বোধ বা মিথ্যা আমি যদি সহজে যাইবার নয় তবে "থাক শালা দাস আমি হ'য়ে" অর্থাৎ বহু চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াও যদি মিথ্যা আমি দূর করা না যায় তবে তাহাকে জগতে দাস করিয়াই রাখা যাইত। কেবল জ্ঞানমার্গের সাধক মিথ্যা আমিকে সম্পূর্ণ রূপে বিলোপ করিতে পারেন, তাঁহাদের সংখ্যা সংসারে অতি বিরল। মিথ্যা আমিকে ভক্তগণ জগতের দাস করিয়া রাখেন ইহাই ভক্তিমার্গ। জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝায় ভগবান্ তাহা সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। যদি তাহা ভোগ করিতে বাসনা থাকে,

তবে আমি ও আমার ত্যাগ করিয়া ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না; এই ত্যাগই সত্য, আমিকে চিনিবার মূলমন্ত্র। এই ত্যাগ পূর্ণমাত্রায় অভ্যাস করিতে পারিলে যখন কোনও মানুষ সিদ্ধ হয়, তখনই এই আমিত্ব ও অসুখকর সংসার নন্দনকাননে পরিণত হয়; তখন নরত্বের ভিতরে ব্রহ্মত্ব ফুটিয়া উঠে এবং নরত্বই ব্রহ্মত্বে পরিণত হয়, তখন নর আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বই অনুভব করে। মহা-ত্যাগী ঈশার ন্যায় তখন সে বলিতে পারে, "আমিও আমার পিতা এক। তুমি আমাকে দে'খয়াছ, আর আমার পিতাকে দেখ নাই?" তখন মিথ্যা আমি বিলুপ্ত হয় এবং দেহ-আবরণের ভিতর দিযা সত্য আমিকে দেখা যায়।

ক্রমশঃ

শ্রী—

বঙ্গবধূর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেব পব)

আমরা কি উপায়ে পবিত্রা, ধার্ম্মিকা, নীরোগা, দীর্ঘ-জীবনী, শান্তিদায়িনী এবং সকলের প্রিয়কারিণী হইতে

পারি, তাহাই প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ চিন্তনীয়। পৌরাণিক আর্য্যনারীগণ বহুশত বৎসর নীরোগ ও পবিত্র জীবন লাভ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিদ্বারা ভারতকে হিন্দুজাতীয় সতী ও পবিত্রতার পবিত্রতেজে উজ্জ্বল ও অতুলনীয় করিয়া গিয়াছেন। সে গৌরবের এখনও ধ্বংস হয় নাই, এই সে দিন আমাদের চক্ষের উপরে কলিকাতা রাজধানীর মধ্য সহরে একটী বঙ্গবধূ হাসিতে হাসিতে স্বীয় পরিধেয় বসনে অগ্নি সংযোগ করিয়া স্বামিসহ সহমৃতা হইয়া সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এই প্রকার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহলক্ষ্মী-প্রণেতার সাধ্বী পত্নী এবং ময়মনসিংহের একটী সম্ভ্রান্ত উকীল-পত্নী মৃত পতির সহগমন করিয়াছিলেন। এসব মাত্র ৩।৪ বৎসরের কথা; প্রাচীনাদের দিকে চাহিলে প্রতি গ্রামে গ্রামেই এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। এখনও অতিবৃদ্ধা যাঁহারা জীবিতা আছেন, তাঁহাদিগের সরলতা-ময় সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে আমরা অবাক্ হই, তাঁহাদের শরীর যেন ধর্ম্মময়, পাপ প্রবঞ্চনা তাঁহাদের দেহ স্পর্শও করিতে পারে না, আমরা তাঁহাদের অনাবশ্যকীয় লজ্জা (পুত্র দর্শনেও অবগুণ্ঠন), বালকোচিত কার্য্য ও ব্যবহার দর্শনে সময় সময় উপহাস করিয়া

থাকি, কত কৌশলে তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধ সাজাইয়া দিই, কিন্তু তাঁহারা তাহার কোনও উত্তর দেন না বা তাঁহাদের কর্ত্তব্যে বিরত হন না, নির্জ্জনে নিজেদের কাজই করিয়া থাকেন। ইহা কি তাঁহাদের মানসিক শক্তির পরিচয় নয়? তাঁহাদের এতদূর সংযম ও সহ্যগুণ আছে বলিয়াই তাঁহারা দেবতা, সাধ্বী ও নিষ্পাপা। আর আজ আমরা সামান্য কথায়ই জ্বলিয়া উঠি, সামান্য অভাব সহিতে পারি না, সামান্য ক্ষুধায় অখাদ্য আহার করি, সামান্য কষ্ট ব্রত উপবাস ছাড়িয়া দিই, সামান্য কারণে সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া লই, হায়! হায়!! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়বেগও আমরা সহিতে পারি না, কারণ আমরা সংযমহীন পশু; আমাদের কার্য্যে, বাক্যে, কর্ত্তব্যে সংযমের ছায়াও স্পর্শ হইতে দেই না, তাই আমরা ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সরলতা, পবিত্রতা, জ্ঞান, মান, সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি, ক্ষান্তি সবই হারাইয়াছি; কিন্তু এসব মানসিক বৃত্তিগুলির পরিবর্ত্তে আমরা কতকগুলি শারীরিক বিলাসিতা বৃত্তির আশ্রয় লইয়াছি। অঙ্গ-সৌষ্ঠবের বিবিধ বেশ ভূষা, বিচিত্র কেশ বিন্যাস ও বিজাতীয় গন্ধ সাবানাদি দ্বারা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সব সর্ব্বনাশকর

দুষ্প্রবৃত্তিগুলি মধ্যবিত্ত গৃহিণীদের মধ্যেই অত্যধিক পরিমাণে কার্য্য করিতেছে। তাঁহাদের ব্যবহারে বঙ্গ-দেশ অন্য প্রদেশের ন্যায় শান্তিলাভ করিতে পারি-তেছে না, তাঁহারা সংসারে ঘরে ঘরে অশান্তির হা হুতাশ জ্বালিয়া তুলিয়াছেন। একবার বড় ঘরের মহিলাদের মধ্যে বিলাসিতার যে প্রবল বেগ ছিল, তাহা বরং এখন একটুকু কমিয়াছে, কিন্তু নিম্নস্তরেই তাহা এখন প্রবল বেগে চলিতেছে। বিলাসিতার লীলাভূমি এই কলি-কাতায়ও অনেকে সাবান ব্যবহার করেন না, গৃহ-কর্ম্মাদি নিজে করিয়া থাকেন এবং স্বদেশী দ্রব্য (নিজেরা প্রাচীন মতে মেতি সুন্ধি দ্বারা তৈল ও সুগন্ধি প্রস্তুত করিয়া) ব্যবহার করেন; কিন্তু সুদূরবর্ত্তী গণ্ডগ্রামে এখনও বিরাম হয় নাই, তাঁহারা বিজাতীয় জিনিষ ও বিলাসিতাকে এক পরম আরামের মনে করেন। মেঘ পর্ব্বতে জন্মে, কিন্তু তথায় বর্ষণ করে না; অনেক বিলাসদ্রব্য বিলাতে ও আমেরিকায় প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহারা তাহা স্পর্শও করে না। আমাদের বিলাসিতা ও ভোগ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই নানারূপ বিচিত্র ধূতি চাদর চুড়ি প্রভৃতি তাহাদের অব্যবহার্য্য ও অনাবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই সব

অনাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য আমাদের যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, তাহা সঞ্চয় করিলে আর আমাদিগকে দারিদ্র্য-অনলে দগ্ধ হইতে হয় না। বিশেষতঃ আমরা বঙ্গ-মহিলাগণ অবস্থা বিবেচনা করিয়া চলি না, ইহাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল কারণ। আমাদের মধ্যে ধনী নির্ধন সকলেরই সমান বেশভূষা, সমান চাল চলন—সমান অলঙ্কার, সমান পারিপাট্য ; রাজা বা ভিক্ষুক পত্নীর পারিপাট্য বড় তফাৎ দেখা যায় না। যাঁহার কর্ত্তা ১০০০৲ এক হাজার টাকা মাসিক বেতন পান বা আয় হয়, তাঁহার মহিষী এবং যাহার কর্ত্তা মাসিক ১৫৲ পনর টাকা বেতন পায় কিংবা আয় হয়, তাহার পত্নী, এই উভয়ের অলঙ্কার-পারিপাট্য বা বেশ ভূষায় কিছুই পার্থক্য দেখা যায় না এবং নিঃস্ব স্বামীর পত্নীকে অবস্থার অতিরিক্ত অলঙ্কারে অত্যধিক অহঙ্কৃতা করিয়া তুলে ; এই অহঙ্কার এবং অলঙ্কার বহাল রাখিতে স্বামীকে আরও ফাঁপরে পড়িতে হয়। এই সব কারণে মধ্যবিত্ত ভদ্র মহিলাগণের সাবধান হওয়া অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

এখনও আমাদের দেশের নিম্ন স্তরে কৃষক, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর মহিলাদের বিলাসিতার প্রতি

প্রলোভন হয় নাই বলিয়াই তাঁহারা পরম সুখী, স্বাস্থ্যবতী এবং অর্থশালিনী বটেন। তাঁহাদের দ্বারাই বঙ্গ-মহিলাদের গৌরব রক্ষা হইতেছে বলিতে হইবে। নতুবা বিলাসিতাপ্রিয়া, অপরিণামদর্শিনী, নিত্যভিক্ষা-তনুরক্ষাশীলা, চিররুগ্ণা ও মুখসর্ব্বস্বা ভগিনীগণ দ্বারা দেশের বা দশের কি উপকার হইতে পারে? অর্থই প্রধান বল, কারণ প্রবাদ আছে "অর্থই সামর্থ্য"; সুতরাং অনাবশ্যক বিলাসিতায় অর্থ ক্ষয় করা মহা পাপ। আর একটী মেয়েলী বাক্য বলিতেছে "স্ত্রীর ভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে জন"; আমরা এই বাক্যটীর প্রথমাংশ যথার্থ করিতে পারি না কি? আমরা গৃহিণী, গৃহিণীই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ; শাস্ত্রকারগণ আমাদিগকে "আর্য্যা" বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন, তাই আমাদিগের তদ্রূপ সাবধান হওয়াও উচিত। নৌকায় একটীও ছিদ্র থাকিলে যেমন তাহা জলমগ্ন হইতে পারে, তদ্রূপ আমাদেরও সামান্য দোষে সংসার-নৌকা ডুবিয়া যাইতে পারে; আমাদের কর্ত্তব্য বড় মহৎ; আমরা বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিলে চলিবে না। প্রতি নিয়ত কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া পারিবারিক সাহায্য করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য; আমরা সাহায্য

করিলে সংসারের মহোন্নতি হইতে পারে ; আমাদের সামান্য সাহায্যও ক্ষুদ্র বটবীজের ন্যায় কালে বহু জীবের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আজ একটী টাকাও বাঁচাইতে পারিলে, কালে তাহা কল্পতরু সদৃশও হইতে পারে ; তখন তাহা হইতে যত ইচ্ছা খরচ করিতে পার, তখন আর তাহার ধ্বংস হইবে না, কিন্তু অঙ্কুরে নষ্ট করা উচিত নয়। আমার একটী আত্মীয়া অতি গোপনে একটী টাকা লগ্নি করিয়াছিলেন, পরে ক্রমে প্রকাশ্যেই তিনি টাকা লগ্নি করিতেন, তিনি এক্ষণে প্রায় লক্ষ টাকা করিয়াছেন ; ঐ পূর্ব্বেকার এক টাকাই তাঁহার মূলধন ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বামীও দেবতা স্বরূপ ছিলেন, তিনি স্ত্রীধন ব্যয় করেন নাই ; পুত্রও তদ্রূপ উপার্জ্জনশীল এবং মাতৃভক্ত। তিনি নিজেও অতি দয়াবতী ছিলেন, খাতককে পীড়া দিতেন না ; অনেক ত্যাগ করিয়াও ৮০।৯০ বৎসর মধ্যে এই টাকা করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত এইচ, ই, স্প্রাই, আই, সি, এস্

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব—মহোদয়েষু—

(অভিনন্দনপত্রম্)

(১)

যং দ্রষ্টুং ফলপত্রপুষ্পলতিকা
বৃক্ষৈরপি প্রেরিতাঃ।
পন্থানো মনুজা গৃহা নিজরজ-
স্ত্যক্ত্বা পরং সজ্জিতাঃ॥
যো দক্ষো যশসা প্রশাস্তি নিতরাং
বঙ্গৈকখণ্ডপ্রজাঃ।
সম্রাজাং শ্রীমতামূপপ্রতিনিধি-
র্জ্জীয়াৎ সদা ধার্ম্মিকঃ॥

(২)

প্রজানুরক্তো বিনয়ান্বিতস্ত্বং
যশোদয়ালাঞ্ছিতসৌম্যমূর্ত্তিঃ।
মান্যো বরেণ্যঃ সুধিয়াং শরণ্যঃ
গণ্যো হি রাজন্যগণেষু ধন্যঃ॥

(৩)

প্রশান্তচিত্তঃ সততং সতাং গতিঃ
বিদ্যানুরাগান্বিতচিত্তসম্মতিঃ।
অতোঽভিনন্দন্তি নরেন্দ্র ! সম্মুদং
দীনান্নরঞ্জনকশ্রেষ্ঠসম্পদং ॥

(৪)

সুখদ ! সুখদম্মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
তব শুভাগমনং নঃ সিদ্ধয়ে সঞ্চকাস্তু ।
তব গতিপথমাপ্তঃ পূর্ণমোদামৃতোৎসঃ
প্রবহতু ভৃশমত্র ক্ষালয়ন্‌ দৈন্যপঙ্কং ॥

(৫)

ভবৎকৃপাবারিকণাভিষিক্তঃ
সঞ্জীবিতঃ স্যাদ্বেদবৃক্ষকোঽয়ং।
ফলপ্রসূনান্বিতশান্তিরম্যো
ধর্ম্মৈককর্ম্মাঞ্চিতলোকগম্যঃ ॥

(৬)

সম্প্রতিচিত্ততমিস্রসমগ্র্যং।
নশ্যতু ধীর ! কৃপাশশিপাতৈঃ ॥
নশ্যতি রাত্রিতমোঘৃণিজালৈ
অজ্ঞইবানঘ ! মন্দহৃদাং নঃ ॥

(৭)

রূপৈর্ম্মিসর্গৈশ্চ শুভৈর্দ্দয়াদিভিঃ
ভবন্তমাসাদ্য মহান্তমিন্দিরা।
গুণাধিকং শান্ততনুং জনপ্রিয়ং
সুখং চিরং তিষ্ঠতু সা, ক্রমাগতা॥

(৮)

১। অস্মদীয় সুদুঃখস্য হেতুর্হি বেদবর্জ্জনং।
ভবদাগমনাৎ পূর্ব্বং মঙ্গলাচরণচ্ছলৈঃ॥
২। বেদ আরভ্যতেঽস্মাভিঃ প্রতিষ্ঠাং কুরু যত্নতঃ
বঙ্গদেশে হি যন্নাস্তি কৃতং নাপি পুরাতনৈঃ॥
৩। মহদ্ভীরাজভিরত্র তৎ, সংস্থাপ্য নবং যশঃ।
ভারতীয়মহাশীর্ভির্ভোঃ শ্রীমন্নভিনন্দ্যতাং॥

প্রদত্তমিদং—
কিশোরগঞ্জ-বেদবিদ্যালয়তঃ।

An Address of Welcome.

To—MR. H. E. SPRY, I.C.S., District Magistrate, Mymensing.

MAY you live long who are a representative of the Great King Emperor. To have a look at you, even the trees are sending forth fruits, leaves and flowers roads

and houses are being cleansed from dust and tastefully decorated: you are ruling a district of Bengal with credit and ability.

2. You are very popular and affable, possessed of fame and kindness and dignified in appearance. You are respected and prominent (in society), a supporter of the learned and much looked up to in service.

3. You are sedate in mind and the shelter of the honest at all times; you are an honour to people devoted to the cause of learning. Therefore we gladly welcome you, O ruler of men, who are a supporter of the poor and who possess superior gifts.

4. It is a matter of great pleasure and a blessing of all blessings to welcome you. May your auspicious visit be attended with success to us. Your journey has opened up a fountain of joy. may it wash clear the deep mire of poverty.

5. May this tree of Veda-Vidyalaya be brought to life by the sprinkling of the water of your kindness: may it blossom and bear fruits and prove a cool resort to the pious to whom virtue is the sole work of life.

6. May the goddess of fortune never forsake you since you are possessed of such talents, physical and intellectual and since you are so worthy, accomplished and popular.

7. O, calm of intellect! remove the darkness of our heart through the light of your favour, like the moon clearing up the darkness of the night.

8. The great cause of our misery is that we go

astray from the ways of Vedas (scriptures). In the name of offering a hearty welcome, we begin the teaching of the Vedas. May you lay the foundation thereof with care. May you earn the fame that is not to be had elsewhere in Bengal nor was ever earned there in the past. As a representative of a Great King, you are thrice welcome, to found this institution to your fresh glory.

KISHOREGANJ,
The 4th Dec. 1912.

Members of the—
KISHOREGANJ VEDA-VIDYALAYA,
(*Mymensing.*)

I visited the Sanskrit College and Veda-Vidyalaya this morning with the Subdivisional Officer. I was given an address and the students also recited. There are 15 students in the College altogether of whom several came from Sylhet.

I understand the College is received with some scepticism in Kishoreganj, but my opinion is that it is a desirable institution which deserves encouragement. I am told the students will in time take up missionary work. I can only hope and anticipate that the instruction they receive here will fit them to become worthy teachers of the people. This is the only Vedic College in the province. It is supported entirely from private sources and is indebted considerably to Babu Dayal Govinda Adhikary Mohant of Syam Sundar Akhra. There is a monthly magazine in connection with the institution.

The 4th Dec. 1912.

(Sd.) SPRY,
Offg. District Magistrate.

আয় ব্যয়ের তালিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বজমা

১৫ নং বিল শীতলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

আদায় ৯৭৵০

৭০। অনঙ্গকিশোর রায় ১৫৲

৭১। গগনচন্দ্র রায় .. ৫৲

৭২। গোবিন্দচন্দ্র রায় ... ১৲

৭৩। মহেশচন্দ্র রায় ... ৫৲

৭৪। বৈকুণ্ঠনাথ রায় ... ৫৲

৭৫। দেবেন্দ্রনাথ রায় ... ৫৲

৭৬। কুঞ্জকিশোর সাহা ২৲

৭৭। জলধর রায় ... ১৲

৭৮। নবীন চন্দ্র সাহা ... ১৲

৭৯। গিরিধন সাহা ... ৵০

৮০। রায়চাঁদ সাহা ... ৷০

৮১। শরৎচন্দ্র সাহা ... ৷০

৮২। প্রকাশচন্দ্র সাহা ... ৷০

৮৩। ভারতচন্দ্র রায় ... ১৲

৮৪। নরসিংহ রায় ... ৫৲

৮৫। হৃদয়চন্দ্র রায় ... ২৲

৮৬। কৈলাসচন্দ্র সাহা ... ৷০

খরচ

৩৮। সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থের অক্টোবর মাসের বেতন—১৫৲

৩৯। মহিমচন্দ্রবসাক দপ্তরীর ঐ মাসের বেতন—৩৲

৩৯। (ক) বনমালী সাংখ্যতীর্থের ঐ মাসের বেতন— ২৫৲

৪০। অগ্রহায়ণের "আর্য্যগৌরব" পত্রিকা ছাপাইবার খরচ মায় মণিঅর্ডার বুকপোষ্ট—৪০৷৵০

৪১। আঠার জন গ্রাহক নিকট ভিঃ পিঃ তে ৪০ খান পত্রিকা ও চেক পাঠাইবার খরচ—২৷৶

৮৭। নবীন, অধর সাহা	॥০
৮৮। রামদয়াল ভৌমিক	১০৲
৮৯। অমর চাঁদ সরদার	৫৲
৯০। ভোলানাথ সরদার	১৲
৯১। রামকুমার চক্রবর্ত্তী	২৲
৯২। গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক	১৲
৯৩। মহিমচন্দ্র ভৌমিক	১৲
৯৪। কিন্দুনম দাস	১৲
৯৫। মহিমচন্দ্র বসাক	৫৲
৯৬। বিপিনবিহারী বাড়রি	৫৲
৯৭। শিবচন্দ্র সাহা ...	১৲
৯৮। পীতাম্বর সাহা	২৲
৯৯। দ্বারকানাথ মল্ল বর্ম্মন্	২৲
১০০। রামমোহন নাথ	।০
১০১। দীননাথ মণ্ডল	১৲
১০২। গগন ধুবী ..	।০
১০৩। কৈলাসচন্দ্র ভৌমিক	৫
১০৪। নবদ্বীপ মজুমদার ...	২৲
১০৫। সাধুচরণ সাহা ...	২৲
১০৬। গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক	।০
	৯৭৵

৪২। ঐ পত্রিকা এক পয়সায় পাঠান যাইতে পারিবে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য টেলিগ্রাম—	১৶০
৪৩। রাখালচন্দ্র সেনের নিকট ৩০ খান পত্রিকা পাঠাইবার মাশুল—	।৶০
৪৪। কঠিহাদী হইতে টাকা আনিবার মুটিয়ার খরচ—	॥৵৬
৪৫। মাসিক চাঁদা আদায়ের বহি খরিদ—	৶০
৪৬। ঋক্‌বেদ সংহিতা ক্রয়ের মূল্য—	২৸০
৪৭। নিরুক্ত নামক বেদগ্রন্থ খরিদ—	১২॥৵০
৪৮। ১২৬—১৫৯ নং গ্রাহক নিকট ৩৩খানি পত্রিকা পাঠাইবার খরচ—	১৶৬
	৩৮২।৶০

১৬ নং বিল ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী

কর্ত্তৃক আদায়—৪৮৶০

১০৭। দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য

পত্রিকার মূল্য . ১৷৹

১০৮। কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ১৷৹

১১০। পরশুরাম, হরিদাস সাহা ১৷৹

১১১। ১২ বাজচন্দ্র, দুর্গাচরণ

সরকার .. ১৬৷৹

১১৫। ১৬ তারাচাঁদ,

কুঞ্জবিহারী পাল . ১৬৷৹

১১৭। শশীকুমার সরকার ... ৪৷৹

১১৮। কৃষ্ণগোবিন্দ দাস ... ১৲

১১৯। কালীচরণ ধর . ২৲

১২০। শ্যামচাঁদ দাস ১৲

১২১। কালীমোহন দে . ৷৹

১২২। কুঞ্জবিহারী বণিক্ ৷৹

১২৩। হরিদাস দে . ৷৹

১২৪। ঈশ্বরচন্দ্র দে ... ।৹

১২৫। পাঁচকড়ি দে ... ১৲

৪৮৶০

১৭ নং বিল ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী

কর্ত্তৃক আদায়—২০৲

১২৬। রাখালচন্দ্র সাহা ... ১৷৹

১২৭। রজনীকান্ত বাড়রি ... ১০৲

১২৮।	নবদ্বীপচন্দ্র দাস	...	১॥০
১২৯।	রামকুমার কর্ম্মকার	...	২৲
১৩০।	মধুসূদন কর্ম্মকার	...	১৲
১৩১।	রামচন্দ্র সাহা	...	১॥০
১৩২।	হরিমোহন বণিক্	...	॥০
১৩৩।	রামহরি বণিক্	...	॥০
১৩৪।	মুকুন্দ বণিক্	...	॥০
১৩৫।	রঘুনাথ দে	...	১৲
			২০৲

১৮ নং ক শীতল চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক আদায়—২৫৮॥০

১৯ নং ক শীতল চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক আদায়—৭৪৲

১।	নন্দকুমার রায়	...	৩০৲
২।	দ্বারকা নাথ বণিক্	...	৪৲
৩।	বলাই সাহা	...	৫৲
৪।	শিবচন্দ্র সাহা	...	১৲
৫।	হরচন্দ্র বণিক্	...	২৲
৬।	নিবারণচন্দ্র সাহা	...	১৲
৭।	ব্রজকিশোর সাহা	...	১৲
৮।	অধরচন্দ্র সাহা	...	২৲
৯।	হরনাথ সাহা	...	৩৲
১০।	শরচ্চন্দ্র সাহা	...	২

১১। হরচন্দ্র সাহা ... ২৲
১২। শশী দাস ... ২৲
১৩। গোবিন্দ সাহা ... ২৲
১৪। রামকানাই সাহা ... ১৲
১৫। রামনাথ সাহা ... ১৲
১৬। রাধানাথ সাহা ... ১৲
১৭। হরনাথ দাস ... ২৲
১৮। জগচ্চন্দ্র সাহা ... ১৷৹
১৯। বাঁশীনাথ পোদ্দার ... ১৷৹
২০। ভগবান্ সাহা ... ৩৲
২১। হরিমোহন সাহা ... ১৲
২২। রামভরণ মিশ্রী ... ১৲
২৩। বৈকুণ্ঠনাথ সাহা ... ১৲
২৪। কুঞ্জমণি দাস্যা ... ২৲
২৫। রঘুনাথ সাহা ... ১৲
২৬। রামগতি বিশ্বাস ... ১৩৷৹
২৭। মৃত্যুঞ্জয় সরকার ... ৬৲
২৮। রামচন্দ্র শর্ম্মা অগ্রদানী ... ৫৲
২৯। অনন্তময়ী দেবী ... ৫৲
৩০।৩১। দেবনাথ সাহা ... ২১৷৹
৩২। গোবিন্দচন্দ্র সাহা ... ৬৷৹
৩৩। কালীনাথ সাহা ... ৩৲
৩৪। ব্রজেন্দ্র মণ্ডল ... ১৷৹
৩৫। গোপালচন্দ্র সাহা ... ১১৷৹

৩৬। ঈশ্বরচন্দ্র সাহা . ... ২৲
৩৭। মদনচন্দ্র সাহা ... ১৲
৩৮। ভরতচন্দ্র সাহা ... ৬৷৹
৩৯। গোবিন্দ, দ্বারকা সাহা ... ৬৷৹
৪১। নন্দ লাল সাহা ... ৩৲
৪২। চন্দ্রকুমার মালাকার ... ১৲
৪৩। বৈকুণ্ঠনাথ দে ... ১৲
৪৪। গোপালচন্দ্র ভৌমিক ২৲
৪৫। শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ২৲
৪৬। উমাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ১৷৹
৪৭। নবীনচন্দ্র সাহা .. ৬৷৹
৪৮। রজনীকান্ত বল .. ৫৲
৪৯। কৈলাসনাথ রায় .. ১৷৹
৫০। শশিমোহন চক্রবর্ত্তী ... ১৷৹
৫১। ভারতচন্দ্র রায় ... ১৷৹
৫২। কালীকিশোর রায় ... ৫০৲
৫৩। কেদারনাথ রায় ... ৫০৲
৫৪। হরচন্দ্র রায় ... ৫৲
৫৫। গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী ... ২৲
৫৬। গোবিন্দচন্দ্র লাহিড়ী ... ১৷৹
৫৭। উমেশচন্দ্র দে ... ১৷৹
৫৮। সুরেশনারায়ণ রায় ... ১৷৹
৫৯। ভগবান্‌চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১৷৹
৬০। তারিণীমোহন চৌধুরী ... ১৷৹

৬১। নরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ১।৷৹
৬২। অন্নদা প্রসাদ ঘোষ ... ১।৷৹
৬৩। রামকুমার দে ... ১।৷৹
অজ্ঞাত নাম ... ১।৷৹

৩২।৷৹

২০ নং বিল ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী
কর্ত্তৃক আদায়—৩৬৲

১৩৬। প্যারীমোহন, কৃষ্ণমোহন দাস ৫৲
১৩৭। প্যারীমোহন,
গোপীমোহন দাস .. ৫৲
১৩৮। পুলিনবিহারী দাস ... ১৲
১৩৯। ঈশ্বরী দাস্যা পক্ষে
রামচন্দ্র সাহা ২৫৲

৩৬৲

২১ নং বিল ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী
কর্ত্তৃক আদায়—২৮।৷৹

১১৩। ১১৪। গঙ্গাসাগর সরকার ১১।৷৹
১৪০। সনাতন সাহা ১৲
১৪১। কালীপ্রসন্ন পোদ্দার ১৲
১৪২। (ক) দীননাথ দে ... ।৷৹
১৪২। (খ) নন্দলাল মেস্তরী গয়রহ ১০৲
১৪৩। জয়চন্দ্র দাস ... ।৷৹
১৪৪। গঙ্গাচরণ শূর ... ।৹

১৪৫। সত্যকুমার কর্ম্মকার ১৲
১৪৬। কাশীনাথ শুক্ল দাস ১৲
১৪৭। ফকিরচাঁদ মেস্তরী ॥০
১৪৮। রাধানাথ মেস্তরী ।০
১৪৯। শ্যামসুন্দর মালী ॥০
১৫০। রাধানাথ সাহা ॥০

২৮॥০

২২ নং বিল ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী
কর্ত্তৃক আদায়—৩৩৲

১৬৮ নম্বর হইতে ১৭৬ নং এবং
১৭৮ নং পর্য্যন্ত ২২জন গ্রাহকের মূল্য
প্রাপ্তি————৩৩৲

১৩৮২৲
বাদ—৩৮২।৶
৯৯৯॥৵০

মঃ—নয়শত নিরানব্বই টাকা নয় আনা
তহবিল।
শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী।

মূল্য প্রাপ্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(গ্রাহক নম্বর ক্রমে লিখিত)

৫। শ্রীযুক্ত পরশুরাম হরিদাস ১॥০
৬। „ রাসবিহারী সরকার ১॥০
৭। „ গঙ্গাসাগর সরকার ১॥০
৮। „ তারাচাঁদ কুঞ্জবিহারী পাল ১॥০
৯। „ শশিমোহন সরকার ১॥০
১০। „ রাখাল চন্দ্র সাহা ১॥০
১১। „ নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ১॥০
১৩। „ রামচন্দ্র সাহা ১॥০
১৭। „ জগচ্চন্দ্র সাহা ১॥০
১৮। „ কাশীনাথ পোদ্দার ১॥০
১৯। „ রামগতি বিশ্বাস ১॥০
২০। „ রামচন্দ্র শর্ম্মা অগ্রদানী (ফ্রী)
২১। „ দেবনাথ সাহা ১॥০
২২। „ গোবিন্দ চন্দ্র সরকার ১॥০
২৩। „ ব্রজেন্দ্র কুমার মণ্ডল ১॥০
২৪। „ গোপাল চন্দ্র সাহা ১॥০
২৫। „ ভরতচন্দ্র সাহা ১॥০
২৬ „ গোবিন্দ চন্দ্র সাহা ১॥০
২৭। শ্রীযুক্ত উমাচরণ চক্রবর্ত্তী ১॥০
২৮। „ নবীন চন্দ্র সাহা ১॥০
২৯। „ কৈলাস চন্দ্র রায় ১॥০
৩০। „ শশিমোহন চক্রবর্ত্তী ১॥০
৩১। „ ভারত চন্দ্র রায় ১॥০
৩২। „ কালীকিশোর রায় (ফ্রী)
৩ । „ কেদার নাথ রায় (ফ্রী)
৩৪। „ গোবিন্দ চন্দ্র লাহিড়ী ১॥০
৩৫। „ উমেশ চন্দ্র দে ১॥০
৩৬। „ সুরেশ নারায়ণ রায় ১॥০
৩৭। „ ভগবান্ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১॥০
৩৮। „ তারিণী মোহন চৌধুরী ১॥০
৩৯। „ নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১॥০
৪০। „ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ১॥০
৪১। „ রামকুমার দে ১॥০
৭৫। „ হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১॥০
১৬৮। „ রাম অবতার দেওয়ারী ১॥০
১৬৯। „ সাচুনী বৈরাগী ১॥০
১৭০। „ কুঞ্জমাধব দাস ১॥০

১৭১ ।	শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	১॥০	১৮৬ ।	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দাস	১।০
১৭২ ।	„ কৃষ্ণচন্দ্র দাস সরকার	১॥০	১৮৭ ।	„ গোপীনাথ দে	১।০
১৭৩ ।	„ মহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১॥০	১৮৮ ।	„ গুরুচরণ সাহা	১।০
১৭৪ ।	„ বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী	১॥০	১৮৯ ।	„ গুরুদয়াল সাহা	১॥০
১৭৫ ।	„ তারানাথ চক্রবর্ত্তী	১॥০	১৯০ ।	„ গিরিশচন্দ্র চৌধুরী	১॥০
১৭৬ ।	„ শিবদাস দত্ত রায়	১॥০	১৯১ ।	„ হরকুমার দাস চৌধুরী	১॥০
১৭৮ ।	„ কুঞ্জকিশোর গোপ	১॥০	১৯২ ।	„ মশ্রবহোসেন সবই	১॥০
১৭৯ ।	„ কালীনারায়ণ গোপ	১॥০	১৯৩ ।	„ মোহিনীমোহন চৌধুবী	১॥০
১৮০ ।	„ নিত্যানন্দ পণ্ডিত	১॥০	১৯৫ ।	„ প্যারীমোহন চৌধুরী	১॥০
১৮১ ।	„ হরমোহন নাথ	১॥০	১৯৬ ।	„ মথুরচাঁদ দাস চৌধুরী	১॥০
১৮২ ।	„ দীননাথ দত্ত	১॥০	১৯২ ।	„ দৌবচন্দ্র দাস চেধুবী	১॥০
১৮৩ ।	„ লোকনাথ কৈবর্ত্ত	১॥০	১৯৩ ।	„ শ্রীকৃষ্ণ দাস	১॥০
১৮৪ ।	„ রামনাথ কৈবর্ত্ত	১॥০	২৩৫ ।	„ কালীপ্রসন্ন দাস	১।০
১৮৫ ।	„ বৈরাগী দাস কবর্ত্ত	১॥০			

(ক্রমশঃ)

আর্য্য-গৌরব।

———:✻:———

মানব।

(৫ পৃষ্ঠার পর)

ঈশ্বর সাধনা অতি কঠিন তপঃসাধ্য বিষয়; প্রথমতঃ অত্যন্ত নীরস ও অপ্রীতিকরই বোধ হয়। ইক্ষুদণ্ডও প্রথম দেখিতে সুদৃঢ় শলাকার ন্যায়, কিন্তু একটুকু সামান্য চেষ্টা করিয়া উপরের আবরণটী ভেদ করিলেই তাহাতে মধুময় সুস্বাদু রস পাওয়া যায়, তখন আর তাহা ছাড়িবার ইচ্ছা হয় না। ঠিক ঈশ্বর সাধনার পথও তদ্রূপ, যিনি একবার কষ্টে সৃষ্টে একটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাকে শত প্রকার ভয় দেখাইয়াও কেহ হঠাইতে পারে না। আমরা তাঁহাকে পাগল উন্মাদ বর্ব্বর নির্ব্বোধ মূর্খ বা দিগম্বর যাহাই বলিনা কেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। পুত্র পরিবার স্নেহে, অতুল ভোগ সম্পত্তিতে সুখ সম্মানে বা সংসার বাসনায় তাঁহার মন আর আকৃষ্ট হইতে পারে না। তিনি ক্রমশঃ কায়মনোবাক্যে একই চিন্তা একই ধারণা, একই ধ্যান ও একই ভাবনা করিয়া তাঁহার

সেই আরাধ্য দেবের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। তাঁহার সে একাগ্রতা বুঝিবার শক্তি অন্যের হইতে পারে না, সাধকই সে সাধনা-রহস্য বুঝিতে সক্ষম। ঐকান্তিক ভক্তি, কঠোর তপস্যা, একাগ্র যোগ-সাধনা এবং নাম জপ সংযমাদি সুকর্ম্ম দ্বারাই এ বিষয়ে চিত্তের দৃঢ়তা জন্মিয়া থাকে। তখন বহি-রিন্দ্রিয়গুলি শনৈঃ শনৈঃ সুসংস্কৃত হইতে থাকে; চক্ষুর জ্যোতি নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ হয়; নিমীলিত নয়নেও অনেক বৈচিত্র চিত্র পরিদৃশ্যমান হয়। কণ্ঠের স্বর মনোহর ও মধুর হইয়া উঠে, কর্ণের ভিতরে যেন এক অনির্ব্বচনীয় দেবনিত্যাদির মধুরধ্বনি শব্দিত হইতে থাকে, নাসিকারন্ধ্র ও হংসের জলমিশ্রিত দুগ্ধ গ্রহণের ন্যায় সংমিশ্রিত বায়ুরাশি হইতে স্বর্গীয় অপূর্ব্ব সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া চিত্তকে আমোদিত করিয়া তুলে। রোগ শোক তাপ ক্ষুধা ক্লেশাদি যেন আপনা আপনি বিদূরিত হয়, সমস্ত সংসার যেন আপনার বলিয়া বোধ হয়; প্রকৃত পক্ষে তখনই—

"উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"।

এই শাস্ত্রবাক্য সফল হইয়া উঠে, তখনই জীব-মাত্রকেই শিব বলিয়া বোধ হয়, তখনই—

"চ্ছেদনং বৃক্ষজাতীনাং দ্বিতীয়ং নরকং স্মৃতম্।"

এই মহাজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ক্রমেই—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা।"

এই নীতি অনুসারে স্ত্রীতেও মাতৃভাব উপলব্ধি হইয়া সাধককে ব্রহ্মচর্য্যে সুদৃঢ় করিয়া তুলে। এমন কি সাধক পুংস্ত্ব স্ত্রীত্ব সবই ভুলিয়া যায়; তখন আমি বা তিনি জ্ঞান তিরোহিত হইয়া 'অহংব্রহ্ম' বলিয়া ঈশ্বর সম্মিলন সুখে তন্ময় হইয়া পড়ে, দৈহিকত্ব প্রাণত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে সাধনা, সে নির্ব্বাণ মুক্তি, সে মোক্ষ প্রাপ্তি, সে সাচ্চদানন্দ-লাভ আর্য্য-ঋষিদেরই ছিল; মানব তাহারও আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, কিন্তু অধিকারী হওয়া সহজ নহে, স্বয়ং ঈশ্বর তাহার বিচার-কর্ত্তা। ধর্ম্মাদি সদ্‌গুণনিচয় তাহার সাক্ষী, প্রকৃত মানবত্বই তাহার অখণ্ডনায় অধিকারী। অন্ধ, উন্মাদ, পতিত ও অযোগ্য ব্যক্তি যদ্রূপ পৈতৃক ধনে দায়াধিকারী হয় না; তদ্রূপ ধর্ম্মহীন, সত্যবর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্য বিরহিত অজ্ঞান ব্যক্তি আর্য্য ঋষিদের বংশধর হইয়াও তাঁহাদের সে দুর্লভ সাধনা লব্ধ ফলের অধিকারী হইতে পারে না। ধর্ম্মপ্রাণ সাধকই অধিকারী হইবার যোগ্য পাত্র। সুতরাং ধর্ম্মকে সহায় করিয়া ধর্ম্মময়

হইতে হইবে। ধর্ম্মের গুণ, ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, এবং ধর্ম্মের ফলাদি অবগত হওয়া অতীব আবশ্যক। সে জন্যই প্রথমতঃ ধর্ম্মের বিষয় কথঞ্চিৎ লিখিতে হইল।

ধর্ম্ম—ধৃ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়ে (ধৃ+মন্) ধর্ম্ম শব্দ সাধিত হয়, 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ বা পোষণ, যদ্দ্বারা আমরা ধৃত বা পোষিত হইতেছি, তাহাই ধর্ম্ম। তাহা না থাকিলে আমরা বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় পতিত ও অপোষিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত হই। ধর্ম্মই মানবের সাধনা, ধর্ম্মই মানবের প্রাণ, ধর্ম্মই মানবের দেহ, ধর্ম্মই মানবের সিদ্ধি, ধর্ম্মই মানবের ঋদ্ধি—ধর্ম্ম ব্যতীত মানবত্বই থাকিতে পারে না! ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইলে ধর্ম্মের লক্ষণগুলি প্রথমতঃ প্রতিপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে বলিয়াছেন।

"ধৃতিক্ষমা দমোঽস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্॥"

ধৃতি—ইহা অতীব পবিত্র মনোবৃত্তি, ইহা দ্বারাই স্মরণ-শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা দ্বারাই শতাবধানী হওয়া যায়, ইহাদ্বারাই ঈশ্বরের স্বরূপমূর্ত্তি ধ্যান করিবার

শক্তি জন্মে; ইহাই ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ; ধৃতিই মানবের ভক্তি, যোগ, জপ, তপঃ, পূজা, সন্ধ্যা ও আরাধনার প্রথম সোপান ও মুখ্য কারণ। ধৃতিই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের অপরিসীম অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে মনোমধ্যে ষোল কলায় পূর্ণ করিয়া প্রদর্শন করাইয়া দেয় ধৃতিযোগে পরিদৃশ্যমান পদার্থের দর্শনে আলোকের আবশ্যক হয় না, নয়নের অপেক্ষা করে না—নৈশ অন্ধকার, পর্ব্বত সমুদ্র, নদ, নদী, দেশ, জনপদ, বন, জঙ্গল, হর্ম্ম্য, প্রাচীর, দূরত্ব বা যবনিকাদি কিছুই সে দৃশ্যের বাধা জন্মাইতে পারে না। ধৃতি-দৃষ্ট পদার্থ প্রতিনিয়ত পূর্ণাঙ্গে প্রতিফলিত হইতে থাকে। ধৃতিই পরম ব্রহ্মের রূপ চিন্তার প্রধান উপায়। ধৃতি দ্বারাই প্রাণবায়ুকে জয় করা যায়, তাহাই প্রাণায়ামযোগ। প্রত্যেক প্রাণায়ামই পূরক, কুম্ভক ও রেচক ভেদে ত্রিবিধ, মাত্রাযুক্ত (সামান্য ধৃতিযোগ) প্রাণায়ামকে লঘু প্রাণায়াম, উহার দ্বিগুণ হইলে মধ্যম প্রাণায়াম এবং ত্রিগুণ মাত্র প্রাণায়ামই উত্তম প্রাণায়াম বলিয়া খ্যাত। উক্ত প্রাণায়াম মধ্যে যাহা জপ ধ্যান যুক্ত তাহাই গর্ভ প্রাণায়াম এবং উহার বিপরীত হইলে তাহাকে

অগর্ভ প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়ামের প্রথম অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন, মধ্যম অবস্থায় গাত্র কম্পন, তৃতীয় অবস্থাতে বিপাক জন্মে। প্রাণায়ামের প্রথমেই ত্রিবিধ দোষ উৎপন্ন হয়, যোগবিৎসাধক ধৃতিযোগে আসনস্থ হইয়া হৃদয়ে প্রণবের যোগ করিবে এবং রজোগুণ দ্বারা তমোগুণের ও সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণের বৃত্তি-নিরোধ করিতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে। ধৃতি যোগে বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে এবং মন হইতে প্রাণাদিকে নিগৃহীত করিয়া সমবায়রূপে প্রত্যাহার করিবে। অষ্টাদশবার প্রাণায়াম করিলেই ধারণা জন্মিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী যোগিগণ ধারণাদ্বয়কে যোগ বলিয়া নির্ণয় করেন। নাড়ী, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, উদর, মুখ, নাসিকাগ্র, নেত্র মূর্দ্ধস্থান এবং সহস্রার এই সকল স্থানে ধারণা করিবে। উক্ত দশ স্থানে দশবিধ ধারণা করিলে সাধক পরমাক্ষর পাইতে পারেন। অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে যেমন এক হইয়া যায় সেইরূপ আত্মাও জীবের সংযোগ করিতে পারিলেই ঐক্য জ্ঞান জন্মে। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম, আমার জরামরণ নাই, পৃথিব্যাদির সম্পর্ক নাই, আমি আকাশাদি পঞ্চভূত বিহীন, আমার দেহ নাই, আমার

স্থানাস্থান নাই, আমাতে রূপ সম্পর্ক নাই, আমার জ্ঞান, বা অজ্ঞান নাই, আমার ব্যান বা উদান বায়ু সম্বন্ধ নাই, আমার দেহ মন বুদ্ধি ও প্রাণ ইহাদের সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই; অন্য কিছুতেই আমার সম্পর্ক নাই—

"অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি প্রাণাপ্রাণ বিবর্জ্জিতম্"

ইত্যাকার জ্ঞান যখন উপস্থিত হয় তখন

"নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত মহমানন্দমদ্বয়ম্।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জ্ঞানরূপ বিমুক্তয়ে॥

(গরুড় পুরাণম্)

এই মহৎ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তখনই মানবের ধৃতিযোগ সিদ্ধ হইবে। এই অষ্টাঙ্গযোগ মানবকে মুক্তির পথে লইয়া চলিবে—তখনই বুঝিতে পারিবে, ধৃতিই মানবের মাতৃরূপিনী—আরাধ্যাদেবী ষোড়শ মাতৃকার ত্রয়োদশ মাতৃকা জগদ্ধাত্রী সাধনার সিদ্ধিবিদ্যা—মানবের কল্পতরুরূপিনী জননী পরমেশ্বরী!!!

ক্ষমা—বাহ্যে চাধ্যাত্মিকেচৈব দুঃখে চোৎপাদিতেকচিৎ।

ন কুপ্যতি নবাহন্তি সাক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা॥

অক্রুষ্টোঽভিহতো যস্তুনাক্রোশেন্নহনেদপি।

অদুষ্টৈর্বাঙ্মনঃ কায়ৈস্তিতিক্ষুশ্চ ক্ষমাস্মৃতা॥

বিগর্হাতি ক্রমাক্ষেপ হিংসাবন্ধ বধাত্মনাম্।
অন্যমন্যু সমুত্থানাং দোষীণাং বর্জ্জনং ক্ষমা॥
বিভাগশীলঃ সততং ক্ষমাযুক্তো দয়াত্মকঃ।
গৃহস্থস্তু সমাযুক্তো ন গৃহেন গৃহী ভবেৎ॥

যে অমূল্য গুণ দ্বারা নিদারুণ দুঃখ সময়েও ক্রোধকে দেহে মনে সর্ব্বতোভাবে দমন করা যায় তাহাই ক্ষমা। কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনাহূত বিনা দোষেও আহত হইয়া দেহ-মন-বাক্যে কোন প্রকার দোষভাব প্রাপ্ত না হইয়া যে গুণ দ্বারা তাহা সহ্য করা যায় তাহাই ক্ষমা। অন্য কর্ত্তৃক ক্রোধপূর্ব্বক কৃত নিন্দা, অনাদর, তিরস্কার, হিংসাবন্ধন, এমন কি প্রাণ বিনাশের উদ্যোগরূপ দোষ সমূহ সহ্য করার নামই উৎকৃষ্ট ক্ষমা। গৃহস্থিত দানশীল, বিভাগশীল, সর্ব্বদা ক্ষমাযুক্ত দয়ালুব্যক্তিকেই গৃহস্থ বলে, গৃহে বাস করিলেই গৃহী হয় না। যিনি নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ যথাশক্তি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সংসারবন্ধনরূপ মোহজাল ছেদন করিতে পারেন তিনিই ক্ষমাকে প্রাপ্ত হন। ক্ষমা ব্যতীত মনুষ্যত্ব জন্মিতে পারে না, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন

"ক্ষমা দয়াচ বিজ্ঞানং সত্যঞ্চৈব দমঃ শমঃ।
অধ্যাত্ম নিরতজ্ঞানমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্।

এই প্রকার সদ্‌গুণ বিশিষ্ট জীবই ব্রাহ্মণ এবং তিনিই প্রকৃত মানব; সেই মানবেরই প্রধান গুণ ক্ষমা। ক্ষমাই ধর্ম্মের ভিত্তি এবং সাধনার মূল, সাধকের কল্পতরু-রূপিণী সিদ্ধেশ্বরী দেবী। সাধক এই ক্ষমারূপা মাতৃদেবীর কোলে বসিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ক্ষমাগুণেই বসুন্ধরা আমাদের ভার বহন করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে অষ্টোত্তর শতবার ক্ষমা করিয়া-ছিলেন; ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির ক্ষমাগুণেই রাজসভায় দ্রৌপ-দীর অপমান সহ্য করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র ক্ষমাগুণেই অক্লেশে বনবাস ক্লেশ সহ্য করিয়া সাধ্বী সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবী সীতাও ক্ষমাগুণে প্রজ্বলিত অনল সন্তাপে সন্তাপিত হন নাই; মহামুনি বশিষ্ঠও ক্ষমাগুণেই শতপুত্র শোক সহ্য করিয়াও শত্রুকে অভিসম্পাত দেন নাই। মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যারাণী ক্ষমার পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন। এদিকে ভরদ্বাজ, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ ক্ষমাশ্রয় করিয়াই স্বীয় দেহকে উই প্রভৃতি পোকা দ্বারা নষ্ট করিয়াও সাধনপথ পরি-ভ্রষ্ট হন্ নাই। সাধক ক্ষমাবলেই আহার, নিদ্রা, পরি-ত্যাগ করতঃ ঝড়বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম অক্লেশে সহ্য করিতে সক্ষম হন। ক্ষমার সমান গুণ নাই, ক্ষমাই সর্ব্বসিদ্ধির

মূল, ধর্ম্মের দেহ মানবত্বের প্রধান কারণ—ক্ষমাই স্বয়ং ভগবতী পরমেশ্বরী দুর্গা—দুর্গারই নামান্তর ক্ষমা—

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥"

দম—কুৎসিতাৎ কর্ম্মণো বিপ্র যচ্চ চিত্ত নিবারণম্।
সঙ্কীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্ততত্ত্বদর্শিভিঃ॥

যে মহদ্‌গুণ দ্বারা ঘৃণিত কার্য্য হইতে মনকে নিবৃত্ত করা যায় তাহাকেই প্রাজ্ঞগণ দম বলেন। অন্যথা—"বাসুদেবার্চ্চনং দমঃ।" বাসুদেবের অর্চ্চনাই দম, দম ব্যতিরেকে কিছুতেই ঈশ্বরসাধনা হয় না। কুপ্রবৃত্তিই নরকের মূল, অধঃপতন ও বিনাশের হেতু, কুপ্রবৃত্তি দমন না করিলে সাধক হওয়াত বৃথা চেষ্টা, মানুষ বলিয়াই গণ্য হইতে পারা যায় না। ভগবান্ দম রূপেই কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দণ্ডিত করেন, তাই সাধক যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে অগ্রসর হয়। যে গুণে সাধক মনে মনে সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিবিহীন হইয়া ঈশ্বরচিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত হন, এবং অপার তৃপ্তিলাভ করেন, তাহাই দম। দমযোগে মহাদেবের ষড়ঙ্গ জ্ঞাতব্য লাভ হয়! সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বচ্ছন্দতা, নিত্য অলুপ্ত শক্তি, ও অনন্তশক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরণাদি বোধঃ
স্বচ্ছন্দতা নিত্যমলুপ্ত শক্তিঃ।
অনন্ত শক্তিশ্চ বিভোর্বিদিত্বা
ষড়ানুরঙ্গাণি মহেশ্বরস্য॥

এই দমগুণেই অন্য প্রবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বকও ভগবানের ধ্যানে একাগ্রতা জন্মিয়া থাকে। মানব-চিত্ত বাতাহত প্রদীপের ন্যায় চিরচঞ্চল, ঝটিকারূপ সহস্র সহস্র বাধাবিঘ্ন—লোভ, হিংসা, ক্রোধ, চিন্তা, ক্লেশ, স্নেহ, ধনাশা, অহঙ্কার, অভিমান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি প্রতিনিয়ত মানবমনকে অস্থির করিয়া ফেলিতেছে, তাহাকে নির্ব্বাত দীপবৎ বিপদ্‌বিহীন—অটল অচল না করিতে পারিলে সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। সেই চিত্তস্থিরতার প্রধান ও মুখ্য উপায় দম। দমকে আশ্রয় করিলে মানবের আর বিঘ্ন বাধা জন্মিতে পারে না, বহিরিন্দ্রিয় আপনা আপনি প্রশমিত হয়, মন স্থির হয়, চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন মানব বাহ্যিক জ্ঞান ভুলিয়া যায়, ভগবানের ধ্যান ধারণায় তন্ময় হইয়া পড়ে, সেই দমই মানবত্ব সম্পাদনপূর্ব্বক যোগসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।

অস্তেয়—অচৌর্য্য ; ইহাই সিদ্ধিলাভের এক প্রধান উপায়। ইহা দ্বারা নির্লোভ, নিষ্ঠা, শান্তি ও অপরিগ্রহ জন্মিয়া থাকে।

"প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা রাত্রৌ বা যদি বা দিবা।
যৎপরদ্রব্যহরণংস্তেয়ং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্॥
তৃণং বা যদি বা শাকং মৃদং বা জলমেব বা।
পরস্বাপহরন্ জন্তু নরকং প্রতিপদ্যতে॥"

প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, রাত্রিতে বা দিবাতে পরদ্রব্য হরণই স্তেয় ; পরের তৃণ, শাক, মাটী, জল বা অতি সামান্য জিনিষও হরণে নরক ভোগ হয়। তাহার প্রতি-প্রসব এই। যথা—

"নহিংসাং সর্ব্বভূতানি নানৃতঞ্চ বদেৎ ক্বচিৎ।
নাহিতং না প্রিয়ং বাক্যং ন স্তেনঃ স্যাৎকদাচন॥'

কিন্তু যাহাতে স্তেয় না হয় তাহাই করা মানবের প্রধান কর্ত্তব্য ; অস্তেয়ই ধর্ম্মের মুল। অস্তেয় দ্বারা মানব দেবতা হয়, জীব মোক্ষ লাভ করে। দেহে মনে বা বাক্যে পর দ্রব্যে অনাসক্তিই পরম অস্তেয়। অস্তেয় লোভকে ধ্বংস করে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে, কামনাকে জয় করে, মনকে স্থির করে, দেহকে পবিত্র করে, চিত্তকে প্রসন্ন করে, পরকে আপন করে, অভাব অশান্তি

বিনষ্ট করে—সাধনার পথ মুক্ত করে—হৃদয়কে পবিত্র করে, ঈশ্বরের সন্নিধানে লইয়া যায়—মানবকে মুক্ত করে। অস্তেয় পরম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ধর্ম্ম।

ক্রমশঃ

দানধর্ম্ম।

দানমেব পরো ধর্ম্মো দানাৎ সর্ব্বমবাপ্যতে।
দানান্মুক্তিশ্চ রাজ্যঞ্চ দদ্যাদ্দানং ততোনরঃ॥

(পূর্ব্বখণ্ড গরুড় পুরাণ)

দানই একমাত্র পরম ধর্ম্ম, দান হইতেই পুরুষের সর্ব্ববিধ অভিলষিত লাভ হয়, দানই পুরুষকে স্বর্গ ও রাজ্য প্রদান করে; অতএব মানবগণ অবশ্য দান করিবেন। দান না করিলে বিত্তই অসার।

একতো দানমেবাহুঃ সমগ্রবর দক্ষিণঃ।
একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্॥

(পূঃ গরুড়)

পণ্ডিতেরা সমগ্র দক্ষিণার সহিত দান এক পক্ষে এবং ভয়ভীত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা এক দিকে এই উভয়কে তুল্য বলিয়াছেন।

কর্ণস্য ভূষণং শাস্ত্রং দানং হস্তস্য ভূষণম্।
কর্ণস্য ভূষণং সত্যং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥

যিনি শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার কর্ণই সুভূষিত, যিনি হস্তে দান করেন তাঁহার হস্তই প্রকৃত বিভূষিত, যিনি সত্য কথা বলেন তাঁহার কণ্ঠই সুশোভিত; ইহাদের আর অন্য ভূষণের প্রয়োজন হয় না। দানই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। যথা—

সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষশ্চ ক্ষমার্জ্জনম্।
জ্ঞানং শমো দয়া দানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

ধার্ম্মিককেই দেবতা মুনি নাগ গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যকগণ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন—ধনাঢ্য বা বিলাসীর কেহ পূজা করে না—যথা

দেবতা মনুয়ো নাগা গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা নরাঃ।
ধার্ম্মিকং পূজয়ন্তীহ ন ধনাঢ্যং ন কামিনম্॥
(পুঃ গরুড়)

সুতরাং ধনের কিছুই মূল্য নাই বাস্তবিক যাঁহারা ধর্ম্ম ও বেদ রক্ষার জন্য ধন দান করেন, তাঁহারা সকল দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। মাংস খণ্ড যেমন জলে থাকিলে মৎস্যে খায়, স্থলে থাকিলে শ্বাপদ জন্তুগণ খায় এবং আকাশে থাকিলে পক্ষীরা খাইয়া

ফেলে, তদ্রূপ বিত্তবান্ ব্যক্তির বিত্তও যেখানেই থাকুক না কেন, কেহ না কেহ তাহা উপভোগ করিবেই করিবে। যথা—"যথামিষং জলেমৎস্যৈর্ভক্ষ্যতে শ্বাপদৈর্ভুবি।

আকাশে পক্ষিভিঃ নিত্যং তথা সর্ব্বত্র বিত্তবান্॥

সুতরাং সর্ব্বথা ধ্বংসশীল ধন দিয়া কিছুই ফল ভোগ করা যায় না, পারত্রিক ফল লাভ করাই শ্রেয়ঃ, সেই শ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইলেই সর্ব্বতোভাবে দান করাই প্রধান কর্ত্তব্য। তবে কোন্ প্রকার দান করা সুখ-দায়ক তাহাই বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন।

বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি ধনমক্ষয় অন্নদঃ।
তিল প্রদঃ প্রজামিষ্ঠাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্॥
ভূমিদ সর্ব্বমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ু হিরণ্যদং।
গৃহদোহগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদো রূপমুত্তমম্॥
যান শয্যাপ্রদোভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভযপ্রদঃ।
ধন্যাদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মশাশ্বতম্॥
ধান্যান্যাপি যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ।
বেদবিৎসু বিশিষ্টেষু প্রেত্য স্বর্গং সমশ্নুতে॥"
ভূমিদানাৎ পরং দানং বিদ্যতে নেহ কিঞ্চন।
অন্নদানং তেন তুল্যং বিদ্যাদানং ততোহধিকম্॥

(কূর্ম্ম পুরাণম্)

ইহা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই সর্ব্ব প্রকার দানেই পুণ্যাদি লাভ হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু বেদ দান করিলে অবিনশ্বর ব্রহ্মত্বে লাভ করা যায়। বেদ শিক্ষার জন্য যাঁহারা দান করেন, তাঁহারাই ধন্য এবং পুণ্যবান্। পক্ষান্তরে যাঁহারা এরূপ শুভকর দানেও বাধা দেন, তাঁহারা কিরূপ তাহাও শাস্ত্রকারগণ দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা—

"যজ্ঞ দান বিবাহানাং বিঘ্নকর্ত্তাভবেৎ ক্রিমিঃ।
দেবতা-পিতৃ-বিপ্রাণামদত্বা যঃ সমশ্নুতে।
প্রমুক্তো নরকাদ্বাপি বায়সঃ স প্রজায়তে॥

(২০ শ্লোক পুঃ গরুড় পুঃ ২২৯ অঃ)

যজ্ঞ, দান ও বিবাহে যে ব্যক্তি বিঘ্ন জন্মায় সে ক্রিমিরূপে এবং দেবতা, পিতা এবং বিপ্রকে দান করিয়া আহার করিলে বায়সরূপে জন্ম গ্রহণ করে।

অন্যথা—একটী প্রচলিত উপাখ্যানে পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন, দান প্রতিষেধকের ন্যায় পাপিষ্ঠ আর নাই। গল্পটী অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—একটী রাক্ষসী রূপ যৌবন গুণ-সম্পন্ন বহু বহু মানব ও অন্যান্য

জীবকে হনন করিয়া গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে নৌকা-যোগে পারাপার করিবার সময় এই নিয়ম করিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি তাহার কথিত শ্লোকের প্রকৃত উত্তর দিতে অক্ষম হইবে তাহাকে সে নিধন করিবে, অন্যথায় সে উত্তর দাতা কর্ত্তৃক হত হইবে। তাহার প্রশ্ন এই—

"গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে নৌকাভিতটবর্ত্তিতে।
সোঽহং বিপ্রঞ্চ ভক্ষ্যামি কঃ পাপিষ্ঠ কিমধিকঃ॥

রাক্ষসী এই প্রকারে বহুজনকে নিহত করিতেছে, কেহই সদুত্তরে সক্ষম হইতেছেন না, ভাবিয়া মহর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসীকে বলিলেন ত্বরায় পার কর, রাক্ষসী ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিল, মুনে! আমার প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে তোমায় বধ করিব। মুনি তাহার প্রশ্ন জানিতে বাসনা করিলে রাক্ষসী প্রাগুক্ত শ্লোকটী বলিল। নারদ তাহার প্রকৃত উত্তর দিয়া রাক্ষসীর উপদ্রব বারণ করিলেন। উত্তর যথা—

আশাং দত্ত্বা ন দাতব্যা দাতারাং প্রতিষেধকঃ। *
স্বয়ং দত্তাহরশ্চৈব স পাপিষ্ঠ ততোঽধিকঃ॥

শ্রীস—

---

* জিলা ময়মন সিংহ বাজীৎপুর থানার অধীন ছয়সতী গ্রাম নিবাসী

বঙ্গবধূর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইহাও অনেকে অবিশ্বাস করিতে পারেন, কারণ আজ কালকার দিনে লোকের বুদ্ধি বড়ই তর্কপরায়ণা, একটু চিন্তা করিয়া উপলব্ধি করিতে চায় না; তাই আমাকে দেখাইয়া দিতে হইতেছে যে এক টাকায় লক্ষাধিপতি হওয়াও কিছুই আশ্চর্য্যকর নহে। কিন্তু সংযমী ও নির্লোভ এবং সদসদ্ বিবেচনা-শীল হওয়া আবশ্যক। উদ্যোগী এবং ধর্ম্মশীল না হইলে কোন কার্য্যেই সুফল পাওয়া যায় না; তাই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত; তিনিই ফলদাতা প্রভু। আমরা আমাদের কার্য্য নিষ্কাম ভাবে করিয়া যাইতে পারিলেই ভাল হয়। এক্ষণে কিরূপে এক টাকাতে লক্ষাধিক টাকা হইতে পারে তাহাই পরীক্ষা করুন্। ভগিনীদের কেহ যদি অর্থাগমের এই শুভ সূত্রটী অবলম্বন করিয়া সুখী হন,

---

মহাত্মা শ্রীযুক্ত নিভরসা রাম গোপ বেদবিদ্যালয় জন্য নগদ ১০০০৲ এক হাজার এবং ভাগল পুর গ্রাম নিবাসী মহাত্মা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পোদ্দার ও শ্রীমতী মহামায়া দাস্যা একত্রে নগদ ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিয়া বেদবিদ্যালয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করতঃ মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ভগবান্ তাঁহাদিগকে আন্তরিক কায়িক ও সুখশান্তি বিধান করুন্। নিঃ আঃ গৌঃ সম্পাদক।

তবে আমি ধন্য হইব ; আমার পরিশ্রম, কুলবধূ হয়ে লেখা সার্থক হইবে। আমাদের দেশে মাসিক প্রতি টাকায় এক আনা সুদও পাওয়া যায়, কিন্তু আমি তাহার অর্দ্ধেক সুদের হিসাব দিয়াই আমার লিখিত বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছি। একটী টাকা মাসিক আধ আনা সুদ পাওয়ার নিয়মে লগ্নি করিলে কিছু সুদ ছাড়িয়া দিয়াও তিন বৎসরে দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৲ দুই টাকা হয়। এই প্রকারে ৫১ বৎসরে এক লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা হইতে পারে। আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া না দেখাইয়া দিলে, বোধ হয় পাঠিকা ভগিনীগণ চিন্তা করিয়া বুঝিবার আয়াস স্বীকার করিবেন না। তাই টীকায় পরিষ্কার লেখা গেল*। ভগবানের কৃপায় অনেকেই ৫০ বৎসর বাঁচিয়া থাকিবেন, এক জনেও পরীক্ষা করুন্। নিত্য নৈমিত্তিক খরচ

* ১৲টাকায় তৃতীয় বৎসরে ২৲টাকা,৬ষ্ঠ বৎসরে ৪৲ টাকা, ৯ম বৎসরে ৮৲টাকা, ১২শ বৎসরে ১৬৲টাকা, ১৫শ বৎসরে ৩২৲ টাকা, ১৮শ বৎসরে ৬৪৲ টাকা, ২১শ বৎসর ১২৮৲ টাকা, (তিন টাকা সুদ ছাড়িয়া দিয়া ১২৫৲ টাকাই ধরা হউক্) ২৪শ বৎসরে ২৫০৲ টাকা, ২৭শ বৎসরে ৫০০৲ টাকা, ৩০শ বৎসরে ১০০০৲টাকা, ৩৩শ বৎসরে ২০০০৲টাকা, ৩৬শ বৎসরে ৪০০০৲টাকা, ৩৯শ বৎসরে ৮০০০৲টাকা, ৪২শ বৎসরে ১৬,০০০৲টাকা,৪৫শ বৎসরে ৩২,০০০৲টাকা,৪৮শ বৎসরে ৬৪,০০০৲ টাকা, ৫১শ বৎসরে ১,২৮,০০০৲ এক লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা হয়

হইতে অনায়াসেই কিছু কিছু বাঁচাইয়া, নিজেদের বিলাসিতা হইতে কিছু কিছু কাটিয়া রাখিয়া, কয়েক বৎসর অপেক্ষা করুন্, দেখিবেন, আপনারা কৃতকার্য্য হইতে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। তখন আমাকেও আপনারা উপদেশ দিতে পারিবেন।

একবার ভাবিয়া দেখুন, আমরা অনাবশ্যকীয় নানা-রূপ অপকার্য্যে কত টাকা অপব্যয় করিয়া থাকি, আমাদের অপব্যয়িতার দরুণই স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে ঋণী ও নিঃস্ব করত উদরান্নের জন্য মহা চিন্তায় ব্যাকুল করিয়া তুলি, শেষে আমাদের সাধের অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়াও অনাটন দূর করিতে সক্ষম হই না। তাই বলি ভগিনীগণ! জীবনের প্রথম ভাগেই সাবধান হউন্; বড় লোকের অনুকরণ, বিলাতের বিলাস-উপকরণ এবং সময়ের অন্যায় অপহরণ ছাড়িয়া দিন্। কাজে প্রবৃত্ত হউন্; সেমিজ, কেমিজ, জ্যাকেট, বডিজ, সাবান এসেন্স প্রভৃতি ব্যবহারের আবশ্যকতা পরিত্যাগ করুন্। কোনও কষ্ট হইবে না, স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে না, ভয় নাই, শাস্ত্রীয় আদেশ পালন করুন্; মনের শান্তি, দেহের কান্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। মানসিক বলে বলবতী হইতে পারিবেন, বিলাস দ্রব্যকে

তুচ্ছ ভাবিয়া লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইবেন। প্রথমতঃ শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রতিপালনে কিছু কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সে কষ্ট অল্পদিনেই সহিয়া যায়, শেষে পরম সুখে সুখী হইয়া কষ্টকে ভুলিয়া যাইবেন। শাস্ত্র মানসিক, শারীরিক বহুবিধ নিয়ম পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন। তাহার প্রতিপালনে সক্ষম হইলে দেবত্ব লাভ করা যাইতে পারে। আমি নিজে অজ্ঞান, তাই মাত্র কয়েকটি নিয়ম লিখিতেছি। "প্রাতরুত্থান" ইহাকে শাস্ত্র বড়ই উপরে তুলিয়াছেন। যিনি প্রাতরুত্থানে অক্ষম, তাঁহার জীবন মৃতবৎ; সর্ব্বদাই প্রাতরুত্থানের জন্য শাস্ত্র নানারূপ আদেশ দিয়াছেন। প্রাতরুত্থানে কি যে অমৃতোপম সুখানুভব হয়, তাহা ভুক্তভোগীই অবগত হইতে পারেন; তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যখন পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ রক্তাভ হয়, তখন বোধ হয় যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিকশিত ও জাগরিত হইয়া জগদীশ্বরকে স্তুতি করিতে থাকে। কোন কবি লিখিয়াছেন,—

"ঊষার মাধুরী বক্ষে মানস মোহন,
ফুটিয়াছে প্রভাত ওই নয়নরঞ্জন।"

বাস্তবিক প্রভাত শব্দ কেবল ফুলকলি বিকশিত হও-

য়ার জন্য নহে, সমস্ত বিশ্বই যেন প্রভাতে ফুটিয়া উঠে। তাই কবি প্রভাতকেই ফুটিতেছে লিখিয়াছেন, অর্থাৎ এই সময়ে সমস্ত জীব পশু পক্ষী বৃক্ষাদিও যেন বিকশিত হয়। এরূপ সুখদ সময়ে জীবশ্রেষ্ঠ মানবেরি নিদ্রাগত হওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়।

(ক্রমশঃ)

তুমি।*

ওগো মম হৃদিকন্দরনিবাসী।
আমি তোমারি করুণা পিয়াসী।
আমি জানি হে তুমি অতি অদূরে,
বিশ্বব্যাপি' আছ অন্তরে বাহিরে—
ইন্দু-কিরণে আছ, সূর্য্যে বিকাশি'।
কোকিল কুহরে শুনি তব গান,
ভ্রমর গুঞ্জনে উঠে তব তান।
পয়োধি প্রান্তরে ভূধর শিখায়,
গগনে গহনে বাসন্তী শোভায়,
আঁধারে আলোকে রয়েছ প্রকাশি'।

শ্রী—

---

* গান্ধারী—ষৎ।

মা।

১

বিমল বিমানে চাঁদ
হাসিছে যামিনী জাগি,
কাননে হাসিছে ফুল
কে জানে কাহার লাগি ?
সেফালি পড়িছে খসি,
কাহার চরণ তলে ?—
কে জানে হাসিছে কেন,
সরোজ সরসী জলে ?

২

ভারত-শ্মশান-মাঝে,
কার শুভ আগমনে,
শান্তির অমিয় ধার,
ছুটিছে আকুল প্রাণে ?
হৃদয় খুলিয়া গেছে
বদনে প্রীতির ভার,
ধর্ম্মের কাঙ্গাল গুলি,
প্রতীক্ষা করিছে কার ?

৩

কার যাদু-মন্ত্র-বলে,
পুণ্যবাণী উচ্চারণে,
আর্য্যের বিকল অঙ্গে
শক্তি এলো এতদিনে ?
শান্তি-নির্ঝরিণী আজি
ছুটে গেছে সাহারায়,
মরা গাঙে বান এলো
কার স্নেহকরুণায় ?

৪

কার পূর্ণ মায়াবলে,
কার পূত পরশনে
মুখরিত এ ভারত,
পুনঃ সেই বেদগানে ?
পতিত ভারতবাসী,
রোগে শোকে জরজর,
কার আগমনে আজি,
হইতেছে অগ্রসর ?

৫

মূঢ় ! তুমি গেছ ভুলি,
কাহার অর্চ্চনা তরে,
পুনরায় সামরব
উঠিয়াছে ঘরে ঘরে ?—
শকতি-রূপিণী তিনি,
বেদ-প্রসবিনী তারা,
অন্নদা,—অভয়া,—দুর্গা,—
দুর্গমে দুর্গতিহরা।

৬

মঙ্গলার আগমনে
মঙ্গল বাজনা বাজে,
সেজেছে প্রকৃতি তাই
স্বভাব-সুন্দর সাজে।
গগন জলদ-হীন,
হিমসিক্ত নিশিথিনী,
তেই মন্ত্র-জাগরণ,—
অমৃত বেদের ধ্বনি।

৭

হিমানী করুণা-ধারা,
মহামায়া অভয়ার,
পতনে নির্ব্বাণ এবে,
দীপ্ত বহ্নি বাঙ্গালার।
ভীরুতা জড়তা গেছে,—
গেছে রোগ-শোক-ভার,
আনন্দ-উৎসব তাই,
দূরে গেছে হাহাকার!

৮

অশক্তে শকতি দাও,
ওগো শক্তি-স্বরূপিণী!
ভয় চিন্তা কর দূর,
বরাভয়-প্রদায়িনী!
জগত-জননী তুমি,
সৃষ্টির কারণ-স্থল,
ক্ষুধাতুরে অন্ন দাও,
পিয়াসীরে দাও জল।

৯

মায়েরে প্রণাম করি,
মাগিও শক্তির বর,
মা নয় সে মহাশক্তি—
বুঝে না বিমূঢ় নর।
বুক-ভরা স্নেহ তাঁর,
মুখ-ভরা প্রীতি হাসি,
মরতে জাগান তিনি,
স্বরগের শোভারাশি।

১০

আপনা বিলায়ে দাও,
যাহা হয় ক্ষমতায়,
পরার্থে তোমার স্বষ্টি,
ভুলা যেন নাহি যায়।
ভুলোনা কর্ত্তব্য নিজ—
তপস্যা—সাধনা—পথ,
যাহাতে লভিবে সুখ,
পূর্ণ হবে মনোরথ।

শ্রীকামিনী কুমার দে।

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"

——:০:——

মানবাত্মা স্বভাবতঃ ধর্ম্মান্বেষী ! এ কথার যাথার্থ্য বিবিধ প্রকারেই প্রমাণিত হয়। যে পতিত হয়, যে ধর্ম্মের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয়, সেও মনে মনে বলে,— "আমার না পড়িলেই ভাল হইত"। পতনজন্য তাহার প্রতি সমাজের যে অশ্রদ্ধা, তাহা সে নিজেই অতি স্বাভাবিক বলিয়া অনুভব করে, এবং তজ্জনিত সামাজিক দণ্ড অকুণ্ঠিত চিত্তে মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত হয়।

যদি মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ ধর্ম্মের এরূপ অনুগত না হইত, তবে মানব-সমাজমধ্যে কেহই শান্তি রক্ষা করিতে পারিত না। সকল দেশে সকল সমাজেই দেখা যায়, মুষ্টিমেয় দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি বহু সংখ্যক শান্তিপ্রিয় মনুষ্যকে অনায়াসে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে পারে। একজন তাঁতিয়া ভীল সমগ্র মধ্যপ্রদেশে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

অনেকে মনে করেন, লোক-সমাজে পাপী দুরাচার মানুষের সংখ্যাই অধিক ; বাস্তবিক তাঁহাদের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে,

মুষ্টিমেয় সাধুপ্রকৃতির লোক বহুসংখ্যক দুষ্ক্রিয়াসক্ত মানুষকে ধরিতেছে, বাঁধিতেছে, জেলে লইয়া যাইতেছে, ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইতেছে! বাস্তবিক ইহা তবে এক বিচিত্র দৃশ্য বটে! যদি জনসমাজে অধার্ম্মিক দুরাচারদের সংখ্যাই অধিক হয়, তবে শক্তি অধিক হয় না কেন? কেন অধার্ম্মিক দলবদ্ধ হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে শাসনে রাখিয়া যথেচ্ছাচারের মাত্রা বাড়াইয়া দেয় না?

কুকুরটীর গলায় বগ্লসটী দিতে যাও, সে ঘাড় পাতিয়া সেটী লইবে,—কেন? সে জানে, তোমার এমন শক্তি আছে, যাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আদবেই উপায় নাই। তেমনি পাপী দুরাচারগণও জানে যে, জন-সমাজের অন্তরালে কোথাও এমন শক্তি লুক্কায়িত আছে, যাহার জয় অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। নতুবা তাহারা সাজা মস্তক পাতিয়া লয় কেন?

ধর্ম্মের জয়ের এই অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্য্যতার জ্ঞান কি মানবের প্রকৃতি-নিহিত নয়? বাস্তবিক তাহাই বটে। রামায়ণ ও মহাভারত এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। উক্ত উভয় গ্রন্থের প্রতি এদেশের আপামর সাধারণের এতটা ভক্তি শ্রদ্ধা কেন? তাহা কি এই জন্য নয় যে, ঐ উভয় গ্রন্থের উপদেশ,—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"?

রামায়ণের কবি দেখাইতেছেন, একদিকে বনবাসী রাজ্যভ্রষ্ট, ও মুষ্টিমেয়-বানর-সৈন্য-সহায় রাম, অপরদিকে প্রবল-প্রতাপ লঙ্কেশ্বর রাবণ;—যাঁহার পরাক্রমে, বীর্য্যে, স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রকম্পিত,—যাঁহার দ্বারে ইন্দ্র, চন্দ্র, শৌর্য্যে, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পালগণ বাঁধা! অবশ্যই (কবি দেখাইয়া না দিলে) বিষয়-বুদ্ধির বিচারে, কে ভাবিতে পারিত যে, এই কপি-সহায়, অরণ্যচারী রামের হস্তে প্রবলপ্রতাপ দশানন সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবেন? কিন্তু তাহাই হইল; রাবণ নিজ বল-দর্পে পাপকে বরণ করিয়া "এক লক্ষ পুত্র ও শোয়া লক্ষ নাতি" সহ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন! উঃ কি ভয়ঙ্কর শাস্তি!—কি ভয়াবহ পরিণাম! ঋষি মুখে না বলিলেও, বুঝিতে দিলেন,—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"।

মহাভারতেও সেই কথা। কুরু-পাণ্ডবগণ উভয় পক্ষ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত,—কৃষ্ণ দ্বারকায় বাস করিতেছেন। তিনি উভয় পক্ষেরই বন্ধু,—উভয় পক্ষেরই আত্মীয়,—উভয় পক্ষই তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী। কৃষ্ণ কি করেন? তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। এক-দিকে আপনাকে ও অপর দিকে নিজ নারায়ণী সেনা রাখিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন—"আমি উভয়েরই বন্ধু,

এক পক্ষ আমাকে লও, অপর পক্ষ আমার নারায়ণী সেনা লও'। অল্পবুদ্ধি দুর্য্যোধন পার্থিব বিভবের প্রতিই সমধিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—মনে মনে ভাবিল,—"একাকী কৃষ্ণকে লইয়া কি করিব? এক বাণের কর্ম্ম বই ত নয়,—এক কৃষ্ণ গেলেই ত সব গেল? আমি নারায়ণী সেনা লইব। ইহারা এক এক জন এক একটী বীর, ইহাদের সাহায্যে যুদ্ধে জয়শ্রী লাভ অবশ্যম্ভাবী"। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থূলমতি দুর্য্যোধন কৃষ্ণের নারায়ণী সেনা লইতে চাহিলেন; কৃষ্ণ বলিলেন,—"তথাস্তু"। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদেরই ছিলেন, পাণ্ডবদেরই রহিয়া গেলেন। এদিকে সুযোগ বুঝিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আপন সারথ্যে বরণ করিলেন, পাণ্ডবসৈন্যগণ মধ্য হইতে মুহুর্ম্মুহুঃ আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নারায়ণী-সেনা ফেলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু এমন কিছু একটা লইয়া গেলেন, যাহা সুবিশাল সৈন্যদল অপেক্ষাও বলবত্তর,—যাহার প্রভাবে এক মানুষ লক্ষাধিক মানুষের শক্তি প্রাপ্ত হয়। তবে তাহা কি?—তাহা কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রভাব,—তাহা শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতিপুঞ্জের গভীর বিশ্বাস ও প্রগাঢ় নির্ভর। "জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্ত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ"

প্রজাবর্গের এই আনন্দোচ্ছ্বসিত বাক্যাবলীই সেই অটুট নির্ভরতার সম্পূর্ণ পরিচায়ক। প্রজাবৃন্দের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল, ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর—অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিস্বামী,—ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-জয়দ্রথ-প্রভৃতি-বীরগণ-বেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, ঐ অরণ্য-চারী, গৃহ-তাড়িত, হৃতসর্ব্বস্ব কতিপয় পাণ্ডবের হস্তে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইলেন! ঋষি মুখে কিছু না বলিলেও আমাদিগকে বুঝিতে দিলেন,—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"।

তবে কি সত্যই ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী? বাস্তবিক সকল দেশের মহাপুরুষগণ ঐ একই কথা বলিতেছেন। তাঁহারা মানবগণকে নিতান্ত আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন,—"তোমরা কখনও নিরাশ হইও না, আশান্বিত হও, ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য"। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়জলধি-তলে নিমজ্জিত হইতে পারে,—রবি শশী স্ব স্ব কক্ষভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মহাপুরুষদের বাক্য বৃথা হইতে পারে না।

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" কথাগুলি মানবপ্রকৃতিতে এমনি ভাবে গ্রথিত,—এমনি ভাবে নিহিত যে, মানুষ এ কথাগুলি শুনিতে বড়ই ভালবাসে,—যতই শুনে প্রাণে ততই নির্ম্মল আনন্দের উদ্রেক হয়! তাই বলিতে হয় যে,

মানব-প্রকৃতিতে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে আমরা শুনিতে ভালবাসি,—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"। এই অমৃত-ময়ী বাণী যে বলে, সে অনায়াসে আমাদের হৃদয়রাজ্য অধিকার করে,—সে হেলায় আমাদের জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে,—সে আমাদিগকে সহজে আপনার করিয়া লয়।

বলি, মহাপুরুষদিগের,—ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সাধুদিগের মানব-মনের উপর যে এতটা প্রভাব তাহার মূলে কি? জগতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ,—বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতির প্রজা সংখ্যা অধিক, কি রুষ-সম্রাটের প্রজা সংখ্যা অধিক? এক রাজ্য মানবের ধন ধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এক রাজ্য মানবের প্রাণের উপর স্থাপিত। বল দেখি, কোন্ রাজ্যের ভিত্তি গভীর স্থানে নিহিত?

সীজার, সেকান্দর সাহ, নেপোলিয়ন প্রভৃতি পৃথি-বীকে জয় করিতে এবং স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করিতে ক্রটী করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের সেই সাম্রাজ্যের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে কি?—না; তাহা জল-বুদ্বুদের মত জলে উঠিয়াছিল, আবার চোকের পলকে জলেই মিশিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে দুই সহস্র বৎসর হইল জুড়িয়া

দেশের এক অশ্বশালায় একটী সূত্রধর-তনয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে ;—এখনও জগতে কত মণি-মণ্ডিত মুকুট ঐ সূত্রধর-তনয়ের চরণের উদ্দেশে ভক্তি-গদ্গদচিত্তে লুণ্ঠিত হইতেছে! বলি, ঐ সকল মহাত্মাদের এতটা প্রভাবের কারণ কোথায়?—আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিব যে, ইহার মূল কারণ,—ঐ "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"।

যখন মানুষ চারিদিকে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিয়া,—পাপের প্রকোপ দেখিয়া পরিম্লান হইয়া পড়ে,—স্বেচ্ছাচারিতার ভীষণ সংগ্রামে একান্ত ক্লান্ত হইয়া যায়, তখন মহাপুরুষগণ তারস্বরে তাহাদের কর্ণ-কুহরে বলিয়া যান—"মা ভৈঃ, যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" হে জগতের পরিশ্রান্ত জীব মানব! হে পাপ-প্রবৃত্তির ক্রীড়নক মানব! আজ যদি বজ্রগম্ভীরস্বরে তোমার কর্ণে এরূপ তেজোময় পুণ্যময় অমৃতময় ধ্বনি প্রবেশ লাভ করে, তবে কি তুমি স্থির থাকিতে পার?

মানব-প্রকৃতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মের একান্ত অনুগত। জ্ঞানিজনমাত্রেই এ কথার সারবত্তা অনুভব করিয়া থাকেন,—সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, -সকল গুরুই শিষ্যকে এই অমূল্য উপদেশ দিয়া

থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ইমানুয়েলক্যাণ্ট এক স্থানে বলিয়াছেন,—"দুইটী বিষয় আমাকে গভীর বিস্ময়ে পূর্ণ করে; একটী ঐ নক্ষত্র-নিকর-মণ্ডিত অনন্ত আকাশ, অপরটী মানবের হৃদয়নিহিত ধর্ম্ম-বুদ্ধি।" বাস্তবিকই মানবের হৃদয়-নিহিত ধর্ম্মানুরাগ আকাশের ন্যায় অসীম ও অনন্তই বটে।

ধর্ম্মের ভূমিই স্বাধীনতার রঙ্গমঞ্চ। আমরা ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য অতি ব্যস্ত হই। কিন্তু তজ্জন্য ততটা ব্যস্ত না হইয়া, নিজের জন্য ব্যস্ত হইলেই যেন ভাল হয়। কারণ ধর্ম্ম আপনাকে নিজেই রাখিতে জানেন। আর জন-সমাজের জন্যও ভাবিও না, তাহারও একজন রক্ষাকর্ত্তা আছেন। জানিও, তোমার আমার উপর ধর্ম্মের থাকা-না-থাকা, সমাজের থাকা-না-থাকা কস্মিন্‌কালেও নির্ভর করে না। হে বুদ্বুদ! তোমাকে যিনি রক্ষা করিতেছেন, তিনিই ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। ধর্ম্মের আঘাতে পাছে হাতের নিকটস্থ স্বার্থহানি ঘটে, সেজন্য মানুষ ভয় পায়। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া এ জগতে কাহারও সর্ব্বনাশ হয় নাই,—'যতো ধর্ম্ম-স্ততো জয়ঃ"।

শ্রীকামিনীকুমার দে।

কর্ম্মফল।

—০:*:০—

'কর্ম্ম' অর্থে ক্রিয়া অর্থাৎ যাহা করাযায় তাহাই বুঝায়; 'কৃ' ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় যোগেই কর্ম্ম শব্দ সাধিত হয়। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ ॥

(চতুর্থ অঃ ১৬ শ্লো)

হে ধনঞ্জয়! কিরূপভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা প্রকৃত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, আর কিরূপ ভাবে করিলে অকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, তাহা জানিতে বুদ্ধিমান্ লোকও মুগ্ধ হইয়া থাকে। অতএব সেই প্রভেদ তোমাকে বলিতেছি। যাহা জানিলে তুমি সংসারদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ প্রতীতি হইতেছে যে সংসারীর কর্ম্ম শব্দে ক্রিয়াই বুঝায়। সেই ক্রিয়া সৎ ও অসৎ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। সৎক্রিয়া—পূজা, যাগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ও সত্যবাদিতা প্রভৃতি; এবং অসৎ ক্রিয়া—চৌর্য্য, বধ ও মিথ্যাদি। কিন্তু পূজা যাগাদি

সৎক্রিয়াও ব্যক্তি ভেদে অসৎ ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রদ্ধাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মূলে যাহা করা যায়, তাহাই সৎ এবং অশ্রদ্ধাদি অধর্ম্মবৃত্তিমূলে যাহা করা যায় তাহাই অসৎ। যথা—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ (গীতা)

অসৎ কর্ম্মদ্বারা নরকাদি এবং সৎকর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" এই শাস্ত্র-বাক্য দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি সর্ব্বজীবে (পশু পক্ষী ও বৃক্ষাদিতেও) সমভাব রাখিয়া সকল জীবকেই দয়া করিতে হইবে; ইহাই সৎকর্ম্ম। এইজন্য মুনিগণ বৃক্ষ হইতে পতিত ফলাদি আহার করিতেন; কারণ, তাঁহারা 'ছেদনং বৃক্ষজাতীনাং দ্বিতীয়ং নরকং স্মৃতম্' বলিয়া বৃক্ষ-দিগকেও পীড়া দিতেন না। এবং তদ্বিপরীতে হিংসাত্ম-কাদি অর্থাৎ "অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি।" ইহাদ্বারাও দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রিয়দিগকে দমন না করিলে মনুষ্য নরকগামী হয়। সুতরাং কর্ম্মজন্য শুভ অশুভ উভয় ফলই নিশ্চয় এবং কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। যথা—

সুখং দুঃখং ভয়ং শোকো হর্ষো মঙ্গলমেব চ।
সম্পত্তিশ্চ বিপত্তিশ্চ সর্ব্বং ভবতি কর্ম্মণা॥

কর্ম্মণা গুণবাংশ্চৈব কর্ম্মণা চাঙ্গহীনকঃ।
কর্ম্মণা বহুভার্য্যশ্চ ভার্য্যাহীনশ্চ কর্ম্মণা॥
কর্ম্মণা রূপবান্ ধর্ম্মী রোগঃ শশ্বৎ স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা চ ভবেদ্ব্যাধিঃ কর্ম্মণারোগ্যমেব চ॥
কর্ম্মণা মৃতপুত্রশ্চ কর্ম্মণা চিরজীবিনঃ।
তস্মাৎ কর্ম্মপরং রাজন্ সর্ব্বেভ্যশ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্॥
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
কর্ম্মণেন্দ্রো ভবেজ্জীবো ব্রহ্মপুত্রঃ স্বকর্ম্মণা॥
স্বকর্ম্মণা ভবেৎ সিদ্ধিরমরত্বং লভেদ্ধ্রুবম্।
স্বকর্ম্মণা হরের্দ্দাসো জন্মাদিরহিতো ভবেৎ॥
সুরত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ রাজেন্দ্রত্বং লভেন্নরঃ।
কর্ম্মণা চ শিবত্বঞ্চ গণেশত্বং তথৈব চ॥
কর্ম্মণা চ মুনীন্দ্রত্বং তপস্বিত্বং স্বকর্ম্মণা।
স্বকর্ম্মণা ক্ষত্রিয়ত্বং বৈশ্যত্বংঞ্চ স্বকর্ম্মণা॥
কর্ম্মণা রাক্ষসত্বংঞ্চ কিন্নরত্বং স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণৈবাধিপত্যঞ্চ বৃক্ষত্বংঞ্চ স্বকর্ম্মণা॥
কর্ম্মণৈব পশুত্বংঞ্চ বনজীবী স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা ক্ষুদ্রজন্তুত্বং কৃমিত্বংঞ্চ স্বকর্ম্মণা॥

(দেবীভাগবতম্)

ইত্যাদি বচন দ্বারা নিশ্চয় উপলব্ধি হইতেছে কর্ম্ম-

জন্য ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে এবং কর্ম্মফল দ্বারাই রাজত্ব, দরিদ্রত্ব, দেবত্ব ও রাক্ষসত্বাদি সবই হইতেছে। শাস্ত্র আরও লিখিয়াছেন,—

"মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।"

সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহের সঙ্গে সঙ্গে কখনই কর্ম্মফল বিলীন হইয়া যাইতে পারে না। জীবকে শত কোটি জন্মের পরে হইলেও কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, আমি আজ কর্ম্ম করিলাম, তাহার ফল আজই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্ম নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ফল ফুরাইয়া যাইবে না কেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"জলাদেরুষ্ণত্বাদিব, দণ্ডাদেভ্রমিরিব"

অগ্নি বা উত্তাপ সংযোগে জল উষ্ণ হইলে কিংবা দণ্ড বা বল সংযোগে চক্রের ভ্রমণ উৎপাদন হইলে যেরূপ অগ্নি, উত্তাপ, দণ্ড বা বল বিলুপ্ত হইলেও, তাহাদের উষ্ণতা ও ভ্রমণাদি বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, সেই প্রকারে শুভাশুভ যাবতীয় কর্ম্মফল তৎকার্য্যকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবেই হইবে। এই যে আমরা চারিদিকে বিভিন্নরূপ জীব দেখিতে পাই,—জীবের বিভিন্নরূপ কর্ম্ম দেখিতে পাই—বিভিন্নরূপ মানব দেখিতে পাই,—কেহ

চোর কেহ সাধু, কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ কর্ত্তা কেহ ভৃত্য, কেহ শিক্ষক কেহ ছাত্র, কেহ যোগী কেহ ভোগী, কেহ ধনী কেহ দরিদ্র, কেহ গৃহস্থ কেহ সন্ন্যাসী, কেহ দাতা কেহ ভিক্ষুক, কেহ উকীল কেহ মক্কেল, কেহ বিক্রেতা কেহ গ্রহীতা, কেহ পণ্ডিত কেহ মূর্খ, কেহ বক্তা কেহ শ্রোতা, কেহ কবি, কেহ গায়ক, কেহ রোগী কেহ নীরোগ, কেহ বণিক্, কেহ কৃষক ইত্যাদি সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফলানুরূপ বিভিন্ন বেশে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম জনিত কর্ম্মফলই ইহার মূল কারণ। যদিও বা কখন কখন দেখা যায় শাস্ত্রাদিষ্ট কুকর্ম্ম করিয়াও কেহ কেহ সুফল ভোগ করিতেছেন এবং কেহ বা শাস্ত্রানুমোদিত সুকর্ম্ম করিয়াও মন্দফল ভোগ কারতেছেন। তাহারও মূলে কর্ম্মফলই বিদ্যমান। মন্দাচারী ব্যক্তিরও পারত্রিক শুভ কর্ম্মফলেই কালে শুভফল পাইতে কোনও বাধা জন্মিতে পারে না এবং শুভকর্ম্মার্থী ব্যক্তিরও পারত্রিক কুকর্ম্মফলে অশুভ ফল ভোগ করিতে হয়; বিশেষতঃ মানবজাতির মানসিক, বাচনিক ও কায়িক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতেই শুভাশুভ কর্ম্মফল উদ্ভব হয়। লোকচরিত্র বুঝা বড়ই কঠিন;

যাহার বাচিক বা কায়িক কাজ অতি উত্তম মনে করি, তাহার ও মানসিক কর্ম্ম অতি জঘন্য হইতে পারে, সুতরাং কর্ম্মফল অন্যের নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে। খাঁটি সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কৃষক, শ্রেণীর অনেকে মুখে সদ্ব্যবহার প্রকাশে অক্ষম, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের হৃদয়ের উচ্চতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হৃদয়ের কাছেই ধর্ম্ম, হৃদয়ের কাছেই কর্ম্ম, হৃদয়ের খবর অন্য কেহ জানিতে পারে না ; জানেন স্বয়ং ভগবান্ এবং জানেন নিজে দেহী। আমরা মাত্র বাহ্যিক বেশ দেখিয়া যাই। যাঁহাকে দেখিয়া আমরা বিলাসী বাবু মনে করি, তাঁহারও ভিতরে যে জনকের ন্যায় ত্যাগশীলতা, শুক-দেবের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য এবং যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদিতা বিদ্যমান না আছে কে বলিতে পারে? ধর্ম্মধ্বজধারী সন্ন্যাসিবেশী বহুলোককেও গুরুতর পাপে দণ্ডিত হইতে দেখিয়াছি। সুতরাং কর্ম্মফল ভগবান ব্যতীত অন্য কেহ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন না। অনেক সময় কর্ম্মকর্ত্তাও কর্ম্মফল বুঝিতে পারেন না। কিন্তু কর্ম্মফলদাতা ভগবান্ সবই জানেন, সবই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

দেবী-ভাগবত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ১৫ পৃঃ)

ঋষিগণ কহে সূত করি নিবেদন,
কহ শুনি সে বৃত্তান্ত আশ্চর্য্য ঘটন।
সর্ব্ব কর্ত্তা জনার্দ্দন জগতের পতি,
তাঁর শির ছিন্ন হ'ল হায় কি দুর্গতি।
বেদের পূজিত যিনি দেবের আশ্রয়,
হয়গ্রীব হন্ তিনি হতেছে বিস্ময়।
আদি দেব পরাৎপর বিভু জনার্দ্দন,
তাঁহার এদশা কেন বল সে কারণ?
সূত কহে এক মনে শুন মুনিগণ,
বলিব বিস্ময়কর সেই বিবরণ;
পূর্ব্বে যুদ্ধ করে দশ সহস্র বৎসর,
পরিশ্রান্ত হইলেন দেব গদাধর।
পদ্মাসনে মহাবিষ্ণু বিশ্রাম কারণ,
সজ্জিত ধনুকে কণ্ঠ করিয়া স্থাপন;
ধনুক উপরে ভার করিয়া অর্পিত,
প্রগাঢ় নিদ্রায় বিভু হইলা নিদ্রিত।

কিছুকাল এইরূপে হইলে অতীত,
যজ্ঞ হেতু দেবগণ হয় সম্মিলিত।
জনার্দ্দন ভগবান্ বিশ্বে যজ্ঞেশ্বর,
দেবগণ মিলে যান তাঁহার গোচর ;
দেখিলা দেবতা সবে নিদ্রিত শ্রীপতি,
কিসে নিদ্রা ভঙ্গ হয় করিলা যুকতি।
বিষ্ণু বিনে বৃথা যজ্ঞ বলিলা শঙ্কর,
জাগরিত কর তাঁয় কহে পুরন্দর।
সবে যুক্তি করে ইহা করিলা নিশ্চয়,
জাগ্রত করিতে হবে সেই সর্ব্বময়।
নিদ্রাভঙ্গে কষ্ট যেন ঈশ্বর না পান,
জাগ্রত করহ তাঁরে হয়ে সাবধান।
ধনুর্জ্যা ছুটিলে শব্দ হবে ভয়ঙ্কর,
সে শব্দে বিভুর নিদ্রা হইবে অন্তর।
সে গুণ ছাড়িতে ব্রহ্মা করিয়া নিশ্চয়,
সৃজিলেন বম্রী নামে কীট দুরাশয়।
কীটে আদেশিলা ব্রহ্মা করিতে ছেদন,
কীট কহে হেন পাপ করে কোন জন ?
"অপরের সুখনিদ্রা ভাঙ্গে যে পামর,
দম্পতি প্রণয়ে বাধা দেয় যেই নর,

কথার উপরে কথা কহে যেই জন,
মাতৃকোল হ'তে পুত্র যে করে হরণ।
ব্রহ্মহত্যা সম পাপী ইহারা সংসারে,
কহ কেন প্রভো হেন পাপ করিবারে। *
কি স্বার্থ আমার তাহে কহ পদ্মনাভ।
পাপ কার্য্য করে জীব হ'লে স্বার্থ লাভ।
বিরিঞ্চি কহিলা শুন ওহে স্বার্থপর !
যজ্ঞ ভাগ পাবে তুমি দিলাম সে বর।
যজ্ঞ কুণ্ড হ'তে যাহা পড়িবে বাহিরে,
সে ঘৃতাদি পাবে, কার্য্য করহ অচিরে।
ব্রহ্মার আদেশে কীট হয়ে হৃষ্টমন,
ধনুকের অগ্রভাগ করিল কর্ত্তন,
অমনি ধনুর গুণ ছুটে ততক্ষণ,
জগৎ কাঁপায়ে শব্দ হইল ভীষণ।
সমুদ্র উদ্বেল হ'ল, কম্পিত ভূধর,
ক্ষুভিত ব্রহ্মাণ্ড, ব্যস্ত বিশ্ব চরাচর।
উল্কা পাত ঘন ঘন ত্রস্ত জীবগণ,
রবি অস্তমিত, বহে উত্তপ্ত পবন।

---

* নিদ্রাভঙ্গঃ কথাচ্ছেদোদম্পত্যোঃ প্রীতিভেদনম্।
শিশুমাতৃবিভেদশ্চ ব্রহ্মহত্যাসমং স্মৃতম্॥

দশ দিক্ ভয়ানক দেবতা আকুল,
কি অনর্থ হবে, সবে ভাবিয়া ব্যাকুল।
অনন্তর প্রশমিত হ'লে অন্ধকার;
দেখে সবে বিষ্ণু শির দেহে নাহি তার।
বিষ্ণুর কবন্ধ কায় করিয়া দর্শন,
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ করিলা রোদন।
হায় নাথ! হায় প্রভো দেব সনাতন,
তোমার মস্তকহীন বল এ কেমন?
এ কি অসম্ভব কাণ্ড বিশ্বাস না হয়,
জাগ্রত কি স্বপ্নে মোরা জানিনা নিশ্চয়।
অভেদ্য অচ্ছেদ্য তুমি অদাহ্য অমর,
কোথায় মস্তক তব কহ মহেশ্বর?
সহিতে না পারি মোরা এ দারুণ শোক,
তোমার অভাবে নষ্ট হইবে ত্রিলোক।
কত মায়া জান তুমি ওহে মায়াময়,
কি মায়া পেতেছ আজি কে করে নির্ণয়।
তোমার কারণ মোরা হয়েছি অধীর,
কি করি কোথায় যাই নাহি কিছু স্থির।
মানব হ'তেও মোরা ঘোর স্বার্থপর,
নির্জ্জর অমর নহি দুর্জ্জন পামর;

আমাদের স্বার্থ লিপ্সা করিতে সাধন,
আরাধ্য দেবের শির করিনু ছেদন।
করেনি যে কার্য্য পূর্ব্বে যক্ষ রক্ষগণ,
আমরা দেবতা হয়ে করেছি এখন।
কি উপায় করি এবে কহ দয়াময়,
তোমার অভাবে হবে সবের বিলয়।
তুমি বিনে রক্ষা কর্ত্তা কেবা দেবতার,
কতবার করিয়াছ বিপদে উদ্ধার।
এইরূপে দেবগণ করিছে ক্রন্দন,
দেবগুরু বৃহস্পতি কহিলা তখন,
ওহে দেবগণ কেন কর অনুতাপ,
অনুতাপে অবিরত বাড়ে শোকতাপ।
শান্ত হও, শোক ত্যজ, করহ বিধান,
তোমরা দেবতা সবে নহ ত অজ্ঞান?
অজ্ঞানের মত কেন কর হাহাকার,
ধৈর্য্য ধ'রে বিপদের কর প্রতীকার।
দৈব বা পুরুষকার উভয়ে সমান,
উভয়ের আরাধনা করে বুদ্ধিমান;
দৈববলে কোন কার্য্য না হলে সাধন,
পুরুষকারের চেষ্টা করে জ্ঞানিগণ।

অতএব কর সবে, পৌরুষ-প্রয়োগ,
কর্ম্মবলে বিষ্ণুশির হইবে সংযোগ।
গুরুবাক্য শুনি' কহে সহস্রলোচন,
পৌরুষে বিশ্বাস মম নহে কদাচন।
বিষ্ণুশির ছিন্ন হ'ল চক্ষের উপর,
দৈবই প্রধান আমি জানি নিরন্তর।
ব্রহ্মা কন দৈবে যাহা হয় বিঘটন,
অবশ্য ভুগিতে হবে না যায় খণ্ডন।
দৈব অতিক্রম করে হেন সাধ্য কার ?
সুখ দুঃখ দৈবযোগে আসে বারবার।
পূর্ব্বকালে কালবশে শুন সবিশেষ,
আমার মস্তক ছিন্ন করিলা মহেশ।
দৈবে হ'ল পুনঃ তাঁর লিঙ্গ নিপতন,
দৈবে সদা অঘটন করে সংঘটন।
এই ইন্দ্র শচীপতি স্বর্গের ঈশ্বর,
কত ক্লেশ ভুগেছেন শুন সবিস্তর।
হইল সহস্র ভগ দৈবে সংঘটন,
স্বর্গচ্যুতি হ'ল তার পঙ্কে পলায়ন।
ইন্দ্র চন্দ্র আমি কিংবা দেব মহেশ্বর,
সবেই পেয়েছি দুঃখ বিস্তর নিস্তর ;

এ সংসারে দুঃখ ভোগ না হয় কাহার,
অতএব কর সবে শোক পরিহার।
ধ্যান কর মহামায়া দেবীর চরণ,
জীবের জননী যিনি বিশ্বের কারণ;
গুণাতীতা আদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী,
জগদ্ধাত্রী রক্ষাকর্ত্রী মঙ্গল-কারিণী।
করিলে যাঁহার ধ্যান দুঃখ নাহি রয়,
চল মোরা লই সবে তাঁহার আশ্রয়।
ইহা বলি আদেশিলা ব্রহ্মা দেবগণে,
তোমরা দেবীর স্তব কর পূত মনে।
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য যত দেবগণ,
করিলা বিবিধচ্ছন্দে দেবীর স্তবন।

স্তব।

নমো দেবি মহামায়ে, বিশ্বোৎপত্তিকরে শিবে,
নির্গুণে সগুণান্বিতে, মাতঃ বিনাশ অশিবে।
ত্রিভুবনেশ্বরী তুমি, শিব কাম প্রদায়িনী,
জীবের জীবন তুমি, সর্ব্বাধার স্বরূপিণী।
তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি সর্ব্বগুণাতীতা,
তুমি লক্ষ্মী, তুমি ক্ষান্তি, স্মৃতিরূপে বিরাজিতা।

শ্রদ্ধা, মেধা, ধৃতি, তুমি, শান্তি, পুষ্টি, প্রদায়িনী,
প্রণবের পর-বিন্দু, অর্দ্ধ-চন্দ্র-স্বরূপিণী।
গায়ত্রী ব্যাহৃতি তুমি, বিজয়া জয়-বর্দ্ধিনী,
ধাত্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ইচ্ছা. তুমি দয়া-স্বরূপিণী।
সকলের মাতা তুমি, সর্ব্বহিত প্রদায়িনী,
জ্ঞানময়ী, বিদ্যা পূজ্যা, তুমি মঙ্গল-রূপিণী।
ভক্ত-বীজ-মন্ত্র তুমি. ভব দুঃখ বিনাশিনী,
আমরা অশক্ত স্তবে, তুমি শক্তিস্বরূপিণী।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, হুতাশন,
বেদবতী সরস্বতী, যম সূর্য্য সমীরণ।
ভুবনের অধিপতি, যত দিক্‌পাল চয়,
তোমারি সৃজিত সব, কেহ তব তুল্য নয়।
শ্রেষ্ঠ হ'তে অতি শ্রেষ্ঠ, তুমি বিশ্বের জননী,
সর্ব্বজ্ঞা সকল-প্রদা, তুমি ত্রিকাল-নয়নী।
তোমার ইচ্ছায় সৃষ্ট, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,
তোমার আদিষ্ট হয়ে, আছে তাঁরা নিরন্তর।
তোমার আদেশে ব্রহ্মা করে বিশ্ব বিরচন,
তোমার আদেশে করে, বিষ্ণু স্থিতি সংস্থাপন।
তোমার আদেশে শিব, বিশ্বের সংহার করে,
তোমার স্বরূপ জানে, হেন শক্তি কেবা ধরে?

কত কোটি নাম তব কেবা তার সংখ্যা পায় ?
বিশ্বের জননী তবু অনাসক্ত আছ তায়।
তড়াগ তরিতে শক্তি, তুমি বিনে আছে কার ?
তবু মোরা ভাবি মনে, উল্লঙ্ঘনে পারাবার।
তোমার শক্তির সীমা, দেবগণে কি জানিবে,
জগন্মাতা জগন্ময়ী, একাকিনী তুমি শিবে।
জগত্ প্রপঞ্চ তুমি, সৃজিয়াছ অবহেলে,
বেদগণ, দেবগণ, সকলি তোমার ছেলে।
তোমার মহিমা মাতঃ কেমনে বুঝিব তবে ?
বেদের অতীত তুমি মুগ্ধ করে আছ সবে।
তোমার মহিমা মাতঃ, তুমিই বুঝিতে নার(ও)।
কে বুঝিবে তব লীলা, আছে কি সে সাধ্য কার(ও)
বিষ্ণুর মস্তক কেন, হ'ল আজি নিপতন,
জান তুমি হে জননি ! বলগো সে বিবরণ।
কি পাপ করেছে মাতঃ, তোমার সদন হরি,
জেনে শুনে কেন কষ্ট, দেহ তাঁরে হে শঙ্করি !
তোমার সেবক হরি, জানি সদা পুণ্যময়,
তাঁহার যে পাপ হবে, কভু কি বিশ্বাস হয় ?
এই দেবগণ সদা, আছে তব অনুগত,
তা'দিগে উপেক্ষা করা, মা তোমার অসঙ্গত।

হরির মস্তক মাতঃ কেন আজি অন্তর্হিত,
এই মহা দুঃখে মোরা অতিশয় বিমোহিত।
জানিনা কেনবা মাতঃ, নির্দ্দয় এ ভক্তগণে,
বিলম্ব করিছ কেন, বিষ্ণু-শির সংযোজনে।
তবে কি দেবের দোষে, এ দুর্দ্দশা হ'ল তাঁর ?
কিংবা যুদ্ধ জয়ে হরি, করেছিল অহঙ্কার ?
তোমার বাসনা কিংবা, হয়েছে মা বরাননে !
বিষ্ণুর কবন্ধ মূর্ত্তি, কৌতূহলে দরশনে।
অথবা অসুরগণ কঠোর তপস্যা বলে,
তোমায় তুষিয়া বর, লভিয়াছে সুকৌশলে।
ভকত-বৎসলা তুমি, মুক্তা দয়া বিতরণে,
অসুরে দিয়েছ বর, বিষ্ণু-শির বিনাশনে।
অথবা লক্ষ্মীর প্রতি, হয়ে বুঝি রাগান্বিত,
অনাথা করেছ তাঁরে ? তাহাও বুঝেনা চিত।
তোমারি সে অংশজাতা, শক্তিরূপা সুপাবনী,
তাহাতে তোমার ক্রোধ কিসে হবে হে জননি !
তোমার (ই) সে অনুগতা, তোমাতেই সদা ধ্যান,
বাঁচাইয়া শ্রীপতিকে রক্ষা কর তাঁর প্রাণ।
হে মাতঃ প্রণত তব, পাদপদ্মে দেবগণ,
বাঁচাও সে জনার্দ্দনে কর কৃপা বিতরণ।

কোথায় বিষ্ণুর শির খুঁজিয়া না পাই হায়!
তোমা ভিন্ন আমাদের, নাহিত মা অন্যোপায়।
অমৃত যেরূপ করে জীবের জীবন দান,
তেমতি তুমিও মাতঃ দেহ আজি বিশ্বপ্রাণ।
প্রসন্না হইয়া দেবী, বেদোক্ত স্তবনে,
আকাশ বাণীতে কন সেই দেবগণে।
"সকলেই সুস্থ হও ওহে সুরগণ,
ভয় নাই হবে শীঘ্র বিপদ মোচন।
হইয়াছি, এই স্তবে, তুষ্ট অতিশয়,
বিপদের প্রতীকার, করিব নিশ্চয়।
যে নর এ স্তবে মম, করিবে পূজন,
বেদপাঠ সমফল, পাবে সেই জন;
দুঃখ মুক্ত হবে তার, আমার বচনে,
সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে, এ স্তব শ্রবণে।
বিষ্ণুর মস্তক ছিন্ন হল যে কারণে,
বলিতেছি সবিস্তার, শুন এক মনে।
একদা কমলাপতি, কমলা দর্শনে,
হাস্য করেছিলা তাঁর নয়নে নয়নে।
শ্রীপতির হাস্যে লক্ষ্মী করে প্রণিধান,
আমায় কুৎসিত হেরি হাসে ভগবান।

এতদিন পরে কেন হাসে নারায়ণ,
কুৎসিত হলেও নহে, হাসির কারণ।
হয়তঃ সপত্নী-প্রেমে, মজিলা শ্রীহরি,
নাজানি সে ভ গ্যবতী কেবা সে সুন্দরী।
এইরূপে নানা চিন্তা করি মনে মনে,
কুপিতা হইলা দেবী তামসাক্রমণে।
তমোগুণে চিত্ত তাঁর করিল আঁধার,
ভুলিলা বিষ্ণুর প্রেম, জ্ঞান আপনার।
বিধাতার নিয়তির কে করে খণ্ডন,
হিতাহিত ভুলে দেবী, শাপিলা তখন।
রুষ্ট ভরে মহালক্ষ্মী অতি ধীরে ধারে,
"মস্তক খসুক তব" বলিলা স্বামীরে।
আপনার সর্ব্বনাশ করিলা আপনি,
কল্পিত সাপত্ন্য ক্রোধে ভুলিলা জননী।
বৈধব্যের মহা ক্লেশ না ভাবিয়া মনে,
ক্রোধভরে বৃথা শাপ দিলা নারায়ণে।
অনৃত, সাহস, মায়া, মূর্খতা, দারুণ *(১
লোভ, নির্দ্দয়তা-শৌচ, নারীর দুর্গুণ।

(১) অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভতা।
অশৌচং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ॥

দেবীশাপে বিষ্ণুশির পড়েছে সাগরে,
মস্তক যোজনা আমি করিব সত্বরে।
এবিষয়ে আর (ও) কিছু রয়েছে কারণ,
কারণ বিহীনে কার্য্য নহে কদাচন।
বলি সে বৃত্তান্ত এবে শুন দেবগণ,
হয়গ্রীব নামে এক দানব ভীষণ।
অনাহারে ভোগ ছেড়ে ধ্যানে হয়ে লীন,
একাক্ষর মায়া বীজ জপে বহু দিন।
তামসী শক্তি ধ্যান করে প্রাণ পণে,
দর্শন দিলাম আমি তার আরাধনে।
সিংহারূঢ়া হয়ে আমি বলিলাম তায়,
হে সুব্রত! কিবা চাও বলহ আমায়।
আমার মোহিনীরূপ করিয়া দর্শন,
প্রণিপাত প্রদক্ষিণ করে ঘন ঘন।
আনন্দে উৎফুল্ল তার নয়ন যুগল,
অশ্রুধারা বহে বেগে ভেসে বক্ষঃস্থল।
মহাতপা হয়গ্রীব মম দরশনে,
কাতরে করিল স্তব বিনীত বচনে।

স্তব।

"সৃজন পালন কারিণি জয়ে,
সংহার কারিণী মহদাশয়ে।

নিয়ত নাশিনী সেবকা শিবে,
কামদে মোক্ষদে শুভদে শিবে।
ধরাম্বু তেজঃ পবনাকাশে,
কারণ কারণ নির্গুণাকাশে।
গন্ধ রস-শব্দ স্পর্শাদি মূলে।
রূপাদি পঞ্চ সূক্ষ্মাদি স্থূলে।
জিহ্বা কর্ণ চক্ষু নাসিকা পদ,
হস্ত ত্বক্ পঞ্চ জীব সম্পদ।
ভগবতী দেবী তুমি মা সর্ব্ব,
আমার আমার বৃথা সে গর্ব্ব।"
কহিলাম তুষ্ট আমি তব তপস্যায়,
বল কিবা বর আমি দিব হে তোমায় ?
হয়গ্রীব বলে "দেবী যদি দেও বর,
তব বরে হই যেন অজেয় অমর।"
ঈশ্বরী কহিলা শুন ওহে বীরবর,
এ সংসারে কেহ কভু না হয় অমর।
মৃত্যু অতিক্রম করে হেন সাধ্য কার ?
কেহই অমর নয় ধ্বংস সবাকার।
জন্মিলে মরণ হয়, মরিলে জনম,
বিবেচনা করে চাহ যা হয় উত্তম।"

অমর করিতে যদি বাসনা না হয়
দেহ সে প্রার্থিত বর হইয়া সদয়।
হয়গ্রীব ভিন্ন কেহ বধিতে না পারে,
দৈত্য কহে দেহ বর ভক্তে তুষিবারে।
'তথাস্তু' বলিয়া দেবী দিলা তারে বর,
গৃহে যাও সুখে রাজ্য কর দৈত্যেশ্বর।
অন্য সব প্রাণী হতে নাহি তব ভয়,
হয়গ্রীব ভিন্ন মৃত্যু হবেনা নিশ্চয়।"
বর পেয়ে মহাসুর হয়ে হৃষ্টমন,
দেব দ্বিজে নানারূপে করিল পীড়ন।
তদবধি তার হন্তা নাহি ত্রিভুবনে,
প্রকৃষ্ট উপায় তার হয়েছে এক্ষণে।
বিশ্বকর্ম্মা হয়গ্রীবা করিয়া ছেদন,
বিষ্ণুর কবন্ধ দেহে করুক্ যোজন।
তবেই জীবিত হয়ে দেব নারায়ণ,
সেই বীর হয়গ্রীবে করিবে নিধন।
ঈশ্বরীর সেই বাক্য শুনে দেবগণ,
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি আজ্ঞা দিলা সেইক্ষণ
দেবের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা বিচক্ষণ,
আনিলা অশ্বের মুণ্ড করিয়া ছেদন।

ছিন্ন মুণ্ড বিষ্ণুস্কন্ধে করিতে যোজন,
সঞ্জীবিত হইলেন দেব জনার্দ্দন।
তদবধি হয়গ্রীব নাম হয় তাঁর,
দেবশত্রু হয়গ্রীবে করিলা সংহার।
যে মানব শুনে এই শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান,
নানারূপ দুঃখে সেই পায় পরিত্রাণ।
দেবীর চরিত্র এই পাপবিনাশন,
অপার সম্পত্তি হয় করিলে শ্রবণ।

ঋষিগণ কহে সূত! কহ পুনর্ব্বার,
কিরূপে হইল মধু কৈটভ সংহার?
কিরূপে বিষ্ণুর সহ হইল সমর,
আশ্চর্য্য সে যুদ্ধ পঞ্চ সহস্র বৎসর।
জলময় ছিল বিশ্ব সব নিরাকার,
কিরূপে জন্মিল তায় দানব দুর্ব্বার।
কিরূপে করিলা হরি তাদের সংহার,
সে সব কাহিনী মুনে! কহ সবিস্তার।
অদ্ভুত বিষ্ণুর কীর্ত্তি করিতে শ্রবণ,
অতীব উৎসুক মোরা আছি মুনিগণ।
শুভযোগে তব সহ হয়েছে মিলন,
পরম পণ্ডিত তুমি জানে সর্ব্বজন।

মূর্খ সহ সম্মিলন অতি কষ্টকর,
বিজ্ঞের সংযোগ যেন সুধার আকর।
পশু মূর্খ উভয়ের কি আছে অন্তর,
আহার মৈথুন নিদ্রা দু'য়ে নিরন্তর।
সদসদ্ জ্ঞানহীন যথা পশুগণ,
বিবেকবিহীন তথা বটে মূর্খ জন।
ভাগবত কথা মূর্খ শুনিতে না চায়,
পশুর সমান মূর্খ সংশয় কি তায়। (১)
মৃগও শ্রবণ সুখ পায় অতিশয়,
ভুজঙ্গ শ্রবণসুখে বিমোহিত হয়।
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মধ্যে এ দুটী প্রধান,
পদার্থ নির্ণয়ে শ্রুতি করে প্রণিধান।
দর্শন ইন্দ্রিয় তুল্য আর কিছু নয়,
চিত্তের আনন্দ তায় জন্মে অতিশয়।
ত্রিবিধ শ্রবণ জ্ঞান কহে বিজ্ঞগণ,
সাত্ত্বিক রাজস তম শাস্ত্রের বচন।

---

(১) মূর্খেণ সহ সংযোগো বিষাদপি সুদুর্জ্জরঃ।
বিজ্ঞেন সহ সংযোগঃ সুধারস-সমঃ স্মৃতঃ॥
জীবন্তি পশবঃ সর্ব্বে খাদন্তি মেহয়ন্তি চ।
জানন্তি বিষয়াকারং ব্যবায়সুখমদ্ভুতম্॥
ন তেষাং সদসদ্ জ্ঞানং বিবেকো ন চ মোক্ষদঃ।
পশুভিস্তে সমা জ্ঞেয়া যেষাং ন শ্রবণাদরঃ॥

সাত্ত্বিক বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণাধ্যয়ন,
যুদ্ধ ইতিহাস বার্ত্তা রাজসে গণন।
পরনিন্দা পরদোষ শ্রবণ কথন,
তামস সে শ্রুতিস্মৃখ পাতক কারণ।
সাত্ত্বিক ত্রিবিধরূপ বলে মুনিগণ,
উত্তম মধ্যমাধম শাস্ত্রে নিরূপণ।
মোক্ষ ফলপ্রদ যাহা তাহাই উত্তম,
স্বর্গ ফলপ্রদ বার্ত্তা জানিবে মধ্যম।
ইহ কালে ফলকর অধম নিশ্চয়,
ত্রিবিধ সাত্ত্বিক বার্ত্তা হয়েছে নির্ণয়।
ত্রিবিধ রাজস বার্ত্তা করহ শ্রবণ,
আততায়ী সহ যুদ্ধ উত্তমে গণন।
মধ্যম শত্রুর সহ পাণ্ডবের রণ,
অধম সে অকারণ বিবাদ শ্রবণ।
পুরাণের পুণ্য কথা অতি মধুময়,
পুণ্য লাভ পাপক্ষয়, বুদ্ধিবৃদ্ধি হয়।
অতএব মহাবুদ্ধে! করহ কীর্ত্তন,
ব্যাসের কথিত সেই পুরাণ কথন।
তোমাদের অভিলাষ করিব পূরণ,
এত বলি কহে সূত পূর্ব্ব বিবরণ।

প্রলয় কালীন পূর্ব্বে সাগরের নীরে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল অচিরে।
সব জলময় যবে লুপ্ত ত্রিভুবন,
অনন্ত শয্যায় সুপ্ত ছিলা নারায়ণ।
দুর্জ্জয় দানবদ্বয় সে মধু কৈটভ,
তাঁর কর্ণমল হ'তে হইল উদ্ভব।
সাগরের জলে তারা ক্রমে বৃদ্ধি পায়,
নানা ক্রীড়া ক'রে তারা সময় কাটায়।
একদা সে ভ্রাতাদ্বয় ভাবে মনে মনে,
কোন কার্য্য কদাপিও নহে অকারণে।
আধেয় আধার বিনে থাকেনা কখন,
মোদের উৎপত্তি স্থিতি নহে অকারণ,
এই জলরাশি কেবা করিল সৃজন,
কেবা জলময় বিশ্ব করিল ধারণ।
মোরা কেন জলমধ্যে করি অবস্থান,
কে করিল আমাদের উৎপত্তি বিধান।
কেবা পিতা কেবা মাতা জানিনা নিশ্চয়,
কেনবা জন্মিনু মোরা দারুণ সংশয়।
এইরূপ চিন্তা করে ভ্রাতা দুই জন,
কৈটভ মধুকে ডেকে বলিল তখন।

শুন ভ্রাতঃ আমি ইহা করেছি নির্ণয়,
শক্তি ভিন্ন এজগতে অন্য কিছু নয়।
মোদের যে শক্তি আছে জলে অবস্থানে,
উহাই কারণ হবে বুঝি নিজ জ্ঞানে।
শক্তিতেই জলরাশি আছে অবস্থিত,
শক্তিরূপা দেবী মূল জানিবে নিশ্চিত।
চল মোরা করি সেই দেবী আরাধন,
এইরূপ চিন্তা করে ভাই দুই জন।
হেনকালে হ'ল এক আশ্চর্য্য ঘটন,
গগনে বাগ্‌বীজ মন্ত্র শুনে দুই জন।
বার বার সেই মন্ত্র করি উচ্চারণ,
আকাশে দামিনী শোভা করিল দর্শন।
আমাদের জপ্য মন্ত্র অতি তেজোময়,
বাগ্‌বীজ রূপিণী বাণী বুঝিনু নিশ্চয়।
মনে মনে এইরূপ করিয়া ধারণা,
অনাহারে স্থিরচিত্তে করে উপাসনা।
সহস্র বৎসর করে তপঃ অনুষ্ঠান,
তুষ্ট হয়ে আদ্যা শক্তি তথা অধিষ্ঠান।
গগনে অদৃশ্য থাকি কহিলা ঈশ্বরী,
বর দিতে আসিয়াছি কহ ত্বরা করি।

তোমাদের স্তবে আমি তুষ্ট অতিশয়,
যাহা চাও তাহা দিব অন্যথা না হয়।
শুনিয়া আকাশবাণী ভ্রাতা দুই জন,
বলিল হে দেবি আজি সফল জীবন।
পরিতুষ্টা হয়ে যদি থাক মহেশ্বরী,
ইচ্ছা-মৃত্যু বর দেহ এ প্রার্থনা করি।
ঈশ্বরী কহিলা "বাঞ্ছা" হইবে পূরণ,
করিলাম ইচ্ছা-মৃত্যু বর বিতরণ।
তোমাদের সহ যুদ্ধে দেবাসুরগণ,
বিজয়ী হইতে আর নারিবে কখন।
এইরূপ বর পেয়ে দৈত্য দুইজন,
জলজন্তু মহা ক্রীড়া করে অনুক্ষণ।
ক্রীড়ায় কৌতুকে গত হ'লে কিছু দিন,
হরিনাভিপদ্মে দেখে ব্রহ্মা সমাসীন।
পদ্মাসনে ধ্যানে মগ্ন দেখিয়া ব্রহ্মায়,
কহিল " সুব্রত ! যুদ্ধ দেহ মো'সবায়।
যুদ্ধ হেতু আসিয়াছি তোমার সদন,
যুদ্ধ কর নতু ছাড়, দিব্য পদ্মাসন।
দুর্ব্বলের যোগ্য নহে, হেন পদ্মাসন,
বীর-ভোগ্য ভীরু-যোগ্য নহে কদাচন।

পদ্মযোনে ! পদ্মাসন কর পরিহার,
নতুবা সংগ্রাম দেহ কি বাঞ্ছা তোমার।”
এত বলি নিরবিল বীর ভ্রাতাদ্বয়,
তপোরত প্রজাপতি চিন্তিতহৃদয়।
কি করি কেমনে করি দৈত্য পরাজয়,
ভাবিতে লাগিলা ব্রহ্মা বিবিধ বিষয়।
সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, হেতু চতুষ্টয়,
অরাতির তরে শাস্ত্রে আছে সুনিশ্চয়।
এদের সামর্থ্য কত জানিনা নিশ্চয়,
নিশ্চয় না জেনে কার্য্য করা বিধি নয়।
কোন্ সদুপায় করি ইহাদের প্রতি,
জানিনা এদের বল জানিনা শকতি।
দানবের সঙ্গে যদি করি স্তুতি বাদ,
রাষ্ট্রে হবে দুর্ব্বলতা ঘোর অপবাদ।
অথবা দুর্ব্বল ভেবে করিবে নিধন,
সুপ্ত জনার্দ্দন আমি কি করি এখন।
প্রজাপতি এইরূপ নানা চিন্তা করি।
মনে মনে স্মরিলেন শ্রীকান্ত শ্রীহরি।
জগতের প্রভু যিনি বিপদ্‌সূদন,
তিনি বিনে কেবা দুঃখ করিবে মোচন।

এতেক ভাবিয়া ব্রহ্মা তুষিতে শ্রীপতি,
করিলা তাঁহার স্তব হয়ে একমতি।

স্তব।

(১)

ওহে দীননাথ বিষ্ণো হরে জনার্দ্দন !
জগৎপাতা সর্ব্বগতে ! মাধব বামন !
সবে তুমি বর্ত্তমান,
তুমি দেহ তুমি প্রাণ,
ভক্তের জীবন তুমি দুঃখনিবারণ !
যোগ নিদ্রা ত্যজে ত্বরা উঠ জনার্দ্দন।

(২)

তুমি অন্তর্যামী, দেব, সর্ব্বশক্তিমান্,
বিপদে সেবকে তুমি কর পরিত্রাণ,
জান তুমি মনোভাব,
তুমি ইচ্ছা তুমি ভাব,
সর্ব্বব্যাপী বিশ্বনাথ তুমি বিশ্বপ্রাণ,
সাকারে বা নিরাকারে আছ বিদ্যমান।

(৩)

তোমার পবিত্র নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে,
পাতকী পবিত্র হয় বিদিত ভুবনে।
তোমাকে চিনিতে পারে,
হেন কেবা এ সংসারে,
আসক্ত রয়েছ, ভক্ত-রিপু-বিনাশনে,
তোমার স্বরূপ রূপ বুঝিব কেমনে।

(৪)

তুমি কি কর স্থিতি লয় ওহে বিশ্বাধার!
সকলের রাজা তুমি জগতের সার।
সহিতে না পারি আর,
দানবের অত্যাচার,
ওই দেখ করে মোরে সংহার সংহার,
তোমার আশ্রয় বিনে নাহি প্রতীকার।

(৫)

দুঃখার্ত্ত ভক্তের প্রতি হইলে নির্দ্দয়,
কলঙ্ক রহিবে প্রভো তব অতিশয়।
ভক্তের যে প্রাণারাম,
ব্যর্থ হবে সে সুনাম
তুমি ভিন্ন অন্য কিছু বুঝিনা নিশ্চয়,
রক্ষা কর রক্ষা কর ওহে দয়াময়।

এইরূপে ব্রহ্মা স্তব করিলা তখন,
তথাপি বিষ্ণুর নিদ্রা না হ'ল খণ্ডন,
নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মা করিলা নিশ্চয়,
আদ্যা শক্তি বিনে আর কেহ কিছু নয়।
যোগ-নিদ্রা রূপিণীর ঘোর আক্রমণে,
নিদ্রিত সে ভগবান অনন্ত শয়নে।
বিষ্ণুকে করিলা যিনি চেতন বিহীন,
সজীব ব্রহ্মাণ্ড কোটি যাঁর মায়াধীন।
গতাসুর মত হরি, যাঁহার ইচ্ছায়,
নিদ্রার অধীন আজি যাঁহার মায়ায়।
না শুনিলা হরি মম কাতর প্রার্থনা
নিষ্ফল হইল মম এত অভ্যর্থনা।
হরির কি শক্তি হরি বশীভূত তার,
মহামায়া যোগ-নিদ্রা শুধু মূলাধার।
আমি বিষ্ণু কিংবা শম্ভু যাঁহার অধীন,
সাবিত্রী, কমলা, উমা, সবে পরাধীন।
যাঁহার অধীনে সুপ্ত, দেব নারায়ণ,
তিনি ভিন্ন কে সে নিদ্রা, করে বিমোচন।
এইরূপে পদ্মযোনি করিয়া চিন্তন,
করিলা দেবীর স্তব, হয়ে একমন।

স্তব।

(১)

বেদগণ বাক্যে মাতঃ, হয়েছি বিদিত,
জগত-কারণ তুমি, দেবী অচিন্তিত।
এই সর্ব্বশক্তিমান,
বিষ্ণু আজি হতজ্ঞান,
যোগনিদ্রা রূপে তাঁর, করে আক্রমণ,
হরিকে করেছ তুমি ঘুমে অচেতন।

(২)

তুমি হে সকল ভূত-মনোবিলাসিনি!
কে জানে তোমায়, তুমি বিশ্ববিমোহিনী।
নিদ্রায় অজ্ঞান হরি,
মূঢ় আমি কিবা করি,
কোটি কোটি জ্ঞানী তব, তত্ত্ব নাহি পায়,
তোমার সে মায়ালীলা, বুঝা নাহি যায়।

(৩)

পুরুষ চৈতন্যময়, কহে সাংখ্য মতে,
চৈতন্যরহিতা তুমি, প্রকৃতি জগতে।

কহ কহ সুনিশ্চয়,
তাই কি মা সত্য হয়,
জানি আমি তাহা নহে, তুমি সর্ব্বসার,
চৈতন্য রহিত হরি, লীলায় তোমার।

(৪)

মাতঃ গুণাতীতা তুমি, যদি বা প্রচার,
সৃষ্টি স্থিতি তব লীলা, বিবিধ প্রকার।
সত্ত্ব রজঃ তমো গুণে,
মাতঃ তুমি সুনিপুণে
প্রাতে বা মধ্যাহ্নে প্রাহ্নে সন্ধ্যা বিদ্যমান,
মুনিগণ তোমারই মা সদা করে ধ্যান।

(৫)

কিন্তু কেহ তব লীলা বুঝিতে না পারে,
সকলের বুদ্ধিরূপা তুমি মা সংসারে।
দেবতার সুখদাত্রী,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধাত্রী,
তুমি কীর্ত্তি মতি রতি, কান্তি, শ্রদ্ধা, ধৃতি,
জগতের বোধয়িত্রী তুমি সে প্রকৃতি।

(৬)

নিদ্রাবশ হরি এই, মম বিদ্যমান,
জননি ! পেয়েছি আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
তর্কের কি প্রয়োজন,
চক্ষে চক্ষে দরশন,
জগত-জননী তুমি শুধু একজন,
ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি করেছ সৃজন।

(৭)

তোমাতে উৎপন্ন সব তোমাতে বিলয়,
বেদগণ তব সৃষ্ট, নাহিক সংশয়।
তোমার যে কিবা রূপ,
অরূপ কি বহুরূপ,
বেদেও জানিতে নারে স্বরূপ কারণ
কারণের তত্ত্ব কভু জানে কি কারণ।

(৮)

বেদের অপরিজ্ঞেয় তুমি সে ভবানী
হরিহর কিংবা আমি কিছুই না জানি।
অন্য সুর মুনিগণ,
সবে অসমর্থ হন,

বুঝিতে তোমার তত্ত্ব কেহ নাহি পারে,
অনির্ব্বচনীয়া তুমি অপূর্ব্বা সংসারে।

(৯)

তব স্বাহা নাম যজ্ঞে করে উচ্চারণ,
যজ্ঞভাগ দেবে তাই, করেন গ্রহণ।
বিনে তব শুভ নাম,
বৃথা সব মনস্কাম,
তুমিই মা দেবতার, বৃত্তি বিধায়িনী,
কে বুঝে তোমায় তুমি বহু মায়াবিনী।

(১০)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে মাতঃ তোমারি কৃপায়,
দৈত্যভয়ে দেবগণ পরিত্রাণ পায়।
দারুণ দানবত্রাসে,
তোমারি করুণা আশে,
তোমারি চরণে আজি লয়েছি শরণ,
আজি বিষ্ণু নিদ্রাবশ তোমার কারণ।

(১১)

এই দৈত্যদ্বয় মাতঃ করহ সংহার,
নতুবা বিষ্ণুর নিদ্রা কর পরিহার।

তোমার বাসনা যাহা,
সত্বরে করহ তাহা,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাতঃ তুমি মূলাধার,
হরি হরাদির বৃথা পূজা বার বার।

(১২)

তোমার প্রভাবে বিষ্ণু অবশ শয়নে,
লক্ষ্মীও অক্ষম তাঁর নিদ্রাপনোদনে।
তিনিও নিশ্চেষ্ট আজ,
কে বুঝে তোমার কাজ,
ভক্তি ভরে এক চিত্তে যে পূজে তোমায়,
সেই ধন্য তার সম কে আছে ধরায়।

(১৩)

শ্রীহরির কীর্ত্তি কান্তি, শুভ বুদ্ধি জ্ঞান,
সবে যেন তাঁরে ছেড়ে, করেছে প্রস্থান,
সকলের মাননীয়া
ত্রিজগতে পূজনীয়া,
তুমিই করেছ মাতঃ হরিকে বন্ধন,
কে পারে তোমার কার্য্য করিতে খণ্ডন!

(১৪)

সকলের শক্তি রূপা সৃষ্টিপ্রসবিনী,
অখিল জগতে তুমি প্রভাবশালিনী।
এক নট রঙ্গালয়ে,
বহুরূপ অভিনয়ে,
এক হয়ে বহুরূপ তুমিও তদ্রূপ,
অরূপ স্বরূপ তুমি, ধর নানারূপ।

(১৫)

যুগে যুগে ক'রে তুমি, বিষ্ণুর সৃজন,
দিয়েছ সাত্ত্বিকশক্তি করিতে পালন;
এবে কেন অচেতনে,
রেখেছ সে নারায়ণে,
যাহা ইচ্ছা কর তুমি কে করে খণ্ডন
এ বিশ্ব তুমিই কর সৃজন পালন।

(১৬)

সঙ্কটে পড়িয়া মাতঃ তব পদ স্মরি,
দয়া প্রকাশিয়া রক্ষা কর সুরেশ্বরী।
রাখিতে ভক্তের মান,
দ্রব হয় তব প্রাণ,

জানি দয়াবতী তুমি, ভক্তের কারণ,
কেন মা করেছ তবে অসুর সৃজন ?

(১৭)

অনন্ত জগৎ তুমি, করিলা নির্ম্মাণ,
দূরে থেকে ক্রীড়া কর, হয়ে সাবধান।
সৃজন বিলীন কর,
কত মায়া মূর্ত্তি ধর,
আমাকে নাশিবে তুমি, বিচিত্র কি তার ?
নাশ মোরে, তায় দুঃখ নাহিক আমার।

(১৮)

প্রথমে সৃজন ভার, করিয়া অর্পণ,
পরে দৈত্যকরে মোরে, করিবে নিধন,
এ অতি বিষম কষ্ট,
কি ইচ্ছা তা বল স্পষ্ট,
বালিকার প্রায় তুমি, সদা লীলাময়ী,
উঠ ত্বরা ভক্তপ্রাণ, রাখ দয়াময়ী।

(১৯)

আপনি অদ্ভুত রূপ, করিয়া ধারণ,
মোরে, বা, দানবদ্বয়ে কর মা নিধন।

নতুবা হরিকে তুল,
কেন ভক্ত জনে ভুল,
সকলি আয়ত্ত তব, তুমি মূলাধার,
সৃষ্টি, স্থিতি কর তুমি প্রলয় সংহার।'

তুষ্ট হয়ে ভগবতী, স্তবে বিধাতার;
করিলা সে যোগ-নিদ্রা রূপ পরিহার।
ক্রমে বিষ্ণুদেহে হ'ল চেতনাসঞ্চার,
বিরিঞ্চির মনে হ'ল আনন্দ অপার।
দেবী-ভাগবত-কথা অমৃতের সার,
শ্রবণে কলুষ রাশি নাশে অনিবার।

শ্রী—

ক্রমশঃ

অভাব কি আমার?

(১)

তবে অভাব কি আমার?
জগৎভরে, আছে প'ড়ে, অনন্ত ভাণ্ডার,
নদীর জলে, গাছের ফলে, ক্ষুধা তৃষ্ণা হরে,
বাকল বাসে, অনায়াসে, লজ্জা দূর করে;
কুটীর কন্দর, আলয় নিকর, তৃণের শয্যা চমৎকার,
তবে অভাব কি আমার?

(২)

পানপাত্র, তরুপত্র অঞ্জলি বিস্তার,
আমার সাথের সাথী, বন্য হাতী বন্য মৃগচয়,
শাখীর শাখা এম্‌নি বাঁকা আতপত্র হয় ;
স্বভাবসুন্দর, শ্যামল প্রান্তর বিশ্রামের আগার
তবে অভাব কি আমার ?

(৩)

বনৌষধি, নাশে ব্যাধি, স্বাস্থ্য সুখসার,
পদ্ম কুমুদ, বনবিনোদ, নানাজাতি ফুল,
চোখ জুড়ায়, মন ভুলায়, গন্ধে প্রাণাকুল।
বিলাস কারণ, অগুরু চন্দন, বকুল মালতীহার,
তবে অভাব কি আমার ?

(৪)

দিবানিশি রবি শশী হরে অন্ধকার,
বরষি বৃষ্টি, নাশে রিষ্টি, স্নিগ্ধ করে কায় ;
শীতের কষ্ট, হয় বিনষ্ট, কশানু-কৃপায়।
মলয় পবন, জুড়ায় জীবন, এমন ভাগ্য কার ?
তবে অভাব কি আমার ?

(৫)

কতই রং কতই ঢং সংভরা সংসার,
করে কি রঙ্গ, নাচে কুরঙ্গ, খঞ্জন ময়ূর,

দৈয়াল শ্যামায়, তান ধরে তায়, মরি কি মধুর।
কোকিল ভৃঙ্গ, গায় বিহঙ্গ, কুরল দেয় বাহার ;
তবে অভাব কি আমার ?

(৬)

তরুতল বেদীস্থল বিশ্রাম আগার,
শান্তিভবন, প্রমোদবন, পর্ব্বত পাহাড়,
আঁধার বেলা, খদ্যোৎমালা, জ্বালে দীপহার
বিশাল গগন, দেখায় নূতন বিচিত্র বাহার,
তবে অভাব কি আমার ?

(৭)

যখন যা চাই, তখন তা পাই, এত দয়া যাঁর,
ছিনু যখন্, গর্ভে তখন্, জননীর স্তনে,
যতন করে, পীযূষ ভরে, রাখ্‌ল যে জনে,
আমার কারণ, আছে সে জন, দয়ার পারাবার,
তবে অভাব কি আমার ?

শ্রীশ——

———

শ্রীশ্রীসরস্বতীস্তোত্রম্।

(২৯শে মাঘ মঙ্গলবার পূজা)

প্রণাম—সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥
ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমোনমঃ।
বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥

স্তোত্রম্—যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেব হততেজসম্।
গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্॥
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে॥
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকাম্॥
গ্রন্থ কর্ত্তৃত্ব শক্তিঞ্চ সৎশিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্॥
লুপ্তং সর্ব্বং দৈববশান্নবীভূতং পুনঃ কুরু।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনী।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বদ্ জীবন্মৃতং সদা।
জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ।

যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূক মুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী যা সরস্বত্যৈ নমোনমঃ॥
বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠান মেব চ।
তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
ব্যাখ্যা-স্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃরূপিণী।
ভ্রম সিদ্ধান্ত রূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ॥
যয়া বিনা প্রসংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে
কালসংখ্যা-স্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ॥
স্মৃতিশক্তি জ্ঞানশক্তি বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী।
প্রতিভা কল্পনাশক্তির্যা চ তস্যৈ নমোনমঃ॥
সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং প্রপচ্ছ যত্র বৈ।
বভূব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ॥
তদা জগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ।
উবাচ স চ তাং স্তৌতি বাণী মিষ্টাং প্রজাপতে॥
সচ তুষ্টাব তাং ব্রহ্মা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
চকার তৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্ত মুত্তমম্॥
যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা।
বভূব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ॥
তদা তাং সচ তুষ্টাব সন্ত্রস্তঃ কশ্যপাজ্ঞয়া।
ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্ম্মলং ভ্রমভঞ্জনম্॥

ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং যদা।
মৌনীভূতশ্চ সস্মার ত্বামেব জগদম্বিকাম্॥
তদা চকার সিদ্ধান্তং ত্বদ্বরেণ মুনীশ্বরঃ।
সংপ্রাপ্য নির্ম্মলং জ্ঞানং ভ্রমান্ধধ্বংসদীপকম্॥
পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা চ ব্যাসঃ কৃষ্ণকুলোদ্ভবঃ।
তাং শিবাং বেদ দধ্যৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুষ্করে॥
তদা তত্তো বরং প্রাপ্য সং কবীন্দ্রো বভূবহ।
তদা বেদ বিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার সঃ॥
যদা মহেন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং সদাশিবম্।
ক্ষণং ত্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্মৈ জ্ঞানং দদৌ বিভুঃ॥
পপ্রচ্ছ শব্দ-শাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স ত্বাং দধ্যৌ চ পুষ্করে॥
তদাত্বত্তো বরং প্রাপ্য দিব্য বর্ষ সহস্রকম্।
উবাচ শব্দ-শাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্॥
অধ্যাপিতাশ্চ যে শিষ্যা যৈরধীতং মনীশ্বরৈঃ।
তে চ ত্বাং পরিসঞ্চিন্ত্য প্রবর্ত্তন্তে সুরেশ্বরীম্॥
ত্বং সংস্তুতা পূজিতা চ মুনীন্দ্রৈর্ম্মনুমানবৈঃ।
দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদিভিঃ॥
জড়ীভূতঃ সহস্রাস্যঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ।
যাং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি তামেকাস্যেন মানবঃ॥

ইত্যুক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
প্রণনাম নিরাহারো রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ॥
জ্যোতীরূপা মহামায়া তেন দৃষ্টা প্যুবাচ তম্।
সুকবীন্দ্রো ভবেত্যুক্ত্বা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ॥
যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণী স্তোত্র মেতত্তু যঃ পঠেৎ।
সুকবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহস্পতিসমো ভবেৎ॥
মহামূর্খশ্চ দুর্ব্বুদ্ধি র্বষমেকং যদা পঠেৎ।
স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবীন্দ্রো ভবেদ্ধ্রুবম্॥

দেবীভাগবতম্।

সরস্বতীস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

শ্রী.........

ঊষা ও রবি।

নির্জ্জন নিস্তব্ধ যবে সুপ্ত বসুন্ধরা।
রজনীর অন্ধকারে অস্ফুটযৌবনা।
স্বর্গ হতে নেমে এল কাকলীমুখরা,
লজ্জাবতী ঊষা বালা উৎসুকনয়না।
পরিধান নীলাম্বরী অদৃশ্য অম্বরে
ঢাকি তনু আপনার ঘোমটা খুলিয়া,

গোপনে পুরুষভীতা ক্ষণেকের তরে
চাহিয়া জগৎ ছবি লইল দেখিয়া।
অমৃত বর্ষিণী সেই দৃষ্টি সঞ্জীবনী
লভিয়া, এ বিশ্বলোক উঠিল জাগিয়া,
সহস্র বদনে যেন করি জয় ধ্বনি,
সে দেবীর স্তুতি গান দিল আরম্ভিয়া।
সাড়া পেয়ে স্বর্গ হ'তে নেমে এল রবি,
ধীরে ধীরে তেয়াগিয়া অলস শয়ন,
দূর হতে দেখে পথে অপূর্ব্ব সে ছবি
মুনি জন মুগ্ধকর উষার বদন।
মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় যেন রহি কতক্ষণ,
দাঁড়ায়ে পশ্চাতে দূরে গুপ্ত ব্যাধ প্রায়,
ধাইল সে দ্রুতগতি তরুণ তপন,
ধরিতে সে শত্রুহীনা বালিকা উষায়।
সম্মুখে পড়িল ছায়া দিব্য মনোহর,
দেবতার রক্ত জ্যোতি—মুহূর্ত্তে বালার
মিটিল সৌন্দর্য্য ক্ষুধা হইল অন্তর,
ভয়ভীতা লজ্জিতা সে কার্য্যে আপনার!
হেরিয়া উষার সেই দ্রুত পলায়ন,
ছুটিল রবির মোহ হইল সদ্‌জ্ঞান

লজ্জা পেয়ে দিবাকর আরক্তবদন
দিবসের কার্য্যে হয় অতি সাবধান।

শ্রীন······

আমি আছি অথবা নাই ?

কথাটা শুনিতে খুব সোজা ; কিন্তু ভাবিতে অতি কঠিন। অধ্যাত্ম-জগতে বিচরণ করিতে করিতে যাঁহার সূক্ষ্ম-দৃষ্টি জন্মিয়াছে, সেই মহাপুরুষই এই কথার মীমাংসা করিতে সক্ষম। কিন্তু, পার্থিব-জগতে বিচরণশীল স্থূল-দর্শী মানবের পক্ষে "আমি আছি অথবা নাই" এ কথার মীমাংসা করা নিতান্ত অসম্ভব। পার্থিব-জগতের সহিত যাঁহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তিনি হয়ত এ কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিবেন। এবং প্রস্তাবককে বিকৃতমস্তিষ্ক মনে করিবেন।

বিশ্বস্রষ্টা-পরমেশ, "আমি" কে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। একাংশ আমি, অপরাংশ তুমি। আমি জীবাত্মা, তুমি পরমাত্মা। জীবাত্মা কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। পরমাত্মা কদাপি সুখ-দুঃখে লিপ্ত হয়েন না। জলের নিম্নগতির মত জীবাত্মার সদাই

নিম্নগতি। আর অগ্নির ঊর্দ্ধ গতির ন্যায় পরমাত্মার সততই ঊর্দ্ধগতি। এই পরমাত্মাই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব পরমেশ। ইনি উপাসকের উপাসনা-সৌকর্য্যার্থ-শুক্তিতে রজত ভ্রমের ন্যায় নানারূপের কল্পনা করিয়াছেন। আমি ইহাঁরই উপাসনা করি—ইহাঁরই ধ্যান করি—আশা—"তুমি" হইব।

আমি যদি ঈশ্বরের অংশীভূত হই, তবে আত্মার আমিত্ববোধ সম্পূর্ণ ভ্রম-সঞ্জাত। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, কিন্তু, ভ্রমাপনোদনের পরে যেরূপ একমাত্র রজ্জু জ্ঞানই বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ আত্মার আমিত্ব তিরোহিত হইলে, একমাত্র আত্ম-জ্ঞানই বর্ত্তমান থাকে।

সাধন-জগতে অত্যধিক অগ্রসর হইলে, "আমি"র কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। তুমিও সেখানে নাই। সেখানে তুমি-আমি-বর্জ্জিত একমাত্র নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব, স্বপ্রকাশ চৈতন্য পরমেশ বিরাজিত। আমিত্বের সর্ব্বথা অভাব হেতু, তখন সাধক ব্রহ্ম হইয়া যান। কাজেই "আমি" কিংবা "তুমি" বলিবার লোক একদা পাওয়া যায় না। আর বলিবারই বা সাধ্য কি ? এক ঘট জল সাগরে নিক্ষেপ করিলে, কাহার শক্তি যে ঘট-জল পৃথক্ করিয়া লইতে পারে ?

পরমাত্মাই যদি জীবাত্মারূপে বিরাজিত, তবে আমি আছি কিরূপে? বস্তুতঃই আমি নাই। আছি বলিয়া যে মনে করি, ইহা আমার ভ্রম, এ ভ্রম গেলে নিশ্চয়ই আমি নাই।

জ্ঞান চক্ষু দৃশ্য নিরাকার ব্রহ্মের আকার কল্পনা যেরূপ উপাসনার সৌকর্য্যার্থ, তদ্রূপ আমি তুমি ভেদটা সাধকের সাধনা সৌকর্য্যার্থ। কেন না, এই ভেদ না থাকিলে, ভক্তি জন্মে না। ক্রমশঃ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইলে, সাধকের এই ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন সাধক ঠিক্ বুঝেন যে, "আমি নাই।"

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ
সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপা-দ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"
মুণ্ডকোপনিষৎ।

আত্মার আমিত্ব বোধই সংসার বন্ধনের কারণ। কিন্তু, আমিত্ব গেলে সংসারের আশঙ্কা থাকে না। অংশীভূত জীবাত্মা নির্ম্মল হইয়া, সুনির্ম্মল পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়। কাজেই আমি যে নাই ইহা সুনিশ্চিত।

ভগবান্ এই অংশদ্বয়ে বিভক্তবৎ প্রতীত হওয়ায়, সৃষ্ট্যাদি জগদ্ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। এই প্রতীতির অভাবে "জগৎ" এই শব্দটীও লুপ্ত হইয়া যাইবে। স্বচ্ছ জল লোহিত পাত্রে রাখিলে যেমন্ন লোহিত জল বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ, আত্মার জীব কল্পনাও ভ্রমাত্মক। (আত্মার জীব কল্পনার উদ্দেশ্য মৎপ্রণীত "যোগকথায়" দ্রষ্টব্য) এই ভ্রমাপগমের জন্যই উপাসনা। উপাসনা দ্বারা এই ভ্রম গেলে, নিশ্চয় বুঝা যাইবে যে "আমি নাই।"

——ওঁ——

ঠাকুর শ্রীসতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
সংস্কৃত কলেজ, কিশোর গঞ্জ।

——

গোরক্ষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই উৎসর্গীকৃত ধর্ম্মের ষাঁড় এক্ষণে চুরি বা বধ করিলেও অপরাধীর দণ্ডাপরাধ হয় না। হীনবল হীন-বীর্য্য ষণ্ডের উৎপাদিত গো-শাবক হীনবল রুগ্ন পীড়িত

ও অকাল মৃত হয়। ঘৃত দুগ্ধপূর্ণ ভারত আজ দুগ্ধ ঘৃত শূন্য। প্রকৃতি এই ভারতে অনায়াস-সুলভ তৃণগুল্মাদি গো-খাদ্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন, কিন্তু যে দেশে আদৌ তৃণ গুল্মাদি গো-খাদ্য উৎপন্ন হয় না, সেই সমস্ত দেশ হইতে (Condensed Milk) নামক জমাট দুগ্ধ নামধেয় পদার্থ রাশি আমদানী হইতেছে, তাহা দ্বারা আমরা দুগ্ধ পানের তৃষ্ণা নিবারণ করি। আমরা ও আমাদের শিশু-গণ, এই দুগ্ধ পান করিয়াও দেশীয় হীনবল পীড়িত গো সকলের দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া রুগ্ন ও পীড়িত হইতেছি। যথার্থ দুগ্ধের অভাবেও শিশুগণ রুগ্ন ও পীড়িত হইতেছে। হায়! আমাদিগের এই দিকে লক্ষ্য নাই। রোগ হই-তেছে ঔষধ খাইতেছি, রোগের মূল ভিতরে রাখিয়া উপরে ঔষধ দিয়া ঢাকিয়াছি, কিন্তু রোগের নিদানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি না। রোগের মূল উৎপাটনের দিকে লক্ষ্য নাই, অর্থাৎ রোগের মূল উৎপাটন আরোগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহা বুঝিয়া উঠি না।

গোজাতি অল্পায়ুঃ হীনবল হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে গোদুগ্ধ-পায়ী শিশু ও মানব ক্রমশঃ হীনবল ও অল্পায়ুঃ হইতেছে। এখন গো-সেবা, গোপালন, গোরক্ষণ, আফ্রিকা, ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে হইতেছে।

তাঁহারা গোজাতির উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি ও গোদুগ্ধের বৃদ্ধি করিতেছেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সবলমস্তিষ্ক, পুষ্ট-দেহ ও দীর্ঘায়ুঃ হইতেছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসন অনুসারে লোকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার সেবা পূজা রক্ষা ও পালন হিন্দুর কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা অনাহারে ও অযত্নে দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে গোপালনের নামে গোবধ করিতেছি।

গোদিগের কি কি আহার্য্য প্রয়োজন হয়, শীত ঋতুতে গোদিগকে সময়োপযোগী বস্ত্রাদি দ্বারা ও গ্রীষ্মে মশকাদির দংশন হইতে উপযুক্ত মশারি কি ধূম দ্বারা এবং বর্ষায় গৃহাদির বাসোপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা রক্ষা করা আবশ্যক। এই সব স্থূল কথা অনেক গোপালকের বোধগম্য হয় না। ক্রমশঃ

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বেদো হি ব্রহ্ম।

যে ব্রহ্ম অদ্যাপি পৃথিবীর সকলের নিকট বৃহৎ বলিয়া পরিগণিত, এবং যাহার নিকট জগতে কেহই সর্ব্বাঙ্গীন নাস্তিকরূপে প্রতীয়মান হয় না। সকল উপা-সকগণই যাঁহাকে নিরপেক্ষভাবে প্রার্থনা করেন।

সকলেই যাঁহাকে অব্যয়, অনাদি, (পরোক্ষে) সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমৎ এক বলিয়া স্বীকার করেন,—

বেদ বা জ্ঞানই সেই সত্য অনন্ত ব্রহ্ম। ইহাতে অবৈদিকগণের কএকটী আপত্তি হইতেছে। প্রথম বেদ বর্ণাত্মক শব্দ সমূহ, যাহার আভাষ আমরা সকলেই ভাষারূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। সত্য কথা, কিন্তু তাদৃশ শব্দকে ব্রহ্ম স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। যাহা নিত্য অবিকারী অক্ষর তত্ত্ব বিশিষ্ট, এবং সুকঠোর ব্রতলভ্য। যাহার যথার্থ ব্যবহার চিন্তা করিলেও নিষ্কাম সহৃদয় ব্রতিগণ আনন্দমগ্ন হইয়া সংসার-ভোগ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। যাহার অভ্যাস কালেই নিঃস্বার্থ বিদ্যার্থিগণের অনাচার সামাজিক কলুষবন্ধন তিরোহিত হয়। যাহার বিকৃত ব্যবহারেও জনসমাজ চরমসুখ অনুভব করেন। যাহা ভিন্ন কেহই বাঁচিতে পারে না, তাহা কেন ব্রহ্ম হইবে না।

অর্থবোধক বর্ণিত শব্দ মাত্রই আত্মা। যাহার আত্মা নাই তাহার স্বকৃত শব্দও নাই। শব্দ আকাশ হইতে কি উৎপন্ন নহে? শব্দ তেজোময় আকাশে প্রতিফলিত হয় মাত্র, ব্রহ্মও তাহাই বটে। সমস্ত বেদ, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে একমাত্র

আকাশের সহিতেই ব্রহ্মের তুলনা করিয়াছেন, আকাশ দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কোথাও বা আকাশকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন।

শব্দ দূরে থাকুক ভৌতিক বা বৈদ্যুতিক তেজঃসংযোগ ভিন্ন বোধ হয় আকাশে কেহ কখন ধ্বনিও শুনিতে পান নাই। আকাশ হইতে শব্দ বা ধ্বনি হইতে পারিলে অথবা আকাশে শব্দ থাকিলে যেমন পার্থিব সমস্ত পদার্থে সর্ব্বদা স্থূল সূক্ষ্মরূপে গন্ধ অনুভূত হয় এবং বহ্নিতে উষ্ণ ও দাহ,—বায়ুতে অনুষ্ণ, অশীত (মধ্যম) স্পর্শ বোধ হয়।

তাদৃশ আমাদিগের সম্মুখবর্ত্তী আকাশে সর্ব্বদাই শব্দ হয় না কেন? প্রতিধ্বনিও আকাশে হয় না, তেজস্বী পার্থিব পদার্থে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ সুবৃহৎ প্রান্তর বা জলাশয়ের কোন পারে কেহ একটী উচ্চৈঃ ধ্বনি করিলে অপর পারে (অপার্থিব পদার্থে) তাহার প্রতিধ্বনি হয় কেন? জলাশয় ও প্রান্তরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন আকাশ রহিয়াছে সেখানে কেন প্রতিধ্বনি হয় না। আকাশ নির্গুণ এই জন্যই নির্গুণ তেজঃ শব্দময় ব্রহ্মের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদ বা জসনেয়ি-সংহিতা এবং ঈশোপনিষদের শেষ "হিরণ্ময়েন" ইত্যাদি

মন্ত্রটীতে ত্রিমাত্র প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক উক্ত হইয়াছে "খং ব্রহ্ম"।

মন্ত্রের অবিকল অনুবাদ—"হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের অপিহিত মুখ, যিনি অমুক আদিত্য পুরুষ সে অমুক আমি (ব্রহ্মজিজ্ঞাসু (অনন্তর) ত্রিমাত্র প্রণব খং ব্রহ্ম)।

বঙ্গার্থ। আমাদিগের সুখবোধের জন্য হিরণ্ময়ের সহিত উৎপ্রেক্ষা করিয়া বুঝাইতেছেন, অর্থাৎ যেই জ্যোতির কিঞ্চিৎ আভা হিরণ্ময়, তাদৃশ জ্যোতির্ম্ময়পাত্র (রশ্মিসকল রসপান (আকর্ষণ) করে, যেখানে সেই আদিত্য মণ্ডল) দ্বারা সত্য আদিত্য মণ্ডলস্থ অবিনাশি-পুরুষের মুখ মাত্র শরীর অপিহিত আচ্ছাদিত বটে।

তথাপি যিনি অমুক (নিরুপাধি) প্রত্যক্ষ আদিত্য মণ্ডলে (পুরুষাকার সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন হেতুক) পুরুষ (অথবা পূর্ণ অস্মদাদি প্রাণ, বুদ্ধি এবং আত্মা দ্বারা জগদ্-ব্যাপক, কিম্বা পুরে (কূটে বা মণ্ডলে) শয়ান (নিক্রিয়) হেতুকপুরুষ) রূপে অবস্থিত সেই কার্য্য-কারণ-সমূহ প্রবিষ্ট (যুক্ত) আমি হইয়াছি এইরূপ উপাসনা করিবে।

প্রণব খ আকাশ অনন্ত বিষ্ণুপদই যজুর্ব্বেদের ব্রহ্ম। ত্রিমাত্র প্রণব দ্বারা ব্রহ্মের নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অবশেষে খ ব্রহ্ম এই আকাশ রূপ ব্রহ্মকে প্রণব জপ করিতে করিতে ধ্যান করিবে। সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ আমি এই অভেদজ্ঞানে চিন্তা করিবে।

মন্ত্রে পাওয়া যায় সত্যব্রহ্মের মুখমাত্র (শরীর) মুখ বাগিন্দ্রিয় অতএব তিনি কেবল বাঙ্‌ময় তেজঃস্বরূপ বেদই বলা যাইতে পারে। তেজোময় আত্মাই বাক্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তাহাই ব্যষ্টিরূপে মন্ত্র অগ্নি এবং ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়াছে। শ্রীশুক্ল যজুর্ব্বেদ বা জসনেয়ি সংহিতার একত্রিংশ অধ্যায়ের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ কণ্ডিকায় পাওয়া যায়, (অনুরূপ অনুবাদ "যাহা (ব্রহ্মকে) পুরুষকে বিধান করা হয়, কত প্রকার বিকল্পনা করা হয়। মুখ কি ইনির হয়, কি বাহুদ্বয় কি উরুদ্বয়, পাদদ্বয় কথিত হয়"। ১০ম কঃ॥

"ব্রাহ্মণ ইনির মুখ হয়" ১১শ কঃ ১ বাক্য॥

"চন্দ্রমা মনঃ হইতে জাত, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য হয়। শ্রোত্র হইতে বায়ু এবং প্রাণ মুখ হইতে অগ্নি হয়" ১২শ কঃ।

(প্রথম মন্ত্রানুসারে) মুখ শরীর ব্রহ্মের মুখ হইতে অগ্নি কল্পিত হইয়াছেন, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ মুখ হইতে

বাক্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে, অতএব বায়ু ও তেজঃ পদার্থ অভিন্ন বলা যাইতে পারে।

অগ্নি শব্দের অর্থও অঙ্গ বা প্রধান ইত্যাদি করিয়াছে। (নিরুক্ত ৫ম অং ১ম খ) কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে (বেদবিদ্) ব্রাহ্মণবাক্য প্রধান, তাহাদিগকে মুখ কল্পনা করা হইলেও বাঙ্ময় মুখ—শরীরের বেদই মুখ বুঝা যায়।

ব্রহ্ম অধ্যয়ন করেন এবং ব্রহ্ম (বেদ) পাঠই উপাস্য যাহাদিগের ইহাই ব্রাহ্মণ শব্দের প্রকৃতার্থ হইবে, ব্রাহ্মণ জন্ম মাত্রেই ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ হয় না, এবং ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করেনা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য একেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী উপাধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্য।

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ-প্রাপ্তির প্রধানতম সাধন—শরীর রক্ষা।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—“ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণামারোগ্যং মূল মুত্তমং” অর্থাৎ আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

মহাকবি কালিদাসও এই মতেরই পোষকতা করিয়া লিখিয়াছেন—

শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং, সাঙ্খ্য প্রবচন প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি তদীয় সাঙ্খ্য প্রবচন নামক—যোগদর্শনে একাগ্রতা ও যোগসিদ্ধির পরিপন্থি-পদার্থ নিচয়ের বিচার প্রসঙ্গে শরীরধারক বাত পিত্ত কফের বিসদৃশভাব ব্যাধি-কেও ধর্ম্মসিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শরীর রক্ষণ সর্ব্ববিধ শ্রেয়ো-লাভের প্রথম সাধন, ইহা অবিসম্বাদি সত্য, এতদ্ বিষয়ে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

আমরা সকলই জানি, সকলই ধারণ করিতে পারি, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাহিত্যিক নামে অভিহিত হই, অনুচিত বাগাড়ম্বর পূর্ণ বক্তৃতার বজ্রনির্ঘোষস্বরে সভাগৃহ কম্পিত করিয়া থাকি—কিন্তু এমন কোনও মঙ্গলময় মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিতে সচেষ্ট হইনা যাহার অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ ব্যাধি বিমুক্ত ও অকাল মৃত্যু-হস্ত হইতে রক্ষিত হইয়া দশের ও দেশের মঙ্গলের জন্য আপনার ক্ষুদ্রশক্তি বিনি-য়োগে কুণ্ঠিত হয় না।

আমরা পরনিন্দা পরহিংসা প্রভৃতি অনর্থকর কার্য্যে

সারাজীবন অতিবাহিত করি,—কিন্তু আত্মা ও সমাজের মঙ্গলকর সদনুষ্ঠানকে অহিতজনক মনে করিয়া উপহাস করিয়া থাকি। বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে আমাদের জাতীয় চরিত্র এতদূর অবনত হইয়াছে যে—আমাদের জাতীয় জীবনের সার সর্ব্বস্ব বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মকেও বিজাতীয় আদর্শে সংস্কৃত (বাস্তবিক বিকৃত) করিতে সমধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকি। সৎ-শিক্ষা ও সদুপদেশের অভাবে আমাদের নৈতিক চরিত্র ও ধর্ম্মজীবনের লয় হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবলতম সংঘর্ষে আমাদের বিবেক-শক্তি তিরোহিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকারে পাশ্চাত্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতম আদর্শ সমূহের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। আমাদের চরিত্রের এতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে আমাদের গৃহলক্ষ্মীদিগকেও সহধর্ম্মিণীর পবিত্র ও সম্মানিত পদ হইতে অপসারিত করিয়া বিষয়ভোগের প্রধানতম সহকারিণী করিয়াছি। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে" এই পবিত্র উপদেশ ভুলিয়াছি।

বিবাহকালীন মন্ত্র শক্তি দ্বারা স্ত্রী-প্রকৃতির শক্তি

বিশেষ ভর্ত্তৃশক্তিতে মিলিত হইয়া অপূর্ণ পুরুষ আত্মার পূর্ণতা সম্পাদন করে, ইহাই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য, কালমাহাত্ম্যে এই কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

কত কি বলিব! আমাদের গৃহদেবতা অকৃত্রিম স্নেহ ও স্বর্গীয় সুখের সজীব মূর্ত্তি পরমারাধ্য জনক জননীকে পর্য্যন্ত আমরা সংসারের জঞ্জাল বলিয়া মনে করি, এবং সময় কুৎসিত বিশেষণে আপ্যায়িত করিতে কুণ্ঠিত হইনা।

পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত জীবনের এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম অসম্ভাব্য নহে।

গঙ্গাজল, তুলসী, বিল্ববৃক্ষ প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রে পরম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মপরায়ণ পবিত্রচেতা মনীষিগণ ইহাদিগকে দেবতা জ্ঞানে প্রণাম ও পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আর্য্য-শাস্ত্রে ইহাদের রোগপ্রশমনী শক্তিও বিশেষভাবে বর্ণিত আছে কিন্তু কালমাহাত্ম্যে হিন্দুদের এই পবিত্র ও মঙ্গল-ময় বস্তুসমূহ আমাদের নিকট অনাদৃত। এখন আমাদের নিকট সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিনা এই বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ রোগ শোকাদি আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। হিন্দুর নিত্য কর্ম্ম

সমূহ যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অনুমোদিত, তাহা আমি সময়ান্তরে প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। সর্ব্বতোভাবে আমাদের বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কলে জল পাইলে আমরা গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হই। তুলসী বেল গাছের ত কথাই নাই। বর্ত্তমান যুগে ইহাই জঙ্গল ও আগাছার মধ্যে পরিগণিত।

আমাদের শিক্ষার দোষেই যে আমারা উৎপথগামী হইয়াছি ইহা ধ্রুবসত্য। আমরা যদি বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করিতাম—"তুলসীদর্শনং পুণ্যং স্পর্শনং পাপ-নাশনং। শরণং পরমং শৌচং ভক্ষণং মুক্তিলক্ষণং।

যদি শিক্ষা করিতাম—

"গঙ্গাজলং সেব্য মসেব্য মন্যৎ॥

যদি গুরুজনের উপদেশানুসারে মনে রাখিতাম—

"সততং বিল্ববৃক্ষেষু সুখং বসতি শঙ্করঃ॥

যদি বুঝিতে পারিতাম—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥

যদি বাল্যকাল হইতে দৃঢ়ভাবে মানসপটে অঙ্কিত করিতাম—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

তাহা হইলে আমাদের চিত্তভূমিতে কখনও বুদ্ধি-ভ্রংশকারী রজোগুণের এতাদৃশ অমিত প্রভাব পরিলক্ষিত হইত না।

আমরা যদি প্রত্যেক বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের পবিত্রতম উপদেশ গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতাম, তবে আমাদের শরীর ও ধর্ম্মের ঈদৃশ অধঃপতন হইত না। এই আমরা এতাদৃশ হীনচরিত্র ও ক্ষীণায়ুষ্ক হইতাম না। জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রধান উপকরণ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় শরীর রক্ষা। শরীর সুরক্ষিত না হইলে দেহ ও চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয় না। অস্থিরচিত্ত অসংযমী মানবের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কোনও কালেই কল্যাণপ্রসূ ও সুসম্পাদিত হয় না। পক্ষান্তরে সুস্থশরীর স্থিরচিত্ত প্রফুল্ল মানবের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মাত্রই অশেষ মঙ্গলের নিদান হয়। তাহার কর্ম্মকুশলতায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হয়। শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সদ্-বৃত্তিসমূহের পরিপোষণ করিবে। যে শক্তিবলে মানবগণের জ্ঞান কর্ম্মার্জ্জনী বৃত্তি ও জীবন-শক্তির ক্রমবিকাশ হয় তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য জ্ঞান-শক্তিসম্বর্দ্ধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, শরীরপোষক ও সর্ব্ব

দুঃখ বিনাশক'। জ্ঞানরাজ্যের সার্ব্বভৌম সম্রাট অনন্ত শক্তিসম্পন্ন প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যে মহীয়সী শক্তির সাধনা করিয়া ভারতে ব্রাহ্মণ্যশক্তি অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও স্পৃহণীয় গৌরব বিস্তার করিয়া ছিলেন, সেই শক্তি ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সম্প্রতি আমরা কর্ম্মদোষে পূত স্নিগ্ধকিরণ স্পৃহণীয় রত্নকে অনাদর করিয়া অধঃপাতের অন্যতম কূলে নিপতিত হইয়াছি। আমরা এখন সুপথ কুপথের পার্থক্য অনুভব করিতে পারি না, মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিতে জানি না। সুধা-ভ্রমে বিষপান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছি, পরহিতপ্রাণ নিষ্কাম ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া যে মহারত্ন আহরণ করিয়া-ছিলেন; ভারতের সেই সার সমুজ্জ্বল রত্ন বিজাতীয় শিক্ষা ও কুসংসর্গের মলিন আবরণে হীনপ্রভ হইয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছে ইহাকি সামান্য পরিতাপের বিষয়! যে রত্নের আলোকসম্পাতে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক অমঙ্গলান্ধকার তিরোহিত হয়, সেই মহারত্ন আমাদের নিকট অনাদৃত।

ফলতঃ এই মহারত্নের আদর করিতে না জানিয়া আমরা ক্রমশঃ শক্তিহীন, রুগ্ন ও অল্পায়ুষ্ক হইতেছি।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই ভারতবাসীর সর্ব্ববিধ অবনতির মুখ্য কারণ।

ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমরা হীনশক্তি ও দুর্ব্বল হইতেছি। আমরা দিন দিনই পূর্ব্ব শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছি। পিতামহের শক্তি অপেক্ষা পিতার শক্তি হীন হইতেছে, পিতার শক্তি অপেক্ষা সন্তানের শক্তি হীনতর হইতেছে। কদাচার ও কুৎসিতাহারে সন্তানগণ পিতৃ-আগত সামান্য শক্তিটুকু পর্য্যন্ত অনায়াসে ক্ষয় করিতেছে। ভারতবাসী একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে দিন দিন সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। যদি স্বদেশহিতৈষী পরহিতব্রত কর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই মহাধ্বংসের পথ হইতে ভারত-বাসীকে অপসারিত না করেন, তাহা হইলে ভারতের সর্ব্বধ্বংস অচিরসম্ভাব্য। আজকাল দেশে দেশে সমাজ সংস্কারের জন্য সভা সমিতি হইতেছে, যদি সমাজের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহাপুরুষগণ সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে "ব্রহ্মচর্য্য" সংস্কারে মনোনিবেশ করেন তবে ভারতের লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ভূত হইবে—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিপাদন করিয়া অপরিণত ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যের বীজ বপন করিতে হইবে। সকলকে বুঝাইতে হইবে "অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ" যথাসাধ্য অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জন-পূর্ব্বক নিয়মিত কাল সদ্‌গুরুর অধীনে থাকিয়া, ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে রীতিমত শিক্ষিত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবে। এই শক্তি সাধনায় যিনি সিদ্ধি লাভ করিবেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ নিশ্চয়ই হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, সাহসী, মেধাবী ও দীর্ঘজীবী হইবে। যদি বাস্তবিক আমাদের জাতীয় জীবন স্বদেশ ও সমাজের উন্নতিসাধনে আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সন্তানগণের নিকট শারীরিক ও মানসিক উন্নতি-মূলীভূত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানের উপদেশ করতঃ ধর্ম্মপরায়ণ করিতে হইবে।

এই মহাব্রত অবলম্বন ব্যতিরেকে স্বয়ং অধঃপতিত জাতির উদ্ধারের আর পন্থা নাই—

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবনমালী সাঙ্খ্যতীর্থ,
কিশোরগঞ্জ—সংস্কৃত কলেজ।

নূতন পঞ্জিকা সন ১৩২০—ইং ১৯১৩।১৪

বৈশাখ—এপ্রেল, মে।

রবি	…	৭ / ২০	১৪ / ২৭	২১ / ৪	২৮ / ১১
সোম	১ / ১৪	৮ / ২১	১৫ / ২৮	২২ / ৫	২৯ / ১২
মঙ্গল	২ / ১৫	৯ / ২২	১৬ / ২৯	২৩ / ৬	৩০ / ১৩
বুধ	৩ / ১৬	১০ / ২৩	১৭ / ৩০	২৪ / ৭	৩১ / ১৪
বৃহস্পতি	৪ / ১৭	১১ / ২৪	১৮ / ১	২৫ / ৮	…
শুক্র	৫ / ১৮	১২ / ২৫	১৯ / ২	২৬ / ৯	…
শনি	৬ / ১৯	১৩ / ২৬	২০ / ৩	২৭ / ১০	…

একাদশী—৪ঠা ও ১৯শে।

জ্যৈষ্ঠ—মে, জুন।

রবি	…	৪ / ১৮	১১ / ২৫	১৮ / ১	২৫ / ৮
সোম	…	৫ / ১৯	১২ / ২৬	১৯ / ২	২৬ / ৯
মঙ্গল	…	৬ / ২০	১৩ / ২৭	২০ / ৩	২৭ / ১০
বুধ	…	৭ / ২১	১৪ / ২৮	২১ / ৪	২৮ / ১১
বৃহস্পতি	১ / ১৫	৮ / ২২	১৫ / ২৯	২২ / ৫	২৯ / ১২
শুক্র	২ / ১৬	৯ / ২৩	১৬ / ৩০	২৩ / ৬	৩০ / ১৩
শনি	৩ / ১৭	১০ / ২৪	১৭ / ৩১	২৪ / ৭	৩১ / ১৪

একাদশী—২রা ও ১৭ই।

আষাঢ়—জুন, জুলাই।

বার					
রবি	১	৮	১৫	২২	২৯
	১৫	২২	২৯	৬	১৩
সোম	২	৯	১৬	২৩	৩০
	১৬	২৩	৩০	৭	১৪
মঙ্গল	৩	১০	১৭	২৪	৩১
	১৭	২৪	১	৮	১৫
বুধ	৪	১১	১৮	২৫	৩২
	১৮	২৫	২	৯	১৬
বৃহস্পতি	৫	১২	১৯	২৬	...
	১৯	২৬	৩	১০	
শুক্র	৬	১৩	২০	২৭	...
	২০	২৭	৪	১১	
শনি	৭	১৪	২১	২৮	...
	২১	২৮	৫	১২	

একাদশী—১লা, ১৬ই ও ৩০শে।

শ্রাবণ—জুলাই, আগষ্ট।

বার					
রবি	...	৪	১১	১৮	২৫
		২০	২৭	৩	১০
সোম	...	৫	১২	১৯	২৬
		২১	২৮	৪	১১
মঙ্গল	...	৬	১৩	২০	২৭
		২২	২৯	৫	১২
বুধ	...	৭	১৪	২১	২৮
		২৩	৩০	৬	১৩
বৃহস্পতি	১	৮	১৫	২২	২৯
	১৭	২৪	৩১	৭	১৪
শুক্র	২	৯	১৬	২৩	৩০
	১৮	২৫	১	৮	১৫
শনি	৩	১০	১৭	২৪	৩১
	১৯	২৬	[illegible]	৯	১৬

একাদশী—১৩ই ও ২৭শে।

ভাদ্র—আগষ্ট, সেপ্টেম্বর।

বার					
রবি	১	৮	১৫	২২	২৯
	১৭	২৪	৩১	৭	১৪
সোম	২	৯	১৬	২৩	৩০
	১৮	২৫	১	৮	১৫
মঙ্গল	৩	১০	১৭	২৪	৩১
	১৯	২৬	২	৯	১৬
বুধ	৪	১১	১৮	২৫	...
	২০	২৭	৩	১০	
বৃহস্পতি	৫	১২	১৯	২৬	...
	২১	২৮	৪	১১	
শুক্র	৬	১৩	২০	২৭	...
	২২	২৯	৫	১২	
শনি	৭	১৪	২১	২৮	...
	২৩	৩০	৬	১৩	

একাদশী—১২ই ও ২৬শে।

আশ্বিন—সেপ্টেম্বর, অক্টোবর।

বার					
রবি	...	৫	১২	১৯	২৬
		২১	২৮	৫	১২
সোম	...	৬	১৩	২০	২৭
		২২	২৯	৬	১৩
মঙ্গল	...	৭	১৪	২১	২৮
		২৩	৩০	৭	১৪
বুধ	১	৮	১৫	২২	২৯
	১৭	২৪	১	৮	১৫
বৃহস্পতি	২	৯	১৬	২৩	৩০
	১৮	২৫	২	৯	১৬
শুক্র	৩	১০	১৭	২৪	৩১
	১৯	২৬	৩	১০	১৭
শনি	৪	১১	১৮	২৫	...
	২০	২৭	৪	১১	

একাদশী—১০ই ও ২৪শে।

কার্ত্তিক—অক্টোবর, নবেম্বর।

রবি	৩০	২	৯	১৬	২৩
	১৬	১৯	২৬	২	৯
সোম	...	৩	১০	১৭	২৪
		২০	২৭	৩	১০
মঙ্গল	...	৪	১১	১৮	২৫
		২১	২৮	৪	১১
বুধ	...	৫	১২	১৯	২৬
		২২	২৯	৫	১২
বৃহস্পতি	...	৬	১৩	২০	২৭
		২৩	৩০	৬	১৩
শুক্র	...	৭	১৪	২১	২৮
		২৪	৩১	৭	১৪
শনি	১	৮	১৫	২২	২৯
	১৮	২৫	১	৮	১৫

একাদশী—৯ই ও ২৩শে।

অগ্রহায়ণ—নবেম্বর, ডিসেম্বর।

রবি	...	৭	১৪	২১	২৮
		২৩	৩০	৭	১৪
সোম	১	৮	১৫	২২	২৯
	১৭	৪	১	৮	১৫
মঙ্গল	২	৯	১৬	২৩	...
	১৮	২৫	২	৯	
বুধ	৩	১০	১৭	২৪	...
	১৯	২৬	৩	১০	
বৃহস্পতি	৪	১১	১৮	২৫	...
	২০	২৭	৪	১১	
শুক্র	৫	১২	১৯	২৬	...
	২১	২৮	৫	১২	
শনি	৬	১৩	২০	২৭	...
	২২	২৯	৫	১৩	

একাদশী—৮ই ও ২৩শে।

পৌষ—ডিসেম্বর, জানুয়ারী।

বার					
রবি	...	৬	১৩	২০	২৭
		২১	২৮	৪	১১
সোম	...	৭	১৪	২১	২৮
		২২	২৯	৫	১২
মঙ্গল	১	৮	১৫	২২	২৯
	১৬	২৩	৩০	৬	১৩
বুধ	২	৯	১৬	২৩	...
	১৭	২৪	৩১	৭	
বৃহস্পতি	৩	১০	১৭	২৪	...
	১৮	২৫	১	৮	
শুক্র	৪	১১	১৮	২৫	...
	১৯	২৬	২	৯	
শনি	৫	১২	১৯	২৬	...
	২০	২৭	৩	১০	

একাদশী—৮ই ও ২৪শে।

মাঘ—জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী।

বার					
রবি	...	৫	১২	১৯	২৬
		১৮	২৫	১	৮
সোম	...	৬	১৩	২০	২৭
		১৯	২৬	২	৯
মঙ্গল	...	৭	১৪	২১	২৮
		২০	২৭	৩	১০
বুধ	১	৮	১৫	২২	২৯
	১৪	২১	২৮	৪	১১
বৃহস্পতি	২	৯	১৬	২৩	৩০
	১৫	২২	২৯	৫	১২
শুক্র	৩	১০	১৭	২৪	...
	১৬	২৩	৩০	৬	
শনি	৪	১১	১৮	২৫	...
	১৭	২৪	৩১	৭	

একাদশী—৯ই ও ২৪শে।

ফাল্গুন—ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ।

বার					
রবি	…	৩	১০	১৭	২৪
		১৫	২২	১	৮
সোম	…	৪	১১	১৮	২৫
		১৬	২৩	২	৯
মঙ্গল	…	৫	১২	১৯	২৬
		১৭	২৪	৩	১০
বুধ	…	৬	১৩	২০	২৭
		১৮	২৫	৪	১১
বৃহস্পতি	…	৭	১৪	২১	২৮
		১৯	২৬	৫	১২
শুক্র	১	৮	১৫	২২	২৯
	১৩	২০	২৭	৬	১৩
শনি	২	৯	১৬	২৩	৩০
	১৪	২১	২৮	৭	১৪

একাদশী—৮ই ও ২৪শে।

চৈত্র—মার্চ্চ, এপ্রেল।

বার					
রবি	১	৮	১৫	২২	২৯
	১৫	২২	২৯	৫	১২
সোম	২	৯	১৬	২৩	৩০
	১৬	২৩	৩০	৬	১৩
মঙ্গল	৩	১০	১৭	২৪	…
	১৭	২৪	৩১	৭	
বুধ	৪	১১	১৮	২৫	…
	১৮	২৫	১	৮	
বৃহস্পতি	৫	১২	১৯	২৬	…
	১৯	২৬	২	৯	
শুক্র	৬	১৩	২০	২৭	…
	২০	২৭	৩	১০	
শনি	৭	১৪	২১	২৮	…
	২১	২৮	৪	১১	

একাদশী—৮ই ও ২৪শে।

ইংরাজি-পর্ব্বদিন।

সম্রাটের জন্মদিন	১ শে জ্যৈষ্ঠ।
খৃষ্টমাস-ডে (বড়দিন) ...	১০ই পৌষ।
নিউইয়ার্স-ডে ...	১৭ই পৌষ।
গুড্ ফ্রাই-ডে	২৭শে চৈত্র।
ইষ্টার মণ্ডে	৩০শে চৈত্র।

হিন্দু-পর্ব্বদিন।

অক্ষয় তৃতীয়া	২৬শে বৈশাখ।	ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	১৪ই কার্ত্তিক।
দশহরা	৩০শে জ্যৈষ্ঠ।	জগদ্ধাত্রীপূজা	২১শে কার্ত্তিক।
স্নানযাত্রা	৪ঠা আষাঢ়।	রাসযাত্রা	২৭শে কার্ত্তিক।
রথযাত্রা	২২শে আষাঢ়।	কার্ত্তিকপূজা	৩০শে কার্ত্তিক।
ঝুলনযাত্রা	২৭শে শ্রাবণ।	শ্রীপঞ্চমী	১৮ই মাঘ।
জন্মাষ্টমী	৯ই ভাদ্র।	শিবরাত্রি	১১ই ফাল্গুন।
দুর্গোৎসব	২০শে আশ্বিন।	দোলযাত্রা	২৮শে ফাল্গুন।
লক্ষ্মীপূজা	২৮শে আশ্বিন।	বাসন্তীপূজা	২০শে চৈত্র।
শ্যামাপূজা	১১ই কার্ত্তিক।	চড়কপূজা	৩০শে চৈত্র।

মুসলমান-পর্ব্বদিন।

সবেবরাত	৩রা শ্রাবণ।	মহরম	২৩শে অগ্রহায়ণ।
ইদেলফেতর	১৮ই ভাদ্র।	আখেরিচাহার	৮ই মাঘ।
ইদোজ্জোহা	২৪শে কার্ত্তিক।	ফতেহাদোয়াজ	২৬শে মাঘ।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়	টাকা
পূর্ব্বজমা	১৩৮২
২৩। ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মাসিক চাঁদা আদায়	১৬।০
ডিসেম্বর	
১। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়	২৲
২। ,, মহেন্দ্রলাল লাহিড়ী	১৲
৩। ,, রাইকিশোর মজুমদার	১৲
৪। ,, রাধিকালাল দে	১৲
৫। ,, কুঞ্জলাল ঘোষ	১৲
৬। ,, শীতলচন্দ্র সেন	৫৲
৭। ,, প্রকাশচন্দ্র নন্দী	২৲
৮। ,, পূর্ণচন্দ্র রায়	১৲
৯। ,, দেবেন্দ্র কিশোর বিশ্বাস	।০
১০। ,, কামিনী কুমার দে	২৲
	১৬।০

ব্যয়	টাকা
পূর্ব্ব খরচ	৩৮২।৶০
৪৯। পণ্ডিত যোগীন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রীর নবেম্বর মাসের বেতন	৪৫৲
৫০। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র ব্যাকরণ-তীর্থের নবেম্বর মাসের বেতন	১৫৲
৫১। কাগজ ২ দিস্তা	॥০
৫২। মহিমচন্দ্র বসাক দপ্তরীর নবেম্বর মাসের বেতন	৪৲
৫৩। তিনজন ছাত্রের খোরাকী	॥৵৬
৫৪। দুইখান খাতা বহি খরিদ	১৵৬
৫৫। নোটের হিসাব বহি	৶০
৫৬। নিভরসাগোপের নিকট টেলিগ্রাম	॥৶০
৫৭। আর্য্য-গৌরব কলিকাতা হইতে সত্বরে পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম	।৵০
৫৮। পত্রিকা গ্রাহকে নিকট পাঠাইবার খরচ	।৵০
	৪৫০।০

জের	১৩৯৮।০	জের	৪৫০।০
২৪। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক আদায় (১৯১।১৯২।১৯৩।১৯৪।১৯৫। ১৯৬।১৯৭।১৯৮।২৩৫।৭৫।৩। এই এগার গ্রাহকের মূল্য)	১৬৷৷০	৫৯। তিনজন বেদের ছাত্রের বৃত্তি	৬৲
		৬০। বেদবিদ্যালয়ের গৃহ মেরামত	৫৲
		৬১। পত্রিকার প্যোক এবং কাপির জন্য কাগজ	।৵০
		৬২। ১৮৪ থান পত্রিকা পাঠা-ইবার ডাক খরচ	৫৶০
		৬৩। পণ্ডিত যোগীন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর ডিসেম্বর মাসের বেতন	৪৫৲
		৬৪। পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র কাব্য-তীর্থ ডিসেম্বরের বেতন	১৫৲
২৫—২৬ } শীতল চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বাজীৎপুর, ভাগলপুর ও ছয়সতী গ্রাম হইতে আদায়	২২৮১৸৵৬		
১। হরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ১৷৷০			
২। রাধাগোবিন্দ সাহা ১৷৷০			
৩। চন্দ্রনাথ পাল ১৷৷০			
৪। চন্দ্রকিশোর কর ১৷৷০			
৫। ঈশান চন্দ্র আচার্য্য ১৷৷০			
	৩৬৯৬৷৷৵৬		৫২৭।৶০

জের জমা	৩৬৯৬৸৶৬	জের খরচ—৫২৭৷৶৹
৬। রামচন্দ্র চন্দ্র	৭৷৹	
৭। রোহিণীকুমার বানার্জ্জি	৫৲	
৮। কালীপ্রসন্ন মজুমদার	৷৹	
৯। ভুবনমোহন সেন গুপ্ত	১৲	
১০। কালীমোহন দাস	২৲	
১১। মথুরানাথ সাহা	২৲	
১২। শিব চন্দ্র সাহা	২৲	
১৩। ঈশ্বর সাহা	১৲	
১৪। বঙ্ক সাহা	৫৲	
১৫। গোলোক সাহা	২৲	
১৬। গোবিন্দ সাহা	২৲	
১৭। চন্দ্রমণি সাহা	১৲	
১৮। নগরবাঁশি সাহা	১৲	
১৯। মনোহর চক্রবর্ত্তী	১৷৹	
২০। নবীন চন্দ্র বণিক	৷৹	
২১। অধর চন্দ্র সাহা	১৲	
২২। শরৎ চন্দ্র সাহা	২৲	
২৩। বিদ্যাধর গোপ	১৲	
২৪। কালীচরণ সাহা	৩৲	
২৫। জ্ঞান চন্দ্র দে	৬৷৹	
২৬। পীতাম্বর দাস	২৲	
২৭। চন্দ্রনাথ কর	১৲	

জের জমা	৩৬৯৬৷৵৬	জের খরচ—৫২৭৷৶০
২৮। রামকুমার দাস	৩৷০	
২৯। যুধিষ্ঠির সূত্রধর	১৲	
৩০। উমেশ শীল	১৲	
৩১। কালীকুমার দাস	১৲	
৩২। নদিয়ার চাঁদ সূত্রধর	১৲	
৩৩। রামজীবন নমদাস	১৲	
৩৪। বিহারী দাস	।০	
৩৫। যোগেন্দ্র দে	।০	
৩৬। দেবেন্দ্র দাস	।০	
৩৭। হরচন্দ্র শীল	।০	
৩৮। হৃদয় কর	১৲	
৩৯। মোহন কিশোর দাস	১৲	
৪০। কৃষ্ণচন্দ্র গোপ	১৲	
৪১। যুধিষ্ঠির নমদাস	১৲	
৪২। গোবর্দ্ধন নমদাস	১৲	
৪৩। শান্তিরাম নমদাস	১৲	
৪৪। হরিচরণ দাস	১৲	
৪৫। জ্ঞানচন্দ্র দে	১৸৶০	
৪৬। রামসুন্দর গোপ	১৲	
৪৭। রাম নারায়ণ নাথ	১৲	
৪৮। কৃষ্ণচরণ গোপ	১৲	
৪৯। মহিম চন্দ্র নাথ	১০৲	
৫০। হরিচরণ নাথ	।০	

জের জমা ৩৬৯৬৷৵৬ জের খরচ— ৫২৭৷৶৹

৫১।	মহিম পোদ্দার	৷৹
৫২।	গিরিশ চন্দ্র রায়	৷৷৹
৫৩।	যোগেশচন্দ্র নাথ	১০৲
৫৪।	ঈশ্বর নাথ	২৲
৫৫।	প্রতাপ চন্দ্র নাথ	৪০৲
৫৬।	বাঁকা বিহারী দাস	২৲
৫৭।	গুরুচরণ গোপ	১৲
৫৮।	সাছুনী নম দাস	৷৹
৫৯।	গগনচন্দ্র সাহা	২৲
৬০।	নিভরসা রাম গোপ	১০০০৲
৬১।	মুরারি মোহন রায়	৩৲
৬২।	ভারত চন্দ্র রায়	৬৷৷৹
৬৩।	নদীবাসী পাল	১৲
৬৪।	সাছুনী পাল	২৲
৬৫।	বিপিন পাল	১৲
৬৬	বৈদ্যনাথ সাহা	৷৷৹
৬৭।	গুরুদাস বিশ্বাস	১৷৷৹
৬৮।	গুরুদাস দাস	৩৲
৬৯।	দুর্গাচরণ দাস	৩৲
৭০।	বংশী দাস	১৲
৭১।	হরগোবিন্দ দাস	২৲
৭২।	মাধবদাস	১৲

জের জমা ৩৬৯৬৷৵৬ জের খরচ—৫২৭৷৶০

৭৩। রামধন দাস	১৲
৭৪। প্যারী দাস	১৲
৭৫। বৈদ্যনাথ তিয়র	১৲
৭৬। নবীন নাথ	১৲
৭৭। ভোলানাথ পোদ্দার	৩৲
৭৮। পীতাম্বর নাথ	১৲
৭৯। রাই মোহন সাহা	৪৲
৮০। ভগবান সাহা	২৲
৮১। জয় দুর্গা দাস্যা	৫৲
৮২। তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
৮৩। মহামায়া দাস্যা ও শ্যামাচরণ পোদ্দার	—১০০০৲
৮৪। যামিনীকান্ত ঘোষ	৫৲
৮৫। মিঞা চাঁদ হাজী	৫৲
৮৬। নবীন চন্দ্র চন্দ	১৲
৮৭। হরেন্দ্র লাল রায় চৌধুরী	১১৷০
৮৮। গোপীনাথ পোদ্দার	১১৷০
৮৯। মাধব প্রসাদ শুকুল	৪৲
৯০। নবীন চন্দ্র সাহা	১১৷০
৯১। নিমচাঁদ সাহা	২৲
৯২। নবকিশোর সাহা	৩৲
৯৩। আনন্দ চন্দ্র রায়	২৲

৩৬৯৬৷৶৬ জের খরচ—৫২৭৷৴০

জের জমা

৯৪। মহেশ চন্দ্র কুণ্ড ৫॥০

৯৫। রামদুলাল পাল ৪॥০

৯৬। রামচরণ পাল ৪॥০

৯৭। যমুনা সুন্দরী দাসী ৩৲

চেক খাতা ১॥৴৬

২২৮১৸৶৬

২৭। নলিনীকান্ত ঘোষ কর্ত্তৃক
ভৈরব হইতে আদায় ১১৸৴০

১। বুধাই গৌর কিশোর
সাহা ৪৲

২। সাছুনী লক্ষ্মীকান্ত
পোদ্দার ৩৲

৩। নিবারণ চন্দ্র পাল ২৲

৪। বাঁশি রাম পাল ২৲

৫। কুঞ্জমোহন পোদ্দার ১৲

১২৲

মণিঅর্ডার খরচ ৴০

১১৸৴০

৩৭০৮৷৴৬

জের জমা	৩৭০৮৷৶৬	জের খরচ—৫২৭৷৵০

২৮—২৯ } ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মস্তুয়া হইতে আদায় ৩৷০

১। আনন্দ কিশোর দে

চাঁদা ২৲

আর্য্য গৌরবের মূল্য ১৷৷০

৩৷৷০

৩৭১১৸৵৬

বাদ খরচ ৫২৭৷৵০

৩১৮৪৷৷৬

মঃ তিন হাজার একশত চৌরাশি টাকা

আট আনা ছয় পাই তহবিল।

শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী,

সহকারী সম্পাদক।

অগ্রহায়ণের চাঁদা সংশোধন করা গেল। ৩৪ পৃঃ।

১। আনন্দ কিশোর রায়	১৫৲
৩। বৈকুণ্ঠ নাথ রায়	৫৲
৪। গোবিন্দ চন্দ্র রায়	১৲
৫। মহেশ চন্দ্র রায়	৫৲
৬। রামকুমার চক্রবর্ত্তী	২৲
৭। পীতাম্বর সাহা	২৲
৮। গগন ধুবী	।০

মূল্যপ্রাপ্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৩৭।	শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু রঞ্জন রায় চৌধুরী	১॥০	গাছা, ঢাকা
২৩৮।	সেক্রেটারী ষ্টুডেন্ট্ লাইব্রেরী	১॥০	নাগরী ঢাকা
২৩৯।	সেক্রেটারী সুদন লাইব্রেরী	১॥০	বারিশাকে ঐ
২৪০।	শ্রীযুক্ত আদিনাথ চক্রবর্ত্তী জমিদার	১॥০	ঐ ঐ
২৪১।	,, ব্রজেন্দ্র কুমার রায় জমিদার	১॥০	নরেন্দ্রপুর ঐ
২৪২।	,, জয়কুমার চন্দ জমিদার	১॥০	খিদিরপুর ঐ
২৪৪।	,, শ্যামাচরণ পোদ্দার	ফ্রী	ভাগলপুর।
২৪৫।	,, হাজি মিঞা চাঁদ বেপারী	৫৲	ভৈরব।
২৪৬।	,, হরেন্দ্র লাল কুণ্ড রায় চৌধুরী	১॥০	ঐ
২৪৭।	,, হরিশচন্দ্র পোদ্দার	১॥০	ঐ
২৪৮।	,, নবীন চন্দ্র সাহা	১॥০	ঐ
২৪৯।	,, মহেশ চন্দ্র কুণ্ড	১॥০	ঐ
২৫০।	,, রামদুলাল পাল	১॥০	ঐ
২৫১।	,, রামচরণ পাল	১॥০	ঐ
২৫২।	,, হরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত হেড্মাষ্টার	১॥০	কটিয়াদী
২৫৩।	,, রসিদ উদ্দিন খাঁ	১॥০	কটিয়াদী
১৩০।	,, চন্দ্রকিশোর কর উকীল	১॥০	বাজীৎপুর
১৩১।	,, চন্দ্রনাথ পাল উকীল	১॥০	ঐ

১৩২।	,,	গুরুদাস বিশ্বাস উকীল	১॥০	বাজীৎপুর
২৫৬।	,,	ঈশান চন্দ্র আচার্য্য	১॥০	বসন্তপুর
২৫৭।	,,	রামচন্দ্র চন্দ্র	১॥০	ঐ
২৫৮।	,,	মনোহর চক্রবর্ত্তী	১॥০	আলিয়াবাদ
২৫৯।	,,	জ্ঞান চন্দ্র দে	১॥০	ছয়সতী
২৬০।	,	পীতাম্বর দাস	১॥০	ঐ
২৬১।	,,	রামকুমার দাস	১॥০	ঐ
২৬২।	,,	নিভরসা রাম গোপ	ফ্রী	ঐ
২৬৩।	,,	মুমারিমোহন রায়	১॥০	কুলিয়ার চর
২৬৪।	,,	ভারত চন্দ্র রায়	১॥০	ঐ
২৭৩।	,,	আদিত্য চন্দ্র মজুমদার	১॥০	কিশোরগঞ্জ
২৬৫।	,,	কালীকুমার কবিরত্ন	১॥০	পুটিজানা
২৬৬।	,,	গিরিশ চন্দ্র দাস	১॥০	শিবগঞ্জ
৩১৫।	,,	আনন্দ কিশোর দে	১॥০	কটিয়াদী
৩১৮।	,,	শরৎকুমার মুন্সী	ফ্রী	কটিয়াদী
৩১৭।	..	রমেশ চন্দ্র রায়	১॥০	ভৈরব।

ক্রমশঃ

কিশোরগঞ্জ বেদবিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণ।

ভগবান্ কৃপায় আমাদের হাতে তিন সহস্রেরও অধিক টাকা মজুত আছে। এই সমস্ত টাকাই স্থানীয় লোন্ অফিসে অস্থিরতর ভাবে ডিপজিট থাকিতেছে। বাজীৎপুর থানার অধীন ছয়সতী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নিভরসারাম গোপ ১০০০৲ এক হাজার এবং ভাগলপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পোদ্দার ও তন্মাতা শ্রীমতী মহামায়া দাস্যা ১০০০৲ এক হাজার টাকা নগদ দান করিয়া বেদ-বিদ্যালয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য ৩১।১।১৩ অর্থাৎ ১৮ই মাঘ শুক্রবার অত্রস্থ সাধারণের এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মুন্সেফ মহোদয় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সুললিত ভাষায় সভার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপর স্তোত্র পাঠ অভিনন্দন পত্র পাঠ এবং আশীর্ব্বাদ পত্র ও রচনা পাঠ হইয়া দাতাগণকে ধন্যবাদ দানপূর্ব্বক ও তাঁহাদের জন্য ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য সম্পাদন করা হয়।

———

আর্য্য-গৌরব।

বেদবিদ্যালয়

"কি শুনি কি শুনি আজ আনন্দের ধুম
মরুভূমে ফুটিল কি অকাল-কুসুম।"

আজকাল সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে রাজকীয় ভাষার বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় আমাদিগকে রাজভাষায় সুপণ্ডিত ও সুশিক্ষিত করিতেছে, আমাদের বুদ্ধির প্রখরতা জ্ঞানের গভীরতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা এবং বিষয় কার্য্যের তৎপরতা বাড়াইয়া দিতেছে; কিন্তু আমরা বহুগুণসম্পন্ন হইলেও যেন কিসের অব্যক্ত অভাব ভোগ করিতেছি—কি যেন আমরা হারাইয়া গিয়াছি—আমাদের আত্মা যেন প্রতিনিয়তই কি খুঁজিতেছে—কি ভাবিতেছে—কিসের জন্য যেন আকুল হইতেছে—আমার অভাব যেন কিছুতেই দূর হইতেছে না। সেই অভাব সেই হৃত ধন কি? যাহা খুঁজিতেছি তাহা পাইব কি না—তাহা পাওয়ার উপায় আছে কি না—এই সমস্যা পূরণের উপায়ই বেদবিদ্যালয় আর হৃত ধনই আমাদের ধর্ম্ম—অভাবই আমাদের বেদজ্ঞান;—সংস্কৃত শিক্ষা। এই ধর্ম্ম,—বেদজ্ঞান,—এবং সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তার জন্যই আমাদের হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ কতিপয় আর্য্য মনস্বীদের

প্রাণের ভিতর বেদ পাঠের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই সুদূর বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্তে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ উপরিভাগের ৺শ্যামসুন্দরের আখড়ার এক কোণে কতিপয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ১৩১৮সনের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে জনসাধারণের একটী সভার অধিবেশন করিয়া বেদবিদ্যালয় স্থাপন স্থির করিয়াছিলেন। সেই সময় স্থানীয় কোন কোনও শিক্ষিত ব্যক্তিগণও ইহাকে উপহাসের জিনিষ—বাতুলের প্রলাপ—পাগলের অসম্বন্ধ জল্পনা—এমন কি স্বপ্নাবিষ্টের স্বপ্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যে ক্ষুদ্র বীজ ঐ দিবস উপ্ত হইয়াছিল, সেই দিবস কোনও ব্যক্তি বেদ-বিদ্যালয়ের সে বীজের মঙ্গল কামনায় ১৲ একটী টাকা মাত্র সাহায্য দান করিয়াছিলেন। তখন রসিকদিগের উপহাসের তীব্র লক্ষ্যের স্থল হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র বীজ, সেই উপহাসের জিনিষ, সেই বাতুলের প্রলাপ, সেই নিদ্রিতের স্বপ্ন আজ সুশোভন আকার ধারণ করিয়া কিশোরগঞ্জবাসী ময়মনসিংহ—নিবাসী সমস্ত বঙ্গদেশবাসী সমগ্র ভারতবাসীর সম্মুখে সজীব আকারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয়, ইহা সমস্ত হিন্দুর প্রাণের জিনিষ, গৌরবের বস্তু। শাক্ত শৈব গাণপত্য সৌর বৈষ্ণব কোন হিন্দু ইহার গণ্ডীর বহির্ভূত নহেন। যিনি নিজকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করেন তিনিই বেদের প্রাধান্য, বেদের শ্রেষ্ঠত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিবেন। স্মৃতি ও শ্রুতিতে বিরোধ হইলে শ্রুতিই প্রামাণ্য কিন্তু সেই প্রামাণ্য জিনিষ কোথায়? বেদ লুপ্ত, সুতরাং হিন্দুর ক্রিয়া লুপ্ত,

হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংসোন্মুখ। এমন আর এক সময় বেদ দেশে লুপ্ত হইয়াছিল। তখন ভগবান অবতীর্ণ হইয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। বুদ্ধ যুগেও শঙ্কর সদৃশ শঙ্করাচার্য্যও বেদাচারবিহীন উন্মার্গগামিগণকে বেদাচারে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। এখন দেশ ঐ বুদ্ধযুগ হইতে অধিকতর বেদাচার বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। হায়! আর কি কোন শঙ্কর জন্মিয়া দেশে পুনঃ বেদাচার প্রবর্ত্তিত করিবেন না। যাহা হউক, আজ এই বঙ্গের পূর্ব্বোত্তর কোণে বেদধ্বনির যে মৃদু নিনাদ শ্রুতিগোচর হইল, ইহাতে পুনঃ প্রাণে আশার সঞ্চার হইতেছে। পুনর্ব্বার বঙ্গে—ভারতে—সমস্ত পৃথিবীতে বিশ্বব্যাপী বেদধ্বনি উত্থিত হইবে। সমস্ত পৃথিবীকে বেদাচার অবলম্বন করিতে হইবে।— সমস্ত পৃথিবী হিন্দু হইবে।

কিশোরগঞ্জের মত এইরূপ ক্ষুদ্র উপরিভাগ কেন বেদধ্বনি শ্রবণ জন্য উদ্‌গ্রীব হইল, ইহার যদি আমরা কারণ অনুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাই, ধর্ম্মপ্রাণ উৎসাহী কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্রসেন ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় কিশোরগঞ্জে আসিয়া বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ গোক্ষীর আতপতণ্ডুল মুদ্গ কদলী প্রভৃতি কতকগুলি ব্রহ্মচর্য্যে উৎকৃষ্ট উপকরণ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এইস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় দেখিতে পাইয়া এই স্থানে বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য মনে করেন। তৎপূর্ব্বেও দুইজন লোক প্রাণে এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া এইরূপ কল্পনা করিতেছিলেন। শীতলবাবু ইহাঁদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে এই আকাঙ্ক্ষা বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল। স্থানীয় মুন্‌সেফ

বাবু মতিলাল রায় এম, এ, বি, এল, বাবু কালীপ্রসন্ন বাগ্‌চি, বাবু দ্বিজেন্দ্রমোহন সেন এম, এ ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ ও সবরেজিষ্টার বাবু উপেন্দ্রলাল পাকরাশী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী জমিদার ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা ইহাতে যোগদান দেন, কিন্তু কিছুতেই উদ্যোক্তাগণ কার্য্য আরম্ভ করিতে সাহসী হন নাই। ইহার পর বিদ্যোৎসাহী সুপণ্ডিত শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র দে বি,এ, (অক্‌সফোর্ড)আই, সি, এম, কিশোরগঞ্জের সবডিভি-সনের ভার প্রাপ্ত হইয়া আসেন। তাঁহারই অদম্য উৎসাহে ও সহানুভূতিতে শ্রীযুক্ত দয়ালগোবিন্দ অধিকারী মোহান্ত মহা-শয়ের বিশেষ আনুকূল্যে এই বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ এই প্রথম দিনের ক্ষুদ্র একটাকা সহস্র সহস্র টাকা ডাকিয়া আনিতেছে। এই বেদবিদ্যালয় কোনও রাজা মহারাজের নামের জন্য বিলাসের বস্তু নহে। ইহা কাঙ্গালের প্রাণের ধন, ইহা গরীবের স্বেদজলমিশ্র অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। ইহার স্থায়িত্বের জন্য উদ্যোক্তারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। হিন্দু সমাজের কাঙ্গাল গরীব অব-জ্ঞাত শ্রেণিকে প্রাণের আহ্বান জানাইতেছেন। কাঙ্গাল গরীব এই আহ্বানে সাড়া দিতেছে। কাঙ্গাল গরীবের ধমনী বেদমাতার প্রাণের কাতরোক্তি শ্রবণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারাই বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ইহাতেই ইহার স্থায়িত্বের আশা করি; ইহা রাজা মহারাজার বিলাসের বস্তু হইলে, ইহা তাঁহাদের এক

ফুৎকারে জন্মিতে ও অপর ফুৎকারে বিলীন হইতে পারিত। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া বেদমাতার চর্চ্চার জন্য এই বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভরসা করি ভগবান ইহাকে স্থায়ী করিবেন।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে ১৯১২ সনের ১লা সেপ্টেম্বর অত্রস্থ শ্যামসুন্দরের আখড়ায় দ্বিতল ও ত্রিতল বাটীতে বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং তদবধি ইহার কার্য্য সুচারুরূপেই চলিতেছে।

হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ ইহার জন্য নগদ অর্থ দানে ও নানা প্রকারে সাহায্য করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় চারিহাজার টাকা নগদ দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ২২ জন হইয়াছে, তন্মধ্যে বেদের ছাত্র ছয়জন। আরও বহু ছাত্র ভর্ত্তি হইতে উপস্থিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে বেদের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী উপাধ্যায়, সাংখ্যের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী সাংখ্যতীর্থ, কাব্যের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঠাকুর সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ এবং আয়ুর্ব্বেদের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সেন কবীন্দ্র কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ সাংখ্যরত্ন কবিরাজ মহোদয় নিযুক্ত আছেন এতৎসহ এই "আর্য্য-গৌরব"—অতি অকিঞ্চিৎকর পত্রিকা খানিও পরিচালিত হইতেছে। উক্ত পণ্ডিতগণ এবং স্থানীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এবং বিভিন্ন স্থানীয় সুলেখকগণই ইহার লেখক। ইহার উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজের অভ্যুদয় এবং বেদ ও সংস্কৃত

ভাষা প্রচার করা। অভ্যুদয়ে কাহারও সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, কাহারও সহিত হিংসা বিদ্বেষ নাই, ইহা আপন মনে আপন ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ঋষিদের যে অভ্যুদয় ছিল, সেই বাসনা হৃদয়ে ইহা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। যাহা হউক মানবের ইচ্ছায় কিছুই হইতে পারে না, ভগবান যাহা করেন, তাহা রোধ করিবার শক্তি কার? আমরা তাঁহার উপরই ন্যস্ত করিলাম, তাঁহারই ঈপ্সিত কার্য্য সম্পাদিত হউক্। গত ২।৩। ১৩ অর্থাৎ ১৮ই ফাল্গুন এই স্থানের হিন্দু জনসাধারণের এক সভা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে সবডিভিসন অফিসার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবং বেদবিদ্যালয় পরিচালন জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণ দ্বারা "কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটী" পুনর্গঠিত হয়। এই সভ্যগণই বেদবিদ্যালয় ও পত্রিকার পরিচালক বটেন।

১। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে বাহাদুর সবডিভিসন অফিসার—প্রেসিডেণ্ট্

২। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চৌধুরী উকীল জমিদার—সেক্রেটারী

৩। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, মুন্সেফ—বাহাদুর

৪। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র সেন পুলিশ ইন্‌স্পেকটার—সেক্রেটারী

৫। শ্রীযুক্ত দয়ালগোবিন্দ অধিকারী মোহান্ত ৺শ্যামসুন্দর আখড়া

৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী ডাক্তার স্থানীয় তালুকদার।

৭। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল উকিল

৮। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ শাস্ত্রী উপাধ্যায় বেদের পণ্ডিত।

৯। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বেদবাচস্পতি ম্যানেজার হয়বতনগর।

১০। শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী—এসিষ্টেণ্ট্ সেক্রেটারী

সভা আয় ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন করিয়া বিশুদ্ধ আছে বলিয়া মঞ্জুর করিলেন। মোট ৩৮৪৮৫০ আনা আয় এবং ৬৭৮৶০ ব্যয় তহবীল ৩১৭০৷৴০ আনা বটে। ইতি। ৭। ৩। ১৩।

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বেদবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী

ঈশ্বর।

(১)

আমি কি তোমার নহি, বলহে ঈশ্বর!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব বিশ্ব চরাচর।
রবি শশী সমীরণ,
গ্রহ তারা হুতাশন,
ভূচর খেচর ওই জলচরগণ,
সকল (ই) তোমার তুমি সবের জীবন

(২)

জীবে জড়ে দেবে নরে নাহি ভেদ জ্ঞান,
সকলি তোমার, তুমি সকলে সমান।
পণ্ডিতে বা মূর্খ জনে,
রাজা বা দরিদ্র সনে
তোমার প্রভেদ নাই অভেদ-হৃদয়,
পাপিষ্ঠ ধার্ম্মিক সবে তোমাতে বিলয়।

(৩)

আমি কি তোমার দেব! নহি দয়াময়?
কে আছে তোমার ছাড়া তুমি বিশ্বময়।
তোমার আদেশ ভরে,
আছি দেহ-প্রাণ ধরে,
আমাতে তোমাতে ভেদ বিশ্বাস না হয়,
ঈশ্বর তোমার নাম, তুমি সর্ব্বময়।

(৪)

বিধাতার বিধি শুধু একের ত নয়,
তোমার ইচ্ছায় মম উদয় বিলয়।
তোমার ইচ্ছায় মৃত,
তোমার ইচ্ছায় ধৃত,
তোমার ইচ্ছায় ইচ্ছা, তুমি ইচ্ছাময়,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি তুমি পাপ পুণ্যচয়।

(৫)

ব্রহ্মাণ্ডের সার তুমি পবিত্রতাময়,
কোটি কোটি পাতকীর তুমিই আশ্রয়।
আমাকে পাতকী বলে,
কোথা তুমি যাবে চলে,
কোথায় লুকাবে তুমি, তুমি সর্ব্বময়।
লুকাবার স্থান তব কোথাও না রয়।

(৬)

আমার (ও) ঈশ্বর তুমি জান, বিশ্বময়।
আমার সে কর্ম্মফল তোমার কি নয়?
তুমি সকলের পতি,
তুমি অগতির গতি,
দেহে প্রাণে আছ তুমি খুঁজিতে কি হয়?
ভালমন্দ শুভাশুভ তোমার কি নয়?

(৭)

সুমতি কুমতি দাতা তুমি মহেশ্বর,
তোমার আদিষ্ট আমি আছি নিরন্তর,
তোমারি এ ফুল ফল,
তোমারি এ গঙ্গাজল,
তোমারি ত মন্ত্র তন্ত্র তোমারি সকল।
তোমাতে তোমার পূজা, তুমিই সম্বল।

(৮)

আমি ত কাহার(ও) নহি, তোমার(ই) ঈশ্বর
তব-পদ-কোটি-রেণু আমার(ই) ভিতর।
এই পদরেণুচয়,
যেন তব পদে রয়,
পাপ ঝটিকায় মম সদা করে ভয়।
ঈশ্বর তোমার নাম সভয়ে অভয়।

শ্রী—

স্বদেশ।

জনম না হ'তে মোর যার শস্যনীরে,
মাতৃস্তন্য পরিপূর্ণ সুধাময় ক্ষীরে।
জনম হইলে যিনি পরম সোহাগে,
লয়েছেন ক্রোড়ে মোরে জননীর আগে।
গভীর আঁধার হ'তে হইয়া বাহির,
চারি দিকে হেরি যাঁর পবিত্র শরীর।
বয়োবৃদ্ধি সঙ্গে রঙ্গে যাঁর ধূলি রাশি,
আনন্দে মেখেছি অঙ্গে, কত ভালবাসি।
শ্যামল প্রকৃতি যাঁর শোভা একশেষ,
প্রথমে করেছে মোর জ্ঞানের উন্মেষ।

আপন বুকের রক্ত করিয়া প্রদান,
কোটি কোটি সন্তানের রেখেছেন প্রাণ ;
অন্তিমে অনন্ত শয্যা হৃদয়ে যাঁহার'
স্বর্গ শ্রেষ্ঠ জন্মভূমি স্বদেশ আমার।

শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী

---

(১)

সরস্বতী ত্রিধারা।

"গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা, পুষ্কলেন ধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা, চতুর্থী নোপপদ্যতে॥"

গুরুশুশ্রূষা, প্রভূত ধন ও বিদ্যার বিনিময়, এই ত্রিবিধ উপায়ে বিদ্যাদেবী প্রসন্না হইয়া থাকেন।

১। বিদ্যার বিনিময়ে বিদ্যালাভ করিতে পারা যায়—মহাভারতের নলোপাখ্যান এই বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে—অযোধ্যার মহারাজ ঋতুপর্ণের নিকট হইতে প্রচ্ছন্নবেশে তদীয় সারথ্য কর্ম্মাবলম্বী, প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক মহারাজ নল, অশ্বহৃদয়ের (অশ্ববিদ্যার) বিনিময়ে অক্ষহৃদয় (গণনাবিদ্যা) লাভ করিয়াছিলেন। এই বিদ্যা ত্রিপথগামিনীর সেই পাতাল-তলবাহিনী নাগলোকভোগ্যা ভোগবতী-ধারার ন্যায় হৃদয়তল-

বাহিনী সরস্বতী ধারা; বিজ্ঞানোন্নতিবিধায়িনী, লোকমনোহর চাতুরীসম্পাদিনী হইয়া থাকে।

২। প্রচুর ধন বিনিময়ে যে বিদ্যার লাভ ঘটে, তাহা বর্ত্তমান যুগের স্কুল কলেজের অভ্যুদয়ে প্রায় সকলেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। ইহা উন্নতানত ভূতলচারিণী সাগর-সঙ্গতা শতমুখী ভাগীরথী দেবীর অলকনন্দা ধারার ন্যায় রজস্তমো-বন্ধুর মানস-ক্ষেত্রের মধ্যস্তরবাহিনী শতমুখী সরস্বতী ধারা। এই ধারা অনন্ত বিজ্ঞান পথ বিধৌত করত, স্থানে স্থানে আবর্জ্জনাপুঞ্জ পুঞ্জীকৃত করিয়া প্রবহমানা হয়। এই বিদ্যার প্রভাবে মোহ-মদিরায় বিভোর হইয়া জীব সঞ্চিত পাপপুণ্যের প্রবাহে হেলিয়া দুলিয়া দুঃখ-সুখভোগ সহকারে মায়ার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতে থাকে। বিজ্ঞানপ্রভাবে প্রকৃতির গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে চায়, জানে না যে লোক বিজ্ঞানে সেই অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী প্রকৃতির গর্ব্ব খর্ব্ব হয় না। কত সুখস্বপ্ন দেখিতে থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ উলট পালটভাবে চক্রনেমিক্রমে ভোগ করিতে থাকে। জালে মীনের ন্যায় কালে জীব নিহত হইয়া পড়ে, প্রকৃতি তখন বিজয়িনী হইয়া সুখের হাসি হাসে। ঈদৃশ বিদ্যায় জীব জাগে না, দুঃখের হাত এড়াইতেও পারে না। অবশেষে বাসনাবশে পিঞ্জরে আবদ্ধ পাখীর ন্যায়, জগৎ-পিঞ্জরে ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রান্ত ক্লান্ত ও স্তব্ধীভূত হইয়া পড়ে।

৩। গুরুশুশ্রূষায় যে বিদ্যার লাভ হয়, তাহাই ত্রিপথ-

গামিনী গঙ্গার নির্ম্মল স্বর্গীয় মন্দাকিনী-ধারানুকারিণী,মানসাকাশের সত্ত্বময় উন্নত স্তর-বাহিনী, পবিত্রতমা অনন্তমুখী সরস্বতী-ধারা।

গুরুশুশ্রূষা যে কি! অনির্ব্বচনীয় অলৌকিকসূত্রে গুরুর ভিতর দিয়া অসমুদ্র-সম্ভূত রত্নরাজি আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহার তত্ত্ব গুরুও সর্ব্বথা জানিতে পারেন না, অন্যে পরে কা কথা।

প্রেমাস্পদ বৎস যেমন মর্ম্মস্পর্শী আকর্ষণে গাভীর অবিজ্ঞাতসারে নিঃশেষরূপে দুগ্ধধারা গ্রহণে কৃতকার্য্য হয়, তেমন গুরুশুশ্রূষু নিরতিশয় প্রেমাস্পদ শিষ্যও মর্ম্মস্পর্শী আকর্ষণে অলক্ষিতক্রমে নিঃশেষ প্রকারে বিদ্যাগ্রহণে সুসমর্থ হয়।

এই জন্যই স্মৃতি বলিতেছে ঃ—"যো গুরুং পূজয়েন্নিত্যং তস্য বিদ্যা প্রসীদতি" যিনি সর্ব্বদা গুরুর পূজা করেন বিদ্যা তাহার প্রতি প্রসন্না হন।

এবং শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রথম স্কন্ধে সূতের প্রতি শৌনকের উক্তিতে দেখা যায়—

সৌম্য! ত্বং বেত্থ তৎ সর্ব্বং, তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য, গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥"

বঙ্গার্থ—হে সুভগ! (সূত) তুমি তাঁহার (তোমার গুরু বেদব্যাসের) বিশেষ কৃপায়, আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় সমস্তের তত্ত্ব যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত আছ; যেহেতু তুমি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য, প্রিয়তম শিষ্যের নিকটে গুরু হৃদয়ের অন্তঃস্তর-নিহিত রহস্য প্রকাশ করিতে সুসমর্থ হন। এই বিষয়ে মনু বলিতেছেন—

যথা খনন্ খনিত্রেণ, নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
এবং গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি" ॥

বঙ্গার্থ—মানুষ যেমন খনিত্র-খনন সাধন যন্ত্র দিয়া অর্থাৎ কুদ্দাল দিয়া খনন করিতে করিতে জল লাভ করে, তেমন শুশ্রূষাকারী শুশ্রূষা করিতে করিতে গুরুগত অর্থাৎ গুরুর অন্তর্নিহিত বিদ্যা লাভ করিতে পারে।

গুরুশুশ্রূষা যে বিদ্যালাভের অনন্যসদৃশ প্রধানতম উপায় ইহা সকল আপ্তোক্তিতে ও যুক্তিতে সুসমর্থিত।

বিদ্যালাভের উল্লিখিত অলৌকিক কৌশলক্রম, সর্ব্বথা মানববুদ্ধির গম্য নহে,, তবে শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায় অবলম্বনে ক্রমে লোকাতীত শক্তি লাভ করিয়া যে সর্ব্বথা জ্ঞাতজ্ঞাতব্য হইতে পারা যায়, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক উপাখ্যানটি এই বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে।

একলব্যের গুরুভক্তি।

একলব্য নামে একজন ব্যাধ-তনয়, ধনুর্বিদ্যায় পার-দর্শিতা-লাভে অভিলাষী হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে কুরুকুলের গুরু ধনুর্বেদাচার্য্য দ্রোণাচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে নিজাভিলাষ প্রকাশ করে ; তখন দ্রোণাচার্য্য সাদর সম্ভাষণে বলিলেন ঃ—বৎস ! তুমি বিদ্যার্থী হইয়া আসিয়াছ, কিন্তু কি করি এ যে বড় ধর্ম্মবিরোধী ব্যাপার। আমি ব্রাহ্মণ, আর তুমি জাতি-পতিত ব্যাধ, তোমাকে বিদ্যাদান করিতে গেলে আমায়

পতিত হইতে হইবে, আর এইরূপ ধর্ম্ম বিরোধ ঘটাইয়া তুমিও পাপ-লিপ্ত হইবে, এবং এইরূপ বিসদৃশ-পথে পদক্ষেপ করিলে বিদ্যালাভের সম্ভাবনা নাই, বিশেষে আমি কুরুকুলের গুরু, তাহারা এবিষয়ে নিশ্চয় বিরক্ত হইবে, অতএব তুমি অন্যত্র গমন কর, ও সুসদৃশ ভাবে—বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা কর, আমিও মনে প্রাণে আশীর্ব্বাদ করি—তুমি কৃতকার্য্য হও। দ্রোণাচার্য্যের এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে ও সদুপদেশে প্রবোধ পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে মনে মনে দ্রোণকে গুরুপদে দৃঢ়ভাবে বরণ করিয়া, প্রণতিপূর্ব্বক যথাভিলষিত নির্জ্জন বনে গমন করিল, এবং তথায় দ্রোণের মৃণ্ময় মূর্ত্তিস্বরূপ গুরুকে সম্মুখে রাখিয়া অতিশয় অভিনিবেশ সহকারে অস্ত্র বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল। অথচ একমাত্র দৃঢ় গুরু-ভক্তি-বলেই ধনুর্বিদ্যায় লোকাতিশায়ি-ব্যুৎপত্তি লাভ করিল। পরে একদা অর্জ্জুন মৃগয়ানুষ্ঠানে সেই বনে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে একলব্য আতিমানুষিক অস্ত্র প্রয়োগের অনুশীলন করিতেছে; তখন অর্জ্জুন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কাহার নিকটে এই অদ্ভুত বিদ্যা শিক্ষা পাইয়াছ? সে সস্মিত মুখে উত্তর করিল যে কুরুগুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকটে, তিনিই আমার এই বিদ্যার সর্ব্বময় গুরু। ইহা শুনিবামাত্র অর্জ্জুন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল, গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিষণ্ণ মুখে গুরুসমীপে গিয়া বলিল—"গুরো! আপনি বলিয়াছিলেন যে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্য; কৈ? সে কথা ত, ছলনা মাত্র, নচেৎ বনের ভিতরে ব্যাধ-শিশুকে আতিমানুষী

বিদ্যায় অলঙ্কৃত করিলেন কিরূপে ? গুরু বলিলেন কৈ ? আমিত কোন ব্যাধকে বিদ্যা শিক্ষা দেই নাই। অর্জ্জুন বলিল, হাঁ মহাশয় ! সে নিশ্চয় বলিয়াছে যে সে আপানারই শিষ্য। তখন গুরু একটুক স্তম্ভিত হইয়া অর্জ্জুনকে লইয়া ঐ বনমধ্যে প্রবেশ করিল, গুরুকে দেখিবামাত্র একলব্য তদভি-মুখে ধাবিত হইয়া গুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে পূজিত করিল, গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন।—তুমি কাহার শিষ্য ? সে বলিল আপনার ; গুরু বলিলেন ; আমিত শিক্ষা দেই নাই, সে—হাঁ আপনিই শিক্ষা দিয়াছেন, আসিয়া প্রমাণ গ্রহণ করুন, এই বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র কুটীর-স্থাপিত দ্রোণের মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তিটীকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল, এবং তাহার সেই পূর্ব্বপ্রার্থনা ও দ্রোণের প্রদত্ত উপদেশ বিষয়ে স্মরণ করাইল ; এবং সে যে দৃঢ়চিত্তে দ্রোণাচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করিয়া বিদ্যালাভে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাও নিবেদন করিল। তখন আচার্য্য অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে বলিলেন, আচ্ছা বাপু, এখন গুরু-দক্ষিণা দাও, সে তৎক্ষণাৎ বলিল, হাঁ গুরু যাহা আদেশ করেন দিব ; তখন গুরু বলিলেন—তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী কাটিয়া আমায় দক্ষিণারূপে অর্পণ কর। সে তখন হৃষ্টচিত্তে ও অম্লানমুখে গুরুর কঠোর আদেশ পালন করিল, দক্ষিণা পাইয়া গুরু বলিলেন, তুমি আমার শিষ্যোত্তমই বট ; তবে তুমি অভিপ্রায় বিরুদ্ধভাবে আমাকে গুরুপদে বরণ করিয়া অবৈধ কার্য্যানুষ্ঠানে পাপলিপ্ত হইয়াছিলে, অতএব তোমার

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন দ্বারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানে পাপ বিদূরিত করা হইল ইহাতে তোমারও অহিত হইল না। কিন্তু এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ না করিলে তুমিও পাপে মলিন থাকিতে, আমিও পাপস্পর্শে কলঙ্কিত ও অধঃ-পাতিত হইতাম। এখন নিষ্পাপ হইয়াছ, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি আমার অর্জ্জুন ভিন্ন শিষ্যগণ মধ্যে সর্ব্বোত্তম বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইবে। এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্য লোকোত্তর দয়া-গুণে শিষ্যকে নিষ্পাপ ও গুরুদায়-বিমুক্ত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত নিজাবাসে ফিরিলেন। আহা! লোকাতিশায়ী মহামহিম-দিগের কি গভীরতাপূর্ণ উদারতা! বাহিরে কঠোর ও ভিতরে কুসুম-কোমল।

এইরূপে পরোক্ষ গুরুশুশ্রূষা ও গুরুভক্তির অসামান্য মহিমাময় একলব্য গুরুর কৃপাতিশয় আকর্ষণ করিয়া নিষ্পাপ ও গুরুদায় বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল সুখ শান্তি সম্ভোগে পূর্ণাধি-কারী হইয়াছিল। এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারাই অস্ত্রপ্রয়োগ কৌশলে সর্ব্বোত্তম বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিল। উল্লিখিত উপাখ্যান পর্য্যালোচনা করিলে গুরু-শুশ্রূষার অলৌকিক মহিমাই প্রতীতিগোচর হয়।

এই গুরুশুশ্রূষায় যদি দম, যম ও নিয়ম সহযোগী হয় তবে মণিকাঞ্চন-যোগ সংঘটিত হয়। এই যোগ প্রভাবে মানবহৃদয় সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করে এবং জাগরূক হয়; ও তাহাতে অনন্তমুখী সরস্বতী-ধারা বহিতে থাকে। জীব জ্ঞান ও

বিজ্ঞানে পরাকাষ্ঠালাভ করে। ব্রহ্মানন্দে যেমন সর্ব্ববিধ আনন্দ তেমন এই বিদ্যায় সর্ব্ববিধ বিদ্যা অন্তর্নিহিত আছে। ইহারই বলে জীব প্রকৃতি পর্য্যন্ত বিজয় করে ও নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত ফলের অধিকারী হয়।

ঈদৃশবিদ্যার প্রসাদ লাভ করিতে সর্ব্বতোভাবে মনঃপ্রসাদ, তাদৃশ মনঃপ্রসাদে গুরু ও শাস্ত্রের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার বশবর্ত্তিতা এবং দম, যম, ও নিয়মের প্রতিপালন মুখ্য সামগ্রী।

যথেচ্ছচারিতা ঈদৃশ বিদ্যালাভের বিরোধিনী। বিদ্যার্থীর তেমন বিদ্যাধারণোপযোগী পাত্রতা-লাভ দ্বারা সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। যথেচ্ছাচারে তাহা হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন ঃ—

"ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং, যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা, দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥

বঙ্গার্থ—মৃণ্ময় আমপাত্রস্থ জল, যেমন পাত্রভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়, তেমন ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে একটি ইন্দ্রিয় স্খলিত হইলে সেই পথে প্রজ্ঞাশক্তি বাহির হইয়া যায়। সুতরাং গুরু এবং শাস্ত্রের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার বশবর্ত্তিতা ও শাস্ত্রোক্ত যুক্তিযুক্ত দম, যম, ও নিয়মের প্রতিপালন দ্বারা শরীর ইন্দ্রিয় এবং মন সুষ্ঠুরূপে যোগ্যতা লাভ করিলে স্নেহপরবশ গুরু অমৃতময়ী বিদ্যাধারা ঢালিয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ করেন।

দম ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, এবং অপরিগ্রহ বা অকল্কতা, এই পাঁচ প্রকার যম; স্বাধ্যায়,

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, ঈশ্বর-প্রণিধান, এই পাঁচ প্রকার নিয়ম; ইহাদের অবলম্বনে শরীর ও মন সত্ত্বময় হইয়া তাদৃশ বিদ্যা-গ্রহণে ও ধারণে সুষ্ঠুভাবে যোগ্যতা লাভ করে। বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে সপ্তমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্।
সেবেত যোগী নিষ্কামো, যোগ্যতাং স্বং মনোনয়ন্" ॥
স্বাধ্যায় শৌচ সন্তোষ তপাংসি নিয়তাত্মবান্।
কুর্ব্বীত ব্রহ্মণি তথা, পরস্মিন্ প্রবণং মনঃ।
এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

গুরুপরবশ, শাস্ত্রসেবী ও সদাচারপরায়ণ না হইলে উল্লিখিত দম যম নিয়মে পরিনিষ্ঠিত হইতে পারে না; সুতরাং তাদৃশ বিদ্যালাভে কৃতকৃতার্থও হইতে পারে না। এখানেই আর্য্যগৌরব দম, যম, নিয়মের প্রতিপালনে অনার্য্যজন সমর্থ হইতে পারে না; তত্তাবৎ সামগ্রী অন্যেতে নাই। এই অমিত-প্রভাব সামগ্রী প্রভাবেই আর্য্যেরা প্রকৃতির বিজয়ী হইয়া আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত করপ্রসারী গৌরবরবি সমুদিত করাইয়াছিলেন।

এবিষয়ে পুরাণাদি শাস্ত্রে বহুবিধ উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, বারান্তরে দুই একটি অদ্ভুত উপাখ্যান পাঠকের গোচর করাইবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীগুরুচরণ বিদ্যারত্ন—

আমি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সত্য আমি বা সত্যস্য সত্যম্ এর গূঢ় রহস্য "প্রজ্ঞানমানন্দং" ব্রহ্ম, "তত্ত্বমসি" অহং ব্রহ্মাস্মি "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ঋক্ সাম যজু ও অথর্ব্ব এই চারি বেদের উপরোক্ত চারি মহাবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সত্য আমিকে চিনিবার জন্যই বেদবিদ্যালয়ের প্রয়োজন। যিনি উহাকে চিনিয়াছেন তিনিই বেদ পড়িয়াছেন, আর যিনি উহাকে চিনিতে পারেন নাই তাহার বেদ পড়া হয় নাই।

জীব ও ব্রহ্মের একতাবাচক বাক্যকে মহাবাক্য কহে। জীব যখন আপন স্বরূপ জানিতে পারে তখনই তাঁহার কার্য্য শেষ হয়। তখন তাঁহার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হয় এবং সে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।

কি করিলে এই সত্য আমিকে পাওয়া যায় কে ইহার সন্ধান বলিয়া দিবে? মন যখন ইহাকে পাইবার জন্য একান্ত অস্থির হয়, তখন নানা উপায়ের মধ্যে যেটা যাহার উপযোগী তাঁহার সেইটাই জুটিয়া যায়। আমাদের ভিতরে যিনি সত্য-রূপে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার অস্তিত্ব ভিন্ন কিছুই থাকিতে পারে না। তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক হন্ এবং তিনিই উপযুক্ত গুরু মিলাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাহার কাছে লইয়া যান।

বেদ, ষড়্‌দর্শন, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহে নানাভাবে তাঁহাকে পাইবার উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নিম্নে ধৃত শিবস্তোত্র ইহারই সমর্থন করিলেন।

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণব মিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পত মিতি চ।
রুচিনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানাপথ জুষাম্,
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

"বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত শাস্ত্র, এইরূপ এইরূপ নানা-প্রকার পথ প্রচারিত আছে এবং ঐ সকল পথের পথিকেরা সকলেই মনে করে, আমরা যে পথে, সেই পথ ভাল। মনুষ্যের রুচি বিচিত্র, তদনুসারে পথও বিচিত্র। অর্থাৎ কেবল পথেরই বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। তাহা ঘটিলেও একমাত্র গম্য তুমি। অর্থাৎ যে, যে পথে যাউক, সকলেই তোমাতে যাইবে। সমুদায় মনুষ্যেরই গম্য তুমি। যেমন জলপ্রবাহ (নদী) সকল ঋজু ও কুটিল ভাবে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশ দিয়া গমন করিলেও সকল প্রবাহেরই গম্যস্থান সমুদ্র, সেইরূপ, সকলেরই গম্যস্থান তুমি।"

অতএব ইহার যে পথ পাওয়া যায় সেই পথেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

আমরা উল্লিখিত পথসমূহের যে কোন পথ ধরিয়া গিয়া সত্য-গামির সন্ধান করি না কেন তাহার প্রত্যেক পথে যাওয়ার জন্যই সাধন আবশ্যক।

"যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ॥ পাতঞ্জল ২৯ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই আটটী যোগের অঙ্গ স্বরূপ।

যদিও বর্ত্তমান সময় সকলের পক্ষে যোগ অভ্যাস সম্ভবপর নয় তথাপি ইহার আলোচনা করিয়া আমাদের কি লাভ হইতে পারে তাহা দেখা উচিত। যদি ইহাদ্বারা কাহার মন সত্য আমি কে চিনিবার জন্য ব্যাকুল হয় তবে তাহার উপযোগী উপায়ও ভগবানের কৃপায় উদ্ভাবিত হইবে।

"অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ পাতঞ্জল ৩০ ॥ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, (অচৌর্য্য) ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই গুলিকে যম বলে।

হিংসা করিও না। হিংসা মানবের মানবত্ব লোপ করে এবং তাহাকে ভগবান হইতে অনেক দূরে লইয়া যায় ; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন হিংসা করিব না কেন ? তবে আমরা তাহাকে ইহার কি সদুত্তর দিতে পারি, অন্যকে হিংসা করিলে আমার কি অনিষ্ট হয় এবং কেনই বা আমি হিংসা করিলে ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যাইব, হিংসাবৃত্তি মানবমনে কোথা হইতে আসিল। কে ইহার জনক ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রকৃত আমিকে খোজ করিতে হইবে। এবং সেই আমি কতদূর বিস্তৃত, আমি ছাড়া জগতে কোন কিছু আছে কিনা, না আমিই সমস্ত জগত্ ব্যাপিয়া আছি তাহাই দেখিতে হইবে।

যদি আমি ভিন্ন জগতে কোন কিছু না থাকে, যদি আমিই সমস্ত জগতময় হই, তবে হিংসা করিব কাহাকে? আমিত আর আমাকে হিংসা করিতে পারি না।

কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করে, কে আপন মস্তকে কষাঘাত করিয়া সুখী হয়? আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে সত্য আমি ও ভগবানে কোন পার্থক্য নাই। ভগবান সর্ব্বব্যাপী সুতরাং প্রকৃত আমিও সর্ব্বব্যাপী। ভগবান সমস্ত জগত্ ব্যাপিয়া আছেন অথচ আত্মমায়ায় বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্", গীতা ১৩.১৬ বহু-তপস্যার পর শাক্য সিংহ যখন যজ্ঞের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, সত্য আমি বা সত্যস্থ সত্যম্‌কে দেখিয়াছিলেন তখনই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। আমরা লোকমুখে শুনিয়া এবং পুস্তকে পড়িয়া বলিয়া থাকি হিংসা করা উচিত নয় কিন্তু কেন হিংসা করা উচিত নয় সেই তত্ত্ব কয়জন বুঝিতে পারেন, কয়জনের মন হিংসার উৎপত্তি স্থানের সন্ধান করে। বুদ্ধদেব 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এই সত্য প্রচার করিতে বহির্গত হইয়া কোটি কোটি নরনারীকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, আর আমরা সেই সত্য এক জনকে বলিয়াও তাহার মন পরিবর্ত্ত করিতে পারি না ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, আমাদের এইটী মুখের কথা প্রাণের অনুভূতি নহে চোখে দেখা সত্য নহে। আর একটু

তলিয়ে দেখিলে আরও ভাল বোঝা যায়। যদি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা যায় ভাল হিংসা না করিবার জন্য পরকে উপদেশ দিতেছ তোমার নিজের হিংসা প্রবৃত্তি লোপ হইয়াছে ? তুমি কাহাকেও কি হিংসা করনা ? তখনি মন উত্তর দিবে হিংসা বৃত্তির লোপ হওয়া দূরের কথা পূর্ণমাত্রায় মনের ভিতরে হিংসা-বৃত্তি রহিয়াছে। কেহ কেহ এমন আত্মপ্রবঞ্চক যে পূর্ণমাত্রার মনের ভিতর হিংসাবৃত্তি রাখিয়া বাহিরে কাহাকেও হিংসা করেন না বলিয়া মনে করেন যে তাহার বুঝি হিংসা বৃত্তি লোপ হইয়াছে ; যাহারা প্রকৃত আত্মদর্শী নন তাহারা শিষ্ট শান্ত ও সৎকর্ম্মান্বিত হইলে ঐরূপ মনে করিতে পারেন বটে, কিন্তু উহার ভিতর অজ্ঞান রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন তাহার am I am Inspired prophet শীর্ষক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন may I can even commit man slaughter, I can commit adultery ইহাতে কি এই বুঝিতে হইবে যে তিনি নরহত্যাকারী অথবা ব্যভিচারী ছিলেন ! কখনই নয়, এই সকল পাপের বীজ যে তাহার ভিতরে ছিল তিনি তাহা স্পষ্টরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। শুকদেব ভগবানের স্তোত্রে বলিয়াছেন, "মোহিতো মোহজালেন পুত্রদারধনাদিষু। বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণাতৎ কৃতং ময়া ইত্যাদি। ইহাতে কি এই বুঝিতে হইবে যে শুকদেবের পুত্র, স্ত্রী, ও ধন ছিল এবং তিনি কথা বলিয়া এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিতেন না ? শুকদেব মহাজ্ঞানী, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত এবং বর্ত্তমান জন্মগ্রহণের

কারণ ইত্যাদি যে বীজ হইতে উৎপন্ন তিনি তাহাও দেখিতে পাইতেন বলিয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন, কোন জমি যখন খুব ভালরূপে চাষ দেওয়া হয় এবং উাহার ঘাস রীতিমত সতর্কতার সহিত পরিষ্কার করা যায় তখন সাধারণ লোক মনে করেন যে উহাতে ঘাস আর নাই, তারপর কোন ফসল দেওয়া হয় এবং যত-দিন ঐ ফসল জমিতে থাকে ততদিন আর ঘাস দেখা যায় না কিন্তু যেমন এই ফসল উঠাইয়া লইয়া জমি অমনি রাখিয়া দেওয়া যায় তখনই দেখা যায় উহার নানাস্থানে ঘাস গজাইয়াছে ; এই ঘাস কোথা হইতে আসিল নিশ্চয়ই ঘাসের বীজ বা মূল জমির ভিতরে ছিল, সময় পাইয়া গজাইয়াছে ; ঠিক সেইরূপ প্রত্যেক পাপের বীজ আমাদের মানস জমিতে বহুদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, সৎকার্য্যরূপ ফসল যতদিন মানস জমি অধিকার করিয়া থাকে ততদিন পাপের বীজ গজাইতে পারে না ; যেই ঐ ফসল উঠিয়া গেল অমনি পাপের বীজ গজাইতে থাকে, তবে মনের ও জমির এমন একটা অবস্থা আছে, যে অবস্থায় ঐ বীজ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় তখন আর কিছুতেই পাপ বীজ গজাইতে পারে না। সকলেই জানেন ভর্জিত ফলের অঙ্কুর হয় না। তীব্র সাধনার আগুনে পাপের বীজ ভাজিয়া ফেলিতে পারিলে মানুষ নিরাপদ্ হয়। তখন আর তার পতনের ভয় থাকে না।

হিংসা করা উচিত নয়। হিংসা ত্যাগ করিতে হইবে এবং অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ এইটী জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে ; কেমন করিয়া করিব। আমি জীবন পথে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম

হিংসা ভিন্ন আমার একদিনও চলেনা। খাওয়াতে হিংসা, বসাতে হিংসা, শোয়াতে হিংসা করিতেছি। মাংস খাইতেছি, শাক শবজি নানাবিধ দ্রব্য আহার করিতেছি। শয়ন করিতে গেলে মশক দংশন করে, আমি এক চাপড়ে তাহার প্রাণান্ত করি। চলিয়া যাইতে শত শত কীট পোকা পায়ের নীচে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এখন উপায় কি? তবে কি আমি সংসারে আসিবনা, তবে কি আমি অনাহারে প্রাণ হারাইব এবং এই জন্যই আমি পৃথিবীতে জন্মিয়াছি। না তাহাও নহে। কোন কার্য্য করিতে হইলে আগে তাহাতে বিশেষ রূপে মনোনিবেশ করিতে হইবে। এবং ইহার উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় বিষয় গুলি বাছিয়া লইতে হইবে। যে গুলি আমাদের কোন দরকারে লাগেনা আগে সেই গুলি বর্জ্জন করিয়া অহিংসার অভ্যাস জন্মাইতে হইবে। পরে যে গুলিকে অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া প্রথমে মনে করিতেছিলাম মানসিক বল সঞ্চিত হইলে তাহাও আর আবশ্যকীয় না থাকিয়া অতি সহজে ত্যাগ করিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।

আমরা বিনা প্রয়োজনে যে সমস্ত হিংসার কার্য্য করি সর্ব্বাগ্রে তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে।

বিবিধবিধি-সহস্রাণি।

১। গৃহস্থ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কেশাদি পরিষ্কার করিয়া, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের বিরোধী নহে এরূপ জীবনোপায় চিন্তা করিবে।

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় পুরুষার্থাবিরোধিনীম্।
বৃত্তিং সঞ্চিন্তয়েদ্বিপ্রঃ কৃতকেশপ্রসাধনঃ॥ (বৃ, না, পুঃ)

২। শৌচ বিষয়ে সদা যত্ন রাখা কর্ত্তব্য, শৌচই সকলের মূল, শৌচাচারবিহীনের সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়।

শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যঃ শৌচমূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তং কর্ম্ম নিষ্ফলম্॥ (বৃ, না, পুঃ)

৩। শৌচ দুই প্রকার বাহ্য ও আন্তর, মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্যশুদ্ধি এবং মনোভাব শুদ্ধি হইলে আভ্যন্তর শৌচ সম্পন্ন হয়।

"শৌচং তদ্দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং বহিঃ শুদ্ধির্ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥(বৃ, না, পুঃ)

৪। শৌচ প্রধানত দ্বিবিধ হইলেও পঞ্চপ্রকারে মন এবং দেহ শুদ্ধ হয়, সত্য, মনঃশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, এবং জল এই পঞ্চ প্রকার শৌচই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

"সত্যং শৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া শৌচং জলশৌচঞ্চ পঞ্চমম্॥ (গঃ পুঃ)

৫। যে মানব সত্যপরায়ণ ও শুচি তাহার স্বর্গ দুর্লভ হয় না। যে মনুষ্য সত্য বচন বলে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞকারী হইতে শ্রেষ্ঠ।

যস্য সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ তস্য স্বর্গঃ ন দুর্লভঃ।
সত্যং হি বচনং যস্য সোঽশ্বমেধাদ্বিশিষ্যতে॥

(গ, পুঃ)

৬। যে ব্যক্তি দুরাচার এবং যাহার চিত্ত ভাব ও দুঃশীলতা দ্বারা দূষিত হইয়াছে সে সহস্র মৃত্তিকা ও শত প্রকার জলদ্বারাও শুচি হইতে পারে না।

"মৃত্তিকানাং সহস্রেণ উদকানাং শতেন চ।
ন শুধ্যতি দুরাচারো ভাবোপহতচেতনঃ॥ (গ, পুঃ)

৭। যাহার হস্ত, পদ, মনঃ সুসংযত এবং বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল ভোগ করে।

"যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতং।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ সতীর্থফলমশ্নুতে॥ (গ, পুঃ)

৮। যে মানব সম্মানে হৃষ্ট হয় না, অপমানে কোপ করে না, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশ বাক্য বলে না, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সাধু।

"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণম্॥ (গ, পুঃ)

৯। দরিদ্র ব্যক্তি যদি প্রাজ্ঞ কিংবা মধুরভাষীও হয়, তথাপি তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ প্রীতিলাভ করে না।

"দরিদ্রস্য মনুষ্যস্য প্রাজ্ঞস্য মধুরস্য চ।
কালে শ্রুত্বা হিতং বাক্যং ন কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে॥
(গ, পুঃ)

১০। কোন ব্যক্তি মন্ত্রবলে বীর্য্য ও প্রজ্ঞাদ্বারা অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না, যাহার যে বস্তু লাভের অদৃষ্ট নাই, তাহার সে বস্তু লাভ না হইলেও মনস্তাপ করিবে না।

"ন মন্ত্রবলবীর্য্যেণ প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ চ।
অলভ্যং লভতে মর্ত্ত্যা স্তত্র কা পরিবেদনা॥ (গ, পুঃ)

১১। যাহার কাল পূর্ণ হয় নাই, সে ব্যক্তিকে শত শরে বিদ্ধ করিলেও মরে না, কিন্তু যাহার কাল পূর্ণ হইয়াছে সে কুশাস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও প্রাণত্যাগ করে।

"নাকালে ম্রিয়তে জন্তুর্ব্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণ তু সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

১২। যে দ্রব্য পাওয়ার যোগ্য, লোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে, যে স্থান গন্তব্য মনুষ্য সে স্থানেই গমন করে, আর যে সকল সুখ দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবিত লোকে তাহাই পাইয়া থাকে। মনুষ্য আপন প্রাপ্য বস্তুই পাইয়া থাকে, তাহাতে প্রার্থনা বা চেষ্টা কি কবিতে পারে?

"লব্ধব্যান্যেব লভতে গন্তব্যান্যেব গচ্ছতি।
প্রাপ্তব্যান্যেব প্রাপ্নোন্তি দুঃখানি চ সুখানি চ।
ততঃ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কিং প্রলাপঃ করিষ্যতি॥
(গ, পুঃ)

১৩। শীল, কুল, বিদ্যা, জ্ঞান ও গুণ ইহারা কিছুই করিতে পারে না, কেবল মাত্র ভাগ্যই পুরুষের ফল প্রদান করে। যেমন বৃক্ষ সর্ব্ব সাধারণকেই পুষ্প ও ফল প্রদান করে, সেইরূপ ভাগ্য শীলাদি অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব তপস্যানুসারে ফলদান করে।

শীলং কুলং নৈব ন চৈব বিদ্যা
জ্ঞানং গুণা নৈব ন বীজশুদ্ধিঃ।
ভাগ্যানি পূর্ব্বং তপসার্জ্জিতানি
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥ (গ, পুঃ)

১৪। নীচপ্রকৃতি ব্যক্তিরা পরের সর্ষপ মাত্র ছিদ্র দেখিলেও তাহা অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু নিজের বিল্বপ্রমাণ ছিদ্র থাকিলেও তাহা দেখিয়াও দেখে না।

"নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥ (গ, পুঃ)

১৫। যাহারা রাগদ্বেষাদি দ্বারা অভিভূত, কুত্রাপি তাহাদের সুখ হয় না, যাহার অন্তঃকরণ শান্তিগুণে ভূষিত তাহারই প্রকৃত সুখভোগ হইয়া থাকে।

"রাগদ্বেষাদিযুক্তানাং ন সুখং কুত্রচিদ্দ্বিজ।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নির্বৃতিঃ॥ (গ, পুঃ)

১৬। যাহার সমধিক স্নেহ আছে, তাহারই সর্ব্বদা ভয় হইয়া থাকে, যেহেতু স্নেহই দুঃখের ভাজন, স্নেহই দুঃখের মূল কারণ।

"যত্র স্নেহো ভয়ং তত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনম্।
স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎ সুখম্॥ (গ, পুঃ)

১৭। পরের বশে থাকিয়া যাহা কিছু ভোগ করা যায়, তৎ সমস্তই দুঃখ এবং স্বাধীন ভাবে থাকিয়া দুঃখ পাইলেও সুখ বলিয়া বোধ হয়। সামান্যত ইহাই প্রকৃত সুখ-দুঃখের লক্ষণ।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

(গ, পুঃ)

১৮। সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ উপস্থিত হয়, সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করে।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
সুখং দুঃখং মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥

(গ, পুঃ)

১৯। যে মানব অতীত বিষয়কে অতিক্রান্ত বলিয়া মনে করে, ভবিষ্যদ্বিষয়ও অনেক দূরে আছে জ্ঞান করে, আর বর্ত্তমান বিষয়েও অনুরক্ত হয় না, সে কোনও প্রকার শোকে অভিভূত হয় না।

"যদ্‌গতং তদতিক্রান্তং যদি স্যাৎ তত্তু দূরতঃ।
বর্ত্তমানে ন বর্ত্তেত ন স শোকেন বাধ্যতে॥

(গ, পুঃ)

২০। কেহ কাহারও মিত্র বা শত্রু নহে, কেবল আচরণ দ্বারাই শত্রু ও মিত্র জানা যায়।

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
কারণাদেব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥ (গ, পুঃ)

২১। বন্ধু ব্যক্তি শোক হইতে পরিত্রাণ করেন, ভয় হইতে রক্ষা করেন এবং প্রীতি ও বিশ্বাসের ভাজন: এই অপূর্ব্ব মিত্র রত্নটী কোন্ ব্যক্তি সৃজন করিয়াছেন ?

"শোকত্রাণং ভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্বাসভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ (গ, পুঃ)

২২। স্বভাবজাত মিত্রে যে প্রকার বিশ্বাস স্থাপন হয়, মাতা, স্ত্রী, সহোদর বা পুত্রেও সেরূপ হয় না।

ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্মিত্রে স্বভাবজে॥ (গ,পুঃ)

২৩। যদি মিত্রের সহিত স্থায়ী প্রণয়দর্শন রাখিতে চাও তবে এই তিনটী দোষ পরিত্যাগ করিবে। মিত্রের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিবেনা ; টাকাদি আদান প্রদান (কুসীদ ব্যবহার) এবং পরোক্ষে মিত্রপত্নী দর্শন করিবেনা।

যদীচ্ছেদ্ শাস্বতীং প্রীতিং ত্রীণি দোষাণি বর্জ্জয়েৎ।
দ্যূতকর্ম্ম প্রয়োগঞ্চ পরোক্ষে দারদর্শনম্॥ (গ, পুঃ)

২৪। বায়ু ও বহ্নির গতি, তুরঙ্গের বেগ, কিংবা মহাসাগরের গভীরতাও নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু শত্রু ব্যক্তির চিত্ত কিছুতেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

অপি বহ্ন্যনিলস্যৈব তুরগস্য মহোদধেঃ।
শক্যতে প্রসরো রোদ্ধুং নানুরক্তস্য চেতসঃ॥ (গ,পুঃ)

২৫। অগ্নি, জল, স্ত্রী, মূর্খ, সর্প ও রাজকুল এই সকল পরোপভোগ্য হইলেও যদি কেহ সেবা করে (ভোগ করে) তবে তাহার প্রাণ নষ্ট হয়।

অগ্নি রাপঃ স্ত্রিয়ো মূর্খঃ সর্পাঃ রাজকুলানি চ।
নিত্যং পরোপসেব্যানি সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥ (গ, পুঃ)

২৬। যে মনুষ্য বালকদিগকে মধুর বচনে, শিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিনয় ব্যবহারে, নারীদিগকে ধনদ্বারা, দেবগণকে তপস্যা দ্বারা এবং সাধারণ লোকদিগকে সদ্ব্যবহার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারেন তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

"স পণ্ডিতো যো হ্যনুরঞ্জয়েদ্বৈ
সান্ত্বেন বালান্ বিনয়েন শিষ্টম্।
অর্থেন নারীং তপসা হি দেবান্
সর্ব্বাংশ্চ লোকাংশ্চ সুসংগ্রহেণ॥ (গ, পুঃ)

ক্রমশঃ

শ্রীসঃ—

আহ্বান।

এস আর্য্যগণ, করে প্রাণপণ
কর পুনর্ব্বার বেদমন্ত্র সার,
ছিল আর্য্যালয়, পূর্ণ শান্তিময়,
পুণ্যাশ্রম বলে ছিল নাম যার।

(২)

পুণ্য জ্যোতির্ম্ময়, মহর্ষিনিচয়,
করিত যথায় বেদ অধ্যয়ন,
স্বর্গ পরিহরি দেবতা শ্রীহরি
করিলা তেথায় জনম গ্রহণ।

(৩)

বেদমন্ত্র বলে, প্রেমানন্দে গলে,
করিত সকলে নাম সঙ্কীর্ত্তন,
ভুলে হিংসা দ্বেষ, ভুলে বাহ্য বেশ,
ভুলে আত্মপর করিত সাধন।

(৪)

মন্ত্র ছিল বেদ ছিলনা প্রভেদ
ছিল সবাকার বিশ্বপ্রেম সার,
কুরঙ্গ মাতঙ্গ, মণ্ডূক ভুজঙ্গ,
মূষিক মার্জ্জার করিত বিহার।

(৫)

যে অবধি হায়, ভোগ বাসনায়,
বিজাতীয় ভাবে মজেছে ভারত,
সেদিন হইতে, ঘোর অশান্তিতে,
আর্য্যের গৌরব হইয়াছে গত।

(৬)

বলি বার বার, কর বেদ সার,
চল ধর্ম্ম পথে পূর্ব্বের মতন,
হও যোগ-রত, বেদ-অনুগত,
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করহ গ্রহণ।

(৭)

দেখিবে আবার, শান্তির আধার,
প্রেম-পারাবার, উঠিবে উথলি,
ভুল হিংসা পাপ, যাবে শোক তাপ,
মাত হে সকলে প্রেমানন্দে গলি।

(৮)

এস হরষিতে, হাসিতে হাসিতে,
বিভু-গুণগানে ঢাল মন প্রাণ,
তাঁহারি চরণ করহ স্মরণ
উপেক্ষা করোনা দীনের "আহ্বান"।

শ্রীজানকীনাথ দত্ত

কামাখ্যা।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর কোণে আসামের গৌহাটী জেলায় মহাদেবী কামাখ্যার পীঠস্থান, ইহা অতি পবিত্র পুণ্য ক্ষেত্র। পাণ্ডাগণ যাত্রীদের সহিত পীড়াপীড়ি করেন না, অধিকন্তু আহার দেন। এখানে নাকি কখনও চুরি হয় নাই, হিন্দু ছাড়া অন্য

জাতি নাই। মিঠাইর দোকানে ময়দাদির শক্‌রা পুরি ইত্যাদি নাই ; নারিকেলাদির কাঁচা সন্দেশই থাকে। আমরা আশ্বিন মাসে ৺ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় তথায় গিয়াছিলাম, তাহা আজ ২।৩ বৎসর হইবে। ময়মনসিংহের উত্তর পশ্চিম দিকে (রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় জগন্নাথ ষ্টেশনে আমরা অবতরণ করি। ওখানে কোনও ষ্টেশন ঘর বা বিশ্রামাগার নাই, কল-হীন একটা জাহাজে যাত্রিগণকে আসিতে হয়। আমরা ঘাটে ফল জল খাওয়ার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছি, সঙ্গীয় লোক চর্ব্বী-বাতিটা রাখিবার স্থান পাইতেছে না অমনি একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক বাতিটা ধরিলেন, লোকটী বাজারে চলিয়া গেল, আমাদের জলযোগ হইল, তিনি প্রায় আধঘণ্টা বাতি ধরিয়া রহিলেন। শেষে জানিলাম তিনি একজন ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্। তাঁহার পায় জুতা বা গায় কুর্ত্তা ছিল না, তিনিও সন্ধ্যাদির জন্যই বোধ হয় নামিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষণ যেন দেবতার ন্যায় দয়াময়। এত দয়া আছে বলিয়াই ভগবান্ তাঁহাকে বড় করিয়াছেন।

ঐ জাহাজে থাকার বড়ই অসুবিধা, এই সময় আমরা একটী রূপগুণশালিনী মহিলা পাইলাম। তিনি সাহেবদের সঙ্গে ফুস্ ফুস্ ইংরেজী বলিতেছেন, ইংরেজী কাগজ পড়িতেছেন, নাকে চস্‌মা, কর্ণে কর্ণফুল, হাতে চুড়ি, পরণে ঘাগরী—তিনি নাকি বিএ, তিনি আমাদের জন্য একটী কাম্‌রা দিতে বলিবা মাত্রই আমরা একটী কাম্‌রা পাইলাম। সে রাত্রিতে জাহাজ

আসে নাই, পরদিন আমরা একটী নৌকা ভাড়া করিয়া মধ্যাহ্নে আহার করিলাম। রাত্রি দশ ঘটিকায় আরোহী-জাহাজ আসিলে আমরা তাহাতে আরোহণ করিলাম। জাহাজ চলিল। জগন্নাথগঞ্জ নদীতে প্রবল স্রোত, যে নৌকা সেখান হইতে প্রাতে ছাড়িয়াছে তাহাও দুই তিন মাইল দূরে গিয়া পাইলাম; এখানে দাঁড়, লগি বা বৈঠা দিয়া নৌকা চালাইয়া উজান নিতে পারে না। তিন চারিটী দড়ি লাগাইয়া খুঁটা পুতিয়া দুই তিন জনে টানিয়া এক একবার কয়েক হাত উজাইয়া আবার খুঁটা পুতিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। ক্রমে উজান দিকে বেগ অত্যন্ত অধিক, এমন কি শেষে জাহাজও সাধারণ নৌকার ন্যায় চলিতে থাকে। প্রাতে দেখিলাম এক অপূর্ব্ব নূতন সংসার, ডান দিকে মাথার উপরে যেন বিশাল পর্ব্বতমালা ঝুলিয়া রহিয়াছে, আর বামদিকে কূলকিনার শূন্য বিস্তৃত জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে। কোনও গ্রাম নাই—লোকজন নাই—কেবল জলই জল। তাহাতে ঢেউ নাই—জলরাশি সাম্‌নে পড়িয়া আছে, এত স্রোত যে বাতাসেও ঢেউ তুলিতে পারিতেছে না। জাহাজ দ্রুতবেগে ছুটিতেছে, কিন্তু ষ্টেশন বড় মিলিতেছে না, যে দুই একটি ষ্টেশনে জাহাজ বিশ্রাম করে তাহাতেও লোক জনের যাতায়াত নাই। ষ্টেশন ঘর নাই, আছে কেবল এক এক খানি কলহীন জাহাজ তাহাও বালুচরের মধ্যে। ষ্টেশন গুলির নামও তদ্রূপ নদীচরজাতীয় অর্থাৎ "রুইমারা," চিলমারা" 'খাইট্যা মারা, ইত্যাদি। যাহা হউক বেলা ১২ ঘটিকায় একটা

বড় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, সেটা বোধ হয় ধুব্‌ড়ী। সেখানে আমাদের ঠাকুর দুদু (পিতামহী) স্নান সন্ধ্যা করিলেন, আমরা বালিকাগণ তীরে গিয়া জলযোগ করিলাম—জাহাজ আমাদের জন্যও একটু অপেক্ষা করিয়াছিল। আমরা জাহাজে ফল মূলাদিও আহার করি না, তবে দুই বৎসরের একটি শিশুকে নারিকেলের জল দেওয়া যাইত। আমাদের পিতৃদেবতা বড় নিয়মাধীন, তিনি মাসাধিক কালও ফলমূলাহারে কাটাইয়া দেন। তাহাতে যেন কিছুই ভ্রুক্ষেপ নাই, কাজেই শৈশব হইতে আমাদেরও অভ্যাস হইয়া আছে। তিন দিবস বেশ নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেল। আমরা এক্ষণে নদীর পাড়ে পার্ব্বতীয় স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম, নদীর প্রশস্ততা ক্রমেই অল্প হইতেছে। আমরা পার্ব্বতীয় লোকদের সন্তরণও দেখিলাম, তাহারা এই প্রবল প্রবাহেও ভাসিয়া যায়, এক ঘাট হইতে অন্য ঘাটে যায়। উহাদের চেহারা বড় আমোদজনক, সকলেই বড় প্রফুল্ল, মেয়েদের নাক পুরুষদের অপেক্ষা লম্বা, সকলের নাকেরই উচ্চতা বড় কম, পুরুষ হইতে মেয়েরা দীর্ঘাকার, আমাদের দেশের পুরুষেরা অধিক লম্বা, তাহাদের মেয়েরা লম্বা, মেয়েদের হাতে দা, কুড়াল, মাথায় বোঝা, পৃষ্ঠে শিশু, কর্ণে বলয় রাশি, হাতে চুড়ি, বক্ষে উড়নী, কোমরে ছালা। প্রত্যেকেরই দুই খানা ছোট কাপড়ে শরীর ঢাকা থাকে। ইহাদের চুল বড় লম্বা এবং কাল, বর্ণ গৌর, কালমেয়ে একটীও দেখি নাই। ক্রমে উভয় দিকে মণ্ডিতমুণ্ড করিমস্তকের ন্যায় পর্ব্বতশিখর দৃষ্টিগোচর

হইতে লাগিল, সে বড় অপূর্ব্ব দৃশ্য, চারিদিকে প্রস্ফুটিত রক্ত-বর্ণ পুষ্প যুক্ত বৃক্ষরাজি, মধ্যে মধ্যে ধূসরবর্ণ তৃণলতা বিহীন পর্ব্বতশিখর; উচ্চতর শিখরে তৃণলতাও নাই, তবে ধূমের মত কি যেন সর্ব্বদাই উঠিতেছে দেখা যায়। ধূম সম্বন্ধেও কি এক প্রবাদ ছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। জগন্নাথগঞ্জ হইতে তৃতীয় দিবসে ৮ ঘটিকার সময় গৌহাটী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে নৌকায় ভাটাল দিকে তীরবেগে দুই তিন মাইল দূরে উমানন্দ শিবের আশ্রমে গেলাম। এই পাহাড় নদীর মধ্যে, চারিদিকে জল মধ্যে শিবমন্দির, একটুকু স্থান, কিন্তু পাথরময়, যেন যুগযুগান্তরের কাল কাল পাথর; জলে ক্ষয় হয় না, লোহার সাবল দ্বারাও ভগ্ন করা দুষ্কর। আমরা শিবালয়ে প্রস্তরময় প্রবাহ জলে ডুবিয়া স্নান করিয়া বড় শীতল হইলাম। সমস্ত শ্রান্তি কাটিয়া গেল; শরীর যেন পবিত্র হইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল, আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হইল। আমরা জলে পর্ব্বতশিখরে একটু পা পিছলিলেই ঝরণার ন্যায় বিষম স্রোতে ভাসিয়া অতলে চলিয়া যাইতাম, কিন্তু মহাদেবের আশীর্ব্বাদে আমরা ভাসিয়া যাই নাই, প্রাণ ভরিয়া স্নান আরাধনা করিলাম। উমানন্দ শিবের প্রণামটী মনে নাই। শিবকে দর্শন করিয়া নৌকায় উঠিয়া আবার তীরবেগে ভাটালদিকে ছুটিলাম। ক্রমে ৺কামাখ্যাদেবীর পর্ব্বতে রাজা হরিশ্চন্দ্র কৃত রাস্তার ঘাটে পৌঁছিলাম। এই ঘাট হইতে ৺কামাখ্যাপীঠ প্রায় আড়াই মাইল দূর হইবে। পাহাড়ের গা বাহিয়া কখন ঊর্দ্ধে কখন সমভাবে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া মার মন্দির পর্য্যন্ত এই রাস্তা গিয়াছে। রাস্তার প্রস্ত ৪।৫ হাত দুই দিকেই অত্যুচ্চ বৃক্ষরাজী; সর্ব্বদাই ছায়া থাকে, কিন্তু বড় গরম লাগে, বাতাস রাস্তায় যাইতে পারে না! তাই বড় উত্তাপ বোধ হয়। আমরা মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই এক অভূতপূর্ব্ব ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলাম। পূজায় ব্রাহ্মণগণ যেরূপ ঘণ্টা বাদ্য করেন, ইহাও ঠিক সেইরূপ, বিশেষতঃ ইহাতে অনিয়মিত রূপে তাল ভগ্ন হয় না। ৺মার বাড়ীতে গিয়া আরও যেন উচ্চরব শুনা যাইতে লাগিল। সেই অপূর্ব্ব প্রকৃতিজাত স্বর্গীয় ধ্বনি বহুদিন কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইত, এখনও যেন বাজিতেছে। আবার কবে এ অপূর্ব্ব দেবধ্বনি শুনিব? হায়! সে দিন কি আর হইবে।’ আমরা দেবীমন্দির দর্শন মাত্র, তিন দিনের উপবাস ও পর্ব্বতারোহণ জন্য পথশ্রমাদি মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেলাম। বিশেষতঃ পিতামহী দেবী যেন ষোড়শীর ন্যায় বলবতী হইয়া উঠিলেন। আমরা—মেয়েরা সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, মন্দিরে বড় অন্ধকার, দিবাতেই প্রথম কোঠায় ৭।৮ টী বাতি থাকে। প্রথমেই দ্বাদশভুজা দুর্গামূর্ত্তি ইহারই পূজা, দশভুজা-দুর্গাপূজা। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ একটু ফরসা ঐ স্থানে “দেবীপীঠ,” পীঠস্থান রক্তবর্ণ পাষাণের মধ্যে অল্পস্থানে জল, ঐ জলে হস্ত-দিয়া প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম দুইটী এই—

“নীলাচলগুহামধ্যে রক্তপাষাণ রূপিণী।
যস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥”

"কামাখ্যা বরদা দেবী নীলপর্ব্বতবাসিনী।
ত্বং হি দেবী জগন্মাতা যোনিমুদ্রা নমোহস্তুতে॥"

আমরা দেবী দর্শন করিয়া পূজা দিয়া বাসায় ফিরিলাম। তখন পিতামহী দেবী আমাদের একজনকে বলিলেন, "মালতি! তোরা খাবি না" আমরা বলিলাম "আমাদের খাওন মনেই নাই। বাস্তবিক মনে করিলেই ঠেকা, তিনি মনে করা মাত্রই যেন আহারের কথা মনে হইল, নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিলাম। পরে পাণ্ডার বাড়ীতে পরম তৃপ্তিতে আহার করিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। ৺কামাখ্যা-মন্দিরের সংলগ্ন পাহাড়ের মধ্যে এক কুণ্ড আছে, তাহার নাম সৌভাগ্যকুণ্ড, তীর্থযাত্রীদের এই কুণ্ডে স্নানাদি করিতে হয়। কুণ্ডের জল পরিষ্কার নয়, তবে বালি বা কাদা নাই, প্রস্তরময় পুষ্করিণী। জলের ভিতর গোল গোল উচু নীচু বহু পাথর পড়িয়া আছে। অনেক কচ্ছপও আছে, ইহারা লোকের নিকট নির্ভয়ে আসে এবং খাদ্যাদি দিলে তাহা আহার করে। ৺কামাখ্যা দেবীর বাড়ীর দক্ষিণে খুব নিম্নে ত্রিপুরা-সুন্দরী-দেবী মন্দির, এই মন্দির ও পীঠ বহুকালের। এই পীঠের সন্নিহিত কুণ্ডের নাম ভৈরবকুণ্ড, এই কুণ্ডে জল বেশী এবং বৃহৎ, প্রায় একটী পুষ্করিণীর মত। এই কুণ্ডে অত্যন্ত কচ্ছপ। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মশালার নিকটবর্ত্তী দুর্গাকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে, সেইটীতে এত পুরাতন প্রস্তর নাই, তাহাতে কাদাও আছে। উহার তলভাগে দুর্গার পদচিহ্ন আছে প্রবাদ। পাহাড়কে প্রণাম করিয়া আরোহণ করিতে হয়। পাণ্ডারা তাহার প্রণাম বলেন।

পাণ্ডারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মত আচারবান্, কিন্তু তাঁহাদের বিধবাদের হাতেও চুড়ি দেখিলাম।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন এক সূর্য্যোদয় হইতে অন্য সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বলি হয়, এক মুহূর্ত্তও বিরাম নাই—দিবা রাত্রি সমান। বলির খড়েগর নাম অসি, ইহা বড় ধারাল, অথচ খড়েগর ন্যায় লম্বা নহে। আমাদের দেশের মত মহিষ বলি দিতে তাহাদের এত উৎপাত ভোগ করিতে হয় না। পাঁঠার ন্যায়ই মহিষ কাটা পড়িতে থাকে। পাহাড়ের লোকেরাই দলে দলে ছাগ, মেষ, হরিণ, মহিষাদি আনিয়া মাকে দান করিয়া থাকে। অনেকগুলি হরিণও বলি হইল। এখানে এক আশ্চর্য্য এই যে, পাহাড়ের গায় সর্পের গতির ন্যায় পাহাড়কে ভেদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া অতি সূক্ষ্মবেগে কখন নিম্নে কখন উর্দ্ধে জলপ্রবাহ চলিতেছে। তাহারই এক এক স্থানে একটু পাথর যুক্ত দেখা যায়, কিন্তু গতির বিরাম নাই। যুক্ত স্থান একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশেষ, ঐস্থান হইতে যত ইচ্ছা জল সংগ্রহ করিতে পার, জল কমিবে না, কিন্তু সংগ্রহ করিতে বড় বিলম্ব হয়, কারণ ঐ সব যুক্তস্থানে ৫।৬ অঙ্গুলীমাত্র জলের গভীরতা। অত অল্প জল হইলেও জলে আবিলতা, ময়লা বা কোন প্রকার দুর্গন্ধ নাই. অতি বিশুদ্ধ স্বচ্ছ ও সুশীতল বটে।

৺ কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে ভুবনেশ্বরী দেবীর পীঠস্থান বহু উর্দ্ধে তিন মাইল দূরে হইবে। এই ৺ কামাখ্যা পর্ব্বতে এই স্থানের ন্যায় এত উচ্চ স্থান আর নাই, এখানেও পীঠ আছে

তাহাতে জল আছে। স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। এখানে একটী সাধক সন্ন্যাসী আছেন, তিনিই ঐ দেবীর পরিচালক। কলিকাতার দুই একটী হিন্দু জজ তাঁহার ভক্ত শিষ্য। তিনি শ্বাসযোগে ধ্যান করিয়া যাহাকে যাহা বলেন তাহা শীঘ্রই পূর্ণ হয়, তিনি বড়ই অলৌকিক বাক্য বলিয়া থাকেন। ইহাঁরই নাম 'অভয়ানন্দ স্বামী'। এই ভুবনেশ্বরীর বাড়ীর পর্ব্বতশিখর বড় পরিষ্কার, অগ্রভাগে উঠিলে নদীকে একটী শ্বেত উত্তরীয়ের মত অল্পপরিসর বোধ হয়, (তাহা ভ্রম নয় ঠিক এইরূপই দেখায়) বড় বড় বৃক্ষাদি যেন ছোট ছোট বেগুনচারা জ্ঞান হয়। জাহাজগুলি কোষাকোষীর মত দেখায়, রেলগুলি যেন ছোট কেড়ার (এক মত অঙ্গুলীর ন্যায় লম্বা কীট কেবল পদ সঞ্চালনে চলে শরীর নড়ে না) মত দেখা যায়। মানুষকেও দেখা যায় তাঁহারা যেন মৌমাছির দলের মত একত্রে জড়িয়া আছেন। মানুষের হাঁটা অনুভব হয় না। রেলের লাইনগুলি যেন স্ত্রীলোকের মাথার সিঁথির ন্যায় সূক্ষ্ম পৃথিবীর সিঁথি স্বরূপ। সব বস্তুকেই অতি বিভিন্ন প্রকার দেখা যায় কিন্তু সূর্য্যদেবকে যেন একটু বড় বোধ হয়; তাহা আমাদের ভ্রম কি সত্য আমরা বুঝিতে পারি না, শ্রীভগবতী দেবীই জানেন। পাহাড়ের পশুগুলিও বড় নয়, গবাদি পশু আমাদের দেশ হইতে ছোট আকৃতির। কিন্তু মশা বড় বৃহৎ, মশাগুলি প্রায় মাছির মত, মশারি ব্যতীত থাকা যায় না।

পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে খালের মত ঝরণা আছে, সে ঝরণার দুই দিকে বহু উচ্চ পর্ব্বতরাশি, ঝরণা দিয়া দ্রুতবেগে জল

পাতাল দিকে যাইতেছে, জলের গভীরতা স্বাভাবিক ৪।৬ অঙ্গুলীর অধিক নহে, কিন্তু প্রবল বৃষ্টি হইলে দুই শত হাতও হইতে পারে। সেই জন্য পাহাড়ের গায়ে রেলগুলি সর্পের গতির ন্যায় কখন বক্র কখন অধঃ কখন ঊর্দ্ধ দিকে অতি সাবধানে চলিয়াছে। হয়ত একটী ঝরণার অপর পার ৫০০ হাত দূরে কিন্তু তাহা এ পার হইতে তিন শত হাত নীচে, কাজেই রেলটা সোজাসোজী যাইতে পারে না, প্রায় ৫ মাইল ঘূরিয়া অন্য একস্থান দিয়া খাল পার হইয়া ঐ অপর পারে আসিল। ঝরণায় যদি স্বাভাবিক জলের অধিক জল না হইত, তবে ঐ ঝরণা দিয়াই রেল পর্ব্বতশিখরে উঠিতে পারিত। পর্ব্বতে সুড়ঙ্গ করিবার আবশ্যক হইত না। ঝরণায় এত জল হয় যে, পর্ব্বতশিখর পড়িলেও গড়াইয়া জলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইতে থাকে। যেখানে ঐরূপ খালের উপর 'পুল' আছে, তাহা হইতে অধোদিকে দৃষ্টি করা নিষেধ, এজন্য অনেকে গাড়ীর দরজা বন্ধ করেন। নীচে চাহিলে ক্রমে মাথা ঘুরিয়া যাইতে পারে।

কামাখ্যার পর্ব্বতোপরি ঘরগুলি বড় আশ্চর্য্য ধরণের। কোনও ঘরের তিনটী মাত্রই চাল। কোনও ঘরের অর্দ্ধেক চাল পাথরেরই একটা ভাগ মাত্র। আবার প্রায় ঘরেরই একভাগ দ্বিতল, ত্রিতল, চতুর্তল বা পঞ্চতল এবং একভাগ একতলই আছে। ইহা বুঝাইতে আমাদের ভাষায় কুলাইবে না। সৌভাগ্য কুণ্ডের তিন পাড়েই পাণ্ডাদের বাড়ী, ২৮০ দুই শত আশি ঘর নাকি পাণ্ডা আছেন। পাণ্ডাদের অধিকাংশের নামের

সঙ্গেই ঈশ্বর শব্দ যোগ থাকে। আমাদের পাণ্ডার নাম জীবেশ্বর ও রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী। আমরা দশহরার দিন বৈকালে ৺কামাখ্যা দেবীর চরণকমল হইতে বাড়ী রওনা হইলাম। পথে বড় জলপিপাসা লাগিল। কয়েকটী জাম্বুরা ফল লইলাম, সে গুলি কত অমৃতময় বোধ হইল তাহা বলিতে পারি না। তীর্থ স্থানের বলিয়াই হউক বা আমাদের জিহ্বার গুণেই হউক এমত সুস্বাদ আর কখনও পাই নাই। আমরা গৌহাটীতে প্রতিমা-বিসর্জ্জন দেখিলাম, লোকে লোকারণ্য প্রায়ই বাঙ্গালী। দুই শত হাত বিস্তৃত নদীর তীরের রাস্তায় চলিবার স্থান নাই। বহু প্রকার নৃত্য গীত তামাসা ও সাহেবদের খেলা হইতেছে।

আমরা ত রেলে জাহাজে গিয়া নির্ব্বিঘ্নে ৺কামাখ্যা দেবী দর্শন করিলাম। এখনও যে জঙ্গলময় লোকজন পরিশূন্য পর্ব্বত-রাশি শ্বাপদ-হিংস্রজন্তু পূর্ণ ও লোক-চলাচলের অযোগ্য সেই পর্ব্বতশিখর আরোহণ ও অবতরণ করিয়া পদব্রজে ধর্ম্ম পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া আমাদেব পিতামহ দেবতা বহু বার তথায় গিয়াছিলেন, যাহা চক্ষে দেখিয়াও ত্রাস হয়। তাঁহারা বিশ্রামের স্থান পাইতেন না—আহারেরও সুবিধা পাইতেন না, তদ্দেশজাত এক রকম 'বোকা' চাউল (ইহা জলে ভিজাইলেই ভাতের মত হয়, পাক করিতে হয় না) ভোজন দ্বারাই বোধ হয় প্রাণ ধারণ করিতেন। ধন্য! ভক্তি! ধন্য বিশ্বাস !!

শ্রীমতী—
শ্রীমতী—

———

দেবীভাগবত।

(২০৬ পৃঃ পর)

ঋষিগণ কহে সূত ! করি নিবেদন,
অদ্ভুত সন্দেহ তুমি করিলে সৃজন।
বেদাদি পুরাণ শাস্ত্রে জানি এ নিশ্চয়,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শ্রেষ্ঠ দেবত্রয়।
পদ্মযোনি প্রাণীদের করেন সৃজন,
অখিল জগৎ বিষ্ণু করেন পালন।
মহেশ্বর যথাকালে করেন সংহার,
ইহাঁদের আদি দেব বিষ্ণু মূলাধার।
বিষ্ণুই অতুলতেজা সর্ব্ব-কর্ম্ম-মূল,
সে বিষ্ণু কিরূপে আজি নিদ্রায় ব্যাকুল ?
বিষ্ণুর অসীম জ্ঞান গেল সে কোথায়,
কে হরিল শক্তি তাঁর, কে হেন ধরায় ?
যে শক্তির কথা তুমি করিলে বর্ণন,
সে শক্তি কিরূপ তাঁর সামর্থ্য কেমন ?
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় সৃষ্টির কারণ,
হেন বিষ্ণু কার তেজে বিমোহিত হন।
মহা বুদ্ধিমান তুমি বিখ্যাত ধরায়,
এ মহা সন্দেহ ছিন্ন করহ ত্বরায়।
সূত কহে শুন ওহে বিজ্ঞ মুনিগণ,
কে করিতে পারে এই সন্দেহ ছেদন !

সনাতন নারদাদি ব্রহ্মার তনয়,
ইহার উত্তর দিতে সক্ষম ত নয়,
কেহ কেহ এইরূপ ক'রেছে নির্ণয়,
বিষ্ণু ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা আর কেহ নয়।
চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের বিষ্ণুই ঈশ্বর,
তাঁর উপাসনা সবে করে নিরন্তর।
কেহ কেহ এইরূপ ভাবিয়া নিশ্চয়,
পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বরে বলে সর্ব্বময়।
সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি সবের কারণ,
এই মনে করে তারা তাঁহার পূজন।
বেদসার করে কেহ ভজিছে ভাস্কর,
সূর্য্যই পরম আত্মা পরম ঈশ্বর।
বেদজ্ঞ পণ্ডিত কেহ মোক্ষলাভ তরে,
বরুণ ইন্দ্রাদি দেবে উপাসনা করে।
কেহ সূর্য্য, কেহ ইন্দ্র, কেহ হুতাশন,
কেহ বা গঙ্গার পূজা করে অনুক্ষণ।
কেহ বা বিষ্ণুই বলে সর্ব্ব-দেবময়,
এক বিষ্ণু বহুরূপে সর্ব্ব-বিশ্বময়।
প্রমাণ ত্রিবিধ তার বলে মুনিগণ,
সুপ্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দাদি শ্রবণ।
উপমান, অর্থাপত্তি, এ দুই প্রকার,
ইহাও প্রমাণ মধ্যে গণ্য অনিবার।

তা ছাড়া মনীষিগণ করেছে নির্ণয়,
সাক্ষ্য ও ঐতিহ্য দুটি তায় গণ্য হয়।
প্রমাণ এ সপ্তবিধ বেদান্তে কথিত,
এ সবেও পরব্রহ্ম নহেন বিদিত।
প্রমাণের সুদুর্জ্ঞেয় বিভু ভগবান,
জ্ঞানমূল বেদবাক্য কর অনুমান।
অতীব দুরূহ সেই ব্রহ্ম নিরূপণ,
প্রত্যক্ষ সুপরিজ্ঞাত নহে কোন জন।
শাস্ত্রবুদ্ধি-বলে জ্ঞানী করেন নির্ণয়,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবে শক্তিময়।
ব্রহ্মাতে সৃজন শক্তি হরিতে পালন,
মহেশে সংহার শক্তি তপনে কিরণ।
বহ্নিতে দাহিকা কূর্ম্মে ধরণী ধারণ,
সকলের শক্তি রূপে সেই একজন।
সমীরণে সঞ্চালিকা শক্তি বিরাজিত,
আদ্যাশক্তি বিনা কেহ নহে সঞ্জীবিত।
ব্রহ্মাদি কেহই কিছু নহে শক্তি বিনে,
শিবের শবত্ব প্রাপ্তি সে শক্তি বিহনে।
এই যে আব্রহ্ম স্তম্ব বিশ্ব চরাচর,
সকল পদার্থে শক্তি আছে নিরন্তর।
শক্তিহীন হলে সবে মৃতের সমান,
শয়নে গমনে সবে শক্তি বিদ্যমান।

এ সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি ব্রহ্মা মহেশ্বর
জ্ঞানিগণ তাঁরি ধ্যান করে নিরন্তর।
বিষ্ণুতে সাত্ত্বিকী শক্তি আছে বিদ্যমান,
নতুবা হ'তেন তিনি মৃতের সমান।
ব্রহ্মাতে রাজসী শক্তি আছে বিরাজিত,
নতুবা শবের মত তিনিও নিশ্চিত।
মহেশে তামসী শক্তি সদা বিদ্যমান,
সংহার করিতে তাই তিনি শক্তিমান।
এই সুবিবেক বলে যত জ্ঞানিগণ,
করেন সে আদ্যাশক্তি দেবীর পূজন।
তাঁহারি ইচ্ছায় হয় সৃজন পালন,
তাঁহারি ইচ্ছায় বিশ্বে সংহার সাধন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অনিল অনল,
সূর্য্য ইন্দ্র দেবাদির শক্তিই সম্বল।
শক্তিবিনা স্ব স্ব কার্য্যে অপারগ সবে,
একা শক্তি বিরাজিতা প্রত্যক্ষ এ ভবে।
সগুণা নির্গুণা তিনি জানে জ্ঞানিগণ,
অসীম অনন্ত, তাঁর নাহি নিরূপণ।
বিষয়ী সগুণ ভাবে বিরাগী নির্গুণ,
কে জানে তাঁহার আছে কত কোটি গুণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গেশ্বরী,
চৈতন্য রূপিণী তিনি চিন্ময়ী শ্রীধরী।

সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধিদাত্রী মঙ্গলদায়িনী ;
কে জানে তাঁহায় তিনি বিশ্ববিমোহিনী।
মায়াবদ্ধ জীব তাঁর কিছুই না জানে,
ক্ষণিক সদ্বুদ্ধি বলে কভু তাঁরে মানে।
পুনঃ ভুলে যায় তাঁরে কালের প্রভাবে,
বিমুগ্ধ কলির জীব উদরান্নাভাবে।
ভেদ বুদ্ধি নরগণ বেদ জ্ঞান হীন,
নানারূপে নানা কার্য্য হয়েছে বিলীন।
কেহ বিষ্ণু কেহ ব্রহ্মা কেহ মহেশ্বর,
নানা ভাবে নানারূপে পূজে নিরন্তর।
পরা শক্তি বিনে আর কেহ-কিছু নয়,
পরমা শক্তির পূজা মুক্তিদা নিশ্চয়।
সিদ্ধান্ত অখিল শাস্ত্রে হয়েছে নিশ্চিত,
একমাত্র শক্তি পূজা সবের উচিত।
এগূঢ় রহস্য মোরে বলেছিলা ব্যাস,
নারদ তাঁহার কাছে করেছে প্রকাশ।
নারদ শুনেছে ইহা ব্রহ্মার সদন
ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কাছে করিলা শ্রবণ।
ব্রহ্মা সনাতনী পূজা কর অনুক্ষণ,
এর বিপরীত কেহ করোনা শ্রবণ।
চৈতন্যরূপিণী শক্তি যাহাতে না রয়,
হেন জড় পিণ্ড দেহে কিবা ফলোদয়।

পরাৎপরা শক্তি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান,
তাঁহারি এ লীলা সবে কর তাঁর ধ্যান।
দেবীভাগবত কথা অমৃতের সার,
শ্রবণে কলুষ নাশ অরাতি সংহার।

ক্রমশঃ

নাথ।

নাথ, কি আর কহিব তোমায়।
জপি' নিশিদিন হ'ল তনু ক্ষীণ,
বিকানু এ জীবন পায়।
দয়ার আশে মম জীবন পাথারে,
নিলাম পাড়ি আমি ফেল নাকো মোরে,
ভব সাগরের পারে তরাও আমায়।
নাথ, দখাত হলনা, দেখাত দিলেনা,
কত সব যাতনা বুঝি প্রাণ যায়।
নাহি জানি আমি সাধনা ভজনা,
তবু আশা মনে দেখিতে বাসনা;
জীবন গেলে তাহে নাহিক ভাবনা
অন্তিমে অধমে নেও চরণে মিশায়ে।

শ্রীদেওয়ান আলিম দাদ খাঁ

কর্ম্মফল।

(১৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

মানবগণ শুভাশুভ কর্ম্ম করিলে এক সময়ে অবশ্যই তাহার ফল উপভোগ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেহ শৈশবাবস্থায়, কেহ বা যৌবনাবস্থায়, কেহ বা বৃদ্ধাবস্থায়, তত্তৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

কোন কোন পাপকর্ম্মের ফলভোগ চিহ্ন দ্বারা পরিলক্ষিত হয়, চিহ্ন দ্বারা যে কর্ম্মফলের ভোগ দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে পরে লিখিব।

মানবগণ যে যে বয়সে শুভ কিংবা অশুভ কর্ম্ম করে, তাহারা সেই সেই বয়সে শারীরিক, মানসিক, ও বাচনিক, কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়, এই সম্বন্ধে হারীত মুনি লিখিয়াছেন।

"যস্মিন্ যস্মিন্ বয়সি যঃ করোতি শুভাশুভানি
তস্মিংস্তস্মিন্ বয়সি শারীর বাচিক মানসানি প্রাপ্নোতি।

আজ কালও তাহা, একটুকু বিশেষ বিবেচনা করিয়া, দৃষ্টি করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, লোকের যে, অবস্থায়ত্রয়ে যথাযথ কর্ম্মজনিত ফল ভোগ হইয়া থাকে! কেহ শৈশবাবস্থায়ই লিখা-পড়া না করিয়া কুক্রিয়াসক্ত হইয়া নানাবিধ রোগগ্রস্ত, হয় ত অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। তখন তাহার শৈশবাবস্থা কখনও তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ইহাই তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত শৈশবাবস্থার কুকর্ম্মজনিত ফল, নচেৎ

এমন হবে কেন! সেও বিদ্যাভ্যাসে রত হইত, অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে শিখিত। কেহ বা যৌবনাবস্থায় অতি বলিষ্ঠ-কায় হইয়াও মানসিক, এবং ঐন্দ্রিক কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া তাহার অতিশয় দৃঢ়বন্ধ মহাতেজঃসম্পন্ন দেহটিকে একেবারে জীবনের তরে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। মদ্যপান গঞ্জিকাসেবন ইত্যাদি অভ্যাস করিয়া বাতুলের ন্যায় হাটে, ঘাটে, মাঠে, প্রান্তরে, বাজারে, বন্দরে ঘুরিয়া পথিমধ্যে নরনারীদিগকে গালাগালি দেয়, স্বয়ংও গালি শুনিয়া থাকে। মত্ততা-বশতঃ আরও কতই না কুকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে, নেশা সহচর করিয়া প্রাণী-মাত্রকেই বধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি! স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, পর্য্যন্ত সমাধান করিয়া পাপরাশি সঞ্চয় করতঃ স্বর্গদ্বার রুদ্ধ পূর্ব্বক নরকের দ্বার উন্মোচন করিয়া লয়। প্রকৃতিস্থ হইলে বেশ বুঝিতে পারে যে মদ্যপান ইত্যাদি অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম, কিন্তু বুঝিতে পারিলেও পুনরায় অভ্যস্ত কুকর্ম্ম জনিত ফলে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, এই সবল দেহটিকে অকর্ম্মণ্য ও অকাল-জরাগ্রস্ত করিয়া ফেলে; এমন কি! উঠিয়া দাঁড়াইতে অসমর্থ হয় তখন আর তাহার সেই যৌবনাবস্থার দেহ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। হায় যুবক! এই কি তোমার কর্ম্মের ফল, এই কি তোমার দশা, একবার কি তুমি ভাবিয়া দেখ না, তোমার সমপাঠী সমশ্রেণীগণ, অনাচার, অসৎসংসর্গ, কুঅভ্যাস, কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বিশেষ বিদ্যাভ্যাসে রত; হয়ত কত নানাবিধ উপাধি ভূষিত হইয়া

ঐহিক্ সুখভোগ করিতেছেন, এবং পারত্রিক সুখেরও দ্বার খুলিয়া লইতেছেন। হায়! তোমার কি! এতই ভ্রম, যে তুমি কা'ল ২ মণ জিনিষ ঈঙ্গিতে স্থানান্তরে নিতে পারিয়াছ, কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ কর নাই, আজ হাঁটিয়া যাইতেও সমর্থ নহ। যে তুমি কা'ল আত্মীয় বন্ধুবর্গের অতি আদরের পাত্র ছিলে, এবং বিশ্বাসের আধার ছিলে, আজ তোমাকে তাহারা ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেছেন। এবং ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস করিতেছেন না, যে তুমি হর্ম্ম্যাদি গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত ছিলে, আজ হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে, প্রান্তরে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছ। ধিক্ তোমায়! একবারও কর্ম্মফল ভাবিয়া দেখ নাই, নচেৎ তোমাকে এই দশা ভোগ করিতে হইবে কেন?

কেহ বা বৃদ্ধাবস্থায়ও সংসারের মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়া মিথ্যা, প্রবঞ্চনা আচরণে কুণ্ঠিত হন না, ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল হা পুত্র! হা কন্যা! ইত্যাদি বলিয়া হাহুতাশ করিয়া কালযাপন করিয়া থাকেন। দারাপুত্র পরিবারবর্গ পোষণ-মানসে, অর্থলোলুপ হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানেও প্রস্তুত হন। কিন্তু একবারও ভাবি কর্ম্মফল চিন্তা করিয়া দেখেন না। হে বৃদ্ধ! এই কি তোমার ধর্ম্ম, এই কি তোমার কর্ম্ম, এই কি তোমার ধ্যান ধারণা, সমাধি, এই কি তোমার আচার, জীবনের শেষভাগেও সংসারমদে মত্ত হইয়া পরকাল ভুলিয়াছ, এখন কর্ম্মে অসমর্থ হইয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছ, মিথ্যা-প্রলাপী বলিয়া লোকসমাজে ঘৃণিত হইতেছ,

যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার জন্য মোক্ষ কর্ম্ম ভুলিয়া অর্থলোলুপ হইয়াছিলে, আজ তাহারাই তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, এবং ধিক্কার দিয়া জীবনের ক্ষোভ জন্মাইতেছে, ইহাই তোমার কর্ম্মের ফল, নতুবা তোমার এরূপ দশা ঘটিবে কেন ? যাক্ এখন কর্ম্মফল স্মরণ করিয়া পুরুষোত্তমের পদাশ্রয় করিলে মুক্তি পাইতে পার, সর্ব্বত্রই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় একথাটি মনে রাখিও—যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, দেহীদিগের চিত্তের বৃত্তি অনন্ত, এ কারণে সকল জন্মেই সুরূপ কুরূপ ভেদে রূপও অনন্ত হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য ঃ—

অনন্তাশ্চ যথাভাবাঃ শরীরেষু শরীরিণাং।
রূপাণ্যপি তথৈবেহ সর্ব্বযোনিষু দেহিনাং॥

কোন কোন শরীরী কেবল পরলোকে শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন, কেহবা মাত্র ইহলোকেই ভোগ করেন। কেহ কেহ বা ইহলোকে ও পরলোক, উভয় লোকেই ফলভোগী হয়েন। এই বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিয়াছেন—

বিপাকঃ কর্ম্মণাং প্রেত্য কেষাঞ্চিদিহ জায়তে।
ইহ চামুত্র চৈকেষাং ভাবস্তত্র প্রয়োজনম্॥

কিন্তু সর্ব্বত্রই শুভাশুভ ফলভোগের প্রতি চিত্তবৃত্তিই প্রয়োজক, অশুভ কর্ম্ম দ্বারা মানবগণ তিনরূপ দেহ প্রাপ্ত হন। জীবাত্মা মরণ ক্ষণে আতিবাহিক নামক শরীর গ্রহণ করেন। এবং পূর্ব্বদেহ হইতে বায়ু, আকাশ, ও তেজ, এই ভূতত্রয় উর্দ্ধে গমন করে, এই আতিবাহিক নামক দেহ কেবল মনুষ্যের হয়

অন্য প্রাণীর হয় না। তাহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, যথা—

"অশুভকর্ম্মণা দেহত্রিতয়প্রাপ্তি র্যথাক্রমং।
তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকম্।
উর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য বিগ্রহাৎ॥

তথা

আতিক বাহিক সংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব!
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥

'মানবাত্মার আতিবাহিক দেহ, প্রেতদেহ, এবং ভোগদেহ ধারণ করিতে হয়। (তৎপরে)

প্রেতপিণ্ড দানে প্রেত-দেহ প্রাপ্তি হয় এবং প্রেত-শ্রাদ্ধ দ্বারা ক্রমেতে ভোগ দেহ প্রাপ্তি হয়। তাহার প্রমাণ বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে, যথা—

প্রেতপিণ্ডৈস্ততো দত্তৈ দেহমাপ্নোতি ভার্গব।
ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ॥

এখানে ভোগ-দেহ শব্দে প্রেত-ভোগ-দেহ বুঝিতে হইবে। কারণ প্রেতদেহানন্তর (অর্থাৎ সম্বৎসরের পর সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়া দ্বারা ভোগদেহ প্রাপ্তি হয়, এরূপ বচনান্তর দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, ১

অতএব এখানে পূর্ব্বোক্ত অর্থই যুক্তিসঙ্গত।

১। কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎপরং। প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহ প্রপদ্যতে॥

'মরণের উত্তর যাহাদিগের সম্বন্ধে প্রেতশ্রাদ্ধ প্রদত্ত হয় না, শ্মাশানিক দেবতা হইতে কল্পকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুক্তি হয় না। ২ এবং তত্রত্য ব্যক্তিদিগের শীত, বায়ু, ও আতপোদ্ভব নানারূপ যাতনা হয়। ৩ অনন্তর বান্ধবগণ মৃতনরের সপিণ্ডীকরণ করিলে সংবৎসর পূর্ণ হইলে অন্য দেহ অর্থাৎ ভোগদেহ প্রাপ্তি হয়। ৪

মৃত নর প্রেত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্তঃহইলে পর স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে।—"ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা" ইহা দ্বারা সম্পূর্ণই প্রতীতি হয় কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ কবিতে হয়। কর্ম্মফলে ১ নরকাদি ভোগানন্তর যথাক্রমে পশ্বাদি জন্ম হইতে উত্তীর্ণ হইলে মনুষ্য শরীরে সেই সেই পাপকর্ম্মজনিত চিহ্নজাত হইয়া থাকে, প্রমাণং—

বিষ্ণুঃ। অথ নরকানুভূতদুঃখানাং তির্য্যক্ত্বাদুত্তীর্ণানাং মনুষ্যে লক্ষণানি ভবন্তি।

ক্রমশঃ

২। প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণং। শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে।

যমঃ। যস্যৈতানি ন দীয়ন্তে প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শঃ। পিশাচত্বং ধ্রুবং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি

৩। তত্রাস্য যাতনা ঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবা।

৪। ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সকৃতে নরঃ। পূর্ণে সংবৎসরে দেহ মতোহন্যং প্রতিপদ্যতে॥

১। কর্ম্মানুরূপং তত্তৎকালং তত্তন্নরকাননুভূয় তির্য্যগাদি শরীরং প্রাপ্য পাপকর্ম্ম শেষেণ তত্তল্লক্ষণোপেতং মনুষ্যশরীরং প্রাপ্নোতি।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

জমা— ৩৭১১৸৶৬

উদ্বৃত্ত প্রেক বিক্রী— ৵৬

৩৭১২৲

৩০। শীতলচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক ৩৫৲

১। হরকিশোর মহিম সাহা ১৫৲

২। জগদ্বন্ধু বণিক্য ১০৲

৩। রাধারমণ বণিক্য ১০৲

৩৫৲

৩১। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়— ১৷০

৩২। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক ৯৲

(৬ জন আর্য্য-গৌরবের গ্রাহকের মূল্য আদায়)

৩৩। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক—১৭৷০

ডিসেম্বর জানুয়ারীর চাঁদা

১। মতিলাল রায়— ২৲

২। মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী— ১৲

৪। শীতলচন্দ্র সেন— ৫৲

৪। পূর্ণচন্দ্র রায়— ১৲

৫। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী— ২৲

৬। মোহিনীমোহন বীর— ৷০

৭। দুর্গাচরণ বিশ্বাস— ২৲

৮। প্রসন্নকুমার মজুমদার— ১৲

৯। কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী—৷০

১০। হরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য— ২৲

১১। কুমুদচন্দ্র রায়— ৷০

১৭৷০

খরচ— ৫২৭।৶০

৬৫। বিল—
পৌষের পত্রিকার ছাপা খরচ মধ্যে মায় মণিঅর্ডার— ৪০।৶০

৬৬। অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকার রেল ভাড়া— ২৲

৬৭। নিভরসারাম ও শ্যামাচরণ পোদ্দারের অভ্যর্থনার নোটীশ ছাপাখরচ মায় কাগজ— ১৷৵৬

৬৮। চিঠি লেখার ৩০০ শত পোষ্টকার্ড ছাপান মায় মূল্য— ১৷০

৬৯। দশকুমারচরিত— ২।০

৭০। বনমালী সাংখ্যতীর্থের নবেম্বর ও ডিসেম্বরের বেতন মধ্যে— ৬।০

জমা—

৭৩। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক ২৲
১। লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী— ২৲
৭৫। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক ১৲
১। সীতানাথ ঘোষ— ১৲
৭৬ শীতলচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক—৬৪৸
১। প্রসন্নকুমার সাহা— ২৲
২। সর্ব্বানন্দ সাহা— ৫৲
৩। শ্যামকিশোর সাহা — ১৲
৪। অমরচাঁদ সাহা — ১৲
৫। ভগবান সাহা— ৷৷০
৬। রামচন্দ্র সূত্রধর— ১৲
৭। ঈশানচন্দ্র সাহা— ৫৲
৮। জগবন্ধু কর্ম্মকার— ১৲
৯। সখীচরণ সাহা— ৷৷০
১০। গুরুচরণ সাহা— ৷৷০
১১। ধর্ম্মনারায়ণ সাহা— ৷৷০
১২। অভয়চরণ চক্রবর্ত্তী— ৷০
১৩। জয়গোবিন্দ সাহা— ১৲
১৪। দীননাথ সাহা— ১০৲
১৫। নীলকণ্ঠ সাহা— ৬৷৷০
১৬। প্যারীমোহন সাহা— ২৲
১৭। কৈলাসচন্দ্র সাহা— ১৷৷০
১৮। রামপ্রসাদ সূত্রধর — ৩৲
১৯। শ্যামসুন্দর সূত্রধর— ৫৲
২০।১৬৬। কৈলাসচন্দ্র সাহা(ক)৫৲
২১। ঈশানচন্দ্র সূত্রধর— ৬৲
২২। গগনচন্দ্র সাহা— ৪৲
২৩। হরচন্দ্র সাহা— ৷৷০

৬৪৸০

খরচ—

৭১। সভাগৃহ সাজান
খরচ কামলা— ১৸৶৬

৭২। সভার জন্য পত্র বিলি
এবং অশ্বিনীকুমার দাস ইং নিকট
১৫ খানি পত্রিকা পাঠান
খরচ— ৸৵০

৭৩। তিন বেদের ছাত্রের
খোরাকী— ২৲

৭৪। সভার চিঠি বিলির
খাম ইত্যাদি মায় কাগজ— ১৲

৭৫। পত্রিকার জন্য
টেলিগ্রাম— ৷৵০

৭৬। এক জন বেদের ছাত্রের
খোরাকী দুই বেলা— ৷৷০

৭৭। যোগীন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর
জানুয়ারী মাসের বেতন— ৪৫৲

৭৮। সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থের
জানুয়ারী মাসের বেতন— ১৫৲

জমা—

৩৭। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক (৪ জন গ্রাহকের মূল্য আদায়) ৬৲

৩৮৪৮৸০

বাদ খরচ— ৬৭৮৶০

৩১৭০৷৵০

তিন হজার একশত সত্তর টাকা নয় আনা তহবিলে মজুত আছে।

শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক

এই পর্য্যন্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল হিসাব শুদ্ধ আছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে হিসাব পরীক্ষক
২৩।২।১৩

খরচ—

৭৯। স্কন্দপুরাণ— ১১৵০

৮০। সামবেদ সংহিতা আরণ্যক এবং ব্যাপ্তি পঞ্চক— ১১৷৵০

৮১। হরেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত পত্রিকা পাঠাইবার খরচ— ১৷০

৮২। পৌষের "আর্য্যগৌরব" পত্রিকার রেলভাড়া— ৩৲

৮৩। পৌষের ১৩২ খানা আর্য্য-গৌরব ডাকে পাঠাইবার খরচ ৩৲

৬৭৫৶০

মূল্য প্রাপ্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৬৫ ।	শ্রীযুক্ত	কালীকুমার কবিরত্ন কবিরাজ	১৷৹
২১১ ।	,,	জগদীশচন্দ্র রায়চৌধুরী	১৷৹
৮৭ ।	,,	দুর্গাচরণ বিশ্বাস উকীল	১৷৹
৮২ ।	,,	প্রসন্নকুমার সেন ঐ	১৷৹
৮৩ ।	,,	কৈলাসচন্দ্র দে ঐ	১৷৹
৮৪ ।	,,	প্রসন্নকুমার মজুমদার ঐ	১৷৹
৭৪ ।	,,	ভৈরবচন্দ্র রায় ঐ	১৷৹
৬৯ ।	,,	কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী মোক্তার	১৷৹
৮৯ ।	,,	হরচন্দ্র পাল উকিল	১৷৹
৯১ ।	,,	অনাথবন্ধু রায় ঐ	১৷৹
২৭৪ ।	,,	কুমুদচন্দ্র রায় নায়েব	১৷৹
১১১ ।	,,	রাজেন্দ্রকিশোর রায় উকীল	১৷৹
৩৭৭ ।	,,	মহেন্দ্রলাল আচার্য্য ডাক্তার	১৷৹
৩৯৮ ।	,,	নীলকণ্ঠ সাহা	১৷৹
৩৯৯ ।	,,	কৈলাসচন্দ্র সাহা	১৷৹
৩১৮ ।	,,	শরৎকুমার মুন্সী সব ইং	১৷৹
৪৮৬ ।	,,	শরচ্চন্দ্র দে	১৷৹
৪৮৭ ।	,,	রামজয় সূত্রধর	১৷৹
৭৩ ।	,,	সত্যেন্দ্রকুমার রায়	১৷৹

ক্রমশঃ।

পত্র-লেখকগণের প্রতি।

(লেখকগণ পত্রের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লিখিবেন। প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া ইচ্ছাধীন)

১। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী—শিশু কবিতা না লিখিয়া সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া সুখী করিবেন।

২। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী—আপনার প্রবন্ধ প্রায় ৪ ফর্ম্মা বিশেষতঃ অনাবশ্যক বহু বিষয়ের অবতারণা আছে। কমিটীতে পাশ হয় নাই।

৩। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন নাথ—'বাসুদেব' সহস্র "নাম" বিষয় বড় বৃহৎ স্থানাভাব।

৪। শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র বণিক্য—'ছাইনারত্ন' প্রবন্ধটী সত্বর পূর্ণ করিয়া দিবেন।

৫। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র দত্ত—'উপহাস' উপহাসেরই যোগ্য, আর্য্য-গৌরবের যোগ্য আছে।

৬। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বিদ্যাভূষণ—"সমাজ সংস্কারের ধারা" বিশেষ-রূপে বিবেচ্য।

৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত বনমালী সাংখ্যতীর্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দে প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রবন্ধ সত্বরে শেষ করিবেন।

মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার ভ্রম সংশোধন।

ঐ সংখ্যায় 'মা' ও 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' এই দুইটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে পর, আমরা জানিতে পারিলাম, ঐ প্রবন্ধদ্বয় পত্রান্তরে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ঐ ঐ প্রবন্ধের লেখক যদি আমাদিগকে ঐ বিষয় জানাইতেন যে,

ঐ প্রবন্ধদ্বয় তিনি পত্রান্তর হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইলে উদ্ধৃত বলিয়াই আমরা মুদ্রিত করিতাম। কিন্তু তিনি তাহা না বলায় আমরা তৎকৃত প্রবন্ধ বলিয়াই ছাপাইয়াছি। ইহাতে আমাদের কোনও দোষ নাই তথাপি ঐ প্রবন্ধদ্বয় আমাদের পত্রিকায় যে যে পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহা আমরা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি। ভরসা করি ঐ প্রবন্ধদ্বয়ের প্রকৃত লেখকগণ ও আমাদের "আর্য্য-গৌরবের" গ্রাহক ও পাঠকগণ আমাদের এ ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন। ঐ প্রবন্ধদ্বয়ের কয়েক পৃষ্ঠা ছিন্ন হওয়ায় আমাদের কর্ম্মফল প্রবন্ধেরও ১ম পৃষ্ঠা তৎসহ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ 'কর্ম্মফল' প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করার নিমিত্ত এই সংখ্যার সহ ছিন্নাংশ পুনঃ মুদ্রিত করিয়া সন্নিবিষ্ট করা গেল পাঠকগণ ঐ প্রবন্ধ মিলাইয়া পাঠ করিবেন নিবেদন।

"দান-ধর্ম্ম" প্রবন্ধে নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংশোধন করা গেল।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১৪৬	কর্ণস্য ভূষণং সত্যং	কণ্ঠস্য ভূষণং সত্যং
১৪৮	দান করিয়া	দান না করিয়া।
১৪৯	তট বর্ত্ততে	স্তট বর্ত্ততে।
„	দাতব্যাং	দাতব্যং।
„	দাতারাং	দাতারং।
„	দত্তা	দত্ত্বা।
„	ততোধিকঃ	স্ততোধিকঃ।

কর্ম্মফল।

—ঃ*ঃ—

'কর্ম্ম' অর্থে ক্রিয়া অর্থাৎ যাহা করা যায় তাহাই বুঝায়। 'কৃ' ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় যোগেই কর্ম্ম শব্দ সাধিত হয়। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ॥

(চতুর্থ অঃ ১৬ শ্লোঃ।

হে ধনঞ্জয়! কিরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা প্রকৃত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, আর কিরূপ ভাবে করিলে অকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় তাহা জানিতে বুদ্ধিমান্ লোকও মুগ্ধ হইয়া থাকে। অতএব সেই প্রভেদ তোমাকে বলিতেছি। যাহা জানিলে তুমি সংসার-দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ প্রতীতি হইতেছে যে, সংসারীর কর্ম্ম শব্দে ক্রিয়াই বুঝায়। সেই ক্রিয়া সৎ ও অসৎ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। সৎক্রিয়া—পূজা, যাগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ও সত্যবাদিতা প্রভৃতি; এবং অসৎ ক্রিয়া—চৌর্য্য, বধ ও মিথ্যাদি। কিন্তু পূজা যাগাদি

আর্য্য-গৌরব।

——০:*:০——

নববর্ষ

(১)

প্রকৃতির দেহ তুমি নবরূপধারী,
তোমার মোহনরূপ যাই বলিহারি।
যৌবন বসন্ত যোগে,
মত্ত তুমি নব ভোগে,
বেলি-গন্ধরাজ-পদ্ম-কুসুম-নিচয়,
মলয়-পবন তব জুড়ায় হৃদয়। * (১)

(২)

কি মোহিনী জান তুমি বলিবার নয়,
পাষাণ-হৃদয়-গিরি বিগলিত হয় ;
প্রেমভরে বুক চিরে,
পূজে সে সঞ্চিত নীরে,
গঙ্গা-মন্দাকিনী তার অশ্রুধারা বয়,
তব তরে উদ্বেলিত সাগর-হৃদয়।

---

(১) *"স চ চৈত্রবৈশাখমাসদ্বয়াত্মকঃ।" শ্রুতিঃ। (চৈত্র বৈশাখ দুই মাস বসন্তকাল)

(৩)

অভিনব রূপ তব আকাশে পাতালে,
উজ্জ্বল-তপন-শশী সুশোভিত ভালে;
উজ্জ্বল নক্ষত্রচয়,
সুপুষ্পিত বিশ্বময়,
উদ্যানে পর্ব্বতে বনে সবে মুকুলিত,
নয়ন ঝলসে রূপে চিত্ত বিমোহিত।

(৪)

কত কোটি বর্ষ তব হয়েছে বিগত,
তবু নব, নিত্য নব, পঞ্জিকার মত।
তোমার নবীন রূপ,
সদাই ত অপরূপ,
জীবন্ত যৌবন তব স্ফুটন্ত মূরতি,
সদাই নূতন ভাব, নূতন শকতি।

(৫)

তোমারি সমষ্টি নিয়ে মোদের জীবন,
পারি না নূতন হ'তে তোমার মতন।
কোথা সেই বাল্য-মেলা,
কোথা সেই ধূলা-খেলা,
কোথা সে চলিয়া গেল নবীন যৌবন?
কোটি কোটি রত্ন দিয়ে মিলে কি এখন?

(৬)

বর্ষে বর্ষে নব বর্ষ, তব আগমন,
বর্ষে বর্ষে দেখি তব নূতন জীবন,
বর্ষে বর্ষে নব ফুল,
বর্ষে বর্ষে পিককুল,
বর্ষে বর্ষে বসন্তের পাই দরশন,
মোদের সে নব বর্ষ ফিরে না কখন।

(৭)

পুরাতন জীর্ণ বাস করি পরিহার,
ধরেছ নবীন ছবি রূপের বাহার,
নদীর নূতন জল,
নব নব শষ্পদল
পাদপের নব পত্র নব চূতফল,
কোটি কোটি কুসুমের নব পরিমল।

(৮)

নূতন নূতন সব নূতনের মেলা,
কত নব বেশ তব কত নব খেলা।
নব-কোকিলের গান,
নব-ঝিঁঝিঁকার তান,
নব-সৌদামিনী-কোলে নব জলধর,
সুরভিত ঋতুরাজ, তব সহচর।

(৯)

নব বর্ষ! নব রূপ করিছ ধারণ,
বহুরূপী তুমি, জান, রূপের কারণ।
তোমার অজ্ঞাত ভবে,
নহে কিছু, নাহি হবে,
পাপরূপ ক্লেদরাশি করি পরিহার,
মোদের সে সব রূপ পাব না এবার?

(১০)

চাই সে জীবন্তরূপ তোমার মতন,
চাই সে পবিত্র-ময় আর্য্যের জীবন,
চাই সেই নব-শক্তি,
চাই সেই নব-ভক্তি,
চাই সেই শুদ্ধাচার বেদ-অধ্যয়ন,
নব বর্ষ! কর নব বাসনা পূরণ।

শ্রী............

———

ঈশ্বর-লাভের উপায়।

—:*:—

একদা গয়াতে তিনটী বাঙ্গালী বাবুর সহিত দেখা হয়। তাঁহাদের তীর্থযাত্রা নয়, দেশভ্রমণ—হাওয়া পরিবর্ত্তন ইত্যাদি, বাচক শব্দই আমার কর্ণকুহর প্রতিধ্বনিত করিল।

বাবুদের একজন বড় দয়ার্দ্র, তিনি গয়ার দরিদ্রদিগকে কিছু দান করিতে মনস্থ করিলেন, ২৫৲টী টাকা দান কারবেন, পাণ্ডাজাকে বলিলেন। পাণ্ডাজী বলিলেন, এ টাকার দ্বারা কিছুই হইতে পারে না, তুমি যদি ইচ্ছা কর, টাকায় ২২ বাইশ গণ্ডা পয়সা (গয়ালী পয়সা) এখানে পাওয়া যায়, ২৫৲ টাকার ঐ পয়সা লইয়া, একটা ভাল এক্কায় চড়িয়া দ্রুত চলিয়া যাইতে যাইতে রাস্তায় ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতে পার। তাহাতে কেহ কেহ পাইতে পারে। পাণ্ডার যুক্তি অনুসারে বাবুটী ২৫৲ টাকার পয়সা লইয়া এক্কায় চড়িয়া পয়সা ছড়াইয়া যাইতে লাগিলেন, এক্কা অতি দ্রুত চালাইতে বলিলেন, পাছে ভিখারীগণ এক্কা ধরিয়া রাখে। বাবুর আদেশ মত এক্কা দ্রুত চলিল, বাবু পয়সা ছড়াইলেন, ক্রমে পয়সা নিঃশেষ হইয়া আসিল। এমন সময় দূর হইতে তিনটী বালক এক্কার নিকট গিয়া এক্কা ধরিতে দৌড়িয়া ছুটিল, এক্কা বহুদূর চলিয়া গেলে, বালকগণ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এক্কার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ঘর্ম্মাক্তকলেবর

হইয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল, ক্রমে দুইটী বালক অবসন্ন হইয়া পড়িল, প্রাণ হাই পাই দিতে লাগিল। দুইটী সেখানেই পড়িয়া রহিল, অন্য বালক বলিল, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না, প্রাণ যায় যাইবে, তথাপি আমি গাড়ী ধরিবই ধরিব। বাঙ্গালী বাবু বড় দয়ালু; আমি বিশ্বাস করি, তিনি আমাকে গাড়ী ধরিতে পারিলে কিছু বেশী দিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণান্ত হইয়া, গাড়ীর পিছনে পিছনে পড়িয়া পড়িয়া, আছাড় খাইয়া দৌড়িতে লাগিল, এই নিদারুণ অবস্থা দেখিয়া বাবুটীও গাড়োয়ানকে ধীরে ধীরে চালাইতে বলিলেন। বালক গাড়ীর সন্নিকটে গিয়া হয়রান হইয়া গাড়ী স্পর্শ করিবামাত্রই পড়িয়া গেল। বাবু বড় ব্যথিত হইলেন, তাহাকে উঠাইয়া যত্ন করিয়া একটী সিকি দিলেন; কিন্তু তাহাতেও তিনি তৃপ্তি পান নাই, সঙ্গে বেশী ছিল না বলিয়া আর দিতে পারিলেন না। বালকের জন্য মনে বড় স্নেহ রহিল। তদনন্তর ঐ বাবুত্রয় কাশীধামে গেলেন, তখন বিশুদ্ধানন্দ স্বামী তথায় ছিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "স্বামিন্। আমাদের একটী প্রশ্ন, ইহার উত্তর দিয়া সুখী করুন। ঈশ্বরকে পাওয়ার উপায় কি?" স্বামীজী প্রশ্ন শুনিয়া কৃত্রিম রাগত হইয়া বলিলেন, "বাঙ্গালী বাবুরা কেবল ত্যক্ত করিতে আসে এবং বড় বড় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, এই ত, ঈশ্বরকে পাওয়ার উপায় কি! ইহা কে বলিতে পারে? আমি ঈশ্বরকে পাইও নাই, তাহার পথেও বেশী দূর যাই নাই, যাও, সরে যাও।" স্বামীজীর

বাক্যে দুটী বাবু চলিয়া গেলেন। তৃতীয় বাবুটী—যিনি পয়সা দান করিয়াছিলেন, তিনি রহিয়া গেলেন এবং স্বামীজীর চরণ-প্রান্তে বসিয়া বহুবিধ কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। বহু-ক্ষণ পরে স্বামীজী অন্তর্য্যামীর ন্যায় বলিলেন, "বাপু! তুমি যে গয়ায় ২৫৲ টাকার পয়সা দান করিয়াছিলে আর একটী ছেলে প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তোমার গাড়ী ধরিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল, তখন তুমি তাহাকে দয়া করিয়া কিছু দিয়াছিলে। ঐরূপ একাগ্রতা, বিশ্বাস এবং প্রাণ যায় যাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া ঈশ্বরের অন্বেষণ করাই ঈশ্বর-লাভের উপায়।"

শ্রীহরিমোহন রায়।

ছাই না রত্ন।

—:*:—

আমি যে বিষয় লিখিতেছি, তাহা একটী সুগৃহিণীর কৃতিত্ব, তাহাতে আমার নিজের কিছু নয়; তিনি নাম প্রকাশে বা লিখিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু বিষয়টী অতি উপাদেয়—তাই আপনার পবিত্র ও প্রকৃত শিক্ষাপ্রদ, স্বধর্ম্ম-রক্ষক, স্বনামখ্যাত পত্রিকায় স্থান পাইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

ছাই বা অঙ্গারকে আমরা তুচ্ছ ভাবিয়া অতি জঘন্য

স্থানে ফেলিয়া দিই, আমরা ভাবি না যে, প্রত্যেক জিনিষকেই যত্ন করিলে রত্নরূপে পরিণত করা যায়। একটী দূর্ব্বা বা তৃণ দ্বারাও ঔষধরূপে অমূল্য জীবনও রক্ষা করা যায়। আমাদের পদদলিত তুচ্ছীকৃত শত শত সামান্য সামান্য পদার্থও বিদেশীয় বণিক্‌গণ রেল ও জাহাজে চড়িয়া তৎ তৎ দেশে নিয়া পুনর্ব্বার আমাদের নিকটই রত্নবিনিময়ে বিক্রয় করিয়া থাকেন। হায়! আমরা দেখিয়া শুনিয়াও কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা জিনিষের প্রতি অবজ্ঞা না করিয়া যত্ন করিলেই আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক দরিদ্রতা দূর হইতে পারে। শত শত সামান্য সামান্য প্রকৃতিজাত, অনায়াস-লব্ধ বস্তু-দ্বারা আমরা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি; চাকরীর জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিবার আবশ্যক হয় না। আমাদের "বসুমতী"ই সর্ব্বদা বসুদান করিতেছেন, এরূপ রত্নপ্রসূতির কোলে থাকিয়াও রত্নলাভে বঞ্চিত; হায়! কি দুরদৃষ্ট! কি পরিতাপ!!

এই সুগৃহিণী আমাদিগকে বহু শিক্ষা দিতেছেন। একদিন তাঁহার বাড়ীতে তাঁহাদের গুরুদেব উপস্থিত হইয়া তীর্থপর্য্যটনের জন্য কিছু অর্থপ্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহার কয়েকটী ছেলে-মেয়ে ও কর্ত্তা প্রভৃতি সকলেই কিছু কিছু অর্থ দিয়া গুরুকে বিদায় করিতেছেন। গুরুদেব গৃহিণীকে বলিলেন, "মা! সকলেই কিছু কিছু দিয়াছে, তুমিও আমাকে কিছু দেও, যাহা দিবে, তাহাতেই আমার কুলাইতে পারিবে, তোমার সামান্য দানেও আমি সন্তুষ্ট হইব।" তিনি বলিলেন, "আমার ত স্বতন্ত্র কিছুই নাই, তবে

আমার বেশ মনে হয়, একটা ভাণ্ডে কিছু কিছু পয়সা রাখিয়া দিয়াছিলাম, সে পয়সা আর কিছুই নয়, আমরা যে ভাল ভাল কাঠ দ্বারা পাক করিয়া থাকি, তাহারই অঙ্গারগুলি ভস্ম হইয়া যাইবার পূর্ব্বে রন্ধন শেষ হওয়া মাত্রই আমি সকলকে লুকাইয়া সঙ্গোপনে রাখিয়া দিতাম এবং ঐ পাড়ার কর্ম্মকারগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া পয়সা দিয়া কিনিয়া নিত। এক্ষণে অনেক দিন হইয়াছে, আর সে ভাণ্ড ত দেখিও নাই। তবে দেখি, যাহা হয়, তাহাই আপনাকে দিব, আপনি অত্যল্প হইলেও গ্রহণ করিবেন বলুন।" গুরুদেব বলিলেন, "তোমার শ্রদ্ধার দান কয়েক আনা পয়সা পাইলেও আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিব।" অমনি তিনি দৌড়িয়া মাটীর নীচ হইতে মৃদ্‌ভাণ্ডটা উঠাইয়া নিয়া গুরুর পদে ঢালিয়া দিলেন। গুরুদেব সেই টাকা পয়সা সিকি দুয়ানী আধুলি প্রভৃতি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। গণিয়া দেখিলেন, প্রায় ছয় শত টাকা হইবে। গুরুদেব বলিলেন, "আমার এত টাকার প্রয়োজন কি? ইহা তোমার কত দিনের সংগ্রহ; তুমি আমাকে সব দিতেছ কেন? কয়েক টাকা দিলেই ত আমার কাজ চলিতে পারে।" তিনি বলিলেন, "গুরুদেব! ইহা আমার 'ছাই' হইতেই উপার্জ্জিত, প্রায় ৩০ বৎসরে এই টাকা হইয়াছে, কিন্তু আমার কিছুই ধারণা নাই যে, এত টাকা হইয়াছে। ইহা সমস্তই আপনাকে দান করিয়াছি, ইহাতে আমার কিছু স্বত্ব নাই, আপনার জন্যই ভগবান্ আমার এই সুমতি দিয়াছিলেন। আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করুন্, ইহা ত ছাইই।" গুরুদেব এই

সুগৃহিণীর বাক্যশ্রবণে তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "মা! ইহা তোমার "ছাই না—রত্ন।"

শ্রীমুকুন্দলাল বণিক্।

—o—

ধর্ম্ম।

(গুরুদেব শ্রীমচ্চিদানন্দকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন।)

গুরু—বৎস! ঈশ্বর ও ধর্ম্ম অপৃথক্। তোমার বুঝিবার নিমিত্ত আমি এই দুরবগাহ বিষয়কে অতি সরলভাবে বিশ্লেষিত করিব। তুমি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর—যেন একটী বর্ণও তোমার মনোবিচ্যুত না হয়।

চিদা—আপনকার অমূল্য উপদেশে এক্ষণে এ দাস আত্ম সংযম করিতে শিখিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বদাই আপনার উপদেশ-বচন মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া থাকে। অতএব দেব! জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তরদানে দাসকে কৃতার্থ করুন।

গুরু—"ধরতি বিশ্বং যঃ স ধর্ম্মঃ।" যিনি এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই ধর্ম্ম। সুতরাং বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ ধর্ম্ম-শব্দবাচ্য এবং বেদ ও উপনিষৎ প্রভৃতি ঈশ্বরনিরূপক শাস্ত্রও ধর্ম্ম নামে অভিহিত। কেন না, শাস্ত্র ও ঈশ্বরে অভিন্নভাব। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ!" অন্যত্র,"কাব্যা-

লাপাশ্চ যে কেচিৎ গীতকান্যখিলানি চ। শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ।" পরন্তু, গুরুদত্ত মন্ত্র দেবতাত্মক। মন্ত্র-বর্ণে দেবরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবার বিধি। এইরূপে জপ করিলে বর্ণাত্মক দেবতা প্রসন্ন হয়েন। ইহারই নাম মন্ত্রচৈতন্য। আর যেখানে মন্ত্রের সহিত দেবরূপের পৃথক্‌রূপে ধ্যান করা হয়, সেখানে মন্ত্র-চৈতন্যরহিত। সে মন্ত্রে কার্য্য করে না—উহা শক্তি হীন। এই হেতু যামল বলিয়াছেন—

"দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।
তত্তদ্বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
তদিষ্টং ভাবয়েদ্দেবি যথোক্তধ্যানযোগতঃ।
বর্ণরূপেণ সা দেবী জগদাধাররূপিণী।—

তন্ত্রে—

"মননাত্ত্রায়তে যস্মান্মন্ত্রস্তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

জীবাত্মার নির্ম্মলাবস্থা যেরূপ পরমাত্মা, মন্ত্রের নির্ম্মলাবস্থাও তদ্রূপ ব্রহ্ম জীবাত্মাকে ছাড়িয়া পরমাত্মার চিন্তা যেরূপ ঘটে না, মন্ত্রকে ছাড়িয়া ব্রহ্মের চিন্তাও সেইরূপ অসম্ভব। জীবাত্মা ও পরমাত্মা—মন্ত্র ও ব্রহ্ম—যেমন, অগ্নি ও দাহিকা শক্তি। এর কোনটীকে বাদ দিয়া কোনটীর চিন্তা চলে না। অগ্নিকে বাদ দিয়া দাহিকা শক্তির চিন্তা হয় না, আবার দাহিকা শক্তিকে বাদ দিয়া অগ্নির চিন্তা অসম্ভব। যেমন, বরফ ও জল।

জলের ঘনীভূত অবস্থা বরফ ; আর তরলাবস্থা জল। তেমনি ঈশ্বরের ঘনীভূত অবস্থা ব্রহ্ম এবং তরলাবস্থা বর্ণাত্মক শাস্ত্র। ঈশ্বর এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া ধর্ম্মশব্দবাচ্য ; আর ঈশ্বরাত্মক-বর্ণ-গ্রথিত শাস্ত্রদ্বারা এই বিশ্বকার্য্য সুষ্ঠু চলিতেছে বলিয়া, শাস্ত্রও ধর্ম্মশব্দবাচ্য। শাস্ত্রবচনই মানবকে ধর্ম্মে অর্থাৎ ঈশ্বরে মিলিত করে, এবং মানবীয় অকর্ত্তব্য কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে। সুতরাং ঈশ্বর ও শাস্ত্র এতদুভয়ই ধর্ম্মশব্দবাচ্য। এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম অধর্ম্মনামে অভিহিত। অপিচ, ঈশ্বর ভিন্ন যাবতীয় পদার্থও অধর্ম্ম। অর্থাৎ ঈশ্বর ও শাস্ত্র ধর্ম্ম, তদ্‌ব্যতীত সকলই অধর্ম্ম।

যে ধর্ম্ম জগতের মূল কারণ, যে ধর্ম্মে জগৎ অবস্থিত, যে ধর্ম্ম জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয়, এবং যে ধর্ম্মের অনাদরে জীবের ত্রিতাপ অবশ্যম্ভাবী, সেই জগদবলম্বন—জগদারাধ্য ধর্ম্মের তত্ত্ব কোথায় নিহিত রহিয়াছে, আমাদিগকে প্রথমেই তাহা খুঁজিয়া লইতে হইবে ; তৎপরে তৎপ্রাপ্তি-পন্থার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" ধর্ম্মের ঈশ্বরের—তত্ত্ব——যাথার্থ্য (ঈশ্বরসম্বন্ধীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত) গুহাতে নিহিত আছে। গুহা কি—পর্ব্বতগহ্বর ? সেথায় কি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত নিহিত রহিয়াছে ? তবে গুহা কি ?—হৃদয়ই গুহা। হৃদয়রূপ গুহাতেই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরসম্বন্ধীয় নিখিল বৃত্তান্ত নিহিত আছে।

হৃদয় চেতনাস্থান। এখানকার ক্রিয়ার দ্বারা জীব চেতনা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানোপস্থিত কার্য্যই বল, আর জ্ঞানকার্য্যই বল, সর্ব্ব-প্রকার চৈতন্য-কার্য্যই এখানকার ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়। এখানে অনাহতনামে দ্বাদশ-দল কমল বিরাজিত। তন্মধ্যে জীবাত্মা অবিদ্যা-সমাচ্ছাদিত হইয়া মানবকে সুখে ও দুঃখে লিপ্ত করিতেছেন। আর যিনি ভগবৎ-কর্ম্ম দ্বারা সুখদুঃখবির-হিত, বাসনা-বর্জ্জিত ও ঈশ্বরবশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন, তদীয় জীবাত্মা তখন নির্ম্মল হইয়া কোন শুভাশুভ কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন না।

কোন্ পথ অবলম্বন করিলে সেই সর্ব্বারাধ্য ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে?—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা," যে পথে চলিয়া, মহাজনগণ ঈশ্বরকে লভিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের পথ। সেই পথ অবলম্বন করিয়াই আমরা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইব।

"ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ।"

ইজ্যা, অধ্যয়ন (ঈশ্বরনিরূপক শাস্ত্রাদির অনুশীলন), দান (সৎপাত্রে অর্পণ), তপঃ (বিধ্যুক্তপথে শরীর শোষণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা প্রভৃতি চিত্তশুদ্ধিবিষয়ক ব্যাপার), সত্য (সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্। প্রাণিগণের হিতকর বাক্যই সত্য, কেবল যথার্থকথনই সত্য নহে।) ধৃতি, (সম্পদ্ ও বিপদে চিত্তের সমভাব), ক্ষমা, অলোভ, (বাসনা-

রাহিত্য, লোভ, জন্মান্তরীণ রাগ-জাত ব্যাধি, এতদাশ্রয়েই মানব, দুঃখাৎ দুঃখং লভে—নরকের পথ প্রশস্ত করে) ধর্ম্মস্যায়মষ্টবিধো মার্গঃ স্মৃতঃ, ধর্ম্মের এই অষ্টবিধ পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে অর্থাৎ এই অষ্টবিধ পথে গমন করিলে, ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। যজ্ঞাধ্যয়নাদি কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের স্থিরতা জন্মে ও চিত্ত নির্ম্মল হয়। কাজেই ধ্যানযোগে, নির্ম্মলান্তঃকরণে, ধর্ম্ম অর্থাৎ নি J শুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমেশ প্রতিভাত হন। এই হেতু ইজ্যাধ্যয়নাদি ধর্ম্মকর্ম্ম। বিধিবোধিত যে সকল কর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের অন্বেষণ করা হয়, তৎসমস্তই ধর্ম্মকর্ম্ম। যথা—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।" ইত্যাদি।

ধর্ম্মই মানুষের অবলম্বন; ইহ ও পরত্র ধর্ম্মই একমাত্র আশ্রয়। ধার্ম্মিক হইলে যম-যাতনা তিরোহিত হয়। মৃত্যু-সময়ে ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করে।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।"

সুতরাং অবিচলিত-চিত্তে নিরন্তর শ্রীভগবানের ধ্যানে রত ও তাঁহারই গুণগানে প্রমত্ত হও।

দ্বৈতবাদ উপাসনার অন্তরায়। তুমি সর্ব্বদেব-রূপ, তোমারই উপাস্যদেবে সংযুক্ত করিয়া, অভিলষিত পরম অভিরাম রূপ হৃৎকমলে নিরীক্ষণ কর, দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হও। তবে

বুঝি, তোমার উপাসনা অবিলম্বে মুক্তি-কন্যা প্রসব করিবে। নতুবা তোমার পূজা, হোম, কীর্ত্তন প্রভৃতি পণ্ডশ্রম মাত্র। তাহাতে ফলোদয় কি? ফল্‌গুর নীরের ন্যায় তোমার হৃদয়-ফল্‌গুর প্রেম-নীর ক্ষণস্থায়ী মাত্র। সে অস্থায়ী প্রেমে কি তুমি পরমপ্রেমময়ের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে? ভগবান্ বলিয়াছেন—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযোগস্য যোগিনঃ॥"
অনন্যচেতাঃ হও; তবে তাঁহার সান্নিধ্যলাভ।

বাল্যাবধিই ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ক্ষণভঙ্গুর জীবন, হয় তো কখন্ জীবন-বুদ্‌বুদ্ অনন্তে মিশিয়া যাইবে, কে তাহার নির্ণয় করিবে? মহাভারত এই হেতুই কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাদনিত্যং খলু জীবিতম্।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

শৈশবেই ধর্ম্মশীল হইবে, প্রোক্ত প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইল।

ধর্ম্মশীলতা মানব-জীবনের সর্ব্বপ্রধান ভূষণ। ধর্ম্ম মানবত্বের প্রধান পরিচায়ক। তদভাবে মানব পশুসদৃশ।

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ,
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো,
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"

ধর্ম্ম-হীন নর যদি পশুতুল্য, তবে মানবজীবন ধারণ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তাই বলি, তুমি সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মের আশ্রয় লও, পশুত্ব ঘুচিয়া তোমার মানবত্ব আসুক। যাহাতে তুমি যমযাতনাতীত হইতে পার, তাহারই জন্য যত্নশীল হও। নতুবা, শেষে নিশ্চয়ই বলিবে—

"শিশৌ নাসীদ্বাক্যং জননি! তব মন্ত্রং প্রজপিতুং
কিশোরে বিদ্যায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ।
ইদানীং ভীতোঽহং মহিষগলঘণ্টা-ঘনরবা-
ন্নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্?"

তাই বলি, তুমি সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর।

ওঁ

ঠাকুর শ্রীসতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
সংস্কৃতকলেজ, কিশোরগঞ্জ।

———

বঙ্গ-বধূর কর্ত্তব্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই মধুময়—জীবনময় ও সুখময় সময়ে যে জীব রুদ্ধগৃহে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের নবজীবনরূপ প্রভাত-মহিমা দর্শন না করে, তাহাকে মৃত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? এই শুভ সময়ে পুষ্পাদিনিঃসৃত-সৌরভসিক্ত, নব-পরিমলযুক্ত, নির্ম্মল শিশিরস্নাত, ঈষৎ শীতলতামিশ্রিত, নূতন তপন-কিরণসংযুক্ত, পবিত্র মৃদুল পবন-সেবনে বৈশল্যকরণীর ন্যায় অমৃতোপম এক অত্যাশ্চর্য্য আনন্দলাভ করত জীবন ও দেহ যেন নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। রোগ, শোক, তাপ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিদূরিত হয়; মনে যেন আনন্দের উৎস ছুটিতে থাকে। এই শুভ সময়ে গঙ্গাতীরে যাইয়া তর তর গতিশীলা পতিতপাবনী গঙ্গার জলে ভক্তিভরে অবগাহন করিয়া স্নান করিলে মনে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয়, এবং শরীরের শিরায় শিরায় কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোত বহিতে থাকে, তাহা বর্ণনীয় নহে। আজকালের দিনেও গঙ্গাতীরে প্রাতঃসময়ে সহস্র সহস্র নরনারী অবগাহন করিয়া থাকেন। অবশ্য বঙ্গনারীগণ হইতে পশ্চিমদেশীয়া মহিলার সংখ্যাই অধিক। তাই বলিয়া বঙ্গরমণীগণের নিকটও গঙ্গার মাহাত্ম্য

অল্পতর হয় নাই, এখনও ঘরে ঘরে রমণী-বদনে গঙ্গাস্তোত্র শুনিতে পাওয়া যায়—অন্ততঃ গঙ্গার প্রণামটি অনেকের কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। প্রাতঃকালে প্রত্যেক নদীর জলই গঙ্গাম্বুর সদৃশ, ইহাও শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং প্রত্যূষে যে কোনও নদীতে স্নান করা যায়, তাহাই গঙ্গাস্নানের তুল্য। এই কারণেই বোধ হয়, বঙ্গদেশের প্রত্যেক প্রধান প্রধান জনপদ নদীতীরে অবস্থিত; এমন কি, নদীবিহীন স্থানে কখনও বাস করিবে না, ইহাও পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন। হিন্দুরমণীগণ আবহমান কাল হইতে প্রাতঃস্নান করিয়া আসিতেছেন, শৈশবে "মাঘমণ্ডল" "যমপুকুর" প্রভৃতি ব্রতাদির জন্য কুমারীদের বাধ্য হইয়াই প্রত্যূষে কাক বক প্রভৃতির জলস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই অবগাহন করিয়া নদীতে স্নান করিতে হয়। গৃহস্থ-বধূদের ত বাধ্য হইয়াই সকলের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান করিতে হয়; বধূগণ স্নান না করিয়া কোনও কার্য্যই করিতে পারেন না; পাকের জিনিষ স্পর্শ করাই নিষিদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে প্রাতঃস্নানেই বধূদের প্রথম অবস্থায় স্বাস্থ্য ভাল থাকে। শেষে ক্রমে কর্ত্তৃত্ব পড়িলে অলস হইয়া প্রাতঃস্নানাদি পরিত্যাগ করিলেই বোধ হয় অনেক গৃহস্থ-বধূ রুগ্না হইয়া পড়েন।

প্রাতঃস্নান যেমন পুণ্যজনক, তেমনই সুখপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর। বঙ্গ-গৃহস্থ-বধূগণ এখন পর্য্যন্ত এই পুণ্য ও সুখকর প্রাতঃস্নান হইতে বর্জ্জিত হন্ নাই। আমরা পল্লীতে থাকিয়া এ সুখ হারাই নাই; সহরের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। সহরে ধর্ম্মকর্ম্ম, বাস-ব্যবস্থা, দান-

দক্ষিণা, আহার-বিহার সব ছোট করিতে হয়। কেবল বিলাসিতা, গাড়ী ঘোড়া, কাপড় চোপড়, বুট-কোট, ঘড়ি চেইন প্রভৃতিরই জাঁকজমক থাকে। বারমাসের তের পর্ব্বের এক পর্ব্বও থাকে না, বাড়ীর বদলে হয় বাসা; আতিথ্যের বদলে হয় হোটেল; দান-দক্ষিণার বদলে চাঁদা ইত্যাদি। যাঁহার বাড়ীখানা এক হাজার হাত দীর্ঘ, তাঁহার 'বাসা' হয় ত একুশ হাত মাত্র; সুতরাং সহরে আসিয়াই আমাদের অবরোধপ্রথা বৃদ্ধি হয়, বাড়ীতে আমাদিগকে যাঁহারা অবরুদ্ধ বলেন, তাঁহারা ভয়ানক ভুল করেন। বঙ্গ-নারীগণ কখনও অবরুদ্ধ নহেন, হিন্দুদের কখনই অবরোধপ্রথা ছিল না, আমরা চিরমুক্ত, তীর্থে, দেশপর্য্যটনে, ব্রতে, উৎসবে আমাদের গতি অপ্রতিহত। আমরা স্বাধীনভাবে নদীতে স্নানাদি করিতে পারি, প্রাতঃস্নান আমাদের নিত্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। গ্রামে তাহার বাধা নাই;—তবে সহরে পুরুষ-প্রধান স্থানে রমণীগণের সে সুবিধা হইতে পারে না।

আমরা নারী, নারীসমাজেই আমাদের সমাজ, তাহাই আমাদের প্রিয় স্থান। আজ পর্য্যন্ত এই বঙ্গদেশে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেক গৃহস্থ-রমণীগণ বিবিধ কথোপকথনে নির্ভয়মনে আপন আপন গ্রামসমীপস্থ নদীতে অবগাহন ও সন্তরণ করিতেছেন। নদীবহুল বঙ্গদেশ হইতে এ মনোহর দৃশ্য এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। মেঘনা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, খোয়াই, গঙ্গা প্রভৃতি অতীব ভীষণ নদীতেও রমণীগণ প্রতিনিয়ত অবগাহন ও সন্তরণ করিতেছেন, প্রভাতসময়েই এ দৃশ্য বহুল পরিমাণে

দেখিতে পাওয়া যায়। * প্রাতঃস্নান করিতে হইলেই প্রাত-রুত্থান করিতে হয়। প্রাতরুত্থান অতি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বস্তুতঃ এ সময়ে সকলেরই একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, যাঁহারা ঐ সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠেন, তাঁহারাই এই শুভ মুহূর্ত্তের শুভফল ভোগ করিতে পারেন। কতকগুলি অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রাতঃকালেই করিতে হয়, এই সময়ে না করিলে আর ভালরূপে হইতে পারে না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই স্নান, সন্ধ্যা, পুষ্পচয়ন, ধূপদান, ইষ্টপূজা, ধ্যান, আরাধনা, যোগ, শিক্ষা, স্তোত্রপাঠ, প্রাঙ্গনে গোবরদান, দন্তমার্জ্জন, ননীতোলা, জলতোলা, গৃহ-মার্জ্জন, গো-গৃহ-মুক্ত-করণ, পূজোপকরণ ও বর্ত্তনাদি মর্দ্দন প্রভৃতি বহুবিধ কাজ আমাদিগকে করিয়া লইতে হয় এবং প্রাতঃকালেই দৈনন্দিন কার্য্যের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। ক্রমেই শিশু ও রোগী বা বৃদ্ধদের পথ্যাদি অতি সাবধানে পবিত্র-

---

* প্রকৃতপক্ষে নদীবিহীন স্থান বাসের কখনই যোগ্য নহে। মানবের যেরূপ রক্ত-বাহিনী ধমনী রুদ্ধ বা নষ্ট হইলে রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া মানবদেহ বিনষ্ট বা বিবশ করিয়া তুলে, তদ্রূপ নদীপথ রুদ্ধ হইলে অথবা নদী না থাকিলে দেশের ভয়ানক অমঙ্গল ও অনিষ্ট হইয়া থাকে। এক দিকে নদীসিক্ত নির্ম্মল বায়ু পাওয়া দুষ্কর হয় এবং অপর দিকে দেশের অস্বাস্থ্যকর বৃষ্টি-ধৌত বিষাক্ত ময়লাদি বহির্গত হইতে না পারিয়া দেশকে নানা পীড়ার জন্মভূমি করিয়া তুলে। পুকুর সংস্কার না করিয়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সংস্কার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। বঙ্গদেশ নদীবিহীন হইতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রায় লোপ পাইতেছে, তাই সর্ব্বপ্রকার পীড়ারও সৃষ্টি হইতেছে। নদীতীরে গবাদি পশুর খাদ্য সৃষ্ট হয়, পথিকের বিশ্রামের পান্থনিবাস হয়, নৌকা-পথচলাচলে মহিলাদের সুবিধার ত সীমাই নাই; দেশে বাণিজ্যের বিস্তার হয়। একটী তড়াগখননে যে পুণ্য হয়, একটী নদীখননে তাহার সহস্রগুণ পুণ্যসঞ্চয় হইতে পারে। দেশের ধনী, মানী, জ্ঞানী, মহাত্মাদিগকে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করি, আমার মত অজ্ঞানা রমণীর বাক্যে একটু মন দেন। গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করুন্।

ভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। শিশুদের প্রতি অতি মিষ্ট-বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদের পাঠ্য নির্ণয় করিয়া দিতে হয়। বাসী বস্ত্রাদি ধৌত পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতেই রৌদ্রে দিতে হয়। গৃহপালিত পশু-পক্ষিগণকেও প্রাতঃকালে একবার স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিতে হয়। এইরূপ বহুবিধ কার্য্য প্রাতেই সম্পাদন করিয়া রাখিতে হয়; নতুবা শেষে আর কোন কার্য্যই সম্পাদন করা যায় না।

প্রাতেই দিবসের খাদ্যাখাদ্য—তিথিবিশেষে নিষিদ্ধ-পদার্থ জানিয়া রাখিতে হয়। খাদ্যাখাদ্য-বিচার-জ্ঞান থাকা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য; ব্রত উপবাসাদি জানিয়া রাখা, পূজোপকরণ প্রস্তুত করা, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যত্ন করা, প্রাতে পানীয় জল সংগ্রহ করা একান্তই আবশ্যক। চিত্তসংযম, জপ ও ঈশ্বর-ধ্যান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত; আমার একটী আত্মীয় এম, এ। তিনি বলেন, যে দিন সুনিয়মে প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সে দিন তাঁহার জটিল কার্য্যও সহজে সম্পন্ন হয়, সকল অকল্যাণ কাটিয়া যায়, প্রাতঃসন্ধ্যাই সমস্ত দিনের শুভাশুভের পূর্ব্বলক্ষণ। মানব মাত্রেরই পূর্ব্বাহ্নে ঈশ্বর-উপাসনা করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী, দেব দ্বিজ ও গুরুজনকে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে অভিবাদন করিয়া সাংসারিক কার্য্যে পশ্চাৎ নিযুক্ত হইতে হয়, ইহাই আমাদের শাস্ত্রের আদেশ। যেমন অগ্নি-সংযোগে ধাতুসমূহের মালিন্য দগ্ধ হয়, তদ্রূপ ভক্তি দ্বারা গুরু ব্যক্তিদের মনোমালিন্য দূর হইয়া

যায়—বিরোধ কাটিয়া যায়—তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করা যায় ; ভক্তি দ্বারা গৃহ আনন্দ-উদ্যান হইয়া উঠে। আমরা গৃহিণী, গার্হস্থ্যই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম, এ ধর্ম্মের সাধন বড় কঠিন, এ কঠিন বিষয়ের প্রায় ষোল কলাই আমাদের উপর ন্যস্ত, আমাদের অজ্ঞতায়—অলসতায়—চঞ্চলতায়—বাচালতায় ও আচারহীনতায় সমূলে গৃহ-ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, সুতরাং গার্হস্থ্যধর্ম্ম-নীতিতেও আমাদের জ্ঞান থাকা অতি প্রয়োজনীয় বটে। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে জগৎ পোষণ করে—অতিথির আশ্রয় দেয়—পিতৃ-লোকের উদ্ধার করে—সংসার স্বর্গ করিয়া তুলে। পিতৃ, দেব, মুনি, মানব, ভূত, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কৃমি, কীট, গো, পশু, পক্ষী, বায়স, পতঙ্গ, বিহঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, ধান্য, তৃণ, সরীসৃপ, এমন কি, পিপীলিকা ও মৎস্যাদি জলজন্তুগণও জীবিকার্থ গৃহস্থকেই আশ্রয় করে এবং গৃহস্থের নিকট সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। কোটি কোটি জীব গৃহস্থের মুখ নিরীক্ষণ করিতে থাকে ; কুক্কুর বিড়াল ও গবাদি পশু এবং গৃহপালিত হংসাদি পক্ষীকে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, আমাদের জন্যই আহারাদির অপেক্ষা করিতেছে, পিপীলিকাগণও আমাদের নিকট খাদ্যার্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। বৃক্ষাদিও অব্যক্তভাবে যেন আমাদের নিকট জলাদি প্রার্থনা করে। একটুকু সামান্য মনোনিবেশ করিলেই এদের হাব-ভাব যেন হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে, ইহারাও যেন আমাদের যত্ন ও দয়ার জন্যই ভিক্ষার্থী হইয়া চাহিয়া আছে, বুঝিতে

পারি। অনেক স্থানে (তীর্থক্ষেত্রেই অধিক) দেখিয়াছি, জলের নিকটে যাওয়া মাত্রই কচ্ছপাদি মৎস্যগুলি ভিক্ষার্থী হইয়া গলা বাড়াইয়া যেন আহার চাহিতেছে—তাহারা নির্ভয়ে গৃহস্থ-দত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদিগকে আহার দেওয়াও পুণ্যকার্য্যের একটী অঙ্গ। তীর্থগুরুগণ ইহাদিগকে আহার দিতেই আদেশ করিয়া থাকেন। এই যে লক্ষ লক্ষ জীবের আহারদাতা গৃহস্থ ও গৃহিণীগণ, তাঁহাদের কত কঠিন কার্য্যের ভার বহিতে হয়, একবার ভাব দেখি। প্রাচীনাগণ ভূমিকে প্রণাম করিয়া বাহির হন, বৃক্ষকে প্রণাম করিয়া উদ্যানে যান, তুলসীকে প্রণাম করিয়া তাহার পতিত পাতা কুড়াইয়া লন, নদীকে প্রণাম করিয়া অবগাহন করেন, গাভীকে প্রণাম করিয়া দোহন করিতেছেন, মণ্ডপকে প্রণাম করিয়া মধ্যে প্রবেশ করেন ইত্যাদি বহু বিষয়েই তাঁহারা ধর্ম্মের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আমরা তাহা বুঝি না বলিয়াই পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করি। বাস্তবিক তোমার যেরূপ প্রাণ, ঠিক বৃক্ষাদিরও তদ্রূপ প্রাণ আছে, রক্ত আছে—সুখ দুঃখ আছে; তোমায় আর তৃণে কিছুই প্রভেদ নাই. তুমিও যেরূপ ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রাণময় পদার্থ, তৃণ-গুল্মাদিও তাঁহারই সন্তানস্বরূপ জীবনময় বস্তু। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং তৃণও আমাদের মত দেহী জীব, তাহাকে প্রণাম করিলে দোষ কি? ঈশ্বর সর্ব্বময়, তৃণেও ঈশ্বর আছেন; তবে ত ঈশ্বরকেই প্রণাম করা হইল, সে বিষয়টা আমরা বুঝিতে পারি কৈ?

প্রাচীন কালে মুনিগণ তুলসী বৃক্ষের ন্যায় অন্যান্য বৃক্ষকেও সজীব প্রাণী জ্ঞানে তাহাদিগকে ছেদন করিতেন না অথবা পীড়াও দিতেন না। শুক-মুখ হইতে পতিত নীবারই ভক্ষণ করিতেন। সেই সর্ব্বজীবে সমভাব আমরা অনুভবই করিতে পারি না। আমরা তুলসী গাছ যেরূপ ছেদন বা ভগ্ন করা গুরুতর পাপ মনে করি, তদ্রূপ প্রত্যেক বৃক্ষাদিতেই সেই ভাব আমাদের (গৃহিণী-দের) রাখা কর্ত্তব্য। রমণীগণ দয়ার মূর্ত্তিস্বরূপিণী, পুরুষ কঠিন হইতে পারেন—ললনাগণ কঠিন হইতে পারেন না, মায়া-বতী—দয়াবতী সতীগণ সর্ব্বদাই পরদুঃখকাতরা—কোমলপ্রাণা —স্নেহপরায়ণা। এই অকৃত্রিম-স্নেহবতী বলিয়াই তাঁহারা পরদুঃখ দর্শন করিতে পারেন না, বিশেষতঃ স্বামীর দুঃখে তাঁহারা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন—স্বামীর মৃতদেহ দর্শন করিতে না করিতেই গতপ্রাণ হইয়া যান, তাঁহাদের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া যায়। তখন দেহকে খণ্ড খণ্ড কর বা অগ্নিতে ভস্ম কর, সে বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একটি বিংশতি বৎসরের মৃত যুবককে নৌকায় তুলিয়া শ্মশানে লইয়া গেল, তাহার ষোড়শী পত্নী ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িয়া গেলেন, তখন কেহ দেখিতে পায় নাই, বহুক্ষণ পরে খোঁজ হইল, জলের নীচে যেন মানুষ পড়িয়া মরিয়া আছে। তুলিয়া দেখে, সেই অভাগিনী বিগত-চেতনা পতি-গত-প্রাণা নব-বিধবা। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহার উদরে এক বিন্দুও জল প্রবেশ করে নাই—জলে কি স্থলে পড়িয়াছে, কি ঘুমাইয়াছে,

কি স্বামিসঙ্গেই গিয়াছে, কিছুই তাহার জ্ঞান নাই। তখন তাহাকে স্বামী সহ দাহ করিলেও তাহার জ্ঞানের উদয় হইত কি না, ঠিক বলিতে পারি না। পরম সাধ্বীগণই সে মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন।

কেহই যুবতী বিধবার স্বর্গারোহণে দুর্ল্লভ সুখ বুঝিতে, কি ধারণা করিতেও পারেন না; তাই সহগমনে বাধা দিয়া সংসার-সুখে আসক্ত করিতে চেষ্টা করেন। অনেক চেষ্টায় মৃতকল্পা বিধবার চৈতন্য হইল, কিন্তু উন্মাদিনীর ন্যায় তাহাকে বহুদিন "অচেতনে ছিলাম ভাল, চেতন হয়ে প্রাণটি গেল" ইত্যাদি প্রলাপ বকিতে হইয়াছিল। এই ঘোর কলিতেও বঙ্গগৃহ হইতে স্বামি-প্রেম—স্বামি-ভক্তি ও স্বামি-স্নেহ বিলুপ্ত হয় নাই; এখনও প্রতিনিয়ত বঙ্গকুল-বধূ সতী ভগিনীগণ স্বামি-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। ভারত ব্যতীত—হিন্দু-গৃহ ব্যতীত—প্রকৃত আর্য্য-রমণী ব্যতীত আর কোথায়ও এ শুভ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই আমার প্রবন্ধ শেষ হইতে না হইতে এক সাধ্বী রমণী পতি-প্রেমের—পাতিব্রত্যের অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইলের অধীন বেতকা গ্রামের অবিনাশচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের পত্নী সতী-শিরোমণি দেবী রাজ-রাজেশ্বরী এই কলিকাতায় আসিয়া পতিহারা হন। মৃতদেহ নিমতলার শ্মশান-ঘাটে গঙ্গাতীরে দাহ করাইবার সময়ে যুবতী স্বামীর দেহে দেহ—হৃদয়ে হৃদয়—আত্মায় আত্মা মিশাইয়া

স্বামীকে আলিঙ্গন করিতে করিতে শিশুপুত্রকেও ভুলিয়া গিয়া অকুতোভয়ে পরমসুখে হৃষ্টমনে প্রজ্বলিত শ্মশান-হুতাশনে স্বীয় দেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অগ্নিদেব যেন তাঁহাকে শীতাংশুর ন্যায় শীতল ক্রোড়েই আশ্রয় দিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য ঘোর শোক-তাপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অগ্নিক্রোড়ে থাকা কালীন তাঁহার কিছুমাত্র সন্তাপও বোধ হয় নাই। কিন্তু এই মঙ্গলময়—চির-শান্তিময় স্বর্গীয় কার্য্যেও মানবগণ পাশববলে—পুলিশ-বলে বাধা দিয়াছিলেন। এই বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীকে মুক্তিপ্রদ স্বর্গ-সোপান-স্বরূপ জ্বলন্ত শ্মশানকুণ্ড হইতে—স্বামীর সুপবিত্র দগ্ধীভূত জড়িত শবদেহ হইতে মহাবলে সকলে টানিয়া আনিয়া ফেলিলেন। এখন তিনি বহু শুশ্রূষায়, বহু যত্নে জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁহার স্বামিভক্তির—তাঁহার সতীত্বের তুলনা নাই—তিনি পিতৃকুল, পতিকুল এবং বঙ্গরমণীকুল উদ্ধার করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার জন্য ধন্য হইয়া তাঁহাকে শত শত প্রণিপাত করিতেছি। তাই বলি, আমাদের কর্ত্তব্য বড় মহৎ—বড় কষ্টসাধ্য—এমন কি, অসাধ্য বলিতে পারি।

আমাদের প্রত্যেক জিনিষের—প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গৃহস্থ-গৃহে যেন একটী লোকও অপরিতুষ্ট না থাকে। একটী গুল্মতৃণও যেন যত্নের অভাবে কষ্ট না পায়, গৃহস্থ-রমণীগণ যেন কাহারও প্রাণে আঘাত না দেন—বৃক্ষ হইতে অকালে অসময়ে অপক্ক ফল ভাঙ্গিয়া না লন—সমস্ত

প্রাণী—এমন কি, বৃক্ষাদিও যাঁহার যত্নে পরিপুষ্ট হন, তিনিই প্রকৃত গৃহিণী—প্রকৃত রমণী—গৃহিণী অন্যকে ভোজন না করাইয়া কখনও নিজে ভোজন করিবেন না। জলে রূপ দেখিবেন না, কর্দ্দমে ধাবিত হইবেন না, অশুচি হইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিবেন না, নৃত্য-গীত ও বাদ্যে প্রিয় হইবেন না, অপ্রিয় ও অসত্য কথা বলিবেন না, অগ্নিতে পাদ উত্তপ্ত করিবেন না, একাকী পথভ্রমণ করিবেন না, দীর্ঘকাল ভোজন করিবেন না, মাংস আহার করিবেন না, পথে, কলসীতে, ভস্মে, জলে প্রস্রাবাদি ত্যাগ করিবেন না। উভয় সন্ধ্যায় ভোজন বা শয়ন করিবেন না, কখনও প্রাণিহিংসা করিবেন না। অঞ্জলি করিয়া জল পান করিবেন না। দিবাতে নিদ্রাগত হইবেন না। সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগাইবেন না। স্তনপানরত বালকের মুখ দর্শন করিবেন না, হাঁটিতে হাঁটিতে স্তন্য দিবেন না, রাত্রিতে তৃপ্তি শেষ করিয়া আহার করিবেন না। ধাতুপাত্রে পাদস্পর্শ করিবেন না।- অন্যের বস্ত্র, গামছা, পাদুকা, আসন ব্যবহার করিবেন না, ভগ্ন পাত্রে আহার করিবেন না, দূষিত স্থানে উপবেশন করিবেন না, গোপৃষ্ঠে আরোহণ করিবেন না, প্রেত-ধূম সেবন করিবেন না, স্নান করিয়া তৈলমার্জ্জন করিবেন না, যাইতে যাইতে কেশ মুক্ত করিবেন না, হস্তদ্বয় পদদ্বয় কম্পিত করিবেন না। স্নান-বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবেন না, দন্ত দ্বারা নখ ও লোম উৎ-পাটন করিবেন না, যাহা ভবিষ্যতের অযোগ্য, সে কর্ম্ম আজও করিবেন না। বৃথা আলাপ, বাদানুবাদ এবং অজ্ঞের সহিত

ধর্ম্মালাপ করিবেন না। কখন ক্রীড়া করিবেন না, নগ্ন হইয়া শয়ন করিবেন না। হস্তে করিয়া পরিবেশন করিবেন না, হস্তে অন্ন রাখিয়া খাইবেন না, কর, চরণ ও মুখ ধৌত করিয়া আর্দ্র থাকিতে থাকিতে ভোজন করিবেন। কখনও চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিবেন না, দাঁড়াইয়া জল খাইবেন না। শিরে উচ্ছিষ্ট লাগাইবেন না। তুষ, ভস্ম, কেশ ও কঙ্করের উপরে অধিবেশন করিবেন না।

পতিতের সহিত বাস করিবেন না, দুই হাতে শির কণ্ডূয়ন করিবেন না। কর দ্বারা প্রহার করিবেন না। অন্যের ধার রাখিবেন না, নিজের অপমান প্রকাশ করিবেন না। উদ্যমশীলা রমণীগণই লক্ষ্মী ও বিদ্যাবতী হয়। সর্ব্বদা উৎসাহ রাখিবেন। বাক্যবেগ, মনোবেগ এবং জিহ্বা-বেগ দমন করিবেন। পাদ-ধৌত জল, মূত্র, উচ্ছিষ্ট, উদক, নিষ্ঠীবন ও শ্লেষ্মা গৃহ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন। অদ্রোহবতী হইবেন। বৃদ্ধ ব্যক্তির বন্দনা করিবেন। কাহারও কদাপি নিন্দা করিবেন না। প্রত্যহ কিছু দান করিবেন। মিথ্যার মত স্ত্রীলোকের শত্রু নাই। পুষ্প, গো, দুগ্ধ, সুগন্ধ, দধি, মণি, গৃহ ও ধান্যগ্রহণে অনিচ্ছা করিবেন না। অদানে আয়ুঃক্ষয় হয়; দান করিবেন। মধু, ফল, মূল, কাষ্ঠ নিকৃষ্টের নিকট হইতেও গ্রহণে দোষ হয় না। পতিব্রতারা স্বামী ভোজন করিলে ভোজন করিবেন, স্বামী নিদ্রিত হইলে নিদ্রা যাইবেন। স্বামীকে কখনও জাগরিত করিবেন না। স্বামী বিদেশে গেলে

অলঙ্কার ধারণ করিবেন না। স্বামীর পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য নাম উচ্চারণ করিবেন না। পরপুরুষের নাম স্মরণও করিবেন না। স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়াও প্রসন্ন থাকিবেন। স্বামী আহ্বান করিলে গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহার নিকট আসিবেন। বার বার দ্বারদেশে গমন বা উপবেশন করিবেন না। অদাতব্য বস্তু কাহাকেও দিবেন না। স্বয়ং পূজার উপকরণ ও ইষ্ট-অন্ন প্রস্তুত করিবেন। সমাজ-উৎসব-দর্শন বর্জ্জন করিবেন। অন্যের বিবাহ দর্শন করিবেন না। সুখসুপ্ত, সুখাসীন ও গ্রন্থগত স্বামীকে উত্থাপিত করিবেন না, স্ত্রীধর্ম্মিণী হইয়া ভর্ত্তাকে দর্শনও করিবেন না এবং কথাও শুনাইবেন না। স্বামীকে ধ্যান করিয়া সূর্য্য দর্শন করিবেন। হরিদ্রা, কুঙ্কুম, সিন্দূর, কজ্জল, তাম্বূল, কবচ, শুভ মাঙ্গল্য আভরণ, কেশভূষণ, কর-কর্ণাদিভূষণ স্বামীর আয়ুষ্কামনায় সর্ব্বদা ধারণ করিবেন। ভর্ত্তৃবিদ্বেষিণী অন্য রমণীর সহিত আলাপও করিবেন না। কখনও একাকিনী থাকিবেন না। নগ্নাবস্থায় স্নান করিবেন না। উদূখল, মূষল, বর্দ্ধনী, পাষাণ, যন্ত্র ও চৌকাঠে উপবেশন করিবেন না। প্রগল্‌ভাচরণ করিবেন না। স্বামি-বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না। পতি ক্লীব, দুরবস্থ, ব্যাধিত, বৃদ্ধ, সুস্থির, দুঃস্থির যাহাই হউন্, পতিব্রতা তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবেন না। ঘৃত, লবণ, হিঙ্গু প্রভৃতি ফুরাইলেও নাই বলিবেন না। লৌহময় পাত্র দ্বারা কখনও পরিবেশন করিবেন না। পতিব্রতা স্নানার্থিনী হইয়া পতিপাদোদক পান করিবেন। পতি-

বাক্যে ক্রোধ-পরায়ণা নারী পরলোকে কুক্কুরী-জন্ম লাভ করে।

সাধ্বী রমণীগণ উচ্চাসনে উপবেশন করিবেন না, পরগৃহে বেড়াইতে যাইবেন না। কদাচ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিবেন না। উচ্চভাষণ বা উচ্চ হাস্য করিবেন না। গুরুজনকে আহ্বান করিয়া ডাকিবেন না।

গুরুজনকে না দিয়া মিষ্টদ্রব্য ভোজন করিলে জন্মান্তরে কেকরাক্ষী হইয়া থাকে। পতিব্রতার পুণ্যবলে যে প্রকার পতিকুল, পিতৃকুল উদ্ধার হয়, তদ্রূপ দুর্বৃত্তা রমণীরা স্বীয় শীলভঙ্গে পিতৃ মাতৃ ও পতিকুলকে পতিত করিবার কালে দুঃখ ভোগ করে। ভার্য্যাই গৃহস্থের মূল, ভার্য্যাই সুখের মূল, ভার্য্যাই ধর্ম্মফলের নিদান এবং ভার্য্যাই সন্তান-বৃদ্ধির কারণ; ইহলোক এবং পরলোক ভার্য্যাদ্বারাই জয় করা যায়, ভার্য্যাদ্বারা গৃহস্থের গৃহে দেব, পিতৃ ও অতিথিগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। যাঁহার গৃহে পতিব্রতা নারী আছে, তাঁহাকেই গৃহস্থ বলা যায়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, যেমন গঙ্গাবগাহনে শরীর পবিত্র হয়, তেমনি পতিব্রতাকে দেখিলে গৃহ পবিত্র হয়। এখন ভাব দেখি ভগিনীগণ! আমরা কেহই কি ভার্য্যাশব্দের যোগ্য হইতে পারি? আমরা গৃহিণীপদ কিরূপে লাভ করিব? আমরা ত সামান্য ভাবেও ভার্য্যার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে শিক্ষালাভ করি নাই। শ্বশুর-শাশুড়ী ও পিতামাতার শুশ্রূষার ধার ধারি না, অতিথির সেবায় মন দেই না, গৃহদ্রব্য লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিয়া

রাখি, দেবার্চ্চনায় যোগদান করিতেও জানি না—সত্যবাক্য—প্রিয়বাক্য এ অযোগ্য রসনা ধারণাও করিতে পারে না—তথাপি আমরাই সুগৃহিণীরূপে পরিচয় দিতে উদ্যত হই।

গোরক্ষণ।

গো-গণ যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অধীন এবং তাহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা যে ঠিক মানবের ন্যায় সম্পাদিত ও নিবৃত্ত হয়, তাহা কয়জন চিন্তা করিয়া থাকেন?

আমাদিগের আহার্য্য ময়দা বা চাউল, ডাইল, তৈল, লবণ। এই সকল দ্রব্য নিত্য আহার না করিলে আমাদিগের শরীর বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইতে পারে না। ইহার একটির অভাব হইলেই শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল—ক্ষীণ, অবস হইয়া পাড়ে। গো-শরীরের জন্যও ঠিক সেইরূপ ঐ সকল দ্রব্য অত্যাবশ্যকীয়। ময়দা বা চাউলের পরিবর্ত্তে আমরা তাহাদিগকে খড়, ডাইলের পরিবর্ত্তে ভূষি, তৈলের পরিবর্ত্তে খৈল ও লবণ দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার একটির অভাব হইলে গো-শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইবে;—অবশেষে গো জীবন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে।

মানবগণ যেমন চাউল, ডাইল, তৈল, লবণ ভিন্ন তরিতরকারী, শাক, আম, কাঠাল প্রভৃতি ফল, আলু, মূলা, ওলকপী,

শালগম প্রভৃতি মূল ব্যবহার করিয়া থাকেন, গোজীবনের জন্যও তদ্রূপ তরিতরকারী, শাক, ফল ও মূলের প্রয়োজন।

এমন কি, মানবশরীরের জন্য যেমন শর্করা ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ গোশরীরের জন্যও গুড় বা চিনি মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা আবশ্যক।

শুক্তির মধ্যে মুক্তা হয়। পাথুরিয়া কয়লার খনিতে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড উৎপন্ন হয়। সেইরূপ মানবের আহার্য্য দ্রব্যের পরিত্যক্ত অংশ আহার করিয়া গোগণ অমূল্য দুগ্ধ প্রদান করে। দুগ্ধ মানবের আহার্য্য জিনিসের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু। ময়দা, চাউল, ডাইল, মাংস, তরিতরকারী, মৎস্য এই সমস্ত জিনিসে মানবশরীর-রক্ষার যে সমস্ত উপাদান আছে, তাহা কেবল এক গোদুগ্ধেই আছে।

কেবল দুগ্ধপান করিয়া মানবশিশু পুষ্ট হইয়া বিরাট মানব-সমাজ সৃষ্টি করে।

পরিণত বয়সেও মানুষ কেবল দুগ্ধপান করিয়া সবল, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ থাকিতে পারে। ইহাতে শর্করা, লবণ, চর্ব্বি প্রভৃতি মানবশরীর-পোষণের উপযোগী সমস্ত দ্রব্য বিদ্যমান আছে। পার্থিব অন্য কোন একটী দ্রব্যে এইরূপ মানবশরীর-পোষণের উপযোগী সমস্ত পদার্থ নাই।

শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৺শ্যামসুন্দর দেবের আখড়ার ইতিহাস।

(৩০ পৃঃ পর)

বাঙ্গালা ১১০৫ সনের কার্ত্তিক মাসে এক প্রবল ঝড় হইয়াছিল; তখন এই ক্ষীণকায়া নরসুন্দা নদীর বিস্তার এক মাইল ছিল, পারঘাটে সেই দিবস পারাবার বন্ধ ছিল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রবল তরঙ্গ পর্ব্বতাকারে খেলা করিতেছিল। সেই দিবস কিশোরগঞ্জ ৺ শ্যামসুন্দরের আখড়ার স্থাপনকর্ত্তা গোস্বামীপাদ ব্রজবল্লভ, অকিঞ্চন ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া ঐ নদীর পূর্ব্বপারে উপস্থিত হইলেন, মাঝী পার করিতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহারা সকলের অলক্ষিতে নদী পার হইলেন। তখন তাঁহারা পূর্ব্বকথিত রাখাল-বৃক্ষের নীচে আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা সঙ্গে বিগ্রহ আনিয়াছিলেন, বেদীর উপর বিগ্রহ রাখিয়া স্নান, সন্ধ্যা, আরতি সমাপন করিলেন। ঐ সময় সেই অরণ্য এক স্বর্গীয় সৌরভে বিমোহিত হইল, একমাত্র উমর খাঁ* ঐ সৌরভ উপভোগ করিলেন। তাঁহারা দেবতার ভোগাদি সম্পাদন করিয়া উভয়ে বেদীর উপর রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে ব্রজবল্লভ গোস্বামী ও অকিঞ্চন ঠাকুর বিলে স্নান করিলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া রাখাল-বৃক্ষমূলে

---

* উমর খাঁর সহিত আখড়ার ইতিহাস বিশেষরূপে জড়িত।

বসিয়াছেন, এমন সময় রাখালগণ গো-পাল সমভিব্যাহারে তাহাদের নিত্য-ক্রীড়ার স্থান নিম্ববৃক্ষ-সন্নিকটে উপনীত হইল এবং বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে দেখিল, তাহাদের বেদীতে দুই জন সাধু বসিয়াছেন। সাধুদের তেজঃপুঞ্জপূর্ণ কলেবর, হরি মন্দিরাঙ্কিত সুপ্রশস্ত ললাট; সর্ব্বাঙ্গ-বিভূষিত হরিনামাবলী, বৈষ্ণববেশোপযোগী পরিধেয় বসন। সাধুদের দেহপ্রভায় বনভূমি প্রভান্বিত। রাখালগণ ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। ব্রজবল্লভ গোস্বামী কহিলেন, বৎসগণ! আমরা তোমাদের খেলার স্থান অধিকার করিয়াছি। আর দুই দিন মাত্র এখানে থাকিবার ইচ্ছা, যদি তোমাদের কোন অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে আমরা পরমসুখে থাকিতে পারি। সর্ব্বকনিষ্ঠ রাখাল কহিল, থাক, তোমরা চিরদিন এখানে থাক, তোমরা এখানে থাকিলে এ স্থান পবিত্র হইবে। তোমাদের পবিত্র সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা পরম আনন্দে খেলা করিব। আর তোমরা যাবে কোথায়? অকিঞ্চন কহিলেন, আমরা তীর্থপর্য্যটনে যাব। সর্ব্বকনিষ্ঠ রাখাল কহিল, কেন? তোমরা তীর্থে যাবে কেন; তোমরা এখানেই থাক; তোমরা এখানে থাকিলে ইহাই তীর্থস্থান হবে, তোমাদেব দর্শন লাভ করিয়া অগণিত পাপী উদ্ধার হবে। আর তোমাদের মনোবাসনা এখানেই পূর্ণ হবে। এখানকার সুন্দর বন; বৃন্দাবন বলে ভ্রম হয়। তবে রাধাকৃষ্ণ নাই। তা তোমাদের মত সাধক এখানে থাক্‌লে গোলোক-বিহারী হরি গোলোক পরিত্যাগ করে এই ভূলোকে এসে

তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর্‌বেন; আমি গো-পাল; আমার কথা রাখ, তোমরা এখানেই বাস কর। একদিন নন্দদুলাল হরি এই গোরাখালদের কথানুসারে কত কাজই না করেছিলেন; তবে বলতে পার, আমি কৃষ্ণসখা রাখাল নহি, তোমরাও ত কৃষ্ণ নও। এখন যাই; গরু চরাই গে; আবার আস্‌ব; খুব চিন্তা করে দেখ; যা বল্‌ছি, যা বলে যাই, বেশ ধারণা করে দেখো; তোমাদের এখানেই থাক্‌তে হবে; এখানে থাকবার জন্যই এসেছ; এখন যাই। এই বলিয়া রাখালগণ চলিয়া গেল। অকিঞ্চন কহিলেন, প্রভো! রাখাল-বালক কি সুমধুর স্বরে বিশুদ্ধ ভাষায় আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ধাঁ করে চলে গেল। আমি যে এর কথার মর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লেম না। ব্রজবল্লভ গোস্বামী কহিলেন, বৎস অকিঞ্চন! সময়ে সবই বুঝ্‌তে পার্‌বে, ধৈর্য্য ধারণ কর; উতলা হইও না। এইভাবে রাখাল-সহবাসে চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত।

সাধুদ্বয়ের মহিমা পুষ্পসৌরভের ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে প্রবাহিত হইল। তদানীন্তন জমিদার চন্দ্রনারায়ণ দাস চৌধুরী লোকমুখে সাধুর গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ঐ রাখাল-বৃক্ষমূলে উপনীত হন। সাধুদ্বয়ের সহিত কথোপকথনে পরম সন্তোষ লাভ করেন এবং ঐখানে বাস করিবার জন্য বিনয়নম্রবচনে অনুরোধ করেন। সাধুদ্বয়ও বৃদ্ধ জমিদারের কৃষ্ণভক্তি ও সদাচার দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হন। যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন, এই স্থান তাঁহার অধীন। তিনি নিজে জমিদারী

পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার ভ্রাতা উদয়নারায়ণ চৌধুরী বর্ত্তমান সময়ে জমিদারীর মালিক; সুতরাং তিনি নিজে ইহা দান করিতে পারেন না—তাঁহার ভ্রাতাকে বলিয়া ঐ স্থানের জন্য এক সনন্দ পাঠাইয়া দিবেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে উদয়-নারায়ণ চৌধুরী সাধু দর্শন করিতে আগমন করেন এবং সাধু দর্শন করিয়া ঐ স্থানে বাস করিবার জন্য সাধু দুই জনকে সভক্তি অনুরোধ করেন। নিজব্যয়ে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যান। মুসলমান জমিদার সাজাওর খাঁ হিন্দু সাধুদের অলৌলিক মহিমা শ্রবণ করিয়া একজন পাইক দ্বারা সাধুকে ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু সাধু তাহাতে অস্বীকার করেন। সাজাওর খাঁ মনে কবিলেন, সামান্য বৈষ্ণব আমার আদেশ গ্রাহ্য করিল না! নিজে বড়ই অপমান জ্ঞান করিলেন। তৎপর দুই জন পাইক পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, সাধুর প্রতি যেন কোন অত্যাচার না হয়। দুই জন পাইক সাধুসকাশে উপস্থিত হইয়া কহিল, জমিদারের আদেশ, তোমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবা। ব্রজবল্লভ গোস্বামী কহিলেন, বৎসগণ। আমরা উদাসীন বৈষ্ণব, রাজা জমিদারের সঙ্গে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, তবে তিনি এখানকার জমিদার, তাঁর আদেশ অবশ্য পালন করা উচিত. আমি এই "আশা-গাছ" রাখিলাম, যদি তোমরা ইহা উঠাইয়া নিতে পার, আমরা তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব, নচেৎ যাইব না। পাইকদ্বয় হাস্যবদনে কহিল, তোমার এই "আশা গাছ" সামান্য নিশান, তাও আবার এখন ঐ নিশান ধরিয়াই

মাটীতে পুতিলে। বোধ করি, আধ হাতও পোতা হয় নাই। আচ্ছা, আমরা ইহা উঠাইতেছি। এই বলিয়া একজন পাইক ঐ আশাগাছ বামহস্তে অনায়াসে উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আশাগাছ নড়িল না। দুই হাতে চেষ্টা করিল; দুই জনে প্রাণপণে এক সঙ্গে উঠাইবার চেষ্টা করিল; আশাগাছ অচলবৎ দণ্ডায়মান রহিল। পাইকদ্বয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল; ভক্তিভাবে সেলাম করিয়া সাধুদের কথা ও "আশাগাছের" কথা সাজাওর খাঁর নিকট নিবেদন করিল। সাজাওর খাঁ ক্রোধান্বিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তথায় দলবল সহ উপস্থিত হইলেন।

আসিয়াই কহিলেন, তোমরা আমার আদেশ-মত আমার বাড়ীতে উপস্থিত হও নাই। তারপর নাকি এক নিশান মাটীতে পুতিয়া কহিয়াছ—ঐ নিশান উঠাইতে পারিলে আমার নিকট উপস্থিত হইবে। কোথায় তোমার সেই নিশান? ব্রজবল্লভ কহিলেন,আমরা তেমন ভাবে আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি নাই, যাহাতে আপনার ক্রোধের কারণ হইতে পারে। আমরা উদাসীন বৈষ্ণব; বনে বনে তীর্থপর্য্যটনে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। এখানে নিবিড় বন-দর্শনে কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করিতেছি। আমরা এখানে থাকিলে আপনার কোন ক্ষতি হইলে আমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি; কাহারও ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কাহাকে বিরক্ত করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আপনি এখানকার বড় জমিদার। সাজাওর খাঁ কহিলেন, আমি তোমাদের ঐ সব কথা শুনিতে আসি নাই।

তোমাদের আশাগাছ কোথায়, দেখাও আর ঐ আশাগাছ উঠাইতে পারিলে আমার ভবনে যাইবে, এমত বলিয়াছ কি না? মাত্র এই কথার উত্তর দাও। হাঁ, বলিয়াছি, আর ঐ দেখুন, চৈতন্যদেবের "আশাগাছ" আপনার সম্মুখেই পোতা আছে। সাজাওর খাঁ আশাগাছ দর্শন করিয়াই অবহেলায় বাম হস্তে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। তৎপর দুই হস্তে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন; আশাগাছ নড়িলও না। সাজাওর খাঁ পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বিশ্রামলাভের পর কহিলেন, সাধু! আমি অনেক মত্ত হস্তীর গতিরোধ করিয়াছি; অনেক ব্যাঘ্র নিজ হস্তে চাপিয়া মারিয়াছি। আমার দৈহিক শক্তিতে আমি এখানকার জমিদারদের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমার এই সামান্য আশাগাছটী উঠাইতে পারিলাম না! বুঝিলাম, তোমরা এ দেশকে পবিত্র করিবার জন্যই আসিয়াছ। আজ হইতে তুমি আমার পরম বন্ধু; আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি এখানকার বড় জমিদার, তবে তুমি যে স্থানে বসিয়াছ, সেই স্থান আমার অধিকারভুক্ত নহে; ইহার সংলগ্নই আমার ভূমি। তুমি এখানে বাস কর, আমি মুসলমান হইলেও তোমার কার্য্যে যতটুক পারি, সাহায্য করিব। হিন্দু তোমাকে যে ভাবে ভক্তি করে, মুসলমানও তোমাকে সেই ভাবে শ্রদ্ধা করিবে। ব্রজবল্লভ কহিলেন, সাজাওর খাঁ! আপনি এখানকার বড় জমিদার, তা আমি জানি; আপনি পরম ধার্ম্মিক, তাও আমি অবগত আছি; আপনার মহৎ অন্তঃকরণের আজ পরীক্ষা পাইলাম। আমি

মুসলমানদ্বেষী নহি; হিন্দু-মুসলমানে আমার সমভাব; ধনী দরিদ্রে আমার সমপ্রীতি। সাজাওর খাঁ কহিলেন, সাধু! তুমিই প্রকৃত সাধু; তোমার কথায় আমার যুদ্ধব্যবসায়ী নীরস প্রাণও সরস হইল; তোমার ব্যবহারে পরম সুখী হইলাম; এখন যাই, সময়ে আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। সাজাওর খাঁ চলিয়া গেলেন। ইহার পর অনেক দিন চলিয়া গেল, আর কোন ভূম্যধিকারী, কি জমিদার কেহই আগমন করেন নাই। এই সময়মধ্যে বনমালী গোস্বামী, শান্তিরাম গোস্বামী, পরমানন্দ গোস্বামী ও নিধিরাম গোস্বামী, কৃষ্ণমঙ্গল গোস্বামী, কৃষ্ণচরণ গোস্বামী,রামকৃষ্ণ গোস্বামী, রামদেব গোস্বামী, রূপরাম গোস্বামী, ধনীরাম গোস্বামী ও তুলসীবল্লভ গোস্বামী ব্রজবল্লভ প্রভুর নিকট ভেক গ্রহণ করেন।

"গোসাঞি ব্রজবল্লভ, সঙ্গে পরিচর সব
ব্রজরসময় কলেবর।
প্রকটিয়া গোসাই সঙ্গে, বিলাসিয়া নানা রঙ্গে
নিস্তারিলা অধম পামর॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নাম, রাধাশ্যামময় ধাম, যার নাম জগতপাবন।
প্রভু মোর বনমালী, শান্তরাম প্রভু মেলী
সঙ্গি প্রভু শ্রীকৃষ্ণচরণ।
প্রভু মোর নিধিরাম, পরমানন্দ রসধাম,
রামকৃষ্ণ জপ অনুক্ষণ॥

রামদেব প্রভু মোর, চন্দ্রকীর্ত্তি গুণধর
জগততারক নাম জার।
রূপে গুণে অনুপাম, ধন্য প্রভু রূপরাম
সদা চিন্ত রূপনাম সার॥
ধর্ম্ম অর্থ মিথ্যা ধন, কেন ভাব অনুক্ষণ
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন সার।
এ ধনের ধনী যেই, বিদ্যমানে ছিল সেই
ধনীরাম নাম ধন্য যার॥
বেদ গুপ্ত অবতার, কলিকালে পরচার,
ভাব-কান্তিময় কলেবর।
করুণা প্রকটি অঙ্গে, বিলাস করিলা রঙ্গে,
তুলসীবল্লভ নামধর॥
এই একাদশ প্রভুগণ, যবে হৈলা অদর্শন,
প্রেম-প্রভাসিত দীনমণি।
জগত হৈল অন্ধকার, উপায় না দেখি আর,
রত্নশুন্য হইলা মেদিনী॥
বিদগ্ধ-রসিক-রায়, গোপীপ্রেমময় কায়,
না দেখিয়া তাঁহাব চরণ।
উপায় নাহিক আর, হায় হায় মাত্র সার,
কান্দিয়া ফুকারে বৃন্দাবন॥

ইতি বৃন্দাবনদাস।

উদয়নারায়ণ চৌধুরী আসিয়া দেখিলেন, বিলপারের অরণ্য আজ লোকারণ্য ; কত সাধু, কত ধনী, কত দরিদ্র, অসংখ্য লোক ; সমস্তই হরিসংকীর্ত্তনে মত্ত। উদয়নারায়ণ বুঝিলেন, সেই মহাধ্বনি গোলোকে পৌঁছিয়া রাধাকৃষ্ণকে বিচলিত করিতেছে ; লোকে খাইতেছে ; বসিতেছে ; আসিতেছে, যাই- তেছে। বহু কষ্টে বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন ;—দেখিলেন, ব্রজবল্লভ গোস্বামী বসিয়া আছেন। উদয়নারায়ণ ভাবিলেন, ধর্ম্ম আজ মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কলির জীবকে নিস্তার করিতেছেন ! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন,—প্রভো! আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ; আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিষয়াসক্ত মানব, আপনার মহিমা কি বুঝিব ? নিজ দয়াগুণে আমাদেব মত পাষণ্ডী পাতকীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আজ মানব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আপনি এক- খানা দেবমন্দির প্রস্তুত করুন্। ব্রজবল্লভ কহিলেন, ভক্ত- চূড়ামণি উদয় ! আজ তুমি ধন্য, ধন্য তোমার হরিভক্তি ; যাও— কীর্ত্তনে যোগ দাও ; আনন্দ ভোগ কর। কীর্ত্তনাদি সমাপন হইল। জনগণ সব চলিয়া গেল। উদয়নারায়ণ দালান প্রস্তুতের কথা বিশেষ অনুরোধ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। উদয়নারায়ণ তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রনারায়ণ রায়ের সঙ্গে পরা- মর্শ করিয়া দালান প্রস্তুত জন্য একখণ্ড ভূমির এক সনন্দ-পত্র তদীয় পুত্র রামচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন। ব্রজবল্লভ গোস্বামী সনন্দ পাইয়া ৺ দেবমন্দির প্রস্তুত জন্য শিষ্যদের প্রতি আদেশ করিলেন। রামচন্দ্র চৌধুরী ব্রজবল্লভ গোস্বামীর

অলৌকিক ব্যবহার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। ১১৩৭ সনের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে সনন্দ প্রাপ্ত হন। সনন্দের অনুলিপি আগামী বারে দেওয়া যাইবে। ৺শ্যামসুন্দরের যে দালান প্রথম প্রস্তুত হয়, তাহার গায়ে লেখা আছে, যথা,—

"ইন্দ্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ।
ঐরাবতগজারূঢ়ো দেবরাজ নমোঽস্তু তে॥
জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারণাঃ॥"
শকাব্দা ১৬৫৩ সন ১১৩৮ সন,
তারিখ চৈত্রস্য দ্বিতীয়দিবসে পূর্ণঃ॥

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে।

ইতিহাস।

(পূর্ব্বময়মনসিংহে একটি শিবভক্ত দ্বিজবংশ)

গাঙ্গাটিয়া। *

পূর্ব্বকালে গম্ভীরনীরপরিপূরিত ব্রহ্মপুত্র নদ বঙ্গদেশের উত্তরপূর্ব্বাংশের ভূমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করত মেঘ্‌না

* আমরা ক্রমেই সুসঙ্গ, জঙ্গলবাড়ী, হয়বতনগর, বৌলাই. ইট্‌না, গুজাদিয়া, মসূয়া, কিশোরগঞ্জ, যশোদল, কাটিহালী, নওপাড়া, মুজফরপুর, রায়পুর, মাঘান. পূর্ব্বধলা, রামগোপালপুর, গৌরীপুর, কালীপুর, ভবানীপুর, নেত্রকোণা, বাঘাবাড়ী,

ও বুড়ী গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়া সাগরালিঙ্গন করিতেন। সুবিস্তৃতায়তন ময়মনসিংহ জিলাটীকে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত কর্ণরেখাক্রমে দ্বিখণ্ডীকৃত করিয়া গুরুগম্ভীর কল কল নাদে অর্দ্ধ যোজন, কি ততোধিক স্থান বিস্তৃত হইয়া তীরবেগে চলিয়া যাইতেন। তৎকালের নদরাজের পূর্ণাবয়ব-দর্শনে বহু উপনদী তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এবং বহু শাখা-নদীও তাঁহা হইতে বাহির হইয়া জিলার সর্ব্ব প্রদেশের ভূমিই সুজলপূর্ণা ও নৌপথবহুলা বাণিজ্যের উপযোগী করিত।

মধু মাসে ব্রহ্মপুত্র-সলিল গঙ্গা-সলিলের ন্যায় পবিত্র হয়, চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থ একীভূত হইয়া ব্রহ্মপুত্র-সলিলে মিলিত হয়। লাঙ্গলবন্ধ, মঠখলা, হোসেনপুর, নসিরা-বাদ, বাগুনবাড়ী প্রভৃতি অষ্টমী স্নানের জন্য বিখ্যাত। এক এক স্থানে দুই তিন লক্ষ লোকও সমবেত হয়। বহু সিদ্ধ-সন্ন্যাসী ঐ সব স্থানে অবস্থান করেন, হিন্দুর—ব্রাহ্মণের—ব্রহ্ম-চারীর পক্ষে গঙ্গা ব্যতীত এমন স্থান দুর্লভ।

কাশ্যপগোত্রায় দক্ষবংশীয় সর্বেবশ্বর অপ্‌সতীর পুত্র দুকড়ির সন্তান গঙ্গা প্রদেশ নৈহাটী ষ্টেসনের নিকট মূলপল্লী

খালিযাজুড়ী, আচমিতা, গোপীনাথের বাড়া, মুমুবদিযা, বাজীৎপুব, ভৈরব, শাখুয়াইর, অষ্টগ্রাম, বাণীগ্রাম, কাযেতপল্লী, গছিহাটা, চাদপুব, জর্যাসিদ্ধি, ভাগলপুর ও সবাব চব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামেব এবং বিখ্যাত বিখ্যাত বংশ ও ব্যক্তিগণেব ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিব। কেহ লিখিলে অথবা যথাথ উপকরণ দিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।

আঃ গোঃ—সম্পাদক।

(মুলাপাড়া) ভট্টপল্লী অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া ঢাকা মহেশ্বরদি পরগণায় ঐ ঐ দুই নামে দুইটী গ্রাম স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণবংশের এক শাখা রাঘবেন্দ্র আচার্য্য বঙ্গাব্দা ১০৮০ সনে ব্রহ্মপুত্রের শাখা গোকুল নদের দক্ষিণ তীরে এই "গাঙ্গাটিয়া" গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে ঐ প্রদেশের অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন ছিল, কিন্তু শস্য ও খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত পর্য্যাপ্ত (বিনা-মুল্যে) পাওয়া যাইত।

রাঘবেন্দ্র নানা স্থানে বিদ্যাভ্যাস করিয়া গোকুল নদের তীর-স্থিত "হরিশ্চন্দ্র পট্টী" নামক গ্রামের সাবর্ণগোত্রীয় জীবানন্দ ভট্টাচার্য্যের (বিদ্যাসাগর টোলে) উপস্থিত হন। যুবকের অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য-দর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয় মুগ্ধ হইয়া রাঘবেন্দ্রকে স্বীয় কন্যাদান করেন। রাঘবেন্দ্র বিবাহিত হইয়া স্বীয় স্থাপিত গাঙ্গাটিয়া গ্রামে টোল স্থাপন করেন। তখনও তিনি কখন কখন মহেশ্বরদীস্থিত ভট্টপল্লীতে বাস করিতেন।

রাঘবেন্দ্রের সাত পুত্র হয়, তন্মধ্যে রামনারায়ণ তর্কবাগীশ পূর্ব্বপুরুষগণের অসাধারণ পুণ্যবলে অত্যন্ত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইহাঁর টোলে নানা দিগ্‌দেশ হইতে ছাত্রগণ আসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত।

ইহাঁর পুত্র রমানাথ নবদ্বীপ গিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দিল্লী পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া দেশে

প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি "চক্রবর্ত্তী" উপাধি ধারণ করেন। ইহাঁর সময়ের কতক দলিল ও দিল্লী হইতে আনীত মারবল-প্রস্তরের জিনিষ এই পরিবারে এখনও আছে।

ইনি পাণ্ডিত্যবলে বহু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ইহাঁর সময় ২৮ নং তালুক রমানাথ চক্রবর্ত্তী প্রায় ১০০০ হাজার টাকা সদর জমায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। রমানাথ চক্রবর্ত্তী মহেশ্বরদী পরগণায় লাকসী গ্রামে রায়-চৌধুরী বংশে বিবাহ করেন। রমানাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী, তৎপুত্র স্বর্গীয় দেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, ইনি মাখান গ্রামনিবাসী স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিবাহ করেন। বিবাহের পরই সন্ন্যাসিবেশে সন্ন্যাসিগণের সহিত কামাখ্যা হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত বহু তীর্থ দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া জপ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। কখন বা প্রভাত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত "উদয়াস্ত", কখন বা অস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উদয় পর্য্যন্ত "অস্তোদয়," কখন বা সূর্য্য উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত জপ করিয়া "উদয়োদয়" প্রভৃতি জপের কঠোর নিয়ম-পালনে মনোনিবেশ করেন। ভূমিসম্পত্তি পার্থিব কোন বিষয়ে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। তাঁহার বিস্তর বিষয়-সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দৈবারাধনার মধুময় আস্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পার্থিব বিষয়ে তাঁহার কি করিবে? তাঁহার এক পুত্র শিবতুল্য রামানন্দ। ইনি শিব-আরাধনায় সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন। ইনি সঙ্কল্প পূর্ব্বক দুইবার দুই লক্ষ

শিবপূজা করিয়াছিলেন এবং জীবনে যে কত শিবপূজা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; কারণ, শিবারাধনাই তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। সেই কালে কাশী ইত্যাদি তীর্থ দর্শন করিতে নৌকাযোগে বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইত; আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের নিকট চিরবিদায় লইয়া, বিষয়পত্র বুঝাইয়া লোক পশ্চিমে তীর্থ দর্শন করিতে এক দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইত। দীর্ঘ পথ ও ঐ পথে চোর-ডাকাত ও ঠগীর ভয় ছিল। গাঙ্গাটীয়া চক্রবর্ত্তি-পরিবারের ১ বহর—পাঁচখানা নৌকা লইয়া স্বর্গীয় ভোলানাথ, স্বর্গীয় সদাশিব চক্রবর্ত্তী ও স্বর্গীয় রামানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি তীর্থদর্শনে বাহির হন। এইরূপে একাদিক্রমে ৪।৫ মাস পরিভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। প্রত্যেক নৌকায় খেলার জন্য পাশা দাবা ইত্যাদি ছিল, কিন্তু কেবল স্বর্গীয় রামানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নৌকায় শিব-মৃত্তিকা ও বিল্বপত্র সংগৃহীত ছিল। সারাদিনই নৌকা চলিত। অপরাহ্নে যেখানে চোর-ডাকাতের ভয় নাই, এরূপ ভাল বন্দর দেখিয়া, সেই স্থানে নৌকা নঙ্গর করিয়া পাকশাক ও আহারাদি করিতেন। রাত্রিতে নৌকা স্থির থাকিত। সময় কাটাইবার জন্য প্রত্যেক নৌকায় দাবা-পাশা ইত্যাদি খেলা আরম্ভ হইত। কিন্তু স্বর্গীয় রামানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নৌকায় প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত তাঁহার শিবপূজার খেলা চলিত। শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের দিনও তাঁহার প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সারাদিন সারারাত শিবপূজা চলিত; সুতরাং সে দিনের সাংসারিক কার্য্যাবলী বন্ধ

থাকিত। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় দেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌত্র জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই পুত্র রামানন্দকে ডাকিয়া বলেন যে, বধূমাতার গর্ভে সুপুত্রসন্তান হইবে এবং সেই পুত্র-দ্বারাই তোমার সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। অর্থাভাব দূর হইবে। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, কৃশকায়, গৌরকলেবর, পুণ্যশ্রী-বিশিষ্ট এক শিশু আসিতেছে। সে অতি ধার্ম্মিক ও বংশের গৌরবস্থল হইবে। শ্রী.........

মানব।

(১৪৫ পৃঃ)

এই অস্তেয়রূপী ধর্ম্মই মানব-মনের সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে প্রস্ফুটিত করে—চঞ্চল মনকে স্থির করে। কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভনে সে মন আর ভুলিতে পারে না। কাম-ক্রোধ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য ও হিংসাদি কুবৃত্তিগুলি আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় অধীন হইয়া থাকে। তখনই মানব দেবতার ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠে। তখনই প্রকৃত শূরত্ব লাভ হয়, তখনই—

"রণং জিত্বা ন শূরঃ স্যাদিন্দ্রিয়ণাং জয়াৎ শূরঃ।" *

---

* "রণং জিত্বা ন শূরং স্যাদিন্দ্রিয়াণাং জয়াৎ শূরঃ।" এই শ্লোকের অন্য আরও কয়েকটি "সত্যবাদী ভবেদ্‌বক্তা"—ইত্যাদি পদ ভুলিয়া

এই শ্লোকাংশের মহদ্‌বাক্য সত্য বলিয়া প্রতিফলিত হয়, তখনই মানব ঈশ্বরসান্নিধ্যলাভে—নির্ব্বাণ-মুক্তিপ্রাপ্তিতে সমর্থ হয়। *

গিয়াছি। শৈশবে পিতৃদেব-বদনে এই মহামূল্যবান্ বাক্যটি শ্রবণ করিয়াছিলাম। যিনি দয়া করিয়া প্রকৃত বাক্যটি উদ্ধার করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রীলেখক।

† অস্তেয়াদি সদ্‌গুণ শৈশবে পিতা-মাতার নিকট যেরূপ শিক্ষা হয়, শত গ্রন্থপাঠেও সেরূপ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার পিতৃ-দেবতার একটি কঠোর শাসন (সুশিক্ষা) এখানে উল্লেখযোগ্য বটে। সেটি বহুদিনের কথা—আমার জন্মস্থান অত্যন্ত জলময় দেশে, বৎসরের অর্দ্ধেক সময়ই জন্মস্থানের চারিদিক্ ব্যাপিয়া জলরাশি ধূ ধূ করিতে থাকে। শুধু জলময় দৃশ্য—জলময় অরণ্য—জলময় হাওর (বৃহৎ মাঠ)—বাস্তবিক জল ভিন্ন আর কিছুই পরিদৃশ্য হয় না; সূর্য্যও যেন জলাকাশ হইতেই উদিত এবং জলমধ্যেই অস্তমিত হন, ঘরের চারি-দিকেও কখন কখন জল হয়। সুতরাং জলের সহিত অতিজড়িত সম্বন্ধ, জলের কোলেই শিশুদের ক্রীড়া করিতে হয়—মাতৃক্রোড় বা নদীক্রোড় দুইই শিশুদের বড় আদরের জিনিষ; তজ্জন্যই অতি শৈশবে শিশুদের হাটার সঙ্গে সঙ্গে জলে সন্তরণও শিখিতে হয় জলে পড়িয়া প্রায় কোনও শিশুকেও ডুবিতে হয় না—নানাবিধ জলখেলা শিশুদের বড় আমোদের হইয়া উঠে। "টেনিস্" খেলার ন্যায় "কদুখেলা" (জলে বলের ন্যায় লাউ ফেলিয়া সাঁতারিয়া ধরা) জলচর শিশুদের বড় প্রিয়। যে আগে ধরিতে পারে, তাহারই বাহবা পড়িয়া থাকে।

আমিও সে খেলা বড় ভালবাসিতাম। জলে সাঁতার কাটা—বাড়ীর পশ্চিমের ঘাটে নামিয়া উত্তর-পূর্ব্ব-দক্ষিণ ঘুরিয়া (পৃথিবীপ্রদক্ষিণের

শৌচ—(শুচি + ষ্ণ) শুচিত্বম্—যথা—

"অভক্ষ্যপরিহারস্তু সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥"
(এঃ, বৃহস্পতিবচনম্)

স্থায়) আবার সেই স্থানেই আসিতাম, রাস্তায় বিশ্রাম করিতাম না, তথাপি কোন কষ্টই হইত না। সে সুখের খেলা—সে সুখের দিন, হায়! এখনও মনে হইলে যেন আত্মহারা হই। আত্মহারা হইয়াছি বলিয়াই লেখার সংযম ছাড়াইয়া অনেক কথা লিখিতে হইল। আমিও একদা জলকেলি করিতেছি, একটি বদরিকাকার "কদু" জলে ফেলিয়া দিয়াছি, বহু শিশুগণ তাহা ধরিতেছে, আমিও ধরিতেছি, টানাটানিতে সেটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! অমনি তীরবেগে বাড়ীর দিকে ছুটিলাম, কিন্তু রাস্তায় অন্যের একটি গাছে একটি ক্ষুদ্র "কদু" ঝুলিতেছে দেখিয়া তাহাই ছিঁড়িয়া নিয়া খেলায় দিলাম। একটি বৃদ্ধ বলিল, এত তাড়াতাড়ি কোথা হইতে তুমি কদু আনিলে? আমি বলিলাম, অন্য একটি স্ত্রীলোকের গাছ হইতে ইহা আনিয়াছি। তখন বৃদ্ধ ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে এরূপ ধমক দিল যে, আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী গেলাম। পিতৃদেব আমার রোদনোন্মুখ চেহারা দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি সে বৃত্তান্ত বলিলাম। তিনি আমাকে 'কদু' নেওয়ার জন্য ভয়ানক ভৎসনা করলেন এবং ইহাই চুরি করা হইয়াছে বলিয়া আমার অঙ্গুলি ছেদনের ব্যবস্থা করিলেন। আমি তখন পর্য্যন্ত কোনও স্কুলে ভর্ত্তি হই নাই, কিন্তু পদ্ম রামায়ণ, মহাভারত আমাকে পড়িতে হইত, তাহা হইতে তিনি মুনিদের চৌর্য্যাপরাধে হস্তছেদন দেখাইয়া দিলেন। মাতৃদেবী বড়ই উদ্বিগ্না হইলেন—কারণ, তিনি জানিতেন, পিতৃদেবতার কথা কখনও মিথ্যা হইবে না—তিনি যাহা বলেন, কেহ তাহা না করিলেও আপনা আপনি

অন্যচ্চ—

"সত্য-শৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত দয়া-শৌচং জল-শৌচন্তু পঞ্চমম্॥
যস্য সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ তস্য স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ।"

(গঃ পুঃ।)

সম্পন্ন হয়। তজ্জনাই তিনি ঐ স্ত্রীলোকটিকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি শিশুকে ক্ষমা কর। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'আমার গাছ ত আপনাদেরই, বিশেষতঃ ঐ কচি লাউটি মরাই ছিল, উহা আপনা আপনিই পড়িয়া যাইত। আমি ত কোনও দাবী রাখি না, প্রজার গাছ কি মনিবের নয়?' পিতৃদেব বুঝিলেন, স্ত্রীলোকটি আমার জন্য সত্য গোপন করিতেছে—'কচুটি' মরা নয়, গাছ ত আপনাদেরই বাড়ী হইতে নিয়া রোপিত—ইত্যাদি বাক্য ঠিক হইতেছে না। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা ব্যস্ত হইও না। তোমার ক্ষমায় অপরাধ লঘু হইতে পারে—কিন্তু ইহার পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, দণ্ড গ্রহণ করিতেই হইবে—ইহকালেও রাজদণ্ড বা গুরুদণ্ড কিংবা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পারত্রিক দণ্ড লাঘব হইতে পারে। এই কথা বলিয়া তিনি আমার অপহরণ-দোষী বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বয় একটি বৃহৎ কণ্টক দ্বারা অকাতরে স্বহস্তে ছিন্ন (বিদ্ধ) করিয়া দিলেন। দর দর ধারায় দাড়িম্বকুসুমাকার রক্ত পড়িতে লাগিল—পুত্রের রক্তস্রোতে তাঁহার বসন ভিজিয়া গেলেও তিনি বিচার-কর্ত্তব্যপালনে ধর্ম্মাধিকরণের সম্মান রক্ষা করিয়া অবিচলিতচিত্ত হইয়া কোনও দুঃখ ভোগ করেন নাই। আমার মনেও ভয়ানক পাপভয় জাগিয়া উঠিল. আমি আর কাঁদিতে পারিলাম না—আমিও তখন কণ্টক-যাতনা যেন ভুলিয়া গিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া রহিলাম।

"সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং বিশিষ্যতে।
যোঽর্থার্থৈরশুচিঃ শৌচান্ন মৃদা বারিণা শুচিঃ॥
শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিরথান্তরম্॥"

(গারুড়ে।)

এই সব শাস্ত্রবচন দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, শৌচই মানবের ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ। শৌচ ব্যতিরেকে প্রকৃত মানবত্বই জন্মিতে পারে না, মোক্ষ-লাভের পবিত্র শক্তি উদ্ভাবিত হইতে পারে না—মানবের মনই বিশুদ্ধ হইতে পারে না। বাস্তবিক শৌচ ব্যতীত মানব ঈশ্বরসাধনার পথে অগ্রসর হইতে অক্ষম—ধর্ম্মলাভে অসমর্থ—মুক্তিসোপান হইতে পতিত। তজ্জন্যই মানবকে প্রাণপণে সর্ব্বাগ্রে শৌচ রক্ষা করিতে হইবে।

"অভক্ষ্য-পরিহারস্তু সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।"

প্রথমতঃ অভক্ষ্য পরিহার করিতেই শাস্ত্র বলিতেছেন।

মাতৃদেবী তাড়াতাড়ি ক্ষত স্থানে ঔষধাদি দিতে লাগিলেন। অল্পদিনেই আমি ভাল হইলাম। আমার শৈশবের সেই পিতৃশাসন বহু প্রকারের জ্বলন্ত পাতক-বহ্নি হইতে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিতেছে—নতুবা কবে দগ্ধ হইয়া যাইতাম। তাই বলি, পিতাই আমার পতিতপাবন গুরু, পিতাই আমার ধর্ম্মরাজ—পিতাই আমার স্বর্গ—পিতাই আমার সর্ব্বদেবতাময় পরমেশ্বর—প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্ম। শাস্ত্রও বলিতেছেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

আজ কালের দিনে অভক্ষ্য পরিহার করা অতীব কঠিন, এক্ষণে ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার উঠিয়া গিয়াছে—সর্ব্বভুকের ন্যায় দাহিকা শক্তি না থাকিলেও মানবগণ সর্ব্বভুক্ হইতে প্রস্তুত হইতেছেন, মাংসাশী জীবের ন্যায় মানব-বদন গঠিত না হইলেও—ভগবান্ তাঁহাদের সে অঙ্গ (সুতীক্ষ্ণ বক্রদন্ত) না দিয়া থাকিলেও আমমাংস-ভোজনেও মানবের ত্রুটি হইতেছে না—ভোজনার্থে জীব কর্ত্তন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে—হাটে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্রই কশাইখানা স্থাপিত হইতেছে।—মাংস ও মাছের বাজারেই অত্যধিক ভিড় হইতেছে। বরং ধারে চাউল বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু কশাইখানায় বা মৎস্যক্রয়ে ধার নাই—নগদ পয়সা দিয়া রেলের টিকিট কিনার ন্যায় ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি লাগিতেছে। এ দৃশ্য বঙ্গদেশেই অত্যধিক। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বলিয়া যাঁহারা মুখে বাহার নিতেছেন, তাঁহারাই আবার জীবিত মৎস্যের ঝোল না হইলে তৃপ্তি পাইতেছেন না। হায়, কি আশ্চর্য্য! যে মৎস্যের ন্যায় পীড়াদায়ক খাদ্য আর নাই, সেই মৎস্যই পীড়িত লোকের পথ্য বলিয়া চিকিৎসকগণ (ডাক্তার বাবুদের মতে) ব্যবস্থা দেন। মৎস্য বা মাংসপোড়া মানুষ-পোড়ার ন্যায়ই গন্ধ বিতরণ করে। বোধ হয়, আস্বাদনে এবং স্বাস্থ্যসাধনেও একরূপই হইবে। মহাত্মা বুদ্ধদেব ভক্তানুরোধে অখাদ্য ভোজন করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। খাদ্যাখাদ্য-নির্ব্বাচন সর্ব্বাগ্রেই স্থির করিতে হয়। আহার ত্রিবিধ ;—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। যথা—

"আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ স্বাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥"

তপস্বী, সাধক ও ধর্ম্মসেবীদিগের সাত্ত্বিক ভোজনেরই অতীব প্রয়োজন। জল, বায়ু, দুগ্ধ ও ফলমূল-সেবনই উৎকৃষ্টতম সাত্ত্বিক আহার। এই পবিত্রতম আহার দ্বারা বিপথগামী ইন্দ্রিয়-গুলি নিস্তেজ হয়—কু-প্রবৃত্তিসমূহ প্রশমিত হয়—চিত্ত প্রফুল্ল হয়—দেহ নীরোগ হয়—মানব অমর হয়—মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে আহারের সঙ্গে চিত্তবৃত্তির ও শারীরিক শ্রীবৃদ্ধির যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা আর কাহারও সহিত হইতে পারে না। পথ্যাশীর রোগ হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষ অনুভব হইতেছে।

"পথ্যাশী কল্যতাং সুখমরোগিতা।" প্রকৃত সাত্ত্বিক-ভোজন-কারী ব্যক্তিই পথ্যাশী বা মিতাশী বটেন। যিনি পরিমিত আহার, বিহার, নিদ্রা, চেষ্টা ও জাগরণাদি করিতে পারেন, তিনিই দুঃখ-নাশক সমাধিলাভেও সমর্থ হন্। যথা—

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥" ৬ষ্ঠ অঃ, গীতা

আমরা দেখিতে পাই, এক টুকরা আফিং গলাধঃ করিলেই প্রাণ যায়। একটি সরিষা-প্রমাণ বটিকা (ঔষধ) সেবনে

পুরাতন রোগও বিদূরিত হয়; একটি "করবীর" গোটা সেবনে মৃত্যু হইতে পারে, একবিন্দু "হোমিওপ্যাথিক" ঔষধ-সেবনে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। এই সবগুলিই আহারের ফল—বস্তুর গুণ; কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? এই প্রকার আহারের ফলে—বস্তুর গুণে মানসিক প্রবৃত্তিগুলিও জীবমান ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। নিজ নিজ চিত্তবৃত্তি অনু-সারেই সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক আহারে প্রবৃত্তি হয়। রাজসিক ও তামসিক আহার কি, তাহাও শাস্ত্র বলিয়াছেন। যথা—

"কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥"

(১৭শ অঃ, গীতা)

অমৃতপায়ী ব্যক্তি যেরূপ মধুপানে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না, তদ্রূপ যাঁহারা সাত্বিক আহার করেন, তাঁহারা রাজসিক আহারে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, তামসিক সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

পৃথিবীতে যত প্রকার জীব আছে, সকলেই এক নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ভোজন করে—এবং সকল খাদ্যই সূর্য্যপক্ক, কালপক্ক বা প্রকৃতিজাত সুপক্ক; কিছুই অগ্নিপক্ক নহে। মানবীয় বুদ্ধির দুর্ব্বলতায়ই হউক বা তীক্ষ্ণতায়ই হউক, আজকাল অগ্নিপক্ক

আহার্য্যের প্রাচুর্য্য হইতেছে। জলকে ত অগ্নিপক্ক করিতেই হয়, কালে বায়ুকেও অগ্নিপক্ক করিয়া সেবন করিতে হইবে, নতুবা তাহা জীর্ণ হইতে পারিবে না।

পূর্ব্বে যে কেবল সূর্য্যপক্ক বস্তুই মুনি-ঋষিগণ আহার করিতেন, শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়—ফল-মূল ও বাতাহারে ৫০।৬০ হাজার বৎসরও তপস্যায় কাটাইয়াছেন, তাহাও দেখিতেছি। জলে ও বায়ুতে সবই আছে, সর্পগণ (বিষধর সর্প) শুধু বায়ু আহার করিয়াই সর্ব্বজীবাপেক্ষা বলিষ্ঠ এবং তেজীয়ান্ ও নীরোগ। যাঁহারা ফলমূলাদি আহার করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী ও নীরোগ হইবেনই হইবেন। নিরামিষাশী ব্যক্তিরাই মৎস্যাশী অপেক্ষা পুষ্ট ও নীরোগ। যে সব মহিলা সধবা অবস্থায় উদরাময়াদি রোগে ভুগিয়া মৃতপ্রায়, তাঁহারাই বিধবা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ধারণ ও নিরামিষ ভোজন করিয়া সংবৎসরে সম্পূর্ণ সুস্থকায় হইয়া উঠেন। এ সব আমরা চক্ষে দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষায় নিরামিষ আহারই শ্রেষ্ঠ এবং সূর্য্যপক্ক আহার আরও শ্রেষ্ঠ, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। সে কথা যাক্, আমাদের শাস্ত্র কি বলিয়াছেন, তাহাই দেখুন—

"মধু মাংসং তথা স্বিন্নমিত্যাদি পরিবর্জ্জয়েৎ।"

(গঃ পুঃ)

মদ্য, মাংস এবং সিদ্ধ অন্ন পরিবর্জ্জন করিবে। যাঁহারা ফলমূল-ভোজনে ব্যথিত হন, তাঁহারা আতপ অন্ন আহার

করিবেন, অম্বুবাচিই বোধ হয়, তাহার প্রমাণের ক্ষুদ্রতম লক্ষণ। পূর্ব্বে যাহা সংবৎসর বা চাতুর্ম্মাসিকরূপে আচরিত হইত, এক্ষণে ধর্ম্ম-ধ্বংসাবশেষে চারিদিন তাহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও একটি উত্তম নিদর্শন। আমরা কলির জীব—আমরা যাহা ধারণা করিতে পারি না—যাহা আমাদের স্বপ্নেও কল্পনা হয় না—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ—শাস্ত্রকারগণ—সাধকগণ—ব্রাহ্মণগণ তাহা অক্লেশে পালন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণেও কতকাংশে শাস্ত্রাচারপরায়ণ পণ্ডিত-সমাজকে নীরোগ ও দীর্ঘজীবী দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রাচারে—আহারে আরও অগ্রসর হইলে তাঁহাদিগকে দুই শত বৎসর জীবিত দেখিতে পাইত। তাঁহারাও "আতপ" শব্দে সিদ্ধ অন্ন বা ভাত বুঝাইয়া দিয়াছেন, খাঁটি আতপ (সূর্য্যপক্ক অন্ন) অন্ন ভোজন করিলে মানসিক শক্তি সমধিক বৃদ্ধি হইত; তাহাতে জীবনীশক্তি বহুপরিমাণে ক্রিয়া করিত, মানব দেবতার ন্যায় নির্জ্জর হইতে পারিত। আমরা অন্ন অর্থে আতার্য্য (তণ্ডুল) বস্তুই বুঝি, আমরা অন্ন অর্থে দগ্ধান্ন বা ভাত বুঝিতে পারি না। আতপান্ন, ভোজ্যান্ন, শূদ্রান্ন, শৌণ্ডিকান্ন, এ সব অন্ন কি কেহ ভাত বুঝেন? তাই বলি, ব্রাহ্মণ আতপভোজী হউন্।

"ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নো যঃ স সোমং পাতুমর্হতি।"

(গঃ পুঃ)

এখানেও কি তিন বৎসরের অধিক উপযোগী ভাত বুঝাইবে? এ বিষয় আর বেশী লিখিতে চাই না। আমার

প্রবন্ধ শৌচ সম্বন্ধে তবে শৌচাচারী ব্যক্তি কি প্রকার অন্ন বর্জ্জন করিবেন, তাহাই অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি। কদর্য্য অন্ন, শত্রুর অন্ন, নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্ন, বেণুবাদ্যজীবীর অন্ন, পরদোষঘোষণাকারীর অন্ন বর্দ্ধুষিকের অন্ন, বেশ্যার দাক্ষাদাতার অন্ন, নপুংসকের অন্ন, রঙ্গাজীবের অন্ন, ব্রাত্যান্ন, দাম্ভিকের অন্ন, লোকপীড়কের অন্ন, স্ত্রীবশ্যের অন্ন, কৃতঘ্নের অন্ন, বন্দী ও স্বর্ণকারের অন্ন, পর্য্যুষিত অন্ন, উচ্ছিষ্ট অন্ন, সংস্পৃষ্ট (হোটেল) অন্ন; দাস, গোপ, শূদ্র, নাপিত, কুলমিত্রাদির অন্ন, পরান্ন ও পক্কান্ন সাধক কখনও আহার করিবেন না। সুতরাং ধর্ম্মান্বেষী ভক্তের পক্ষে ফলমূলাদিই আহার করা কর্ত্তব্য; তাহাতেই মেধাবৃদ্ধি হয়, শৌচাচার রক্ষা হয়, দেহ পবিত্র হয়, মন পরিষ্কার হয়। আমরাও অনেকটা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, দৈনিক একটিমাত্র নারিকেল-ফলই সাধকের আহারের পক্ষে যথেষ্ট হয়। তদুপরি গোদুগ্ধাদি সেবন করিলে আর কোনও খাদ্যের আবশ্যকই হয় না। আমরা বার বার বলিতেছি, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি আহারে সাবধান হউন। যাঁহারা ফলমূলাদি আহারে অক্ষম, তাঁহারা প্রথম নিরামিষাশী ও হবিষ্যাশী হউন্, ক্রমে সব অভ্যাস হইবে, ক্রমে ফলমূলাশীও হইতে পারিবেন। অভ্যাসের নিকট বাধা-বিঘ্ন কিছুই খাটে না। যে গৃহে একজন কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া গৃহের বাহির হইতেও শীতে জড়-সড়ভাবে পরাঙ্মুখ, সেই গৃহেই অন্যে তৎকালেই জলে নিমগ্ন হইতেছেন। যে গৃহে দিবসে পঞ্চবার ভোজনকারী

ব্যক্তির বাস, সেই গৃহেই পঞ্চ দিবসে একবার আহারকারী লোকও দেখিতে পাই। বিশেষতঃ ঐ অত্যধিক-আহারী ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও বল অত্যল্প। আমরা বাঙ্গালা জাতি যে, শৈশবে লাবণ্যলাভে অক্ষম, কৈশোরে অর্দ্ধস্ফুটনোন্মুখ এবং যৌবনে জরাগ্রস্ত হইতেছি আর বার্দ্ধক্যে পা দিতে না দিতেই যমালয়ে চলিয়া যাইতেছি, ইহার প্রধান কারণই শৌচশূন্যতা —ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচাররাহিত্য—ব্রহ্মচর্য্য-পরিহার ও ধর্ম্মহীনতা। সত্য বটে, আমাদের এই প্রবন্ধে কাহার কাহারও উপর অদৃশ্যভাবে কশাঘাত পড়িতে পারে; লেখককে সাম্য-ভাবের অভাব বলিয়া দোষারূপও করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সংসারে সাম্য হওয়া অতীব দুরূহ। অনেকেই মুখে সকলই সমান, অনেকে আপনা আপনি সাম্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র বা চৈতন্যদেব সাজিয়া সকলকেই উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এরূপ ঘরে ঘরে, সহরে সহরে, বাজারে বাজারে কত বুদ্ধ, কত চৈতন্য, কত কৃষ্ণ, আর কত যে রামচন্দ্র আবির্ভূত হইতেছেন, তাহার সীমা নাই। তাঁহারা সকলেই জনে জনে অবতার, কিন্তু তাঁহারা সকলেই কি বুদ্ধ, চৈতন্য, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ইন্দ্রিয়-সংযমে সক্ষম হইয়াছেন? মানাপমানে, সুখে দুঃখে, নিন্দা-প্রশংসায় তুল্য ভাবেন? রামচন্দ্রের ন্যায় চতুর্দ্দশ বৎসর ফলমূলাহারে, বুদ্ধের ন্যায় সন্ন্যাসাচারে, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভাগবৎজ্ঞানে এবং চৈতন্যের ন্যায় ভক্তিযোগে বিগলিত হইয়া কয়দিন থাকিতে পারিতেছেন?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ॥"

(১২শ অঃ, গীতা)

আমরাও বলি, সর্ব্বজীবে সাম্যভাবই প্রকৃত মানবত্ব। নিজের সম্মান-গৌরব বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত সে সাম্যের দোহাই দেওয়া বাতুলতা মাত্র। হিংসা দ্বেষ, বেশ-ভূষা, সুখ-দুঃখ যদি "বলি" দিতে পার, তবেই তুমি সকলের সঙ্গে এক হইতে পারিবে। শীত-গ্রীষ্মে, বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান না হইলে সকলকে সমান জ্ঞান করিতে পারে না। তুমি প্রতিহিংসাসাধন জন্য সহোদর ভ্রাতার নামেও মোকদ্দমা করিবে, অথচ মুখে বলিবে, "মানব-জাতি সব এক।" তোমার আহারে সাত্ত্বিকতা জন্মিলে সকলকেই আপন ভাবিতে পারিবে। শৌচরক্ষায় আহারই প্রধান, অন্ন-শৌচই প্রধান শৌচ। মানবের পক্ষে সাত্ত্বিক আহারই ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট খাদ্য এবং তাহা গর্ভাবস্থায়ই জীব শিক্ষা পাইয়া থাকে; বায়ু গ্রহণ, দুগ্ধপান, জলপান করা কাহাকেও অভ্যাস করাইতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম খাদ্য জীবন-প্রতিপালনের উপযোগী নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার জীবই (বৃক্ষ লতাদিও) নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে। হস্তী, গো, মহিষাদি নিরামিষাশী পশুকে

বলক্রমেও মৎস্যাদি আহার করান যায় না। করাইলেও তাহারা রুগ্ন বা মৃত হইয়া যায়। এমন কি, একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষকেও তাহার নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্য দিতে পার না। বরং বৃক্ষ প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি অন্য খাদ্য গ্রহণ করিবে না। একত্র একটি শেফালিকা এবং বেলি দুইটি ফুলের গাছই রোপণ কর, শেফালিকা তাহার শিকররূপ কর দ্বারা তিক্ত রস এবং বেলি তাহার শিকর দ্বারা স্নিগ্ধরস গ্রহণ করিবে; একে অন্যের আহার্য্য কখনই গ্রহণ করিবে না। এই প্রকার মানবজাতিরও ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতীয় হিন্দুর সাত্ত্বিক আহারই যে মুখ্য ও নির্দ্ধারিত, তাহা নিশ্চয়। হিন্দু সাত্ত্বিক আহার পরিত্যাগ করিলে রুগ্ন বা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সন্দেহ কি? ধার্ম্মিকের ত কথাই নাই। হিন্দুর অশৌচসময়ে এখনও হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এক্ষণে "সংসর্গশ্চাপি নিন্দিতৈঃ" এই শ্লোকাংশ দ্বারা আমাদিগের শৌচরক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ-সংযোগ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইতেছে। নিন্দিতের সংসর্গ কত যে দূষণীয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

"দুর্জ্জনস্য হি সঙ্গেন সুজনোঽপি বিনশ্যতি।
প্রসন্নং জলমিত্যাহুঃ কর্দ্দমৈঃ কলুষীকৃতম্॥"

(গঃ পুঃ)

পরিশিষ্ট।

আয়-ব্যয়ের হিসাব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জমা— ৩৮৪৮৸০

৩৮। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক আদায় ২৭৩।৩১৫।২৬৬।৩১৭।২৬৫। ২১১।৮৭।৯৬।৬৯।৯১ ৪৮৭। ২৭৪।১১১।৩৭৭।৪৮৬ (১৫ জন) গ্রাহকের মূল্য ২২॥০

৩৯। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মাসিক চাঁদা আদায় ১৩৲

ফেব্রুয়ারী।

১। মতিলাল রায় ১৲

২। মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ১৲

৩। শীতলচন্দ্র সেন ৫৲

৪। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ১৲

ডিসেম্বর।

৫। রাইকিশোর মজুমদার ১৲

৬। রাজেন্দ্রকিশোর রায় ৩৲

১৩৲

খরচ— ৬৭৫৶০

৮৪। সভাগৃহের বেড়া মেরামত ১।০

৮৫। সভার গেট্ সাজাইবার বাঁশ ১৲

৮৬। পৌষের ১২৬ খানা পত্রিকা বিলি ও ১২ খানা ভিঃ পিঃ করার খরচ ৪॥৶০

৮৭। চৈত্রের কাপি প্রেসে পাঠাইবার খরচ ।৵০

৮৮। বেদান্তদর্শন ও পারস্কর-গৃহ্যসূত্র খরিদ ৪॥০

৮৯। সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থের ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন ১৫৲

৯০। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বৃত্তি ও ছাত্রদের আসন কম্বল দুইখান খরিদ ৯৲

জমা—

৪০। শীতলচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক আদায় ৯॥৵০

১। দীনবন্ধু রায় ॥০

২। যুধিষ্ঠির মাল ৵০

৩। রামগোপাল পাল ৬॥০

৪। রজনীকান্ত পাল ২॥০

———

৯॥৵০

৪১। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক ৭৬।৪১২।৮৩।৫০৬।৩০০।৫২০।৭৮ (৭ জন) গ্রাহকের মূল্য আদায় ১০॥০

৪২। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক (কটিয়াদী থানার মধ্যে) আদায় ১৫৬৲

১। বৈদ্যনাথ কপালী ৫৲

২। নবীনচন্দ্র শর্ম্মা রায় ১৲

৩। জ্ঞানচন্দ্র রায় ও উপেন্দ্রচন্দ্র রায় ৫০৲

৪। শিবনাথ সাহা এক হাজার টাকার মধ্যে সম্প্রতি আদায় ১০০৲

———

১৫৬৲

খরচ—

৯১। মাঘ ফাল্গুনের পত্রিকা কলিকাতা হইতে আসার, রেল ভাড়াদি ৬।৵০

৯২। মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা ডাকে ১৫২ খানা পাঠাইবার খরচ ৪॥৶০

৯৩। সুরেন্দ্রপাল দপ্তরীর মাঘ মাসের বেতন ৫৲

৯৪। ঐ সংখ্যা ৪২ খানার ডাক-খরচ ও ভিঃ পিঃ ২৲

৯৫। বেদ-বিদ্যালয়ের কাগজ কালি ১৵০

৯৬। পণ্ডিত বনমালী সাংখ্যতীর্থের নবেম্বর মাসের বেতন ২৫৲

৯৭। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের আর্য্যগৌরব ছাপার খরচ ১৫০৲ টাকা প্রাপ্য মধ্যে ১০০৲

৯৮। সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থের মার্চ্চ মাসের বেতন ১৫৲

৯৯। বৈশাখের কাপি বুক্ পোষ্ট এবং রেজেষ্টরী ॥০

১০০। যোগীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চের বেতন ২০৲

খরচ—

১০১। ঐ ঐ মাসের পত্রিকা ছাপা-
নের অবশিষ্ট খরচ ৫০।৹

.০১৫৸৵০

	৪০৮০।৵০
বাদ খরচ	১০১৫৸৵০
	৩০৪৪।৹

তিন হাজার চুয়াল্লিশ টাকা আট আনা তহবিল।

শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।

এই পর্য্যন্ত হিসাব পরিদর্শন করিয়া দেখা গেল, হিসাব ঠিক আছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে, উকীল, বি, এল।
২।৪।১৩।

মূল্যপ্রাপ্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪১৯।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য	১॥•
৮৩।	শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লিক	১।৵
৫১৪।	,, রামগোপাল পাল	১॥•
৫১৫।	,, রজনীকান্ত পাল	১॥•
৫০৬।	তারকনাথ চৌধুরী (সব রেজিষ্টার)	১॥•
৩০০।	,, অসিধারী বানার্জ্জি (সব ইং)	১॥•
৫২০।	,, শীতলচন্দ্র ভূঞা (ডাক্তার)	১॥•
৭৮।	দেবীচরণ চক্রবর্ত্তী (উকীল)	১॥•
৫০৭।	প্যারীমোহন কর (সব ইং)	১॥•

ক্রমশঃ

৩১।৩।১৩

চৈত্রের সংখ্যার ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫২	উপরিভাগে	উপবিভাগে	৩০১	নিলামপাড়ি	দিলাম পাড়ি
২৫৬	হৃদয়ে	হৃদয়ে লইয়া	৩১২	যোগ্য আছে	যোগ্য নহে
২৭১	সত্য গামির	সত্য আমির			
২৭৩	পরনারীকে	নরনারীকে	পৌষ সংখ্যা		
			৭১	এমন কি	এই শব্দ বাদ
২৭৯	কুশাস্ত্র	কুশাগ্র			
			১১০	সতত আমির	সত্য আমির
২৮৬	আসিতে হয়	থাকিতে হয়	১১৩	কষ্ট	কষ্টে
১৯২	যুক্ত, যুক্ত স্থান,	মুক্ত, মুক্ত স্থান	১১৫	এবং নিঃস্ব	বরং নিঃস্ব

১৯২ উর্দ্ধে তিন মাইল, উর্দ্ধে দেড় মাইল।

আর্য্য-গৌরব।

১ম বর্ষ]　　　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০　　　　[৮ম সংখ্যা।

প্রতিমা।

মাটীর প্রতিমা যদি ঈশ্বর না হয় ?
তবে কি বৃথাই তাঁর নাম সর্ব্বময় ?

শ্রী সঃ—

বিরাট।

(১)

বিশাল বিরাট তুমি অসীম অপার,
কেমনে বুঝিব মোরা ?
অনন্ত নক্ষত্রচয়, গ্রহ উপগ্রহময়,
কোটি কোটি রবি-শশী রোম-কূপে যাঁর,
তাঁহাকে বুঝিতে পারে, হেন শক্তি কার ?

(২)

অধঃ উৰ্দ্ধ দশ দিকে সমান বিস্তার,
যোজন অনন্ত কোটি।
বিশাল বিস্তৃত দেহ, ভাবিতে না পারে কেহ,
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ না পায় সন্ধান,
কেমনে বুঝিবে তাঁরে মানব অজ্ঞান ?

(৩)

অতি দ্রুতগতিশীল জানি সে বিদ্যুৎ,
রবির কিরণরাশি।
এ হ'তেও কোটিগুণ, যদি কোন সুনিপুণ,
দ্রুতগতি চলে পুনঃ পরার্দ্ধ বৎসর,
তবু কি তোমার সীমা পায় মহেশ্বর ?

(৪)

তোমায় ভাবিতে গিয়ে হই জ্ঞানহীন :
পারি না ভাবিতে আর।
স্বর্লোক দ্যুলোক তুমি, তলাতল মর্ত্তভূমি,
কিন্নর-গন্ধর্ব্বলোক লোকালোকময়,
বিরাট—বিরাট তুমি সত্য এ নিশ্চয়।

শ্রী সঃ—

সরলতা।

"আর্জ্জবং ধর্ম্মমিত্যাহুরধর্ম্মো জিহ্ম উচ্যতে।
আর্জ্জবেনেহ সংযুক্তো নরো ধর্ম্মেণ যুজ্যতে॥
সর্ব্ববেদেষু বা স্নানং সর্ব্বভূতেষু আর্জ্জবম্।
উভে এতে সমে স্যাতাংমার্জ্জবং বা বিশিষ্যতে॥"

(মহাঃ অনুঃ, ১৪২ অঃ)

"প্রবীণগণ সরলতাকেই পরম ধর্ম্ম কহেন, এবং কুটিলতাকেই অধর্ম্ম কহেন। সমস্ত বেদ-অধ্যয়নরূপ স্নান এবং সর্ব্বভূতে সরলতা প্রদর্শন, এই উভয় সমান হইতে পারে অথবা বেদস্নান হইতে সরলতাই উৎকৃষ্টতর হইবে।"

আজ কালের দিনে সংসার হইতে যেন সরলতা উঠিয়া গিয়াছে। সকলেই যেন আপনাকে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ঢাকাই যেন আজকাল গৌরবের বিষয়; যিনি সরল, তিনিই বোকা, তিনিই মূর্খ, তিনিই আহাম্মক। তুমি যতই শঠতা দেখাইতে পার, ততই তোমার গৌরব-পশার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ততই লোকজন তোমার আশ্রয় লইতে আসিবে, ততই লোকসমাজে তোমার বাহবা পড়িয়া যাইবে, তোমাকেই জন-নেতৃত্বে বরণ করিবে। তুমি রাজকর্ম্মচারী, তোমার আহারে একটু বিলম্ব হইল, যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইতে পার নাই, তুমি জান, প্রকৃত কারণ বলিলে তোমার দণ্ড হইবে। তথাপি

তুমি সত্যকথা বলিয়াই দণ্ড গ্রহণ করিলে; কিন্তু লোক-সমাজে তোমাকে বোকা বলিবে, অনেকে তোমাকে আহাম্মক, নির্ব্বোধ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিবে; কাজেই অন্যদিন তোমাকে লোকনিন্দার ভয়েই এমন এক মিথ্যা অজুহাত দিতে হইবে যে, সে হেতুতে তোমার আর দণ্ড হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। দোষ তোমার নয়, দোষ আজকালের সময়ের, "কলৌ বিমার্গা গতিঃ।" আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ষ্টেশনে একটি সরস্বতী উপাধিধারীর সাক্ষাৎ পাই; তাঁহার পায়ে বুট, ডবল মোজা, পরণে ইস্ত্রী ধুতি, গায় কোট, বুকে ঘড়ি, হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট, মাথায় টুপী, কপালে টেরি, বয়স ২৫ পঁচিশ বৎসর।

যুবক আমাদের কামরায় উঠিয়াই তাঁহার আসবাব গুছাইতে লাগিলেন, মুখে ইংরাজি, সংস্কৃত এবং হিন্দী ছুটিতেছিল, নেহাত ঘৃণার সহিত যেন দু'এক কথা বাঙ্গালা বলিতে লাগিলেন। তাঁহা দ্বারা বহু আরোহী তাড়িত ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি একাই পাঁচ জনের স্থান অধিকার করিয়া লইলেন, অনেকের মাথার উপরের ঝোলানো কাঠটিও দখল করিয়া নিলেন, ইহাই যেন তাঁহার চিরবাসস্থান। আমাদের সঙ্গে একজন সুশিক্ষিত জমিদার ছিলেন; যুবক সেই ভদ্রলোকের জিনিষগুলিতে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, তখন তিনি তথায় ছিলেন না, কাজেই যুবকের প্রতি আমাকেও অশ্রদ্ধা উক্তি প্রয়োগ করিতে হইল। তাহার অসারত্ব মনে করিয়াই এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম। কিন্তু তিনি দু'এক কথার পরই যখন সরস্বতী বলিয়া

পরিচয় দিলেন এবং তাঁহার মনঃকল্পিত সংস্কৃত বলিতে লাগিলেন, তখন আর প্রতিবাদ না করিয়া পারিলাম না। আজকালের বাঙ্গালা ভাষার মা-বাপ নাই—কোনও প্রকার বন্ধন নাই—যিনি যাহা মনে করেন, তাহাই প্রয়োগ করেন, কিন্তু আজও সংস্কৃতের সে দুর্দ্দশা—সে যদৃচ্ছাপ্রয়োগ ঘটে নাই। সরস্বতী মাতৃভাষাকে সে দুর্দ্দশা ঘটাইতেছেন দেখিয়া আমাকেও প্রতিবাদ করিতে হইল ; তিনি উত্তর দিলেন, "ভাষা ব্যাকরণের ধার ধারে না, একবচন বহুবচনের অপেক্ষা করে না, অন্যের বুঝিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি হয় নাই" ইত্যাদি। বিশেষতঃ আমাদের বাসস্থান পূর্ব্ববঙ্গ মনে করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীর ন্যায় কৃত্রিম ভাষা উচ্চারণ পূর্ব্বক জন্মস্থান লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমনই সময় আমার সঙ্গীয় ভদ্রলোক গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া যুবকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার সহিত তিনি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে আলাপ করিতে লাগিলেন, সরস্বতী তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া সংস্কৃত ধরিল, তিনি পরিশুদ্ধ সংস্কৃত বলিলেন, সে তাহাও বুঝিতে পারিল না, তখন তাহার সরস্বতী উপাধির প্রতি সমস্ত আরোহীরই সন্দেহ হইল ; সে প্রথমপাঠ্য সংস্কৃত গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণেও সক্ষম হইল না। পরে বাঙ্গালা ভাষায়ও তাহার অধিকার প্রকাশ পাইয়া পড়িল, ক্রমে সেই শাঠ্য-বিভূষিতের বাসস্থান, অবস্থা সকলই প্রকাশ হইয়া গেল। সে আমার সঙ্গীয় ভদ্রলোকের বাসায়ই কিছুদিন ছিল। তখন সেই সরস্বতীরূপী লম্বশাটপটাবৃত, টেরি-ঘড়ি-ছড়ি-বিভূষিত

যুবক ঐ ভদ্রলোকের পা জড়াইয়া ধরিল এবং তখন সরলভাবে বলিল, সামান্য কয়েক টাকা ব্যয় করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চল-নিবাসী এক পণ্ডিত হইতে সরস্বতী উপাধি লাভ করিয়াছি। এ স্থলে বলা বাহুল্য, তাহার জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গ নহে।

আমরা এই অসরলতার জন্য যুবককেও দোষ দেই না, কালের গতিতেই আপনা আপনি মনের গতি জন্মিয়া থাকে। আজকাল এই অসরলতার ন্যায় বহু লোককেই শাঠ্যাবলম্বী হইতে দেখিতেছি। অনেকে সম্মুখস্থিত স্বীয় পিতাকেও স্বীকার করিতেছেন না, পিতার ইহাই দোষ যে, পিতা পুত্রের ন্যায় সজ্জিত সভ্য হইতে পারেন নাই। কালের স্রোতেই নির্ধন ভাড়াটিয়া বসনে সজ্জিত হইয়া ধনাঢ্য সাজিতেছে, অসাধু সাধুর বেশ ধরিতেছে, যে যাহা নয়, সে তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভেজাল জিনিষ অপেক্ষা ভেজাল মানবের সংখ্যাই অধিক হইতেছে, অধিকন্তু ভেজালেরই আদর বাড়িয়াছে; যে দোকানী ভেজাল দিতে না জানে, সে বোকা; যে ব্যক্তি বিদ্যা-বিভূষিত হইয়াও নানা যোগাড়ে উপাধি লাভের চেষ্টা করেন নাই, তিনিও ঘোর মূর্খ। এই প্রকার সকল শ্রেণীতেই শাঠ্যের বাহাদুরী দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই লোকে আর এখন সরল হইতে চায় না; মনে এক, মুখে আর দেখানই এখন শিক্ষার বাহাদুরী; যিনি মুখে যাহা বলেন, কাগজে যাহা লেখেন, কাজে তাহার বিপরীত করিয়াই বাহবা নিয়া থাকেন, কাজেই সমাজে সরল ব্যক্তিই বোকা বলিয়া অভিহিত হয়।

"আমি নানা কৌশলে অনেককে ঠকাইয়াছি, হাকিমকে ফাঁকি দিয়াছি, উকীলকে নাকাল করিয়াছি, মহাজনের টাকা মাটী করিয়াছি, বিনা পয়সায় পত্রিকা পড়িয়াছি, রেল কোম্পানীর ভাড়া এড়াইয়াছি, বিমা কোম্পানীকে ঠকাইয়াছি" ইত্যাদি বহুপ্রকার শাঠ্যসূচক কথাই আজকালের খোস-গল্প ও উপদেশ-বাক্য। এইরূপ একটি বাহাদুরীজনক শাঠ্য (যাহা প্রকৃত বলিয়াই শুনিয়াছি) এখানে উল্লেখ করা গেল। ঘটনাটি বড় কৌশলপূর্ণ।

"রাম ও শ্যাম দুই জনই গ্রাজুয়েট; তাঁহারা নানারূপ কাজ করিয়াও যথেস্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। দুই জনে বড় মিল—একপ্রাণ—একমত। এবার উভয়ে একখানা দোকান খুলিলেন, বড় সহরে বড় বাড়ী ভাড়া করিলেন, দোকানটি একেবারে গঙ্গার উপরে স্থাপিত হইল। কয়লা সরবরাহও তাঁহাদের একটি কর্ম্ম, প্রকাণ্ড কারবার, একখানা গুদামেই তিন হাজার বাক্স টীন মাল ভরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রাম দোকানের স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন, শ্যাম তাহা খরিদ করিলেন; নগদ টাকা দিতে না পারিয়া রামকে দশ হাজার টাকার একখানা খত সম্পাদন করিয়া দিলেন, বহু ভদ্রলোক তাহার সাক্ষী হইলেন, শ্যাম তাহা রেজিষ্টরী করিয়াও দিলেন। রাম মধ্যে মধ্যে টাকার তাগাদা করিতেন, শ্যাম তাহা স্বীকার করিতেন এবং সময় নিতেন। পরে রাম ঐ টাকার নালিশ করিলেন,

শ্যাম উপস্থিত হইয়া কিস্তিবন্দি করিলেন, এক কিস্তি খিলাপ হইলে সব টাকাই দিতে হইবে, এই নিয়মে কিস্তি হইল। সময়ে কিস্তি খিলাপ হইল, রাম ডিক্রী জারি করিয়া প্রায় এগার হাজার টাকার অস্থাবর ক্রোক বাহির করিলেন। রাম পিয়নের সঙ্গে নিজেই গিয়া নিশান-দেহী করিয়া গুদামের সমস্ত মাল ক্রোক করিলেন। শ্যাম রামকে বহু অনুনয়-বিনয় করিয়াও ক্রোক ফিরাইতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সরিয়া গেলেন। বহু গাড়ী ভরিয়া টীনের বাক্সগুলি সবজজ আদালতে আনীত হইল। শেষে নির্দ্দিষ্ট দিনে মাল নীলামে চড়িল। হরি নামক এক ব্যক্তি নীলাম ডাকিতে গিয়া হাকিমকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! বাক্সে কি আছে, আমি খুলিয়া দেখিতে চাই।" হাকিম তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। ডিক্রীদার রাম বাক্সগুলি এদিক্ ওদিক্ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতেছিলেন। হঠাৎ একটি বাক্স তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল, সেই বাক্সটি অন্য একটি বাক্সের উপরে পড়িয়া যাওয়ায় দুইটি বাক্সই ভাঙ্গিয়া গেল। তখন দর দর করিয়া একটি হইতে ঘি এবং অপরটি হইতে নারিকেল তৈল ছড়িয়া পড়িল। তখন ডিক্রীদার এগার হাজার টাকা পর্য্যন্ত ডাকিলেন; কিন্তু অন্য মহাজনদের ডাক উপরে উঠিল। একজন মাড়োয়ারী মহাজনের ডাকে বিশ হাজার টাকায় সমস্ত মাল নীলাম হইয়া গেল। রামের মায় খরচ সমস্ত টাকা আদায় হইল। ডাক-ফাজিলী নয় হাজার টাকা শ্যাম ওয়াপস্ লইলেন। অতঃপর রাম ও

শ্যাম একত্র হইয়া উভয়ে সমভাবে সমস্ত টাকা ভাগ করিয়া নিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া দেড় বৎসরে বিশ হাজার টাকা লভা পাইয়াছেন।”

পাঠক মহোদয়! এ পর্য্যন্ত, বোধ হয়, লাভের গূঢ় রহস্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। রাম ও শ্যামের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও প্রকার অসরলতাও দৃষ্ট হইতেছে না। মাড়োয়ারী মহাজনেরও ৩০।৪০ লক্ষ টাকার কারবার, এ ক্ষুদ্র মাল অন্য মালের সহিত দশমিক বিন্দুর ন্যায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। কে তাহার খোঁজ করে? শাঠ্য-রহস্য অপরাধজনক না হইলেও কিছুতেই প্রকাশ পাইতেছে না। পাঠক! এখন রাম ও শ্যামের মুখেই আত্মপ্রশংসা বা খোস-গল্প শ্রবণ করুন। তাঁহারা এক দিবস তাঁহাদের এক বন্ধুর নিকট বলিতে লাগিলেন, “এই গুদামে যে তিন হাজার বাক্স টীন মালবন্ধ ছিল, তাহা দ্বারাই আমরা ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা লাভ করিয়াছি; উহার একশত বাক্সে নারিকেল তৈল ও একশত বাক্সে ঘি ছিল এবং অবশিষ্ট সমস্তগুলিতেই গঙ্গাজল ভরা ছিল, সেগুলি বিশ হাজার টাকায় নীলাম হইয়াছে। আমরা ঐ টাকা পাইয়াছি।” বন্ধু বলিলেন, “তোমরা কি সাহসে গঙ্গাজল ভরিয়া রাখিয়া-ছিলে? তাহা খুলিয়া পড়িলে ত দোষের হইত?” তাঁহারা বলিলেন, “ভাই, সে বুদ্ধি আমাদের ছিল, পূর্ব্বাঞ্চলের কেহই জাহাজে রেলে গঙ্গাজল নেয় না, কয়লার নৌকায়ই গঙ্গাজল নিয়া থাকে; মাঝিরা অন্য জল মিশাইবে বলিয়া আমরা গঙ্গা-

জলের টীন বন্ধ করিয়া রাখি। কারণ, অন্য জলে গঙ্গাজল নষ্ট হয়। এইরূপেই কয়লার সঙ্গে সর্ব্বদা গঙ্গাজল পাঠাইয়া থাকি। বল ত দেখি, তবে আর কি শঠতা হইল? কে আমাদের দোষ ধরিতে পারিবে?" এই প্রকার শাঠ্যই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, সুতরাং 'সরলতা' প্রবন্ধ অনেকেরই অপ্রীতিকর হইবে, সন্দেহ নাই; তবে শাস্ত্র যে সরলকেই স্বর্গ দান করিয়াছেন, তাহাই আমরা দেখাইয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি।

"সর্ব্বভূতানুকম্পী যঃ সর্ব্বভূতার্জ্জব-ব্রতঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতশ্চ স বৈ ধর্ম্মেণ যুজ্যতে॥
আর্জ্জবে তু রতো নিত্যং বসত্যমরসন্নিধৌ।
তস্মাদার্জ্জবযুক্তঃ স্যাদ্ য ইচ্ছেদ্ধর্ম্মমাত্মনঃ॥"

(মহাঃ ভাঃ অঃ)

"যিনি সর্ব্বভূতে দয়াবান্, যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সরলতা প্রদর্শন করেন, যিনি সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান করেন, তিনিই পরম ধার্ম্মিক। যিনি নিয়ত সরলতারত, তিনিই অমর-সন্নিধানে বসতি করেন এবং যিনি ধর্ম্ম কামনা করেন, তিনিই সরল হইবেন।" ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

শ্রী সঃ—

———

কালের দংশন।

কালের দংশন আহা এমনি কঠিন,
বিকসিত তামরস, মর্ম্মময় চারুহাস,
শোভিত সরসে ছিল ইন্দীবরালোকে।
ছিন্ন হ'ল করহাট, বিচ্ছিন্ন হইল নাল
শুকাইল নবদল অলক্তকদল।
শুকাল সিন্দূর-রাগ সঙ্কোচ হইল দল,
পত্রনাল সংকোচিত অপ্রিয় দর্শন।
গেল সে মধুর-হাস, অপগত পুষ্পরস,
দুঃখাত্মকভূত যথা রহিল মলিন,
কালের দংশন আহা এমনি কঠিন।
এই যে ছিল ব্রততী, দূর্ব্বাদল শ্যাম অতি,
তাম্র রাগ কিসলয়-কর প্রসারিয়া।
প্ররোহে প্ররোহে তার, সকুট্মল পুষ্পহার,
কীটজ কীটজারাগ ঘ্রাণের তর্পণ।
ছিন্ন হ'ল মূল তার, অপগত জলসার,
ঢলিয়া পড়িল দল শ্যামল বল্লরী।
শুষ্ককাণ্ড কিসলয়, প্ররোহ প্রসূনচয়,
দুঃখাত্মক ভূত যথা রহিল মলিন,
কালের দংশন আহা এমনি কঠিন।
অমল-কমলদল-সদৃশ মুখমণ্ডল,
এই যে যুবক ছিল ললিত সুন্দর।

দংশিল তাহারে কাল, জ্বররূপ হলাহল,
দেহ বিলিখিল তার যথা হলাহল।
শোণিতের গতিরোধ, হল স্নায়ু স্থাণুবৎ,
স্পন্দহীন হস্ত-পদ সকল শরীর ;
ত্বকের স্পর্শন-শক্তি, শ্রুতির শ্রবণ-শক্তি,
রসনার বাক্‌শক্তি হরিয়া লইল।
নাসিকার ঘ্রাণশক্তি, চক্ষুর দর্শনশক্তি,
হরিল, হইল নেত্র অর্দ্ধনিমীলিত।
করি করাঘাত বুকে, শোকতপ্ত-রুদ্ধশ্বাসে,
বাহু প্রসারিয়া ধরি হৃদয়-নন্দন।
বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়পাশ, বিলুপ্ত চৈতন্য আহা
কাঁদে মাতা আকুলহৃদয়ে।
শোকানল প্রজ্বলিল, প্রাণ জল উচ্ছ্বসিল
বর্ষিল নয়নপথে ধারা অনিবার।
না ফিরাল যুবা পাশ, না মেলিল আঁখিতার,
না স্ফুরিল বাক্য তার জড়-রসনায়।
মাতার করুণস্বরে, না কাঁদিল সমস্বরে,
মাতার দুঃখেতে দুঃখ নাহি প্রকাশিল।
স্পন্দহীন জড় যথা, পড়িয়া রহিল তথা,
জগতের কেহ যেন সে নয় এখন ;
কালের দংশন আহা কঠিন এমন।

শ্রী—

—— ——

গোরক্ষণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গোষ্ঠ বা গোচারণ-ভূমির উৎকর্ষ ও অপকর্ষতার উপরেই গো-জাতির উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা নির্ভর করে। ভারতে এখন আর সেই গোবিন্দের লীলাভূমি বৃন্দাবন নাই, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকার গোষ্ঠ নাই। সেই উত্তরগো-গৃহ নাই!! নৈমিষারণ্য প্রভৃতি ঋষি-জন-সেবিত বিস্তৃত প্রান্তর নাই!!! তাই আজ আর ভারতে সেই সুরভি নাই, নন্দিনী নাই, গো-পালের শ্যামলী ধবলী নাই, কামদুঘা দ্রোণদুঘা প্রভৃতি গাভীর স্মৃতিও নাই।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়
গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

বলিয়া যে ভগবান্ জগদাধারকে প্রণাম করি, তিনি কি আর গোবিন্দ হইয়া এই ভারতে গোকুলে গোপকুলে বাস করিবেন না? আর কি গোবালকদিগকে লইয়া গো-পালনে মনোনিবেশ করিয়া ভারতবাসীকে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীকে গো-সেবা, গো-পালন ও গো-পরিচর্য্যা শিক্ষা দিবেন না? নন্দ গোপের বাধা বহন করিয়া গোপগণকে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর করিয়া

দিবেন না ? ভগবান্ গোবিন্দকে স্মরণ করিয়াও কি ভারতবাসী গোপগণ স্বীয় বৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া শূদ্রবৃত্তি দাসত্বকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অবলম্বন করিবে ?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গো।

"গম্ ধাতোঃ কর্ত্তরি ডো প্রত্যয়ঃ।" (রূঢ় শব্দ) কিন্তু কাহারও কাহারও মতে "গচ্ছতি ইতি গো" অথবা "গম্ ধাতোঃ করণবাচ্যে ডো। গচ্ছতি অনেন বৃষস্য যানসাধনাৎ। স্ত্রীগব্যাশ্চ দানাদিভিঃ স্বর্গগমনহেতুত্বাৎ।" গো শব্দ যৌগিক।

ইহারা স্বনামখ্যাত চতুষ্পাদ, স্তন্যপায়ী ও রোমন্থকজাতীয় জন্তু। ইহাদের পায়ের খুর দ্বিখণ্ডিত, মস্তকে দুইটি শৃঙ্গ ও ইহাদের দুই পার্শ্বে তেরখানি করিয়া ২৬ খানি পঞ্জরাস্থি আছে। গোকম্বল বলিয়া ইহাদের গলদেশে একটি স্থূল চর্ম্ম বিস্তৃত আছে। "গলকম্বলবত্বং গোত্বম্।" যাহাদের গল-কম্বল আছে, তাহারাই পূর্ব্বে গো বলিয়া অভিহিত হইত। গলকম্বলবিহীন গো-জাতীয় পশু গবয় প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইত। কিন্তু সম্প্রতি আর সেই পার্থক্য নাই। একজাতীয় গো দৃষ্ট হয়, যাহাদের পৃষ্ঠ ও স্কন্ধদেশের মধ্য স্থলে একটি উচ্চ ঝুঁটি আছে, ঐ ঝুঁটিকে ককুৎ বলে। ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐরূপ ককুদ্‌যুক্ত গোকে Zebu বলেন এবং

ককুদ্‌বিহীন গোলশৃঙ্গ গোদিগকে Taurus এবং চেপটা শৃঙ্গবিশিষ্ট গোদিগকে Gaveaus বলেন।

গো জাতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নানাজাতীয় গৃহপালিত ও বন্য গো দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, চীন, জাপান ও তাতার প্রভৃতিতে, ইউরোপের ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মন প্রভৃতি রাজ্যসমূহে, আমেরিকার নানা স্থানে এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপসমূহে বিবিধজাতীয় গোর আবাসভূমি।

হিমালয় প্রদেশে চামরী গো পাওয়া যায়, ঐ সকল গোর লাঙ্গূল ভূস্পর্শী, দীর্ঘ ও মসৃণ। ইহাদিগের দ্বারা ঐ প্রদেশের লোকে চাষাবাদ করে এবং ইহাদের দুগ্ধ পান করে। চামরীর লাঙ্গূলে অতি মসৃণ কৃষ্ণ ও ধবল রোমরাজি বিদ্যমান থাকে, তদ্দ্বারা চামর প্রস্তুত হয়।

চট্টগ্রাম ময়মনসিংহে, উত্তরে কুচবিহার প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে গোজাতীয় এক শ্রেণীর পশু দৃষ্ট হয়, উহারা গবয়, গয়াল বা মিথুন বলিয়া উক্ত হয়। ইউরোপের পর্ব্বতসমূহের শিখরদেশে বাইসন Bison নামক ককুদ্‌বিশিষ্ট গোজাতীয় এক প্রকার বন্য জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের শরীরের আকৃতি মহিষ অপেক্ষাও বৃহৎ। উহাদের মস্তকে ও ঘাড়ে অত্যন্ত লম্বা লোম হয়। ঐ লোমগুলি ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া

পড়ে। শীতকালে ঐ লোম গজাইয়া উঠে, গ্রীষ্মে পড়িয়া যায়। ঐ লোমে সূতা প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট দস্তানা প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

উহারা অরণ্যে দলবদ্ধ হইয়া চলে এবং কোন হিংস্র পশু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে আক্রমণকারীকে আক্রমণ করে।

লিথুয়েনিয়ার গভীর অরণ্যে হস্তিসদৃশ বিশালকায় ইউরণ নামে গোজাতীয় পশু দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত গোসকলের পরস্পর সংযোগে নানাজাতীয় সঙ্কর গো উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমোক্ত জাতীয় গোসকলের মধ্যে নানা প্রকারের শ্রেণী-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই প্রবন্ধে গোসমূহের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ—যে সকল গোর গলকম্বল আছে, তাহারাই আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে গো-শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট। যাহাদিগের গলকম্বল নাই, তাহারা গবয়শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু উভয় শ্রেণীই দুগ্ধাদি দান ও কৃষিকার্য্যে আমাদিগের গো-পর্য্যায়ে অভেদে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয়তঃ—যে সকল গোর ককুদ্ আছে, (Zebu) তাহারা ও যাহাদের ককুদ্ নাই, তাহারা দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

শৃঙ্গ দ্বারাও গো-সকলের একরূপ বিভাগ আছে। যথা—গোল শৃঙ্গবিশিষ্ট ও চেপ্টা শৃঙ্গবিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র শৃঙ্গবিশিষ্ট (Short horned) ও বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট

(large horned) দুইটি শ্রেণী বিভাগ আছে। উর্দ্ধ্বশৃঙ্গী ও অধঃশৃঙ্গী ভেদেও দুইপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে।

বর্ণাদি-ভেদে আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ গো সকলের এক-প্রকার শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। যথ—কৃষ্ণা, নীলা, শুভ্রা, রক্তবর্ণা, বিচিত্রবর্ণা ও কপিলা অর্থাৎ সুবর্ণবর্ণা। ইহাদের মধ্যে কপিলার বিশেষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

"গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা।" কৃষ্ণবর্ণা গাভী বহু দুগ্ধ দেয় ও ঔষধার্থ কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়।

ত্বকের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা-ভেদে দুই প্রকার গাভী আছে। সূক্ষ্মত্বক্‌বিশিষ্টা গাভী অধিক দুগ্ধবতী।

ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ার (Imperial Gazetteer) নামক গ্রন্থের ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার ৩য় খণ্ডে ভারতীয় গোজাতিকে প্রদেশভেদে, শৃঙ্গ, পুচ্ছ ও মস্তকাদিভেদে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই বিভাগটি অতি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

(১) গুজরাটী গো—

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের উত্তরাংশের (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা পুরী ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের) গো-সকলই ভারতীয় গোজাতির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই গাভীগণ দেখিতে যেমন সুশ্রী, তেমনি দুগ্ধবতী। ইহারা প্রত্যহ দশ হইতে ষোল সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। এই গো-জাতি কৃষিকার্য্যের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে কাঙ্ক্রেজি বা উদীয়াল নামক গোশ্রেণী উৎকৃষ্টতম। ইহা-

দিগের বর্ণ রজত-শুভ্র, শুভ্র-মিশ্র ধূসর, ধূসর ও গাঢ় ধূসর। ইহাদিগের জঙ্ঘা ঈষৎ দীর্ঘ। এতদ্ব্যতীত ইহাদের শরীর অতি সুঠাম ও সুগঠিত। মস্তক উন্নত, শৃঙ্গ মোচড়ান (spiral) বয়স্ক বৃষের শৃঙ্গ অতি বৃহৎ ও সুশোভন। কর্ণযুগল বৃহৎ, সরল ও মুক্ত (open)। পদগুলি সুগঠিত ও সুসংস্থিত (well-placed)। খুর ছোট, গোল ও দৃঢ় (durable)। গুজরাটী গো-সকল বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বেদ-বিদ্যালয়ের স্থান-সৌষ্ঠব।

ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ সহরে একটি বেদ-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার সংসৃষ্ট "আর্য্য-গৌরব" নামক মাসিক পত্র হইতে বিদ্যালয়-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আচারনিষ্ঠ, অক্লান্তকর্ম্মা, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার সম্পাদক এবং সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রবল অনুরাগী, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহোদয় তাঁহার সহকারী—এ বাস্তবিক মণি-কাঞ্চন-সংযোগ হইয়াছে। কিন্তু প্রবল চেষ্টা ও প্রাণপণ পরি-শ্রম করিয়াও অনেক সময় দেখা যায় যে, অনুষ্ঠানে আশানুরূপ সফলতা হইতেছে না। ক্ষেত্রে গলদঘর্ম্ম হইয়া হলচালন করিয়াও

আশানুরূপ শস্য লাভ করা যায় না। অতএব ক্ষেত্রটি ছাড়া আরও কিছু দেখিতে হইবে। এ বিদ্যালয়ের স্থানটি ৺ বারাণসীর ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্রও নহে, কলিকাতার ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রও নহে—এমন কি, জিলার কেন্দ্রভূমি নসিরাবাদও নহে—এখানে বেদ-বিদ্যালয় টিকিবে কি? এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইবে—বিশেষতঃ অনুরাগীর; কেন না, স্নেহঃ পাপাশঙ্কী।

বিগত চৈত্র সংখ্যার "আর্য্য-গৌরবে" সম্পাদক গিরিশ বাবু বেদ-বিদ্যালয়ের একটা রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। দেখিলাম, স্থান সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছন, জনৈক মহামনা ব্যক্তি কিশোরগঞ্জে বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ, আতপ তণ্ডুল, মুদ্গ, কদলী প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যের উৎকৃষ্ট উপকরণ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া এ স্থানে বেদ-বিদ্যালয় সংস্থাপন আবশ্যক মনে করেন। পড়িয়া মনে মনে বলিলাম,—বন্ধো,

"এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

মুদ্গ-দুগ্ধ-তণ্ডুল-কদলী সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার অনেক স্থানে এই দুর্দ্দিনেও উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পাওয়া যায়; কিন্তু তা হ'লে সর্ব্বত্রই কি বেদ-বিদ্যালয় টিকিতে পারে?

দেখিতে হইবে যে, ব্রহ্মচারীর দেহ-পোষণ উপযোগী দ্রব্যাদি এখানে প্রচুর থাকিলেও, ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণের পোষক প্রকৃত সার এই স্থলে আছে কি না? যদি থাকে, তবেই বলিতে হইবে, স্থানটি নির্ব্বাচন সুষ্ঠু হইয়াছে; নচেৎ পরিণামে ইহা উদ্যোক্তৃ-বর্গের হতাশার কারণ হইবে মাত্র।

আমার বিশ্বাস, স্থানটি ঠিকই নির্ব্বাচিত হইয়াছে ; কেবল ব্রহ্মচারীর দেহ-পোষণোপযোগী বস্তুজাত সুলভ বলিয়াই নহে—এখানে ব্রহ্মচারীর প্রাণপোষণ-পদার্থও আছে ; সেই কথাই আমি কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি।

ময়মনসিংহে—বিশেষতঃ জেলার পূর্ব্বাংশে বল্লালী শ্রেণী-বিভাগ নাই, তাই এখানে কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় ইত্যাদি সংজ্ঞা শুনা যায় না। এমন কি, রাঢ়ী ও বৈদিকে সম্বন্ধবাদও হইয়া থাকে। ইহাতে এই স্থানের ব্রাহ্মণসমাজে অশাস্ত্রীয় কতকগুলি আচার-ব্যবহার কদাপি প্রচলিত হয় নাই। যথা—জাতরজা কন্যার বিবাহ ; স্ত্রীলোকের আমরণ কৌমার্য্য, নারীগণের পিত্রালয়ে চিরাবাস ; অজ্ঞাত-কুলশীলা (ভরার) কন্যা গ্রহণ ইত্যাদি ইত্যাদি। বঙ্গের কেন্দ্রস্থ ব্রাহ্মণ-সমাজ ঐ সকল কুপ্রথায় জর্জ্জরিত হইয়া অধঃপাতে গিয়াছে। আজ যে আমরা এত চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে সাহেব সাজিতে দেখি ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য এত অকার্য্য কুকার্য্য করিতে দেখি, এই কু-লীন-প্রথাও তাহার একটা অন্যতর কারণ। সাধে কি বল্লালকে কলির চেলা বলে? তাই এই সমাজে এখনও খাঁটি ব্রাহ্মণ সমধিক পরিমাণে আছেন। ইহাঁদের ব্যবসায়ও ভাল ; প্রায়শঃ যজমানশিষ্য দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। যাঁহারা অবস্থাবিপাকে রাজ-কার্য্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও আচারহীনতা অতি কম দেখা যায়।

এই গেল ব্রাহ্মণদের কথা। বৈদ্য-কায়স্থে পার্থক্যটা যদিও

এ অঞ্চলে নাই, তথাপি ব্রাহ্মণেতর এই সকল ভদ্রলোকেরাও প্রায় সকলেই দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, বার মাসে তের পার্ব্বণ, পিতৃ-মাতৃ-কৃত্যাদি শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদন করিয়া থাকেন। কালধর্ম্মে বিলাতী বিষ এই সমাজে ঢুকিয়াছে জানি, কিন্তু তাহা এখনও তেমন উৎকট হয় নাই।

তবেই দেখা গেল, ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণপরিপোষক সমাজ এখানে রহিয়াছে। তাই বেদ-বিদ্যালয় ঠিক উপযুক্ত স্থলেই সংস্থাপিত হইয়াছে।

রিপোর্টে দেখা যায়—বেদ, সাংখ্য, কাব্য, ব্যাকরণ এবং আয়ুর্ব্বেদ এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপিত হইতেছে। আরও (অন্ততঃ) একটি বিষয় যেন এ স্থানে অধ্যয়নের ব্যবস্থা হয়। সেটি পঞ্চম বেদ অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র। আমার এ কথাটি বলিবার একটু ব্যক্তিগত স্বার্থও আছে। এই বেদ-বিদ্যালয়ের সন্নিকটেই আমার কুল-গুরুর অধিষ্ঠানভূমি। কিরূপে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ এ স্থানে আসিয়া মন্ত্রগ্রহণ করেন, অবান্তর হইলেও স্থানমাহাত্ম্যসূচনার্থ তাহা সংক্ষেপে যথাশ্রুত বলিতেছি। আমাদের বংশের বীজী পুরুষ শ্রীহট্টের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া এক রাজত্বের পত্তন করেন;—পরে সেই রাজ্য—বাণিয়াচঙ্গ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। রাজা ইষ্টদেবীর বাড়ীতে সন্ন্যাসী স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই মন্দিরাধিপতি করিয়া দীক্ষাগুরুর পদে বৃত করেন এবং যদিও পরে রাজ্যাধিকার মুসলমানের হাতে চলিয়া যায়, তথাপি বংশানুক্রমে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ৺ কালীবাড়ীর

সন্ন্যাসী হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। আমার প্রপিতামহ দেব বহু শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও আগমে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, শাস্ত্রানুসারে গৃহীর সন্ন্যাসী হইতে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ। তাই বংশের জনৈক প্রধান ব্যক্তির সমভিব্যাহারে গৃহী গুরুর অন্বেষণে দেশভ্রমণে বাহির হইয়া কিশোরগঞ্জের সন্নিকটস্থ যশোদলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সুখ্যাতিশ্রবণে তাঁহাদের বড়-বাড়ীতে একটি বৎসর অবস্থান করিয়া গুরু পরীক্ষাপূর্ব্বক এখানেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা এম, এ, বিদ্যাবিনোদ।

অহল্যা।

মহামতি কুমারিল ভট্ট বলেন, ইন্দ্র অর্থে সূর্য্য, ঐশ্বর্য্যার্থক ইদি ধাতু দ্বারা ইন্দ্র পদ সার্থক হইয়াছে; পরমৈশ্বর্য্যবান্ ভগবান্ সূর্য্য ইন্দ্রপদবাচ্য। "অহনি লীয়তে নশ্যতীতি অহল্যা।" অর্থাৎ দিবসে যাহা থাকে না, সেই রাত্রির নামই অহল্যা। সেই রাত্রিকে যিনি জীর্ণ করেন (বিনাশ করেন), তাঁহারই নাম অহল্যাজার অর্থাৎ সূর্য্য। ইহা ভিন্ন ইন্দ্র নামক অপর কোন ব্যক্তি অহল্যানাম্নী কোন মানবীতে উপগত ছিলেন না।

কেহ কেহ বলেন, কর্ষণার্থ হল ধাতুর পদ হল্যা অর্থাৎ

কর্ষণযোগ্যা ভূমি ; ন হল্যা অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি কর্ষণের যোগ্যা নহে, সেই পাষাণময়ী ভূমির নামই অহল্যা। এই অর্থ অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রে অহল্যার পাষাণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অহল্যা নামে কোন মানবী ছিল না, পাষাণও কেহ কখনও হয় নাই।

সংস্কৃতভাষা অর্থসাগর, ব্যুৎপত্তি থাকিলে ইহা হইতে এত অর্থ উত্থাপন করা যায় যে, যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লইতে পারেন। অনেক আদিরসের কবিতাকে শান্তিরসে পরিণত করা যায়, আবার শান্তিরসের কবিতাকেও আদিরসে পরিণত করা যাইতে পারে। সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যায় রামে শ্যাম হইয়া দাঁড়ায়, ইতিহাস পুরাণাদির সত্যগুলি এতাদৃক্ ব্যাখ্যার এক ফুৎকারে আকাশে উড়িয়া যায়, সুতরাং আমরা এরূপ কল্পিত জল্পিত ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি।

কতকগুলি উপকথা শাস্ত্রকথা বলিয়া হিন্দুসমাজে বহু দিন হইতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই সকল কুসংস্কারের মূল শাস্ত্রদর্শনাভাব। আমাদের শাস্ত্রবাক্য আবার বহু স্থানেই রূপকালঙ্কারে, অদ্ভুত রসে, অর্থবাদে ও কূটার্থে পরিপূর্ণ, সুতরাং শাস্ত্রদর্শীদিগের মধ্যেও যাঁহারা বিপুল ধীশক্তিসম্পন্ন নহেন, তাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। এতাদৃশ ব্যাখ্যাতার মুখে এবং কথকদিগের মুখে যাঁহারা শাস্ত্রকথা অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের বহু স্থানেই কুসংস্কার থাকিবার সম্ভাবনা।

কথকগণ শাস্ত্রের বিবৃত ব্যাখ্যা ও অশাস্ত্রকে শাস্ত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতেছেন। ইত্যাদি নানা কারণে অহল্যা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

অহল্যা গৌতম-শাপে পাষাণ হইয়াছিলেন, ইন্দ্র সহস্রযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপর গৌতমের অনুগ্রহে সহস্রলোচন হইলেন, ইত্যাদি অনেক কথাই আমরা শুনিতেছি ও বিশ্বাস করিতেছি। অহল্যার কিছুমাত্র পাপ ছিল না, তিনি গৌতম-রূপধারী ইন্দ্রকে পতিজ্ঞানেই গ্রহণ করিয়াছিলেন. এরূপ বিশ্বাসও আমাদের অনেকের অন্তরে জাগরূক। কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

বাল্মীকি রাম-লক্ষ্মণাদির সমসাময়িক লোক, রামায়ণের বহু ঘটনাই তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত। সুতরাং রামায়ণী ঘটনা জানিতে হইলে একমাত্র বাল্মীকির রামায়ণই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। বাল্মীকি রামায়ণের বিরুদ্ধ কথা পরবর্ত্তী কোন শাস্ত্রে থাকিলেও তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যেহেতু বহুকাল পরে পরস্পর শ্রুত ঘটনা অপেক্ষা প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা সকলের নিকটেই সমাদৃত ও প্রমাণরূপে গৃহীত। সুতরাং বাল্মীকি রামায়ণে অহল্যার বৃত্তান্ত কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আমরা আজ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রাম নিকটে মনোহর তপোবন দর্শন করিয়া অগ্রগামী বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! এ কাহার তপোবন

এবং এখানে জন-প্রাণীই বা দেখিতেছি না কেন? বিশ্বামিত্র বলিলেন, রঘুবর! বহুকাল পূর্ব্বে এ স্থানে মহর্ষি গৌতমের তপোবন ছিল। একদা সুরপতি ইন্দ্র এই আশ্রমে গৌতমপত্নী অহল্যাকে একাকিনী অবলোকন করিয়া গৌতমের বেশ ধারণ পূর্ব্বক অহল্যার নিকট বলিলেন,—সুন্দরি! আমি তোমার সহিত সহবাস ইচ্ছা করিতেছি। অহল্যা কপটাচারী মুনিবেশ-ধারী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তাহার সহিত রমণ ইচ্ছা করিলেন এবং রমণান্তে বলিলেন,—সুরবর! আমি কৃতার্থা হইয়াছি এবং তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ঋষি এখনই আসিতে পারেন; অতএব তুমি তোমার আত্মসম্মান এবং আমার সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। অহল্যার বাক্যে সুরপতি হাসিয়া বলিলেন, সুন্দরি! আমিও তুষ্টিলাভ করিয়াছি, যে স্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানেই এখন চলিলাম। *

—সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেশধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ॥
সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে!।
মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন!॥
মতিঞ্চকার দুর্ম্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ।
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা॥
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ! গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো!।
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ! সর্ব্বথা রক্ষ গৌরবাৎ॥
ইন্দ্রস্তু প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ।
সুশ্রোণি! পরিতুষ্টোঽস্মি গমিষ্যামি যথাগতম্॥

সহবাসান্তে এই কথা বলিয়া ইন্দ্র গৌতমের কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। ইন্দ্র গৌতমের ভয়ে দ্রুতবেগে চলিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে দেখিলেন, গৌতম কুশ ও সমিধ হস্তে লইয়া তাঁহার কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন গৌতম গৌতমের বেশধারী দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রকে সম্মুখে দর্শন করিয়া ক্রোধভরে বলিলেন,—দুর্ম্মতি! আমার রূপ ধারণপূর্ব্বক তুমি অকর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছ, অতএব তুমি অণ্ডকোষ-রহিত হইয়া থাক।

রোষান্বিত গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের অণ্ডদ্বয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। *

তৎপরে মহর্ষি গৌতম নিজ ভার্য্যা অহল্যাকে অভিশাপ প্রদান করত বলিলেন,—তুমি বাতভক্ষ্যা, নিরাহারা ও সর্ব্ব-প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া এই তপোবনে ভস্মরাশির মধ্যে বহু সহস্র বর্ষ অনুতাপানলে সন্তপ্তা হইতে থাক। যখন দশরথাত্মজ রাম

---

* এবং সঙ্গম্য তু তদা নিশ্চক্রামোটজাত্ততঃ।
সসম্ভ্রমাত্ত্বরন্ রাম! শঙ্কিতো গৌতমং প্রতি॥
গৌতমং সন্দদর্শাথ প্রবিশন্তং মহামুনিম্।
গৃহীতসমিধং তত্র সকুশং মুনিপুঙ্গবম্॥
অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেশধরং মুনিঃ।
দুর্ব্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্বচনমব্রবীৎ॥
মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্ম্মতে!।
অকর্ত্তব্যমিদং যস্মাদ্বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি॥
গৌতমেনৈবমুক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা।
পেততুর্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ॥

এই বনে আগমন করিবেন, তখন তুমি পবিত্রা হইয়া পুনর্ব্বার স্বদেহ ধারণ পূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিবে।

. মহাতেজা গৌতম সেই দুশ্চারিণী অহল্যাকে এই অভিশাপ প্রদান করত মনোহর হিমালয়-শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। *

এখানে পাষাণ হওয়ার কোন কথাই নাই। সর্ব্বভূতের অদৃশ্যা ও নিরাহারা হইয়া ভস্মমধ্যে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বহু সহস্র বর্ষ এই বনে বাস করিতে থাক। গৌতম এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন।

এই অভিশাপের অবস্থার সমালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, অহল্যা তখন পূর্ব্বদেহ নিয়া জীবিতাবস্থায় ছিলেন না। জীবদ্দশায় কেহ সকলের অদৃশ্যা থাকিতে পারে না। অহল্যার এমন কোন তপঃপ্রভাবও ছিল না যে, সেই বলেই তিনি অদৃশ্যা হইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ রক্ত-মাংসের

---

* তথা দৃষ্ট্বা চ তং শক্রং ভার্য্যামপি চ শপ্তবান্।
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি॥
বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্ব্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি॥
যদৈতচ্চ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুদ্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি॥
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি।
এবমুক্ত্বা মহাতেজা গৌতমো দুষ্টচারিণীম্।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে মহাতপাঃ॥
রামায়ণ, আদিকাণ্ড, একোনপঞ্চাশ সর্গ।

দেহ কখনও বহু সহস্র বর্ষ থাকে না। মন্বাদি শাস্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, সত্য যুগে পরমায়ুর পূর্ণ সংখ্যা চারি শত বর্ষ ছিল, ত্রেতাযুগের পূর্ণায়ু তিন শত বর্ষ মাত্র। *

অপিচ দেহ থাকিলে বহু সহস্র বর্ষ নিরাহারেও কেহ থাকিতে পারে না।

ভস্মরাশির মধ্যে থাক, অভিশাপের এই ভস্ম শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, অহল্যার দেহ গৌতম-শাপে ভস্মীভূত হইয়াছিল। তাহার আত্মা সেই দৈহিক ভস্মের মধ্যে তপোবনে বহু সহস্র বর্ষ পাপের ফল অনুতাপ ভোগ করিতেছিল। রামাগমনে তিনি পাপমুক্তা হইয়া পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বাল্মীকি রামায়ণে গৌতম-শাপে ইন্দ্রের সহস্রলোচন-প্রাপ্তির কোন কথাই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রের সহস্রাক্ষ নাম হওয়ার অন্য কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শাস্ত্রে আছে, কার্ত্তবীর্য্য সহস্রবাহু ছিলেন। একটা লোকের অঙ্গে এক হাজার হস্তের সমাবেশ মানব-দেহের আয়তনে কুলায় না। পায়ের পাতা হইতে গজাইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত দুই দিক্ দিয়া হাত বাহির হইয়া পড়িলেও এক হাজার হস্তের স্থান সঙ্কুলন হয় না। সুতরাং সহস্র বাহুর কথা একেবারেই অযৌক্তিক হইয়া দাঁড়ায়। অথচ শাস্ত্রকথা যে একেবারেই গাঁজাখোরী কথা, তাহাও আমরা বিশ্বাস করিতে

* তপঃপ্রভাবে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়, এই জন্য গৌতম বহু সহস্র বর্ষ পরেও জীবদ্দশায় অহল্যাকে পুনর্লাভ করিয়াছিলেন।

পারি না। স্কন্দপুরাণে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বাহুতে সহস্র বাহুর বল ছিল, তাই তিনি সহস্রবাহু বলিয়া অভিহিত।

· বোধ হয়, রাবণের দশটা মাথা ও বিংশতি হস্তের বল থাকায় তিনিও দশানন ও বিংশতিবাহু বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন।

আচার-ব্যবহার-শিক্ষা, সভ্যতা অসভ্যতাদি ভেদে এক মানব জাতিই রাক্ষস, পিশাচ ও কিন্নরাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

দেবদ্বিজদ্বেষী পর্ব্বতারণ্যবাসী আমমাংসভোজী অসভ্য মানবই রাক্ষস নামে অভিহিত। সুতরাং একটা মানুষের দশটা মাথা, কুড়ীখানা হাত থাকা একেবারেই অযৌক্তিক।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্র হস্ত ও রাবণের বিংশতি হস্ত, দশমুণ্ড যেরূপ শক্তি অবলম্বন করিয়া কল্পিত হইয়াছে, ইন্দ্রের সহস্রলোচনও সেইরূপ ঐশ্বর্য্য অবলম্বন করিয়া কল্পিত। ইন্দ্র দেবরাজ, শাস্ত্র বলেন—"রাজানশ্চারচক্ষুষঃ" অর্থাৎ রাজা নিজে কিছুই দেখেন না, সমস্তই চরমুখে অবগত হইয়া থাকেন, চরই রাজার চক্ষুঃস্বরূপ। দেবরাজ ইন্দ্রের সহস্র চর ছিল ; তাই তিনি সহস্রাক্ষ বলিয়া অভিহিত।

বাৎসায়ন মুনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রের সহস্র মন্ত্রী ছিল, মন্ত্রীই রাজগণের চক্ষুঃস্বরূপ ; তাই ইন্দ্র সহস্রলোচন নামে অভিহিত।

এই তো গেল শাপের কথা। ইহার পর রামায়ণে লিখিত আছে, ইন্দ্র গৌতমশাপে অণ্ডরহিত হইয়া অগ্নিদেব ও অন্যান্য দেবগণের সহিত পিতৃলোক-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে পিতৃগণ একটি মেষের অণ্ড উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রের অণ্ডস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিলেন, তাহাতেই তাঁহার অভাব দূর হইল।

শাস্ত্রে এইরূপ অনেক অদ্ভুত কথা আছে, ছাগমুণ্ড দক্ষের স্কন্ধে জোড়া লাগিয়া গেল, গজমুণ্ড গণেশের স্কন্ধে জোড়া লাগিল। এই সকল কথার ভিতরে কোন্ তাৎপর্য্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। যার তার একটা মাথা হইলেই যে জোড়া দেওয়া যায়, আবার পশুর মাথায় দেবতার মাথার কার্য্য করে, এ কথা তো একেবারেই যুক্তিহীন। দক্ষ দেবাদিদেব মহেশ্বরের নিন্দা করিয়া পশুর ন্যায় অজ্ঞানতার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র গৌতম-পত্নীগমনে পাশব ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই জন্যই পশুর অঙ্গ তদীয় অঙ্গ হইল বলিয়া তাহাদের কুৎসা কীর্ত্তিত হইয়াছে, কি অন্য কোন তাৎপর্য্য আছে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

সংযম।

—•—

(২)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, "ধারণা দ্বারা চিত্তকে বন্ধ করিবে, ধ্যান দ্বারা ধৃত চিত্তের একতানতা সম্পাদন করিবে। তৎপর সমাধি দ্বারা বিষয়ান্তর-দৃষ্টি-পরিশূন্য নির্ব্বাত-দীপবৎ চিত্ত যখন একটি মাত্র বিষয়ে স্থির থাকিবে, তখন তাহা প্রকৃত "সংযম" হইয়াছে বুঝিবে।"

সুতরাং প্রথমে আমাদিগকে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির বিষয় অবগত হইতে হইবে। কাজেই কি উপায়ে ধারণাদির অধিকারী হওয়া যায়, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

যোগ-শাস্ত্রমতে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গীভূত। সুতরাং প্রথমতঃ যথাক্রমে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি পঞ্চাঙ্গের অনুশীলন করিতে হইবে। যোগময়ী মা'র অপার করুণায় যমাদি প্রত্যাহারান্ত পাঁচটি অঙ্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলে, সাধক ক্রমশঃ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অধিকারী হইয়া "সংযমী" হইবেন।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উক্ত হইয়াছে—

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈ বচ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি! প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে॥"

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই কয়টি যোগাঙ্গ। প্রোক্ত অষ্টবিধ যোগাঙ্গের সাধন-দ্বারা সাধক চিত্ত-বৃত্তিকে নিরোধ করিতে পারেন বলিয়া "সংযমী" অথবা "যোগী" নামে খ্যাত হন।

সংযম অতি পবিত্র। পুরাকালে সংযমাবলম্বী ঋষিগণ "আর্য্য" নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং অসংযমী নর-নিকর "অনার্য্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধুনা নেত্র-হীন পদ্ম-পলাশ-লোচন নামধারীর ন্যায় ঘোর অসংযমী—অনার্য্য ভারত-বাসী নিরর্থক আর্য্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন। হায় ভারতবাসী! তোমরা অনার্য্য-জনোচিত আচার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আর্য্যনামের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছ। তাই বলি, যথানিয়মে যমাদির অনুষ্ঠান করিয়া, পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় সংযমী হইয়া আর্য্য-গৌরব বৰ্দ্ধিত কর। তুমি ইহা মনে রাখিও যে, সংযম একমাত্র ভারতবাসীর সম্পত্তি। এ সম্পত্তিতে অন্যের অধিকার নাই। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, বৰ্ত্তমানে তোমরা স্বর্ণ-ভারতের সংযম-সুবর্ণ-খনি আহ্লাদে অন্য দেশবাসীকে দান করিয়া বিনিময়রূপে "অসংযম-হলাহল" গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছ! কবির ভাষায় বলা যায় যে, "নিজ অন্ন পরে পরপণ্যে দিয়ে, পরিবৰ্ত্ত ধনে দুরভিক্ষা নিলে।" গীতার কথায় বলি, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" যা'ক্—এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি।

সংযমকে খাঁটিরূপে বুঝিতে হইলে, পূর্ব্বকথিত যম, নিয়ম,

আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি সুষ্ঠু পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজনীয়। অতএব যথাক্রমে যমাদির বিবৃতি করা হইতেছে—

১। যম—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচঞ্চেতে যমা দশ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অন্যের দ্রব্যে লোভরাহিত্য), ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব (প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা একরূপত্বমার্জ্জবং), ক্ষমা, ধৃতি (সম্পদ্ ও বিপদে চিত্তের সমভাব), মিতাহার (পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ।), শৌচ (শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। স্নানাদির দ্বারা যে শুদ্ধি, তাহাকে বাহ্য শৌচ কহে। গুরুশুশ্রূষা ও অধ্যাত্মবিদ্যা দ্বারা যে শুদ্ধি, তাহাকে আভ্যন্তর শৌচ বলে।) এই দশটী যম।

২। নিয়ম—

তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বরপূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্ম্মতিশ্চ জপো ব্রতম্॥
এতে চ নিয়মাঃ প্রোক্তাঃ—

(তপ)—বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরশোষণং প্রাহুস্তপসাং তপ উত্তমম্॥

(সন্তোষ)—যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং মনঃ পুংসো ভবেদিতি।
যা ধীস্তামৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণম্॥

(আস্তিক্য)—ধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসো যস্তদাস্তিক্যমুচ্যতে॥

(দান)—ন্যায়ার্জ্জিতং ধনঞ্চাল্পমন্যদ্বা যৎ প্রদীয়তে।
অর্থিভ্যঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তং দানমেতদুদাহৃতম্॥

(ঈশ্বর-পূজন)—ভক্তিসহকারে স্বেষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করার নাম ঈশ্বর-পূজন।

(সিদ্ধান্ত-শ্রবণ)—সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং বেদান্তশ্রবণং বুধৈঃ।
বেদান্তাদি ঈশ্বরনির্ণায়ক শাস্ত্র-শ্রবণকে সিদ্ধান্ত শ্রবণ কহে।

(হ্রী)—বেদ ও লৌকিক পথে কুৎসিত কর্ম্ম বলিয়া যাহা অভিহিত হইয়াছে, তত্তৎকর্ম্মাচরণে যে লজ্জা, তাহাই হ্রী।

(মতি)—বিহিতেষু চ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যা সা মতির্ভবেৎ।

(জপ)—গুরূপদিষ্ট মন্ত্রে স্বেষ্ট দেবতার রূপ চিন্তা করিবে। ইহারই নাম জপ। স্থূলতঃ, মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া ধ্যান পূর্ব্বক মন্ত্রবর্ণগুলি মনে মনে উচ্চারণ করিলে প্রকৃত জপ হয়।

(ব্রত)—প্রসন্নগুরুণা পূর্ব্বমুপদিষ্টমনুজ্ঞয়া।
ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধার্থমুপায়গ্রহণং ব্রতম্॥
গুরুর উপদেশে ধর্ম্মার্থ-কাম-সিদ্ধির জন্য উপায় অবলম্বন করার নাম ব্রত।

৩। আসন—

"স্থিরসুখমাসনম্।"

সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র।

যেরূপে উপবেশন করিলে দেহ ও মনের সুখ ও স্থিরতা জন্মে, তাহাকে আসন কহে। উপাসনা-সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন আসন নাই। তবে যোগিগণ সিদ্ধ ফলপ্রদ যে সকল আসনের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, মাদৃশ জনের নিমিত্ত সেই সকল আসনই প্রয়োজনীয়। যথা—স্বস্তিক, গোমুখ, পদ্ম, বীর, সিংহ, ভদ্র, মুক্ত ও ময়ূর প্রভৃতি।

ঠাকুর শ্রীসতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
সংস্কৃত কলেজ।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

কায়মনোবাক্যে কোনও প্রকার জীবকে পীড়া না দেওয়াই অহিংসা। এ বিষয় মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে বৃহস্পতি ও ভীষ্ম যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে এখানে লিখিত হইল। যজ্ঞার্থে এবং পূজার্থে পশুহনন দূষণীয় নহে, তাহাও ভীষ্মদেব বলিয়াছেন, সে বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে; উদরার্থে জীবহিংসা কত যে গর্হিত ও নারকীয়, তাহাই এখানে মহাভারত হইতে দেখান যাইতেছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—“অহিংসা, বৈদিক কর্ম্ম, ধ্যান, ইন্দ্রিয়-সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই সকলের মধ্যে পুরুষের পক্ষে

শ্রেয় কি ? বৃহস্পতি এই ছয়টিকেই ধর্ম্মের দ্বারস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি আত্মসুখ ইচ্ছা করত অহিংসক ভূতসমুদায়কে দণ্ড দ্বারা নিহত করে, সে পরলোকে গিয়া সুখী হয় না। যে পুরুষ সর্ব্বভূতে আত্মোপম ন্যস্তদণ্ড ও জিতক্রোধ, তিনি পরলোকে সুখী হন্। যিনি আত্মদুঃখের ন্যায় পরদুঃখে উদ্বিগ্ন হন্, সর্ব্বভূতে আত্মরূপে তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করেন, তিনিই ধার্ম্মিক। আপনার পক্ষে যাহা প্রতিকূল, তাহা পরের প্রতি সন্ধান করিবে না, সংক্ষেপতঃ ইহাই ধর্ম্ম। পুরুষ প্রত্যাখ্যান, দান, সুখ-দুঃখ, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে আপনার উপমা দ্বারা প্রমাণ প্রাপ্ত হন। অতএব পালন করিবে, হিংসা করিবে না, জীবলোকে ইহাই উপদেশ।"

ভীষ্ম বলিলেন,—"ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এই অহিংসাকে মন, বাক্য, কর্ম্ম ও লক্ষণভেদে চতুর্ব্বিধরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন পাদচারী জীবগণের ক্ষুদ্র পদচিহ্ন গজ-পদ দ্বারা পিহিত হয়, তদ্রূপ অহিংসাতে সমস্ত ধর্ম্ম সমাবিষ্ট হইয়া থাকে; পুরা-কাল হইতে ধর্ম্মতঃ অহিংসাই শ্রেষ্ঠরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। যিনি প্রথমতঃ মনে মনে ত্যাগ করিয়া বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা পরিহার করত মাংস ভক্ষণ না করেন, তিনি বিমুক্ত হন। তপোযুক্ত মনীষিগণ কখনও মাংস ভক্ষণ করেন না। যে মোহসমন্বিত মানব পুত্রমাংসোপম মাংস ভক্ষণ করে, সে অধম পুরুষরূপে স্মৃত হয়। অবশ পাপাচার পুরুষ হিংসা করিয়া ভূয়োভূয় পাপযোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রতি জিহ্বারই যে প্রকার রসজ্ঞান হয়,

তদ্রূপ আস্বাদিত বস্তু হইতে রাগ জন্মে এবং চিত্তও সে প্রকারে গঠিত হয়। অনেকানেক সাধুজন (শিবিরাজ প্রভৃতি) নিজ জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বমাংস দ্বারা পরমাংস পরিপালন করত অক্ষয় স্বর্গে গমন করিয়াছেন। কুরুনন্দন! মাংস ভক্ষণ না করিলে যে ধর্ম্ম হয় এবং এ বিষয়ে যাহা উৎকৃষ্ট বিধি আছে, তাহাও শ্রবণ কর। যাঁহারা সৌন্দর্য্য, সৌভাগ্য, আয়ু, বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল ও স্মৃতি প্রাপ্ত হইতে কামনা করেন, তাঁহারাই হিংসা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যিনি মাংস পরিত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বভূতের অধর্ষণীয়, সর্ব্বজীবের বিশ্বসনীয় এবং নিয়ত সাধু-সকলের সম্মত হন। সপ্তর্ষিগণ, বালখিল্যগণ এবং মরীচিপ মনীষিগণ মাংস ভক্ষণ না করাকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। যিনি মাংস ভক্ষণ না করেন এবং পশু (কেবল চতুষ্পদ জন্তু নয়, সর্ব্বপ্রকাব জীব) হনন ও ঘাতন না করেন, তিনিই সর্ব্বভূতের মিত্র। যে পরমাংস দ্বারা নিজমাংস বৃদ্ধি কবে, সে নিয়ত অবসন্ন হয়। যিনি শতবৎসর প্রতিমাসে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন, আর যিনি মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হন, তাঁহারা উভয়েই সমান। যিনি যতব্রত হইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন, তাঁহাকেও মধু-মাংস বর্জ্জন করিতে হয়। মধুমাংস বর্জ্জন করতঃ পুরুষ সতত সত্র দ্বারা যজ্ঞ করেন, সদা দান করিবার ফল প্রাপ্ত হন, প্রকৃত তপস্বী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত হন, তাঁহারও অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে। রসজ্ঞান হইলে মাংস পরিত্যাগ করা অতি দুষ্কর কর্ম্ম।

সর্ব্বপ্রাণীর অভয়প্রদ এই অমাংস-ভক্ষণ-ব্রত আচরণ অতি উৎকৃষ্ট। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বভূতের অভয় দান করেন, তিনি লোকমধ্যে প্রাণদাতা হন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। মনীষিগণ এই পরম ধর্ম্মের প্রশংসা করেন। আপনার প্রাণ যেমন অভিলষিত, জীবগণের প্রাণও তদ্রূপ। আত্মোপমা দ্বারাই বিশুদ্ধবুদ্ধি মানবগণ পরকে মনন করেন। সকলেরই মৃত্যুভয় আছে, সুতরাং মাংসভোজী পাপ-পুরুষ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক হন্যমান রোগহীন নিষ্পাপ জীবগণের ত মৃত্যুভয় হইতেই পারে। অতএব মাংস-পরিবর্জ্জনকে ধর্ম্ম, স্বর্গ ও সুখের আয়তন জ্ঞান করিবে। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অহিংসাই পরম তপস্যা, অহিংসাই পরম সত্য—যাহা হইতে সত্য প্রবৃত্ত হয়। তৃণ, কাষ্ঠ বা প্রস্তর হইতে মাংস জন্মে না, জীবহত্যা করিলে মাংস উৎপন্ন হয়, অতএব তাহার ভক্ষণে দোষ ঘটিয়া থাকে। যিনি মাংস ভক্ষণ না করেন, তিনি সর্ব্বভূতের শরণ্য, সকল জীবের বিশ্বাস্য, লোক-সকলের অনুদ্বেগকর এবং স্বয়ংও উদ্বিগ্ন হন না। যদি খাদক না থাকে, তবে ঘাতক হয় না, খাদকের নিমিত্তই ঘাতক হয়, মনুষ্য মাংস-ভক্ষকের জন্যই জীবহনন করিয়া থাকে। ইহা অভক্ষ্য, এই নিমিত্ত হিংসা নিবৃত্ত হয়। হন্যমান জীব হিংসকদিগের আয়ু গ্রাস করে। প্রাণিহিংসক রৌদ্রকর্ম্মশীল মানবেরা মাংসাদ হিংস্র জন্তুর ন্যায় সর্ব্বজীবেরই উদ্‌বেগজনক। যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা নিজমাংস-বৃদ্ধির ইচ্ছা করে, সে উদ্বিগ্ন হইয়া বসতি করে এবং অপকুলে জন্মগ্রহণ করে, সংযতচিত্ত মহর্ষিরা

মাংসের অভক্ষণকে ধন, যশঃ ও আয়ুর্বৃদ্ধিকর, স্বর্গজনক এবং মহৎ স্বস্ত্যয়ন কহেন। মাংস ভক্ষণ না করিয়া যিনি প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্, তিনি সর্ব্বভূতের অনভিভবনীয়, আয়ুষ্মান্, রোগহীন ও সুখী হইয়া থাকেন। তিনি হিরণ্য-দান, গো-দান ও ভূমিদান অপেক্ষা বিশিষ্ট ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন্। অপ্রোক্ষিত, বিধি-বিরহিত বৃথা-মাংস কখনই ভক্ষণ করিবে না, মনুষ্য যদি তাদৃশ মাংস ভক্ষণ করে, তবে নরকে যায়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সর্ব্বভূতে দয়াপ্রকাশের সদৃশ ধর্ম্ম নাই, দয়াবান্ মানবের কদাচ ভয় হয় না, দয়াবান্ তপস্বীদের ইহলোকে ও পরলোকে জয় হয়, ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা অহিংসাকেই ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া, যাহা অহিংসাত্মক, তাহাই করিতে আদেশ দিয়াছেন। মাংসভোজীর ন্যায় ক্ষুদ্র ও নৃশংসতর নর আর কেহই নাই, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ অন্য কিছুই বিদ্যমান নাই, অতএব মানব আপন প্রাণে যেরূপ দয়া করিবে, অপরেও তদ্রূপ দয়া করিবে। এ বিষয় স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডেও অনেক বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যও মাংসমধ্যেই গণ্য, এমন কি, মৎস্যাশী ব্যক্তি সর্ব্বমাংসাশীর সমান এবং মৎস্যাহার পরিত্যাগ সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ ব্রত।

"মৎস্যাশী সর্ব্বমাংসাশী তন্মৎস্যান্ সর্ব্বথা ত্যজেৎ।"

(স্কঃ পুঃ)

লোভবশতঃ মাংস ভক্ষণ করিলে গুরুতর পাপ হয়, মূঢ় ব্যক্তি আত্মপুষ্টির জন্য প্রাণিহিংসা করিয়া ইহকালে ও পর-

কালে কোথায়ও সুখী হয় না। সুখার্থী ব্যক্তি পরকে আপনার ন্যায় দেখিবে, সুখদুঃখ নিজের পক্ষে যেমন, পরের পক্ষে তদ্রূপই বিবেচনা করিবে। পরের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ করিলে নিজের জন্য পরের তদ্রূপ করার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। আজও এ বিষয়ে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বীরা অতিশয় অগ্রণী. তাঁহাদের সমক্ষে কোনও প্রকার জীবের রক্তপাত হইতে পারে না, পশ্চিম ভারতে বোম্বাই সহরে জৈনদের জন্য দিবাতে মাংসবিক্রয় রহিত হইয়াছে। সেখানে রাত্রি দশটার পর ঘণ্টাযুক্ত গাড়ীতে বাজারে মাংস যায় এবং তখনই তাহা ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রাতে কোনও প্রকার চিহ্নও পাওয়া যায় না। আমাদের হিন্দুদের সবই ছিল, অন্যের নিকট হইতে অহিংসা-ধর্ম্ম শিখিবার আবশ্যক নাই, এখনও শত শত হিন্দুকুলশিরোমণি, ব্রহ্মচারিগণ শাস্ত্রোক্ত অহিংসা-ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। ভারতে নিরামিষভোজী লোকের সংখ্যা করা যায় না—আমরা আমেরিকা হইতে নিরামিষ-ভোজনের ব্যবস্থা আনিয়া গৌরবান্বিত হইতে পারি না। আর্য্যগণ! আপনারা আবার সেই ধর্ম্মসার অহিংসার বিস্তার করুন্, আবার ঘরে ঘরে "আর্য্য-গৌরব" বিরাজিত হউক, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বলিয়া জগৎ প্রতিধ্বনিত হউক।

শ্রীরজনীকান্ত সূত্রধর।

বঙ্গ-বধূর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা প্রত্যক্ষ-দেবতা পতিকেও প্রকৃত শুশ্রূষা করিতে শিখি নাই ; তাঁহার পাদোদক-গ্রহণে লজ্জা বোধ করি ; কিন্তু আজ কালও আমাদের মধ্যে দুই চারিটী সতী-সাধ্বী পতি-দেবতাকে দিব্য চক্ষে চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন। সত্য যুগেও ঘরে ঘরে সতী রমণী বিরাজ করিতেন কি না, জানি না। দুই চারি জনেই সতী-মাহাত্ম্য ও পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারাই জগতে পরমপূজনীয়া—স্বর্গেরও আদরণীয়া। এই বঙ্গ-রমণী-মণ্ডলীমধ্যেও কয়েক বৎসর যাবৎ উপরি উপরি কয়েকটী সাধ্বী মহিলা পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আসিতেছেন—পতি-সহগমন করিয়া সত্য যুগের প্রভা বিস্তার করিতেছেন। পতিকে অবজ্ঞাকারিণী কটুভাষিণী ভগিনীগণকেও শিক্ষা দিতেছেন। এই গত ১৩১৯ সনের ১৯ শে ফাল্গুন সোমবার রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় কলির রাজধানী কলিকাতার মধ্য সহরে শ্যামপুকুর থানার অধীন ৫৪।১।১ রাজা রাজবল্লভের গলিতে বটকৃষ্ণ পালের কর্ম্মচারী মহাত্মা দুকড়ি বাবুর পঁয়তাল্লিশ বৎসরবয়স্কা পতিগত-প্রাণা সাধ্বী পত্নী দেবীরূপিণী "নির্ম্মলা সুন্দরী দাসী" স্বামীর শবদেহ বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সতী তাঁহার নিজ দেহে পরমানন্দে অগ্নি জ্বালাইয়া পতির স্বর্গীয় মূর্ত্তি

ভাবিতে ভাবিতে মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ হইয়া সতীত্বের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অক্ষয় স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সেই সতীশিরোমণি দেবীস্বরূপিণী "নির্ম্মলা" নাম প্রত্যহ ঘরে ঘরে রমণীগণ-বদনে উচ্চারিত হওয়া উচিত। তাঁহার সেই অভূতপূর্ব্ব অক্ষয় কীর্ত্তি-রক্ষার্থে হিন্দু-রমণীগণের যথাসাধ্য যত্ন ও দান করাও একান্ত কর্ত্তব্য। দেবি! নির্ম্মলে! তুমি যে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছ, তাহাতে তোমাকে সেই সত্য যুগের সতী, সাবিত্রী, সীতা ও অরুন্ধতীর প্রতিমূর্ত্তিই মনে করি; মানবীর যাহা সাধ্য নয়, তুমি তাহাই সাধন করিয়াছ। তোমার পবিত্র চরণকমলে শত শত অভিবাদন করিতেছি, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের মনেও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উদয় হউক। আমরাও যেন পতি-দেবতাকে ভক্তি করিতে শিক্ষা পাই। আমাদের শাস্ত্র-কারগণ বলিয়া থাকেন, "স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী মানবদেহে যে সাড়ে তিন কোটিসংখ্যক রোম আছে, তাবৎ-পরিমিত কাল স্বর্গভোগ করিতে থাকেন। বেদেনীগণ যেমন গর্ত্ত হইতে সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি সহ-মৃতা নারী মৃত পতিকে উদ্ধার করিয়া, তৎসহ স্বর্গ-সুখ-ভোগ করেন।" বল, বল দেবি! তোমাব তুলনা আর কোথায় আছে? তোমার এই দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি আমাদের বঙ্গ-বধূদের শিক্ষা না হয়, তবে আর প্রবন্ধ লিখিয়া কি হইতে পারে?

শ্রী... ... ...

শ্মশান।

(১)

ভয়ের কারণ তুমি নহ রে শ্মশান,
বড় ভালবাসি আমি।
পবিত্র তোমার ছাই
অঙ্গে মেখে স্বর্গ পাই,
তব সম্মিলন বড় সুখের কারণ,
দারুণ সংসার-জ্বালা করে নিবারণ।

(২)

বুক ভেঙ্গে গেছে শোকে যাদের কারণ,
কেঁদে কেঁদে নিশিদিন।
তব সুখ-সম্মিলনে,
পাব সে সুপ্রিয়গণে,
এ হ'তে সুখের আর কি আছে উপায়,
দারুণ বিরহ যায় তোমার কৃপায়।

(৩)

এসেছি এ দ্বীপান্তর পরলোক হ'তে,
গুরুতর অপরাধে।
ভুলেছি সে আদি স্থান,
ভুলেছি সে দিব্য-জ্ঞান,
ভুলেছি সে দেবলোক দেবের প্রণয়,
ভুলেছি পরম-পিতা বিভু দয়াময়।

(৪)

ভুলেছি সে ধন-রত্ন—ধর্ম্মের সাধন,
যা ছিল সম্বল মম।
নাই সেই দিব্য-নেত্র,
নাই সে পবিত্র ক্ষেত্র,
পারি না ধর্ম্মের বীজ করিতে বপন,
একমাত্র তুমি মম উদ্ধার-কারণ।

(৫)

কত কাল দ্বীপান্তর থাকে পাপী জন,
জান তুমি সমুদয়।
তোমার আশ্রয়ে এসে,
যায় পুনঃ স্বীয় দেশে,
পায় সে বাঞ্ছিত পিতা পিতামহগণ।
তোমার(ই) প্রসাদে হয় প্রিয়-সম্মিলন।

(৬)

কে আছে তোমার মত এত গুণাধার,
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি।
যে যেমন আশা করে,
সে তেমনি পায় পরে,
ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষা করে আসে যেই জন,
তাহার(ও) বাসনা তুমি করিছ পূরণ।

(৭)

জ্বলন্ত অঙ্গারময় দেহটি তোমার,
ধা ধা ক'রে জ্বলে সদা।
তবু নাহি করি ভয়,
সাগর তরঙ্গময়,
সাহসে করিয়া ভর ডুবে যেই জন,
অমূল্য রতনরাজি পায় সে সুজন।

(৮)

শ্মশাননিবাসী সদা দেব মহেশ্বর,
শ্মশানবাসিনী কালী।
শ্মশানে সাধন তরে,
সিদ্ধ মুনি-ঋষি চলে,
পরম-পবিত্র তুমি অন্তিম-আলয়,
এমন সুখের স্থান আর কোথা হয় ?

শ্রী সঃ—

বিবিধ-বিধি-সহস্রাণি।

২৭। যাঁহার নাম ও গোত্র অজ্ঞাত এবং যিনি গ্রামান্তর হইতে আগত, এরূপ ব্যক্তিকেই পণ্ডিতগণ অতিথি বলেন। গৃহস্থ তাঁহাকেই বিষ্ণুজ্ঞানে অর্চ্চনা করিবেন। এইরূপ অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া গমন করিলে, তিনি গৃহীর পুণ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাপরাশি গৃহে অর্পণ করেন।

অজ্ঞাতগোত্রনামানমন্যগ্রামাদুপাগতম্।
বিপশ্চিতোঽতিথিং প্রাহুঃ বিষ্ণুবৎ তং প্রপূজয়েৎ॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥ (বৃঃ নাঃ)

২৮। দেহ জীর্ণ বা কেশ পলিত হইলে সংসারকার্য্যে নিবৃত্ত হইয়া গৃহী পত্নীকে পুত্র-হস্তে রক্ষণ জন্য সমর্পণ করিয়া ধর্ম্মার্থ বনগামী হইবেন। পত্নী একান্তই ইচ্ছা করিলে সঙ্গে যাইবেন। তখন ফল-মূল আহার করিবেন এবং বেদ অধ্যয়নে নিরত ও নারায়ণপরায়ণ হইবেন।

দূষিতাং স্বতনুং দৃষ্ট্বা পলিতাদ্যৈশ্চ সত্তমাঃ।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥
ফলমূলাশনো নিত্যং স্বাধ্যায়নিরতস্তথা।
দয়াবান্ সর্ব্বভূতেষু নারায়ণপরায়ণঃ॥ (বৃঃ নাঃ)

২৯। গৌড়ী, মাধ্বী এবং পৈষ্টী ত্রিবিধ মদ্য আছে; সকল প্রকার বর্ণের ব্যক্তিরই মদ্যপান নিষিদ্ধ।

গৌড়ী মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া পৈষ্ঠী চ ত্রিবিধাঃ সুরাঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যৈরপেয়া স্যাৎ তথা স্ত্রীভিশ্চ পণ্ডিতৈঃ॥ (ঐ)

৩০। মৃত্যু সন্নিহিত, সম্পদ্ চঞ্চল, দেহ বিনশ্বর, দর্প করা কখনও উচিত নহে। যাহার সংযোগ আছে, তাহার বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য। জগতের সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, ইহা ভাবিয়া জনার্দ্দনের পূজা করাই কর্ত্তব্য।

নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ সম্পদত্যন্তচঞ্চলা।
আসন্নমরণো দেহস্তস্মাদ্দর্পং নিষেধয়॥
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তাঃ সর্ব্বঞ্চ ক্ষণভঙ্গুরম্।
এতজ্‌জ্ঞাত্বা মহাভাগাঃ পূজয়ধ্বং জনার্দ্দনম্॥ (বৃঃ নাঃ)

৩১। সর্ব্বপ্রকার যত্নে ধর্ম্ম-সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে সর্ব্বত্র পূজিত হন।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ।
সর্ব্বত্র পূজ্যতে সম্যগ্‌ধর্ম্মবান্ নাত্র সংশয়ঃ॥ (বৃঃ নাঃ)

৩২। শরীর সর্ব্বদা যাতনাময় এবং মলাদি দ্বারা দূষিত, যে ব্যক্তি এই প্রকার শরীরকে বিশ্বাস করিয়া আত্মার উন্নতি-সাধন করে না, সে-ই প্রকৃত আত্মঘাতী।

শরীরং যাতনারূপং মলাদ্যৈঃ পরিদূষিতম্।
তস্মিন্ করোতি বিশ্বাসং তং বিদ্যাদাত্মঘাতকম্॥ (বৃঃ নাঃ)

৩৩। সর্ব্বপ্রাণীর পীড়াজনক কার্য্য না করাই যোগসিদ্ধি-কারিণী অহিংসা।

সর্ব্বেষামেব ভূতানামক্লেশজননং হি যৎ।

অহিংসা কথিতা সদ্ভির্যোগসিদ্ধিপ্রদায়িণী ॥ (কূঃ নাঃ)

৩৪। পরদার-গমন, পাপীদের উপসেবন এবং পারুষ্য, এই তিনটি প্রথম নরক।

পরদারাভিগমনং পাপিনামুপসেবনম্।

পারুষ্যং সর্ব্বভূতানাং প্রথমং নরকং মতম্॥

(বাঃ পুঃ)

৩৫। চৌর্য্য, বৃথাভ্রমণ এবং বৃক্ষাদির ছেদন দ্বিতীয় নরক।

ফলস্তেয়ং মহাপাপং ফলহীনং তথাটনম্।

ছেদনং বৃক্ষজাতীনাং দ্বিতীয়ং নরকং স্মৃতম্॥

(বাঃ পুঃ)

৩৬। বর্জ্জনীয় দ্রবের পরিগ্রহণ, অবধ্যের বধ বা বন্ধন এবং আত্মীয় বান্ধবের সহিত বিবাদ, এই কয়টী তৃতীয় নরক।

বর্জ্যাদানং তথা দুষ্টমবধ্যবধবন্ধনম্।

বিবাদো বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং তৃতীয়ং নরকং মতম্॥

(বাঃ পুঃ)

৩৭। সংসার-সুখ-বিনাশক সর্ব্বজীবে ভয় দেওয়া এবং স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতিই চতুর্থ নরক।

ভয়দং সবসাত্ত্বানাং ভবভূতিবিনাশনম্।

ভ্রংশনং নিজধর্ম্মাণাং চতুর্থং নরকং স্মৃতম্॥

(বাঃ পুঃ)

৩৮। হিংসা, মিত্রগণ প্রতি কুটিলতা, মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ এবং একাকী মিষ্ট-ভোজন পঞ্চম নরক।

"মারণং মিত্রকৌটিল্যং মিথ্যাভিশংসনং চ যৎ।
মিষ্টৈকাশনমিত্যুক্তং পঞ্চমন্তু নৃযাতনম্॥"

(বাঃ পুঃ)

৩৯। ফলাদিহরণ, পরনিগ্রহ, প্রণয়-নাশন, যানহরণ ষষ্ঠ নরক।

"যাত্রাফলাদিহরণং যমনং যোগনাশনম্।
যানযুগ্মস্য হরণং ষষ্ঠমুক্তং নৃযাতনম্॥"

(ঐ)

৪০। রাজভোগ নষ্ট করা (রাজার প্রাপ্য না দেওয়া), রাজ-জায়া-নিষেবণ এবং রাজার অহিতাচরণ, এই কয়টি সপ্তম নরক।

"রাজভাগহরং মূঢ়ং রাজজায়া-নিষেবণম্।
রাজ্ঞামহিতকর্ত্তৃত্বং সপ্তমং নরকং স্মৃতম্॥"

(ঐ)

৪১। লোভ, লোলুপতা এবং লব্ধ ধর্ম্ম ও অর্থ (সঞ্চিত ধন ও ধর্ম্ম) নষ্ট করা অষ্টম নরক।

"লুব্ধত্বং লোলুপত্বং চ লব্ধ-ধর্ম্মার্থ-নাশনম্।
লালাসংকীর্ণমেবোক্তমষ্টমং নরকং স্মৃতম্॥"

(ঐ)

৪২। ব্রহ্মস্বহরণ, ব্রাহ্মণগণের নিন্দা কীর্ত্তন এবং বান্ধব-গণের সহিত বিরোধ-সংঘটন, ইহা নবম নরক।

"বিপ্রোক্তং ব্রহ্মহরণং ব্রাহ্মণানাং বিনিন্দনম্।
বিরোধং বন্ধুভিশ্চোক্তং নবমং নরযাতনম্॥"

(ঐ)

৪৩। শিষ্টাচার বিলোপ করা, শিষ্ট জনের বিদ্বেষ করা, শিশু বধ করা (গর্ভ নষ্টকরণাদি) শাস্ত্রচৌর্য্য ও ধর্ম্মচৌর্য্য, এই কয়টি দশম নরক।

"শিষ্টাচারবিনাশং চ শিষ্টদ্বেষং শিশোর্বধম্।
শাস্ত্রস্তেয়ং ধর্ম্মস্তেয়ং দশমং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

৪৪। ষড়ঙ্গবিনাশন, ষাড়্গুণ্যপ্রতিষেধ, এই দুটি একাদশ নরক।

"ষড়ঙ্গনিধনং ঘোরং ষাড়্গুণ্যপ্রতিষেধনম্।
একাদশং তথৈবোক্তং নরকং সদ্ভিরুত্তমম্॥" (ঐ)

৪৫। সাধু জনের নিন্দা, সর্ব্বদা চুরির চেষ্টা, অসৎ ক্রিয়া ও সংস্কার-পরিবর্জ্জন, এই সকল দ্বাদশ নরক।

"সৎসু নিন্দা সদা চৌরমনাচারমসৎক্রিয়া।
সংস্কারপরিহীনত্বমিদং দ্বাদশমুচ্যতে॥" (ঐ)

৪৬। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অপচয়, অপবর্গের ক্ষয় ও সম্বিৎ-সম্বেদন, এই সকল ত্রয়োদশ নরক।

"হানির্ধর্ম্মার্থকামানামপবর্গস্য হারণম্।
সংবেদং সংবিদামেতৎ তু ত্রয়োদশমুচ্যতে॥" (ঐ)

৪৭। ধর্ম্মবর্জ্জিত ক্ষপণ ও বর্জ্জন এবং গৃহে অগ্নি প্রদান, এই সকল অতিগর্হিত চতুর্দ্দশ নরক।

"ক্ষপণং ধর্ম্মহীনং চ যদ্বর্জ্জ্যং যচ্চ বহিস্কৃদম্।

চতুর্দ্দশং তথৈবোক্তং নরকং তদ্বিগর্হিতম্॥" (ঐ)

৪৮। অজ্ঞান, অসূয়াপ্রকাশ, অশুভাবহ, অশৌচ এবং অসত্য বাক্যপ্রয়োগ, এই কয়টি পঞ্চদশ নরক।

"অজ্ঞানং চাপ্যসূয়ত্বমশৌচমশুভাবহম্।

স্মৃতং তপ্তং চ দশকমসত্যবচনানি হ॥" (ঐ)

৪৯। আলস্য, ক্রোধ, আততায়িত্ব, পরগৃহে অগ্নিদান, পরস্ত্রীতে বাসনা, শাস্ত্রে ঈর্ষাভাব ও ঔদ্ধত্য এই কয়টী বিশেষরূপে নিন্দিত ষোড়শ নরক।

"আলস্যং বৈ ষোড়শকং সক্রোধং চ বিশেষতঃ।

সর্ব্বস্য চাততায়িত্বমাবাসেম্বগ্নিদাপনম্॥

ইচ্ছা চ পরদারেষু নরকায় নিগদ্যতে।

ঈর্ষাভাবশ্চ শাস্ত্রেষু উদ্ধতত্বং বিগর্হিতম্॥" (ঐ)

৫০। অতঃপর শেষ-পাপলক্ষণ উল্লিখিত হইতেছে। দেব, ঋষি, ভূত, নর ও পিতৃগণ উদ্দেশে দেয় দ্রব্যে লোভ, পরধনে লিপ্সা, সর্ব্ববর্ণে একতা, ওঙ্কার হইতে নিবৃত্তি, পাপীদিগের স্মরণ ও অনুগমন, গুরুজনের নিন্দা, অগম্যা-গমন, ঘৃতাদি বিক্রয়, ঘোর-চণ্ডালাদি অসৎপরিগ্রহ, স্বদোষ গোপনপূর্ব্বক পরদোষ প্রকাশন, মাৎসর্য্য, বাগ্‌দুষ্টতা, নিষ্ঠুরতা, অধর্ম্মাবহ নাম গ্রহণ, অধর্ম্ম-সেবা ও দারুণত্ব, এই সকল নরকাবহ বলিয়া শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শেষপাপস্য লক্ষণম্।

দেয়ং দেবর্ষিভূতানাং মনুজানাং পিতৃনথ।

লিপ্‌সা পরধনেষ্বেব সর্ব্ববর্ণেষু চৈকতা ॥
ওঁকারাদপি নিবৃত্তিঃ পাপকারী স্মৃতশ্চ সঃ।
গুরোর্ব্বাদো মহাপাপমগম্যাগমনং তথা ॥
ঘৃতাদিবিক্রয়ো ঘোরশ্চণ্ডালাদিপরিগ্রহঃ।
স্বদোষাচ্ছাদনং পাপং পরদোষপ্রকাশনম্ ॥
মৎসরিত্বং বাগ্‌দুষ্টত্বং নিষ্ঠুরত্বং তথাপরে।
টৌকিত্বং তালবাদিত্বং নাম্না বাচামধর্ম্মজম্।
দারুণত্বমধর্ম্মিত্বং নরকাবহমুচ্যতে ॥” (ঐ)

৫১। যে জন ধর্ম্মশীল, অভিমান ও রোষহীন, বিদ্বান্ ও বিনয়ী, যিনি কাহারও ক্লেশ ও সন্তাপদায়ক না হন, যিনি স্বদারে পরিতুষ্ট ও পরদারে পরাঙ্মুখ, তাঁহার সংসারে কোনও প্রকার ভয়ের (নরকের) কারণ হইতে পারে না।

“যো ধর্ম্মশীলো জিতমানরোষো,
বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী।
স্বদারতুষ্টঃ পরদারবর্জ্জং,
ন তস্য লোকে ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ ॥” (ঐ)

শ্রী সঃ—

———

পরিশিষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জমা		খরচ	
জমা——	৪০৬০।৶০	*খরচ——	১০১৫৸৶০
৪৩। শীতলচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক আদায়	১১৫৲	১০১। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বৃত্তি	১॥৶০
১৪´৩।৩৪´২।১৩৯´।১৩৪।১৩৩। ৩২৮´।৫২´৮।১৪´৫।৫২´৭।৩৩০´। ১৪০´।১৪৮´।১৩৬´।১৩৮।৩৩´৯। ৩৩১´।৩৩৩´।২৯৭´। আঠার জন গ্রাহকের মূল্য——	২৭৲	১০৩। গেইট্ প্রস্তুতের খরচ—	৪৲
১। রাজমোহন বণিক্য	৫৲	১০৪। গোপালচন্দ্র দাস কেরাণীর ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চের বেতন——	১৬৲
২। হরিশ্চন্দ্র চন্দ——	৩৲	১০৫। তালজাঙ্গা যাওয়ার গাড়ী-ভাড়া——	৩৲
৩। গুরুচরণ পাল	১৲	১০৬। পত্রিকার জন্য টেলিগ্রাম——	।৶০
৪। দয়ালচন্দ্র পাল	১০৲	১০৭। কলিকাতা হইতে গফরগাঁও পর্য্যন্ত রেল ভাড়া ও গফরগাঁও হইতে পত্রিকা আনার খরচ——	৫।৶০
৫। নন্দকিশোর পাল——	১৲	১০৮। চৈত্রের ২১৪ জন গ্রাহক নিকট পত্রিকা পাঠাইবার খরচ——	৭।০
৬। গোবিন্দচন্দ্র পাল——	১৲	১০৯। বেদ-বিদ্যালয়ের শতরঞ্চ ১ খানা——	৮৲
৭। সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী——	৫৲		
৮। মদনমোহন গোপ——	২৲		
৯। রামকানাই গোপ——	৫৲		
১০। শ্যামকিশোর দে——	৫৲		
১১। চন্দ্রনাথ দত্ত——	৫০৲		
	১১৫৲		১০৬১॥০

* বৈশাখের ৯৭ন' বিলে মায় মণিঅর্ডার ১০০৲ নহে ১০১৲ টাকা হইবে।

জমা——————————৪০৬০।৶০

জের জমা——————————১১৫৲

৪৪। গোপালচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক আদায় মাসিক চাঁদা——১৮৲

মার্চ্চ—

১। মতিলাল রায়——————২৲

২। মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী——১৲

৩। রাইকিশোর মজুমদার——১৲

৪। রাধিকালাল দে————২৲

৫। শীতলচন্দ্র সেন————৫৲

৬। গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী——৬৲

৭। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী————১৲

১৮৲

৪৫। নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক————৩৬৲

১। ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৪৲

২। গোবিন্দচন্দ্র স্মৃতিরত্ন—১৲

৩। শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য———১১৲

৪। তারিণীমোহন চৌধুরী—৩৲

৫। কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য্য—৫৲

৬। সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য—৫৲

৭। ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন——৩৲

৩৬৲

৪২২৯।৶০

জের খরচ——————১০৬১॥০

১১০। চৈত্রের পত্রিকা আরও ৪৪ জন গ্রাহক নিকট পাঠাইবার ডাক-খরচ————১৸৶০

১০৬৩।৶০

জের জমা—————৪২২৯।৶০

৪৬। শীতলচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক

আদায়———১০৲

১। জয়নাথ সূত্রধর গঙ্গারিয়া

হইতে মণিঅর্ডারযোগে ১০৲

৪২৩৯।৶০

বাদ খরচ————১০৬৩।৶০

৩১৭৬৲

একত্রিশ শত ছিয়াত্তর টাকা তহবিল।
তন্মধ্যে একত্রিশ শত টাকা কো-
অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ষাণ্মাসিক
আমানত আছে।
শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী।
সহকারী সম্পাদক বেদ-বিদ্যালয়।
এই পর্য্যন্ত হিসাব পরিদর্শন করিয়া
দেখা গেল, হিসাব ঠিক আছে।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে বি, এল,
২৫/৪/১৩।

মূল্যপ্রাপ্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৪৩। শ্রীযুত উমানাথ রায় উকীল ১৷৷০

৩৪২। " কৃপাশঙ্কর রায় ডাক্তার ১৷৷০

১৩৯। " সুরেন্দ্রকিশোর কর উকীল ১৷৷০

১৩৪। " রজনীকান্ত দত্ত উকীল ১৷৷০

১৩৭। " কামিনীকিশোর ধর এম্ এ, বি, এল্, ১৷৷০

৩২৮। " বলরাম দাস ১৷৷০

৫২৬। " সুরেশচন্দ্র চৌধুরী ১৷৷০

১৪৫। " হলধর দাস ১৷৷০

৫২৭। " দয়ালচন্দ্র পাল ১৷৷০

৩৭০। " কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ১৷৷০

১৪০। " সুরেন্দ্রনাথ বসু উকীল ১৷৷০

১৪৮। " নীলাম্বর দাস এম্ এ, বি, এল্ ১৷৷০

১৩৬। " যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস উকীল ১৷৷০

১০৮। " শ্যামাকান্ত সেন উকীল ১৷৷০

৩৩৯। " অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল ১৷৷০

৩৩১। " সুরেন্দ্রনাথ নাগ ১৷৷০

৩৩৩। " অবনীমোহন মুখার্জ্জি ১৷৷০

২৯৪। " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত ১৷৷০

৫০৪। " জ্ঞানেশ্বর সেন ১৷৷০

৩৯৭। " হরেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত ১৷৷০

৪৯১। " জয়নাথ দত্ত রায় ১৷৷০

৫১৩। " গঙ্গাগোবিন্দ অধিকারী ১৷৷০

৫৯২। " যামিনীকান্ত সিংহ ১৷৷০

ক্রমশঃ

শ্রী সঃ—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন, তাঁহারা তাঁহাদের দেয় মূল্য অতি সত্বরে পাঠাইয়া দিয়া উপকৃত করেন। নতুবা আগামী বারের পত্রিকা ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। আমরা অষ্টম মাসের পত্রিকাও তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিলাম, আর যেন তাঁহাদিগকে মূল্যের জন্য তাগিদ দিতে না হয়।

আর্য্য-গৌরব।

১ম বর্ষ]　　আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩২০　　[৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

অনন্ত।

(১)

হে অনন্ত!　তুমি তব মহিমা অপার,
　　　　নমস্কার! নমস্কার!
　　সর্ব্ব-সাক্ষী বিশ্বময়,
　　জান তুমি সমুদয়,
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহি বিশ্বাধার।
জান এহৃদয় কেন পাগল আমার॥

(২)

নাহি পাই সুখ শান্তি সদা ভ্রান্তি ময়,
　　　　নিশি-দিন হাহাকার,
　　তোমার সৃজিত জীব,
　　তোমায় পাবে না শিব!
বিচারেশ!　তোমার কি এমনি বিচার!
অব্যক্ত কাতর বাণী বুঝ না আমার?

(৩)

কত কোটি ভাষা জান কে জানে তোমায়,
অনন্ত তোমার গুণ।
ব্রহ্মা কোটি মুখে যদি,
ব’লে যান নিরবধি,
গুণের বর্ণনা তবু হয় কি তোমার?
ব্যাসাদি পরাস্ত, তুমি অনন্ত অপার। *

সম্পাদক।

শোক।

(১)

দ্বিজেন্দ্র! দ্বিজেন্দ্র তুমি কবিকুল-মণি,
তোমার তুলনা তুমি।
মরুতে কুসুম ফোটে, মেরুতে মলয় ছোটে,
উদ্যানে তরঙ্গ খেলে তব কবিতায়।
কেমনে তোমায় ভুলি, রয়েছ হিয়ায়।

---

* চতুর্ম্মুখো যদি বা কোটিবক্ত্রো
ভবেন্নরঃ কোঽপি বিশুদ্ধচেতাঃ।
স বৈ গুণানাময়ুতৈকদেশং
বদেন্নবা দেববরস্য বিষ্ণোঃ॥
ব্যাসাদ্যা মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তুবন্তো মধুসূদনম্।
মতিক্ষয়ান্নিবর্ত্তন্তে ন গোবিন্দ গুণক্ষয়াৎ।

(গঃ পুঃ)

(২)

পঞ্চভূত দেহ তব হয়েছে বিলয়,

নয়নে নয়নে তবু।

দেখি যেন সর্ব্বক্ষণ, তোমার সে সুবদন

কানে কানে বাজে যেন কবিতা ঝঙ্কার,

সাধে কি তোমার তরে এত হাহাকার।

(৩)

অনন্ত গ্রহাদি তায় এক শশধর,

নয়ন-রঞ্জন করে।

আছে কবি অগণন, তায় তুমি এক জন,

জন্মভূমি স্বদেশের সর্ব্ব মূলাধার,

ঘরে ঘরে ঘোষে তব মহিমা অপার।

(৪)

তোমার অভাব আর হবে না পূরণ,

তুমি কবি কহিনুর।

দেবতা অভাবে পড়ে, তোমায় নিয়েছে হরে ?

সাজাইতে স্বরগের কবি কুঞ্জবন ?

মর্ত্ত্যের মানব আর পাবে না কখন ? *

সম্পাদক।

---

* এই কবিতাটী কোন সভায় পাঠজন্য দেওয়া যায়, কিন্তু শেষে আর পাওয়া যায় নাই বলিয়া পঠিত হয় নাই। (সম্পাদক)

কৃষি।

(১)

"কৃষির্ধন্যা কৃষির্ম্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যাজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥"
(পরাশরঃ)

কৃষিই ধন্য, কৃষিই পবিত্র এবং জীবমাত্রের জীবনস্বরূপ; সুতরাং অন্য সমস্ত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াও কৃষি কার্য্য করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষ, অপিচ বঙ্গদেশ কৃষির সম্পূর্ণ উপযোগী; ভগবান্ এই ভূমিকে সম্পূর্ণ সময়োচিত বৃষ্টি রৌদ্রাদি দ্বারা সুজলা সুফলা ও শস্য-শ্যামলা করিয়াছেন। ভারতের সমস্ত অধিবাসীই কৃষিজীবী ছিলেন, এখনও ঌ অংশ লোক কৃষি দ্বারা জীবন যাপন করেন। যাঁহারা কৃষি বিহীন, তাঁহারাই 'হা চাকুরি হা টাকা' করিয়া দিন রাত হাহাকার করিতেছেন। কৃষকের অন্নের অভাব হয় না, "কাল কি খাইব" এই মৃত্যুযন্ত্রণাদায়ক চিন্তা কখনও সু-কৃষকের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না; কৃষক এবম্বিধ বহু প্রকার দুশ্চিন্তা হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করেন। এই জন্যই শাস্ত্র কৃষককেই প্রকৃত সুখী বলিয়াছেন। "দেবগণও অন্নাধীন, সর্ব্ব বেদের আশ্রয় ব্রহ্মা অলক্ষ্মীযুক্ত হইয়া লঘুতা স্বীকারপূর্ব্বক দীন বচনে অন্ন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এক মাত্র কৃষি দ্বারাই লোকের

ভিক্ষাবৃত্তি নিবৃত্তি হয়, লোক ভূপতি হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মাণিক্য ও বস্ত্র বসনাদি যুক্ত ব্যক্তিরাও অন্নের জন্য কৃষকের আশ্রয় লন, অন্নই প্রাণ, বল এবং সর্ব্বার্থসাধক ; এই অন্ন কৃষি দ্বারাই উৎপন্ন, সুতরাং কৃষির ন্যায় পরম বস্তু আর কিছুই নাই।" *

এই যে আমরা প্রতিনিয়ত নিদারুণ অভাব ভোগ করিতেছি, গৃহে বাহিরে কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না, আমাদের মনের ভিতরে যেন কিএক দারুণ অশান্তি-হুতাশন হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, শত যত্নে শত চেষ্টায়ও তাহা নির্ব্বাপিত হইতেছে না। ইহার প্রধান কারণই অন্নাভাব। আমাদের পেটে ভাত নাই,—গোলায় ধান নাই,—ক্ষেতে শস্য নাই, শুধু বাহিরের বসনের চাকচক্যে—কথার পারিপাট্যে বিলাসের আড়ম্বরে—এবং বাবুত্বের বাহাদুরিতে এ অভাব এ অশান্তি দূর হইবার নয়। অন্নাভাবে আমাদের চিরন্তন পৈতৃক ক্রিয়াতিথ্য বিলুপ্ত হইতেছে।

---

* চতুর্ব্বেদালয়ো ব্রহ্মা ব্রবীতি কৃপণং বচঃ।
অলক্ষ্ম্যা যুজ্যতে সোঽপি প্রার্থনা লাঘবাশ্বতঃ ॥
একয়ৈব পুনঃ কৃষ্যা প্রার্থকো নৈব জায়তে।
কৃষ্যান্বিতো হি লোকেঽস্মিন্ ভূয়াদেকশ্চ ভূপতিঃ
স্ববর্ণ-রৌপ্য-মাণিক্য-বসনৈরপি পূরিতাঃ।
তথাপি প্রার্থয়ন্ত্যেব কৃষকান্ ভক্ত-তৃষ্ণয়া ॥
কণ্ঠে হস্তে চ কর্ণে চ স্ববর্ণং যদি বিদ্যতে।
উপবাসস্তথাপি স্যাদন্নাভাবেন দেহিনাম্ ॥
অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নমন্নং সর্ব্বার্থসাধকম্।
দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ ॥
(পরাশরঃ)

এমন কি আমরা পিতা মাতা বা সহোদর ভ্রাতা ভগিনীকেও দু'বেলা ভাত দিতে অক্ষম হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। "অন্ন চিন্তা চমৎকার" এই সুদারুণ চিন্তা মানবকে পশুত্বে পরিণত করে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা, বুদ্ধি, সত্য, সরলতা ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি এই চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া যায়। এই দুরবস্থার এই হাহাকারের এই দরুণ অভাবের বিনাশের কারণ একমাত্র কৃষিই নিশ্চয়। কৃষিবলই দেশের প্রকৃত বল; পূর্ব্ব কালে সংসারত্যাগী ফলমূলাহারী ঋষিগণও উৎকৃষ্ট কৃষি ক্ষেত্র-তপোবনকেই সযত্নে প্রতিপালন করিতেন; প্রধান প্রধান ঋষিদের এক একটি প্রদেশের ন্যায় তপোবন ছিল, তাহা দ্বারাই বহু লক্ষ শিষ্যের—সহস্র সহস্র অতিথির ভরণ পোষণ চলিত। আর এক্ষণে আমরা স্বীয় উদর পূরণেও অক্ষম হইতেছি। কৃষিকে আমরা হেলায় পরিত্যাগ করিয়া এই নিদারুণ অবস্থায় পতিত হইয়াছি। যদিও

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

এই শাস্ত্র বাক্যটীতে আমরা দেখিতে পাই কৃষি ধনোপার্জ্জনের দ্বিতীয় উপায়; তথাপি আর একটী জনশ্রুতি দ্বারা আমরা বাণিজ্য হইতে কৃষিকেই লক্ষ্মী লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় মনে করিতেছি। সেটী সংস্কৃত বাক্য না হইলেও আমাদের বাঙ্গালীর প্রাণের কথা; কথাটি এই—"ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের দোনা"। বাস্তবিক কৃষির সহিত বাণিজ্যেরও তুলনা

হয় না। কৃষিতে লোকসানের সম্ভাবনা অতিকম, লাভ অনন্ত; অথচ সে লাভ কেবলই উৎপন্ন—কেবলই বৃদ্ধি। বাণিজ্যের ন্যায় অন্যের ধন গ্রহণ নহে। বাণিজ্যের লাভ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ হইতে পঞ্চদশ গুণের অধিক দৃষ্ট হয় না, না হয় পঁচিশগুণই ধরিয়া লওয়া হউক্। পাঠক! এবার কৃষির লাভ দেখুন, ধান্যই প্রধান কৃষি, যাহা আমরা খাইয়া প্রাণ ধারণ করি এবং যাহা অতি সহজে প্রতি তিন মাসে বা চারিমাসেই সুফল প্রদান করিয়া থাকে। সেই একটি ধান্যের বাজ হইতে এক বৎসরে সামান্য যত্নে বহু পরিমাণ ত্যাগ করিয়াও ৪০,০০০০০ চল্লিশ লক্ষ ধান্য উৎপন্ন হয় *। এই চল্লিশ লক্ষ ধান্যের বীজ নষ্ট না করিলে দশ বৎসরেই পৃথিবীর সমস্ত মানবের আহার্য্য সংস্থান হইতে পাবে। একবাব ভাবিয়া দেখিলে—ভগবানের লীলা ভাবিলে নির্ব্বাক্ হইতে হয়। ধান্যের এত বৃদ্ধি হয় বলিয়াই ধান্য আমাদের খাদ্য, ধান্যের ন্যায় বৃদ্ধিজনক অন্য কোনও শস্য আছে কিনা জানিনা। মুগ, কলাই, তিল, যব, সরিষা, বুট প্রভৃতি শস্যও বহু পরিমাণ ফল প্রদান করে; কিন্তু বৎসরে বারবার উৎপন্ন হয় না। এ সব ফসলের জন্যও আমাদের দেশে বিশেষ কিছু যত্ন করিতে হয় না, প্রকৃতিদত্ত সাময়িক রৌদ্র বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারাই যথেষ্ট ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপিচ এই সব শস্যই আমাদের জীবনধারণের মূল—জল বায়ুর ন্যায় প্রতিনিয়ত প্রাণ-পোষণকারী ও একান্ত প্রয়োজনীয়। এই

* ৫০০ পাঁচশত ধান্যের ওজন এক তোলা।

প্রকার একটী নারিকেল বীজ হইতে উৎপন্ন একটী নারিকেল বৃক্ষ হইতে প্রতি বৎসর দুইশত নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা বিনা যত্নে শত বৎসর ফল প্রদান করে। কালস্রোতে আমরা ‘কৃষক’ মহাত্মগণকে ‘চাষা’ প্রভৃতি বাক্যে উপেক্ষা ও গালিবর্ষণ করিয়া থাকি ; হায় ! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের, দুঃখের ও মূর্খতার বিষয় আর কি হইতে পারে ? আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ কৃষিকে কত উপরে তুলিয়াছেন, এখানে তাহারই একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা লিখিত হইল।

“প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এক রাজা ছিলেন, একজন মুনি তাঁহার নিকট কিছু অর্থ প্রার্থনা করিলে, রাজা পরম সমাদরে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ কবিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রীকে ধন দিবার আদেশ করেন। রাজমন্ত্রী ধনাগার হইতে বহু পরিমাণ স্বর্ণ ও রজত-মুদ্রা আনয়ন করত মুনি-সমীপে রাখিয়া, সেগুলি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। মুনি কহিলেন “এ ধন কাহার জন্য, কোথা হইতে আনা হইয়াছে। মন্ত্রী বলিলেন “এ ধনরাশি আপনার জন্যই রাজকোষ হইতে আনা হইয়াছে” মুনি বলিলেন ‘এ ধন আমি গ্রহণ করিতে পারি না, ইহা রাজার নিজের ধন নহে।” রাজমন্ত্রী মুনির বাক্যে ক্রোধে অধির হইয়া রাজাকে মুনির অন্যায় ব্যবহার পরিজ্ঞাপন করিলেন এবং এরূপ অসদুক্তি-কারী মুনিকে তাড়াইয়া দিবারও অভিপ্রায় জানাইলেন। ধীমান্ রাজা মুনিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ‘এ ধন গ্রহণে আপনার অসম্মতি কেন ? ইহা ত আমার নিজের ধন, আমার রাজকোষে

অন্যের ধন থাকা কখনই সম্ভাবনা হইতে পারে না; আপনি নিঃসন্দেহে ইহা গ্রহণ করুন।' মুনিবর রাজার বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে বলিলেন 'মহারাজ!' আপনি এ ধনের রক্ষাকর্ত্তা এবং ব্যবস্থার কর্ত্তা সত্য, আপনি ন্যায়ানুসারে প্রজা হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়াছেন ইহাও সত্য, আপনার ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যে কোনও প্রকার অপবিত্রতা নাই তাহাও সত্য, কিন্তু এ ধন আপনার স্বোপার্জ্জিত নহে, ইহা প্রজার উপার্জ্জিত, সুতরাং আমি আপনার ধন বলিয়া এই ধনরাশিকে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহাতে আপনার এবং আমার উভয়েরই অসত্যের আশ্রয় দেওয়া হয়। আপনি আমাকে আপনার অর্জ্জিত ধন দান করুন।" মহামনা রাজা মুনির সারগত বাক্য শুনিয়া করযোড়ে বলিলেন "মহাত্মন্! তাহা হইলে আমাকে কিছু সময় দিন আমি স্বোপার্জ্জিত ধনই আপনাকে দিব" মুনিও প্রসন্ন-মনে সংবৎসর পরে ধন গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিদায় হইলেন।

রাজাও ধন উপার্জ্জন মানসে ছদ্মবেশে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চাকুরি খুঁজিতে লাগিলেন। দেশে দেশে ঘূরিয়া অবশেষে অন্য এক রাজার সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন। রাজা নব নিযুক্ত সেনাপতির নিঃস্বার্থতা, দক্ষতা, সুশিক্ষা ও অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন; এমন কি তিনি তাঁহাকেই প্রকৃত রাজসিংহাসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। সেনাপতি যখন সংবৎসর পূর্ণ হইবার কিয়দ্দিন

পূর্ব্বে বিদায় প্রার্থনা করিলেন, তখন রাজা হতাশ হইয়া পড়িলেন; সেনাপতিকেই রাজত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ব'ললেন 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি' এখন রাজ্যশাসনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি; আমি বিশ্রাম করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি এই রাজ-সিংহাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ইহা আপনি গ্রহণ করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।' ছদ্মবেশী রাজ-সেনাপতি সবিনয়ে বলিলেন 'আমি আপনার ভৃত্য, এ রাজ-সিংহাসন আমার চিরনমস্য, ইহা গুরুর আসন, আমাকে সিংহাসনে আরোহণের অনুরোধ করিবেন না। আমি ধর্ম্মতঃ আপনার এ অনুরোধ রাখিতে অক্ষম, আমাকে বিদায় দিন। আমি আপনার ভৃত্যস্বরূপে যাহা করিয়াছি, তাহাও আপনার প্রদত্ত বৃত্তির অনুরূপ নহে; তবে ভৃত্যের ত্রুটি সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়, আমি আপনার উচ্চ বৃত্তির অযোগ্যই বটি।' বৃদ্ধ রাজা সেনাপতির বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে গলদশ্রু নেত্রে বলিতে লাগিলেন, সেনাপতে! আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিদান করিবার আমার ক্ষমতা নাই; সম্পূর্ণরূপে আপনার কর্ত্তব্য সাধন হইয়াছে, আপনাকে আমি যাহা প্রদান করিব, তাহা গ্রহণে আপনি যেন অসম্মত না হন এই আমার শেষ অনুরোধ।' এই বলিয়া রাজা পঞ্চকোটি সুবর্ণ মুদ্রা সেনাপতির গন্তব্য স্থানে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। সেনাপতি তাহা গ্রহণ করিয়া রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতির অভাবে রাজ্যে হাহাকার উঠিয়াছে, সংবৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, রাজার সত্য নষ্ট হইবে ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল হইতেছিল। এমনই সময়ে বহু শকট-পূর্ণ পঞ্চকোটি সুবর্ণ মুদ্রা সহ রাজা রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিল, আনন্দ কোলাহলে নগর পূর্ণ হইল। সংবৎসর পূর্ণ হইল, মুনিবরও আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রাজা স্বোপার্জ্জিত অর্থরাশি সানন্দে মুনিকে সমর্পণ করিলেন। মুনি এবারও বহু শকটপূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রাগুলিকেও তুচ্ছ ভাবিয়াই পরিহার করিয়া বলিলেন "মহারাজ এধনও আপনার নিজের উপার্জ্জিত নয়, ইহা অন্যের উপার্জ্জিত, আপনি আপনার কর্ম্ম কুশলতায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে এবং সদ্‌গুণদ্বারাই অন্যের উপার্জ্জিত ধন আহরণ করিয়াছেন, এমন কি আপনার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া সেই প্রবাণ রাজা আপনাকে তাঁহার সমস্ত রাজত্বও সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, আপনি তাহা গ্রহণ করেন নাই; গ্রহণ করিলেও তাহা আপনার স্বোপার্জ্জিত হইত না। আপনার গুণরাশি রাজাকে বিমুগ্ধ না করিলে এই পঞ্চকোটি সুবর্ণ মুদ্রাও আপনি পাইতেন না, আপনাদ্বারা এ ধন ত উপার্জ্জিত হয় নাই। বরং যাহাদের প্রাপ্য ছিল, আপনার ক্ষমতাই তাহাদিগকে তাহা পাইতে দেয় নাই। আমি এধনও গ্রহণ করিতে পারি না। আপনি স্বোপার্জ্জিত ধন আমাকে দান করুন, আপনি সত্যে মুক্ত হউন্। আপনি যশঃ ও পুণ্যভাজন হউন, আমি আপনাকে আরও সংবৎসর সময় দিলাম, আপনি এই সময় মধ্যে স্বকীয়

অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখুন।' মুনি এই বলিয়া বিদায় হইলেন।

বিবেকশীল রাজা মুনির বাক্য শ্রবণে এবং প্রদত্ত ধন প্রত্যর্পণে ব্যথিত চিত্ত হইয়াও ধৈর্য্য ধরিয়া মনে মনে সত্যমুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা, সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলে রাণী জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। তখন রাজমহিষী রাজাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন 'প্রভো! এজন্য আপনি চিন্তিত হইতেছেন কেন? এই যে আমি একটী কদলী-বৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলাম, তাহাতে তো ফল হইয়াছে; এফল কি আপনার নিজের অর্জ্জিত নহে, ইহাই দান করুন না কেন?' রাজরাণীর অমৃতময়ী বাণী শ্রবণে রাজার চিত্ত সুস্থির হইতে লাগিল, অচৈতন্য ধমনীগুলিতে যেন মৃত সঞ্জিবনী রক্ত-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল; মুহূর্ত্তে রাজার মনোমালিন্য বিদূরিত হইল, রাজা সুস্থ হইলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক বিষ্ণুপূজা সমাপন করিয়া পূজোপকরণ ধান্য দূর্ব্বাদি এবং একটী কদলীবৃক্ষ স্বহস্তে ভূকর্ত্তনপূর্ব্বক রোপণ করিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাহাতে যত্ন সহকারে জলাদি সিঞ্চন ও তৎপোষণোপযোগী কার্য্যাদি করিতে লাগিলেন। চারিদিক্ পুষ্পবৃক্ষশাখা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া দিলেন ও তাহাও পুষ্পিত হইতে লাগিল। রাজা প্রতি-নিয়ত দেবতা-নির্ব্বিশেষে সেগুলিকে প্রাণপণে সেবা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বৃক্ষনিচয় অপূর্ব্ব শ্রী ও অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সংবৎসরে কদলীদল পরিপক্ক হইতে

লাগিল; ধান্য ও দূর্ব্বাদল স্বীয় স্বীয় শস্য প্রদান করিলে রাণী তাহা হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণী স্বোপার্জ্জিত সুপক্ক কদলিনিচয়, ধান্য ও দূর্ব্বাদল ও তৎনিঃসৃত স্বকৃত তণ্ডুল এবং পুষ্পাদি মস্তকে বহন করিয়া লইয়া ঋষির চরণে সমর্পণ করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন আকাশে স্বর্গীয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; স্বয়ং হলধর গদাধর তথায় উপস্থিত হইলেন, মুনিবর হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন 'ধন্য রাজন্! তুমি ধন্য! তোমার জন্ম সফল, ধন্য তোমার স্বাধ্বী পত্নী, আজ তোমরা যথার্থ স্বোপার্জ্জিত ধন দ্বারা আমায় পরিতুষ্ট করিয়াছ; আমি ইহা সাদরে গ্রহণ করিলাম। তোমরা পবিত্র হইয়াছ। ঐ দেখ অন্তরীক্ষে দেবদেব গদাধর তোমাদের জন্য দিব্য বিমান রাখিয়াছেন; তোমরা মুক্ত হইয়াছ, এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহে স্বর্গারোহণ কর। আজ হইতে তোমার রাজ্যে কখনই অন্নাভাব হইবে না। অন্নপূর্ণা তোমার প্রজার গৃহে গৃহে বিরাজিত থাকিবেন।' মুনির বাক্যে শেষ হইতে না হইতেই রাজা ও রাণী নশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্যানযোগে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া জ্যোতিঃ রূপে আকাশে মিশিয়া গেলেন। সকলে ভগবানের এই অপূর্ব্ব লীলা এবং মুনির অপরিসীম স্বার্থত্যাগ দর্শনে চমৎকৃত হইলেন।"

হায়! হায়! যে দেশে কৃষির এত মহিমা! যেদেশে দেবতা ভগবানের অবতার হলধর: কালধর্ম্মে সে দেশেও

কৃষিমাহাত্ম্য বুঝাইবার আবশ্যক হইতেছে ইহা হইতে পরি-তাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ! বাস্তবিক কৃষিই দেশের জীবন। ইহাতে আমরা আরও দেখিতে পাই। কৃষিই আমাদের আত্মনির্ভরের মূল। মহাপ্রাজ্ঞ রাজর্ষি জনক স্বহস্তে হল চালন করিতেন। ইহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। "আপনার কাজ বামনে করে" এই মূল্যবান্ প্রবাদটি দ্বারাও আমরা বেশ বুঝিতেছি, মানব জাতির যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তাঁহারাও নিজেরা নিজের কাজ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের মান যাইত না, বরং সম্মান বৃদ্ধিই হইত ; যে ব্রাহ্মণ নিজের কাজ নিজে না করিতে পারেন, তাঁহাকেই সমাজে হীন মনে করিত ; ব্রাহ্মণ অন্যের অন্ন গ্রহণ করিতেন না, শাস্ত্র বহুপ্রকারে নিষেধ করিয়াছিল। ইহার কূট অর্থ না করিয়া সরল অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণগণ নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করিতেন, চাকর কিংবা শূদ্রাদির কথা দূরে থাকুক্ ভ্রাতার প্রস্তুত খাদ্যও গ্রহণ করিতেন না। কাজেই প্রত্যেক ঋষিকে নিজে অন্ন (শস্য) উৎপাদন করিতে হইত। এখানে কেহ মনে করিবেন না যে, তাঁহারা ভাত প্রস্তুত করিতেন। পূর্ব্বের ঋষিরা ভাত আহারই করিতেন না; ফল মূল ও জলাদিই তাঁহাদের অন্ন ছিল, তাহাও অন্যের হইলে অখাদ্য হইত। এই প্রকারে সমস্ত কাজই নিজেরা করিয়া লইতেন। অন্যের বল্কল, আসন, ভাণ্ড, কমণ্ডলু কিছুই ব্যবহার করিতেন না। হায়! আমরা এতই ক্ষুদ্রমনা হইয়াছি যে, তাঁহাদের সেই সদ্‌গুণগুলিকে—সেই আত্মনির্ভরতাকে 'ঘৃণা' বলিয়া

উল্লেখ করিতেও লজ্জিত হই না। ধর্ম্ম এবং স্বজাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলে আত্মনির্ভর—নিজের পায় নিজের দণ্ডায়মান হওয়া অতীব প্রয়োজন। তুমি ঘোড়ায় চড়িবে না, বেহারার কাঁধে উঠিবে না, অন্যের পাক আহার করিবে না, অন্যের প্রস্তুত কাপড় পরিবে না, বাইসিকেল দৌড়াইবে না, রেলে উঠিবে না, জাহাজে চলিবে না, অন্যের জল বা ফলও গ্রহণ করিবে না, এমন কি অন্যের পত্নিকেও তুমি দর্শন করিবে না। তাই বলিয়া যদি আমরা বলি তুমি ঘোড়াকে—বেহারাকে—বাইসিকেলকে রেলকে—জাহাজকে—অন্যকে ও অন্যের পত্নী প্রভৃতিকে ঘৃণা কর; ইহাই কি ঠিক হয়? বাস্তবিক এক্ষণে আমরা এই প্রকার ভ্রমেই পড়িয়াছি। কাজ করিতেই জাতি যায়—মান যায়, এই এক ধূয়া উঠিয়াছে। ইহাই আমাদের কৃষিনাশের—সর্ব্বনাশের মূল।

যদি প্রত্যেকে নিজেদের ব্যবহার্য্য যাবতীয় পদার্থ নিজেরা প্রস্তুত ও উৎপন্ন করিয়া লন, তবে আমাদের সংসার কত সুখের—কত শান্তির নিকেতন হয়। আমরা তখন আপন পায় দাঁড়াইতে পারি, আমাদের সমস্ত অভাব বিদূরিত হয়। এই অভাব একমাত্র কৃষি দ্বারাই দূর হইতে পারে।

সম্পাদক।

ক্ষুদ্র কও কারে ?

ক্ষুদ্র বই, আছে কই   এ বিশ্ব সংসারে ?
ক্ষুদ্র কও কারে ?

মেঘ পারাবার,   বরফ তুষার
জল কণাময়।

জলের কণায়   জাহাজ চালায়,
চালায় শকটচয়।

শশী দিবাকর,   নক্ষত্রনিকর
রেণুকায় সব ভরা।

পর্ব্বত পাহাড়,   ধূলি রেণু সার,
ধূলিকণা পূর্ণ ধরা।

জড়বিন্দু জালে,   তরঙ্গ উত্তালে,
সুগভীর শব্দোদয়।

দেশ মহাদেশ,   বিভাগ প্রদেশ,
পল্লী পল্লী যোগে হয়।

বিনা প্রজা বল,   সম্রাট্ দুর্ব্বল,
রাজা প্রজা শক্তিধর।

একের মিলন,   সমাজ সৃজন,
একে একে চরাচর.

ক্ষুদ্র পরমাণু, জড় আদি স্থাণু
সকল বিকার যার।
যাঁহার ইচ্ছায়, জগৎ জন্মায়,
যিনি নিত্য সারাৎসার।
ধ্যান ধারণায়, যা পাই চিন্তায়
যিনি সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতম।
সকলি সমান, ছার ভেদজ্ঞান
ভেদই মনের তমঃ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।

ভক্তি।

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

ভগবান্ নারদকে বলিতেছেন—"আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগিগণ হৃদয়েও অবস্থান করি না, আমার ভক্তগণ যেখানে আমার লীলা গান করেন, আমি সেখানেই অবস্থিতি করি।"

ভগবান্ নারায়ণ যদিও সর্ব্বব্যাপী, যদিও তিনি সর্ব্ব জীবে সমদর্শী—অখণ্ড—অব্যয়—স্থূল ও সূক্ষ্মতম, তথাপি তিনি স্বয়ং বলিতেছেন 'আমি আমার ভক্তহৃদয়েই অবস্থান করি।" এরহস্য এ নিগূঢ়তত্ত্ব—এ মহদ্বাক্য—এ ভগবানের আদেশ বুঝিবার

আমাদের শক্তি নাই; আমরা মানব, আমাদের সে দেবতার আজ্ঞা—সে ঈশ্বরলীলা বুঝিতে যাওয়া বাতুলতা বই আর কি হইতে পারে? ভগবান বহুরূপী, তিনি যেমনি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজা-পতি, তেমনি সংহারকর্ত্তা মহাকাল; তিনি যেমনি আনন্দময়, দয়ালবন্ধু, তেমনি বিভীষিকাময় দণ্ডদাতা; তিনিই সুরভিত কুসুমসদৃশ কোমল ও মনোহর এবং তিনিই ইন্দ্র-বজ্র-সদৃশ কঠিন ও কর্কশ; তিনিই দ্রবময় সুশীতল সরোবর এবং তিনিই পাষাণময় পর্ব্বত; তিনিই দংশনকারী বিষধর সর্প, আবার তিনিই কশ্যপরূপী চিকিৎসক। তিনিই পূর্ণিমার ষোল কলাপূর্ণ শশধর, তিনিই আবার অমাবস্যার ঘোর তিমির-জাল, তিনিই দিবা, তিনিই রাত্রি, তিনিই রোগ, তিনিই ঔষধ, তিনিই জীব, তিনিই শিব, তিনিই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডময় ঈশ্বর—ভক্তের কল্পতরুরূপী ইষ্ট দেবতা—ভক্ত তাঁহার নিকট যাহা চায় তাহাই পায়, অসম্ভব সম্ভব হয়, মৃত জীবিত হয়, বিষ অমৃত হয়, মানব অমর হয়, সংসার স্বর্গ হয়, অসাধ্য সাধ্য হয়, পাতকী পবিত্র হয়—জীব মুক্ত হইয়া যায়।

ভাই ভক্ত! তুমি তাঁহার নিকট যাহা চাহিবে, তিনি তোমার কর্ম্মচারীর ন্যায় তাহাই করিবেন। এখন আমরা দেখিব সেই ভক্ত কে? ভক্তি লাভের উপায়ই বা কি? আমরা ধ্রুব ও প্রহ্লাদকে তাঁহার পরম সিদ্ধ ভক্ত দেখিতে পাই—পরমেশ্বর তাঁহাদের প্রতি অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন—জগতে তাঁহারা ভক্তশিরোমণি রূপে অভিহিত হইয়াছেন। ভগবান্

তাঁহাদিগকে দশদিকে—অন্তরে বাহিরে রাজদেহ রক্ষকের ন্যায় আপন দেহ বিনিময়ে সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের বুদ্ধি, বৃদ্ধি, ঋদ্ধি ও সিদ্ধি তিনিই দান করিয়াছেন। তাঁহারা যে একবার বলিয়া ছিলেন,—

"করশীর্ষাদ্যঙ্গুলেষু সত্যস্তং বহু পঞ্জরম্।
কৃত্বা রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো নমস্তে পুরুষোত্তম॥"

"হে পুরুষোত্তম। তোমাকে প্রণাম করি. তুমি আমার হস্ত, মস্তক, অঙ্গুলি ও বাহুপঞ্জর প্রভৃতি সমস্ত দেহকে অদ্য রক্ষা কর।" ভক্তের এই প্রার্থনায়ই তিনি বিগলিত হইয়া প্রাণপণে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া ছিলেন। ভক্তের জন্য তিনি সকল কর্ত্তব্যই সাধন করিতে পারেন।

মানবের মন চঞ্চল—এ চঞ্চল মনে ভগবদ্-ভক্তির উদয় হওয়া, আর বন্য মহিষ-শৃঙ্গে নিক্ষিপ্ত সরিষার অবস্থিতি দুইই সমান। তবে ভক্তের জন্য নিপাতন-সিদ্ধি আছে। "ধা-ধাতু হইতে "হিত" হয়—"হন্" ধাতু হইতে "ঘ্ন" হয়, এসব যেরূপ অল্প শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট বাচালতা বলিয়াই প্রতিপাদিত হয়, তদ্রূপ সংসারে থাকিয়া ভক্তি যোগে ভগবানের সান্নিধ্যলাভও বহু লোকেব পক্ষেই ঔপন্যাসিক কল্পিত গল্প বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু যখন মানব দুঃখের পর দুঃখ, বিপদের পর বিপদ্ ভুগিয়া, মৃত্যুযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইয়া, নিরুপায় হইয়া নিশ্চেষ্ট হয়; তখন যদি অনন্যচিত্তে ভক্তিভরে (মহিষশৃঙ্গে সরিষা অবস্থান সময়ও) তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে। তবেই

তাঁহার সিদ্ধি সুদূরপরাহত না হইয়া করতলগতও হইতে পারে। যখন শোকে তাপে হতাশে ইন্দ্রিয় চেষ্টা বিলুপ্ত হয়, সংসার শূন্য বলিয়া বোধ হয়, তখনই ঈশ্বরের প্রতি মনের একাগ্রতা জন্মিবার সুবিধা হয়; তখনকার ভাবনাই সিদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ। যখন আমরা প্রিয় পুত্র ভ্রাতা বন্ধু প্রভৃতিকে শ্মশানবহ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া প্রত্যাগমন করিতে থাকি, তখন এই মদগর্ব্বিত অদম্য কাম ক্রোধ লোভাদি ইন্দ্রিয়নিচয় যেরূপ ম্রিয়মাণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাৎকালিক ঈশ্বরনিবিষ্টচিত্ততা ভক্তিলাভের প্রধান উপাদান বলিয়াই বোধ হয়। এবিষয়ে একটী প্রবাদও প্রচলিত আছে;—

"রমণান্তে শ্মশানান্তে পুরাণান্তে চ যা মতিঃ।
সা মতিঃ সর্ব্বদাচ স্যাৎ কো জনো যোগী নো ভবেৎ॥"

মনের ভাবনা দ্বারাই সাধনা,—

"মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজেদেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

অনেক সময় দুঃখে পড়িয়াই ঈশ্বরের দিকে মনের গতি হয়। পরম ভক্ত সাধক 'ধ্রুব' ও 'প্রহ্লাদ' ও যদি নিদারুণ দুঃখে না পড়িতেন, তাহা হইলে এ দুর্লভ ভগবদ্ভক্তি লাভে সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ ছিল। মহাত্মা ধ্রুব শৈশবে প্রাণদাতা জনক হইতে মৃত্যুযন্ত্রণাস্বরূপ ভ্রাতা উত্তমের অন্যায় সমাদর ও বিমাতার সুকঠোর বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়াই, রাজার রাজা পিতার পিতা ভগবানের শরণ লইবার অভি-

প্রায়ে একাগ্র মনে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানকেই ভাবনা করিয়াছিল। স্তন্যপায়ী শিশু স্বীয় গর্ব্ভধারিণীকেও পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকেই মাতা অপেক্ষা শতগুণে দয়াধার ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি, অচলা অটলা নির্ম্মলা ছিল। তাই ভগবান্ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া—যোগিগণের হৃদয়মন্দির পরিত্যাগ করিয়া—অরণ্যে আসিয়া শিশু 'ধ্রুব'কে সাশ্রুনেত্রে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পবিত্র করিয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য স্বর্গশ্রেষ্ঠ ধ্রুবলোকে বাসস্থান নির্ম্মিত হইল। ধন্য ধ্রুবের ভক্তি! ধন্য বালকের শক্তি!! ধন্য! ভগবানের লীলা! ধন্য ভক্তবাৎসল্য!! বালক প্রহ্লাদ যখন একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা প্রাণদাতা জনক কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে ছিলেন, যখন জগদেকবীর পিতাও শিশুপুত্রের প্রাণ বধের জন্য নানা প্রকার কঠিন উপায় উদ্ভাবন করিতে ছিলেন; যখন বিষ-প্রয়োগ-পর্ব্বতোপরি হইতে নিক্ষেপ—সমুদ্রে নিমজ্জন—সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত দ্বারা শিশুকে জর্জ্জরিত করিতেছিলেন, যখন বালকের ইন্দ্রিয় সকল বিকল ও চেতনা বিহীন হইয়াছিল, যখন তাঁহার বাহ্যিক জ্ঞান—ক্ষুধা তৃষ্ণা—সুখদুঃখমান-অপমান-স্নেহ-মমতাদি বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখনই সেই শিশু প্রহ্লাদ নিরুপায় হইয়া একাগ্রচিত্তে অচল অটল ভাবে ভক্তি ভরে সেই অদ্বিতীয় ভক্ত-বৎসল ভগবান্‌কে স্মরণ করিবামাত্রই তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ

হইয়াছিলেন। বালক ইহাই বুঝিয়া ছিলেন "রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে" তাইত সেই পরম দয়াল ভক্তগতপ্রাণ ভক্তের দুঃখে বিগলিত হইয়া ভক্তের প্রতি নিক্ষিপ্ত দণ্ডগুলি নিজে বুক পাতিয়া লইয়া ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রকার সুরথ, বিদূরথ, ভগীরথ, সুধন্বা, সুদর্শন, বিদুর, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, হনুমান্, চন্দ্রহংস, কার্ত্তবীর্য্য, বিভীষণ, প্রবীর প্রভৃতি রাজগণ এবং জনা, শৈব্যা, দময়ন্তি, সাবিত্রী, সাতা, চিন্তা, দ্রৌপদী, শশিকলা, অনসূয়া, অরুন্ধতি প্রভৃতি রমণীগণ এবং নারদ, পরাশর, ব্যাস, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, অঙ্গিরা, সনক, সনন্দ, সনাতন, জাবাল, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক এবং শুকদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ, শঙ্কর, রামপ্রসাদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রাজাকৃষ্ণচন্দ্র, ভুবন রায়, রামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী প্রভৃতি ভক্ত সাধকগণ যখন যখন ভক্তিভরে একাগ্রচিত্তে অনন্যোপায় হইয়া প্রাণভরিয়া ভগবান্‌কে আহ্বান করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা সেই ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। ভগবান্ জীবাত্মা, পবন, সলিল, বটবৃক্ষ, বালক, ব্রহ্মচারী ও পবিত্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া, অথবা স্বপ্নাবেশে ভক্তকে দর্শন দিয়া থাকেন। তখনই তাঁহার আদেশকে আমরা "দৈববাণী" বলিয়াই পরিগ্রহণ করিয় থাকি।

বিপদের পর বিপদ্ অতীব যন্ত্রণাদায়ক; দুঃখসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আবার তাহাতে নিমজ্জন কিংবা মহাকষ্টে

পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া হঠাৎ অতলে নিপতন, মৃত্যুযন্ত্রণা হইতেও ভীষণতর। রাবণ-হৃতা সীতা অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিয়া পতিকর্ত্তৃক মুক্তি লাভের পর যখন একমাত্র অবলম্বন জীবিতেশ্বর পতি-দেবতার মর্ম্মন্তুদ কঠোর বাক্যে শত বজ্রাঘাত-সদৃশ যাতনা ভোগ করিতেছিলেন; যখন তাঁহার সতীত্বের প্রতি সন্দেহ হইয়াছিল, যখন তিনি পতির সমক্ষে জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ করিতেছিলেন, যখন তিনি বুঝিয়া ছিলেন বিনাদোষেও তিনি জগদেকদেবতা প্রেমাধার সর্ব্বগুণাশ্রয় প্রিয়তম পতি-দেবতার অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন। যখন তিনি ইহাও ভাবিতে ছিলেন যে জন্মান্তরীণ কোনও গুরুতর পাপ দ্বারা এরূপ কর্ম্ম ভোগ করিতে হইয়াছে, নতুবা সর্ব্বসদ্গুণ-বিভূষিত-ভগবদ্রূপী পতি দেবতার মনে এরূপ ইতরোচিত ভাব প্রবেশ করিবে কেন? যখন তিনি সভামধ্যে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন "সৌমিত্র মিথ্যাপবাদগ্রস্তা হইয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না, এক্ষণে চিতাই এই ঘোরতর বিপদের ঔষধ; স্বামী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এক্ষণে চিতাই আমার কর্ম্মানুরূপ গতিদান করিবে।" এই বলিয়া চিতায় প্রবেশ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব-প্রকার পাপপুণ্যের সাক্ষী ভগবান্‌কে ভক্তিভরে স্মরণ করিলেন, "হে বিভো! আমি কায়মনোবাক্যে কখনও পতি-দেবতাকে অতিক্রম করি নাই, সুতরাং তুমিই আমাকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করিবে।" ত্রিলোকবাসী লোক সীতাকে পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নিতে পতিত হইতে দেখিতে পাইল। তখনই জন-

মণ্ডলীর হাহাকার শ্রবণে ধর্ম্মাত্মা রামও অশ্রুপূর্ণ নয়নে চিন্তাকুল হইলেন। অমনি সেই ভক্তগতপ্রাণ ভগবান্ বিচলিত হইলেন, আকাশে দৈববাণী হইল "সীতা স্বয়ং লক্ষী, আপনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনার এত ভ্রম কেন?" দেখিতে দেখিতে ভগবান্ অগ্নিরূপে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চিতা সায়িতা, সূর্য্যসদৃশী তপ্তকাঞ্চনভূষণা, নীলকুঞ্চিতকেশী, অবিকৃতরূপা, অনিন্দিতা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন "এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর, ইহাতে পাপের লেশ মাত্র নাই, এই শুভলক্ষণা সীতা বাক্য মন বুদ্ধি অথবা চক্ষুদ্বারাও কখন তোমাকে অতিক্রম করে নাই; রাঘব! আমি আদেশ করিতেছি, এই পাপবিহীনা বিশুদ্ধ-স্বভাবা সীতাকে গ্রহণ কর, ইহাকে আর কোনও কথা বলিও না।" ভগবানের বাক্যে রামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করিলেন, সীতার মৃত্যুযন্ত্রণাধিক দুঃখ তিরোহিত হইল, তিনি অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভগবানের লীলা—সতীত্বে গৌরব—ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এই প্রকার সর্ব্ব সম্পত্তিবিবর্জ্জিত হইয়া, মৃত পুত্রকে শ্মশানে লইয়া, যথায় শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন নিরাশায় হতাশ হইয়া একাগ্রমনে ভগবান্‌কে ভক্তিভরে স্মরণ করিয়াছিলেন, তখনই সেই দয়াল প্রভু ব্রহ্মাদি দেবগণকে সঙ্গে নিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইয়া মৃত পুত্রের জীবন দান করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি ও মুক্তি দান করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদী যখন স্বামিগণ কর্ত্তৃক অরক্ষিতা হইয়া

কুরু সভায় নির্লজ্জ ভাবে আনীতা হইয়াছিলেন, যখন স্ত্রীলোকের একমাত্রধন সতীত্ব ও লজ্জা রক্ষার দ্বিতীয় উপায় ছিল না; যখন তিনি লজ্জায় মৃতকল্পা হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণাধিক মহাকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন; যখন দুষ্টমতি দুঃশাসন সবলে বিবসনা করিতে চেষ্টা করিতেছিল, যখন তিনি অনন্যমনে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া ভক্তিভরে অদ্বিতীয় দয়াল পুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করিয়াছিলেন, তখনই তিনি দৈববাণীরূপে আশ্বাস দিয়া পরম ভক্তা শিষ্যার পরিধেয় বসন অনন্ত করিয়া দুষ্টের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। তখন ভক্তির জয় জয়কার—সতীত্বের ধন্যবাদ ও দ্রৌপদীর গৌরবে সভাস্থল প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

এই প্রকার প্রত্যেক ভক্ত সাধকের প্রতি ভগবান্ সর্ব্বদা দয়াশীল। প্রবন্ধের দীর্ঘতা নিবারণ অভিপ্রায়ে আমরা সেগুলি পৃথক্ পৃথক রূপে বিস্তৃত ভাবে দেখাইতে পারিতেছি না। তবে আজ কালও যে এরূপ ঘটনার অভাব হইতেছে না, তাহার জন্য দুই একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি।

অনেকেই জানেন কেহ কেহ নিজেরাও বা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন দেবালয়ে বিশেষতঃ বৈদ্যনাথ ও তারকেশ্বরে হত্যা দিয়া—একাগ্র মনে ভগমান্ মহেশ্বরকে ভক্তি করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির দৈববাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুত্রশোকাতুর বা অপুত্রক, পুত্র লাভ করিয়াছেন, রোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন, নির্ধন ধনী হইয়াছেন। ভগবানের কৃপায় শুষ্কতরু মঞ্জুরিত হয়,—

অন্ধ দিব্যনেত্র লাভ করে,—মূর্খ বিগত যৌবনেও পাণ্ডিত্য লাভে সমর্থ হয়,—ভোগী যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ; এখনও এসব দৃষ্টান্তের অভাব হয় নাই, কিন্তু চাই সেই নিরেট বিশ্বাস !—নির্ম্মলা ভক্তি !! দোষ দেবতার নয়, দোষ আমাদের নিজের ; আমরা মনকে স্থির করিতে পারি না—ভক্তির আশ্রয় লইতে জানি না—ভক্তবৎসল ভগবানকে দেখিয়াও দেখিনা—কাতর প্রাণে—অনন্য মনে—মুক্তকণ্ঠে—সরলভাবে ভক্তিভরে একটী বারও ডাকি না ! কালস্রোতে ভক্তি-বিশ্বাস শ্রদ্ধা-প্রেম সব ভাসিয়া গিয়াছে। আমরা নানা প্রকার অযুক্তি কুযুক্তি দ্বারা সত্যঘটনা গুলিকে বিকৃতি করিয়া, ভক্তিকে যুক্তি-অসি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিতেছি ! এই যে সেদিন, তীর্থক্ষেত্রে একজন ধনীলোক যুবকপুত্র হারাইয়া প্রিয়ব্রতের ন্যায় মৃতকল্প প্রাণে ভক্তিভরে ঈশ্বরকে আহ্বান করিয়া ছিলেন তৎপত্নীও সপ্তদশ দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভগবানকে ডাকিতেছিলেন। ভগবানের হৃদয় টলিল, তিনি ছদ্মবেশে ব্রহ্মচারীরূপে তাঁহাদের নিকট আসিয়া দর্শন দিলেন ; শোক বিদূরিত হইল ; পঞ্চপুত্রলাভের বর দিয়া ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী কথিত নির্দ্দিস্ট নির্দ্দিষ্ট সময়েই তাঁহারা সেই পঞ্চপুত্রই লাভ করিয়াছেন।

পাঠক মহোদয়গণ ! নিজ নিজ জীবনে এই প্রকার ভগবানের কত অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়াই পরীক্ষা করুন। "ভক্তের বোঝা ভগবান্ বয়" এইত আর

একদিন এক নরাধম অগ্নিবান সংযোগে এক ভক্তের প্রাণনাশে তিনবার চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইল, ভগবান বাণের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, বাণ আর ছুটিতে পারিল না (১) "তাই বলি রাখে হরি মারে কে ? তোমরা বলিতে পার বাণে দোষ ছিল, আমরা তাহা স্বীকার করিব না, আমরা বলিব ভগবান ছিলেন তিনি আপন বুক পাতিয়া আঘাত লইয়াছেন ; আয়ুষ্মানের আয়ুদান করিয়াছেন—ভক্তের জন্মান্তরীণ ভক্তের প্রাণ রাখিয়াছেন। (২) এই প্রকার আজকালও প্রতিনিয়ত ভক্তবৎসল ভগবান পরোক্ষে প্রত্যক্ষে তাঁহার ভক্তগণেকে রক্ষা করিতেছেন। ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই হৃদয়ে তিনি চিরবিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণই তাঁহাকে ভক্তিনেত্রে দেখিতে পান। অন্যে তাহা বুঝিতেও অক্ষম।

সম্পাদক

---

(১) তিনি বিজ্ঞলোক, মাসিক পনর শত টাকা উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ঘটনাটি পত্রিকায় লিখিয়া দিলে সংসারের বড়ই উপকার হয়।

(২) ত্রিপুরা হিতৈষী লিখিয়াছেন পুলিশ ইং শ্রীযুক্ত হরকুমার গুপ্তের ভাগিনেয়ী বাত ব্যাধিতে কাতর হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। তিনি একদা দিবালোকে স্বপ্ন দেখিলেন এক বৃদ্ধ তাহাকে বলিতেছে "তুমি নিজে গিয়া আজই কাত্যায়ণী কালীবাড়ীতে পূজা দিলে ভাল হইবে" বালিকা হাটিতে অক্ষম, তথাপি দৈববলে কালীবাড়ীতে গিয়া পূজা দিবা মাত্রই ভাল হইলেন। ১৩২০।৩১ জ্যৈষ্ঠ বসুমতী।

নরবলি।

পুরাকালে মধ্যে মধ্যে নরবলি হইত এরূপ উপাখ্যান আমরা দেখিতে পাই। মুনিপুত্র শুনশেফকেও যূপকাষ্ঠে নিপতিত হইতে হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজকালও মধ্যে মধ্যে নরবলি হইতেছে এরূপ বৃত্তান্ত আমরা শুনিতে পাই। বহু প্রকারে বহু স্থানে নরবলি হইতেছে তাহাও সত্য। তবে দেবতার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের জন্য নরবলি পড়িলেই মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। একদল বাবু দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া পড়েন—এরূপ নৃশংস ব্যাপার—এরূপ আততায়ীর ব্যবহার তাঁহাদের দয়ার প্রাণে—কোমল হৃদয়ে—জ্ঞানের চক্ষে—সাম্যের সমাজে অতীব অসহনীয়। বাস্তবিক যাঁহাদের দেবতার নিকট পাঁঠা বা মেষ বলি দেখিতেও চক্ষু ফাটিয়া রক্ত পড়ে—বুক ফাটিয়া ফোয়ারা ছুটে, তাঁহাদের পক্ষে কে নরবলির কাহিনী কি বিষম বিভীষিকাময়ী তাহা বলিবার নয়। কিন্তু আজ আমরা লক্ষ-নর-বলি—লক্ষ শিশু-বলি—প্রতি বৎসর কালরূপ অমাবস্যায় লক্ষ বলি, লক্ষ্য ও প্রত্যক্ষ করিয়া যে কাহিনী লিখিতেছি তাহাতে আমাদের ন্যায় নির্দ্দয় নির্ম্মম ব্যক্তির কঠোর হৃদয়ও বিচলিত হইতেছে—লেখনী চলিতেছে না—ভাষাস্ফূরিতেছে না—ভাব ফুটিতেছে না—বাক্যও জুটিতেছে না তবে মহামুনি বিশ্বামিত্রের ন্যায়

যদি কোন মহাত্মা আমাদের দুঃখ দূর করেন—নরবলি নিবারণ করেন সেই আশায় আজ সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি।

হিন্দু দেবতার জন্য পাগল—বিদ্যাই আমাদের পরম দেবতা (১)—বিদ্যা মুসলমানের পক্ষেও তদ্রূপ। বিদ্যা শিখিবার জন্য ইউরোপীয়ান, আমেরিকান্ জাপানী প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত সভ্য ও প্রাজ্ঞজাতি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; আমরাও বিদ্যার জন্য প্রাণ দিব, তাহাতে আপত্তি কি? কিন্তু পুরাকালে আমরা প্রাণ দিয়া বিদ্যালাভ করিতাম; আবার বিদ্যালাভ করিয়া অক্ষয়—অজর প্রাণও পাইতাম। বিদূরথ-পত্নী-যোগাদি-সর্ব্ব-বিদ্যা সাধিনী-তাপসী লীলাবতী প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। এক্ষণে আমরা বিদ্যাও লাভ করিতে পারি না—অথচ অকালে প্রাণও দিই ইহাই আমাদের দুঃখ কষ্ট।

আমরা বিদ্যা শিক্ষার জন্যই প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নরবলি দিতেছি—সুরথ রাজা লক্ষ পশুবলি দিয়াছিলেন। ক্রমেই লোক বিজ্ঞতম হয়; যে এই সূত্রানুসারেই আমরা এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, (২) সেই বর্ত্তমান শিক্ষাই আমাদের আরাধ্য

(১) বিদ্যা নাম কুরূপ রূপমিদং বিদ্যাতি গুপ্তধনং;
বিদ্যা সাধুকরী জনাপ্রয়করী বিদ্যা গুরূণাং গুরু।
বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তি নাশনকরী বিদ্যা পরং দৈবতং
বিদ্যা রাজসু পুজিতা চ ধনিনাং বিদ্যা বিহীনঃ পশুঃ॥" (গঃ পুঃ)

(২) কমলিনী মলিনী দিবসাত্যযে
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধিবিদধে রমণী মুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ॥

দেবতা—লৌহময় স্কুল গৃহই আমাদের যূপকাষ্ঠ,—ঊর্দ্ধতন সভ্যগণ ও শিক্ষক মহোদয়গণই আমাদের পুরোহিত,—হায়! আর আমরা অভিভাবকগণই নরবলি দাতা নির্ম্মম পূজার্থী।—আর বলিতে পারি না—ষোলকলা পূর্ণ শশিকলার ন্যায় মনোহর কনক-কান্তি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নিরোগ কুসুম-কলিকা-সদৃশ সুকুমার শিশুগণই আমাদের "বলি"—আর অসি,—সে ত সহস্র-মুখী—খুরধার সমন্বিতা মৃত্যু-বিষপরিপূরতা—জ্বর-জরা-বিসূচি-কাময়ী কঙ্কাল-কারিকা মৃত্যুকন্যা।

পাঠক! অভিভাবকগণ একবার ভাবিয়া দেখ—তোমার নিজের অবস্থাই একবার স্মরণ কর। তোমার সেই প্রাণের প্রাণ—হৃদয়ের সারধন—সবর্ণ নিরাময় দেহ—চির প্রফুল্লচিত্ত শিশু আজ পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া কি হইয়াছে? কোথায় তাহার সে সবল দেহ? কোথায় তাহার সে নবকিসলয় সদৃশ শুভকান্তি? কোথায় তাহার সে প্রফুল্লতা—কোথায় তাহার সে বাল্যস্বভাব সুলভ আমোদ প্রমোদ? এ যেন, সে নয়, এ যে শ্মশানোন্মুখ কঙ্কালসার—জীবনীশক্তি বিহীন—বিশুষ্ক কান্তি নরাকার কাষ্ঠপুত্তলিকা। হায়! আজ এ শিশুর মুখের মধুর হাসি কোথায়? কেন এমন হইল? তাহা কি আর বুঝাইয়া দিতে হইবে? ইহা কেবল এ বঙ্গে নয় সমস্ত ভারতের কথা।

এই যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের বংশ ধ্বংস হইতেছে, ইহারই বা কারণ কি? একটুকু মাত্র চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে,

যাহাদের বংশের যে পরিমাণ ছেলে টোল বা মাদ্রাসা ছাড়িয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইতেছে, তাহাদের মধ্যে তদনুরূপ বংশ হানি হইতেছে। কৃষক, মাড়োয়ারী বা নিরক্ষর লোকদের (স্বাস্থ্যের তথাকথিত নিয়ম পালন না করিয়াও) বরং বংশ বৃদ্ধিই হইতেছে। আর আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার সম্পূর্ণ নিয়ম পালন ও গরম জল গরম বায়ু, সেবন করাইয়া—মাসের বেশি দিন সাগু বার্লি দিয়া ছেলেদের পিছনে পিছনে বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ রাখিয়াও শতকরা দশটি ছেলেকে বিসর্জ্জন দিতেছি। অবশিষ্ট যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও কঙ্কালসার হাস্যহীন স্ফূর্ত্তিশূন্য চিররুগ্ণ বিফলপ্রাণ শুষ্ক দেহ।

কলিকাতা, বোম্বাই, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রধান নগরগুলির কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রতি জিলার সদরে মহকুমায় ও বড় বড় পল্লী সমূহে যাহাতে বিশ লক্ষেরও অধিক বিদ্যার্থী সে সকল স্কুল পরিদর্শন করিলে অন্ধকূপ হত্যার কথা মনে পড়িয়া শরীর শিহরিয়া উঠে।

একদিকে শিশুরা স্কুলে প্রবেশ করিয়াই হঠাৎ কুলধর্ম্ম, কুলাচার, কুলগ্রন্থ, কুলক্রিয়া ও দেব পূজাদি এবং তাহাদের বালস্বভাব সুলভ আমোদ প্রমোদ ও স্বাধীন ক্রীড়া কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া উদ্বিগ্ন মনা হইয়া পড়ে। অপরদিকে অল্প-পরিসর অল্লায়তন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিনের ঘরে প্রবল রৌদ্রের বেলায় গায় গায় সংলগ্ন হইয়া (বঙ্গদেশের তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীর ন্যায়) পরস্পর পরিত্যক্ত ও দূষিত বিষাক্ত শ্বাস-

প্রশ্বাস গ্রহণে অকালোপযোগী কোর্ট, সার্ট, বুট, কম্ফাটার কেপ ও মোজাদি দ্বারা দেহাবরণে স্বল্প অক্ষর ও স্বল্পশব্দ যুক্ত ভাষায়, বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, কৃষি, ইতিহাস ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রাশীকৃত পুস্তকের অনাবশ্যকীয় আলোচনায়—রুগ্ন্ ক্ষীণস্বর ভগ্নদেহ ক্ষণকালস্থায়ী শাস্ত্রোক্ত গুরু শিষ্য সম্বন্ধশূন্য শিক্ষকের তাড়নায়- ক্ষুৎপিপাসাতে মলমূত্রাদির অযথা ও অসহনীয় বেগধারণে অপেয় অস্পৃশ্য দূষিত ও পর্য্যুসিত জল ও বিষাক্ত ময়রার প্রস্তুত ভেজাল মিষ্টান্নাদি সেবনে ও এবম্বিধ বহুপ্রকার অনিয়মে দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন কয়দিন থাকিতে পারে ? তাই আমরা প্রতি বৎসর অন্যূন পক্ষে লক্ষ শিশুকে হারাইতেছি। ইহা "নর বলি" বই আর কি হইতে পারে ? আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শিক্ষার পক্ষপাতী, কিন্তু ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যাকুল।

ক্ষামি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বালক বালিকা ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই বিনা প্রয়োজনে হিংসা করিবার অভ্যাস করে। ছোট ছোট ছেলেদের অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা পতঙ্গ, কাঁকড়া ও পাখীর ছানা প্রভৃতি ধরিয়া লেজে, পায় ও ডানায় সূতা অথবা সূক্ষ্ম দড়ি বাঁধিয়া আমোদ করার জন্য উহাদের হাতে দেয়, ছোট ছেলেরা এই দড়ি বা সূতা ধরিয়া

ইচ্ছামত টানিতে থাকে এবং বদ্ধ প্রাণীটী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে। বড় ছেলেরা পাখী ধরিয়া বলি দেয়, ছোট ছেলেরা উহা দেখিয়া এইরূপ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। বাল্যের এই অন্যায় ও অসংযত অভ্যাস হইতে হিংসা করা যে উচিত নয়, এই কথা তাহারা একেবারে ভুলিয়া যায় এবং প্রথম হিংসা করিতে গেলে মনে স্বভাবতঃ উহা না করিবার জন্য যে একটী ভাব বা বাধা উপস্থিত হয়, এই ভাব বা বাধা একেবারে লোপ পায়। এই কুশিক্ষার জন্য দায়ী কে? এই প্রশ্ন হইলে সকলেই বলিবেন, পিতা মাতা অথবা যে কোন অভিভাবকের উপর বালক বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে তাহারাই ইহার জন্য দায়ী। কয়জন অভিভাবক ছেলে কি প্রকারে গঠিত হইতেছে, তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখেন। কেবল পড়া শুনায় ভাল হইলেই হইল, ইহাই বর্ত্তমানে বহু অভিভাবকের মত। বাল্যের এই সামান্য কার্য্যের দ্বারা বালক বালিকা যে কি অমূল্য রত্ন নষ্ট করিয়া ফেলে, কয়জন তাহার আলোচনা করেন। অনেক যুবক ও যুবতী বালক বালিকার জনক ও জননী হন, যে অবস্থায় ভোগ সুখ ভিন্ন অন্য কিছুই তাহার মনে স্থান পায় না, তখন তাঁহারা সন্তানকে পুতুলের মতন সাজাইয়া অলক্ষ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের বিনাশের হেতুভূত সুন্দর ও সুসজ্জিত হইবার ইচ্ছা সন্তানের মনে জন্মাইয়া দিয়া সুখী হন। বালক-বালিকা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিখিয়াছে বড়ই ভাল কথা, কিন্তু উহাদের মন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন আছে কি না, তাহা কয়জন

দেখিয়া থাকেন ? স্ফুটনোন্মুখ কুসুম-কোরকের ন্যায় সুন্দর ও সুশোভন বালক বালিকা ভবিষ্যৎ জীবনে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইয়া শুকাইয়া যায় কেন ? সহস্র সহস্র বালক বালিকার মধ্যে কয়জন ভবিষ্যতে বংশ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হয় ? পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় জনস্রোত চলিতেছে, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে। লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে; কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্র বলে কয়জন বংশের ও দেশের গৌরব রক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেছে। ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব যে, আমাদের বালক-বালিকাগণ সুশিক্ষার পরিবর্ত্তে কুশিক্ষা লাভ করিতেছে—যাহাতে আমদের হৃদয়ের সদ্বৃত্তিসমূহের স্ফুরণ না হইয়া উহারা অকালে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। শিশুসন্তানগণের কোমল মন অনুকরণ-প্রিয়; উহারা যাহাদিগের অনুকরণ করিতেছে, তাহারা সংযমী ও সত্যপ্রিয় না হওয়ায় শিশুদিগের প্রকৃত শিক্ষার স্থল হইতে পারিতেছে না। সুতরাং আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমাদের শিশুসন্তানগণ যদি উপযুক্ত ও চরিত্রবান্ না হয়, তবে তাহার জন্য আমরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

বালক বালিকা কেন হিংসা করিতে শিখে, তাহাদের মনে হিংসা এবং অহিংসা উভয়েরই বীজ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে বীজের অঙ্কুর হওয়ার জন্য আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বুঝিয়া বা না বুঝিয়া যে রূপেই হউক চেষ্টা করিয়া থাকি, উহাই অঙ্কুরিত হইয়া স্বীয় বীজানুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকে।

তবে ইহার এইমাত্র পার্থক্য যে হিংসার বীজ অতি সামান্য চেষ্টায় অঙ্কুরিত হয় এবং অহিংসার বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের আবশ্যক। মনের উপরিভাগে হিংসার বীজ বর্ত্তমান এবং উহা এত শক্তিশালী যে সাধারণ কার্য্য দ্বারাই উহার রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি হয়; কিন্তু অহিংসার বীজ মনের গভীরতম প্রদেশে বর্ত্তমান এবং উহার অঙ্কুর জন্মান কঠিন ব্যাপার। তবে একবার ইহাকে অঙ্কুরিত করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে মহামহীরূহে পরিণত হয়, তখন উহার সুশীতল ছায়ায় সংসারের পাপ-তাপদগ্ধ কোটী কোটী নরনারী শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

ভাবই মানুষকে পোষণ করে এবং ভাবই মানুষের চালক, প্রথম জীবনে অহিংসার ভাব জন্মাইতে পারিলে এবং উহা রক্ষিত হইয়া বর্দ্ধিত হইলে, মনুষ নিরাপদ্ হয়। তখন আর অন্য কেহ তাহাকে হিংসা করিতে পারে না। এমন কি স্বাভাবিক হিংস্র জন্তুও তাহার সম্মুখে হিংসা বৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ"॥

পাতঞ্জল ৩৫॥

অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার নিকট হিংসার ভাব ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তির অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার নিকট স্বাভাবিক হিংস্র যাহারা তাহারাও হিংসা করিতে সমর্থ হয় না। ইহাই হিংসা ত্যাগের চরম অবস্থা এবং মানব-

মন হিংসা বর্জ্জিত হইল কি না তাহা জানিবার ইহাই একমাত্র কষ্টিপাথর। যতদিন এই অবস্থা লাভ না হয়, ততদিন জানিতে হইবে যে হিংসা ও অহিংসার মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছে। উভয়ে মনোরাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু স্থায়িরূপে কাহারও জয় পরাজয় হয় নাই। এই অবস্থা লাভই অহিংসার বিজয় নিশান। এই নিশান উত্থিত হইলে এবং উহা সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইলে হিংসা বৃত্তি বিফল মনোরথ হইয়া মনোরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সুদূরে চিরদিন তরে পলায়ন করে। তখন সে আর দ্বিতীয়বার এই রাজ্য আক্রমণ করিবারও বাসনা রাখে না। এমন কি উহার প্রবল প্রবল সহযোগী অহঙ্কার, দম্ভ, দর্প, ক্রোধ, পারুষ্য, অভিমান ও অজ্ঞান একত্র মিলিত হইয়াও আর ঐ রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

আমরা বিনা প্রয়োজনে হিংসা অথবা বৃথা হিংসা ত্যাগ করার প্রসঙ্গে হিংসা ত্যাগের চরম লক্ষ্যে আসিয়া পড়িলাম। বৃথাহিংসা ত্যাগ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। উদ্দেশ্য, যদি কেহ এই ভাবে জীবন গঠন করিতে চান, তবে উহা তাহার সমক্ষে যত সরল ও গ্রহণোপযোগী করিয়া ধরা যায় ততই মঙ্গল।

পৌত্তলিক।

হে চির সুন্দর তুমি হয়ে বিশ্বময়,
রহিয়াছ, ইথে কারো নাহিক সংশয়।
পূর্ণ বিকশিত যার হয়েছে নয়ন,
সর্ব্বভূতে সেই তব পায় দরশন।
"হরি" কিংবা "আল্লা" "গড্" যদি বিশ্বময়,
মাটির পুতুল কি গো বিশ্ব ছাড়া হয় ?
শুনেছি অনেকে বলে এই কথা আজ,—
হিন্দুরা মাটিরে পূজে ছি, ছি, এ কি লাজ !
সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া যদি সত্য আছে স্থিত,
মৃন্ময় পুতুলে সে কি নাহি বিরাজিত ?
ফলে ফুলে তরুমূলে সরল নয়নে
হিন্দুরা দেখিতে পান সেই মহাজনে।
যে, হিন্দুরে ঘৃণা করে বলে পৌত্তলিক।
সেই অন্ধ মানবেরে ধিক্ শত ধিক্ ॥

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মজুমদার বি, এ,

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

যে যে মহাত্মগণ আমাদের এ অকিঞ্চনকর "আর্য্য-গৌরবে"র বিনিময়ে তাঁহাদের বহুমূল্যবান্ সংবাদপত্রগুলি সাদরে প্রদান করিয়াছেন, আমরা পরমা ভক্তিসহকারে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আর্য্যগৌরবসম্পাদক।

১। সাহিত্য সংবাদ—(বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়)—"ভক্তের পূজাপদ্ধতি" "আসল ও নকল" "পুরুষোত্তম" "মুক্তি" "সতী মহিমা" প্রবন্ধগুলি সাধকের সিদ্ধমন্ত্রস্বরূপ, অতীব সদুপদেশপূর্ণ—পত্রিকার গৌরব-স্থল।

২। স্বাস্থ্য সমাচার—(চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়,) "কুমারতন্ত্র", "খাদ্যদ্রব্যসংরক্ষণ" "দীর্ঘায়ু রহস্য" "শারীরিক পরিশ্রম ও স্বাস্থ্য" "স্বাস্থ্য নিবাস" "শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্যকথা" "উপদেশ" ও "জ্ঞানের সদ্ব্যবহার" "কৈশোরে ইন্দ্রিয় সমস্যা" প্রভৃতি প্রবন্ধ রুগ্ন বাঙ্গালীর ধন্বন্তরির ন্যায় উপাদেয়।

৩। সৌরভ।—(চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ) চন্দ্রালোক প্রকৃতই যেন চন্দ্রালোক। ইহাতে যেমন স্নিগ্ধতা আছে, তেমনি গুপ্ত মেঘ ও অশনি সমাজ-সংস্কারকগণকে গুপ্তাঘাত করিতেছে। "নব পঞ্জিকা" বেশ সময়োপযোগী সুপাঠ্য। "শেফালী" কবিতাটী বেশ সৌরভ খুলিয়াছে। "নীলাতঙ্ক" মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক চিত্র। "ধর্ম্মে বিপত্তি" না থাকাই ভাল।

৪। ব্রাহ্মণ সমাজ—(মাঘ—চৈত্র) ইহাই প্রকৃত স্বদেশী

ও স্বধর্ম্মের পত্রিকা, ইহা দেখিতেও আনন্দ হয়। "হিন্দুজাতিতত্ত্ব" "আচার" "তৃষিতের কাতরতা" "নবীন ও প্রবীণ" "এখন কি কর্ত্তব্য" "সামাজিক সম্বন্ধ" প্রভৃতি প্রবন্ধে অতীব জ্ঞানগভীরতা ও শিক্ষার পারিপাট্য আছে। ব্রাহ্মণ সমাজ ধর্ম্মে ও ধনে শ্রেষ্ঠ —ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে পত্রিকার ছাপা ও কাগজাদির উন্নতির জন্য আরও কিছু ব্যয় করা আবশ্যক নহে কি ?

৫। কায়স্থ পত্রিকা—(বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ,) "প্রার্থনা", "ধর্ম্মতত্ত্ব" "স্ত্রীশিক্ষা" প্রভৃতি প্রবন্ধ অতীব প্রীতিকর ও সদ্‌-ভাবপূর্ণ এবং পত্রিকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিজনক। ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে সমস্তই কায়স্থ লেখক, এরূপ স্বজাতি-প্রীতি আজকাল দুর্লভ ; সুশিক্ষিত সমাজে শাস্ত্রালোচনাই উন্নতির মূল ও আনন্দের বিষয়।

৬। তোষিণী—(বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়) "পৃথিবীর জন্ম-কথা" "সেকেলে কাহিনী" "আফ্রিকার অসভ্যজাতি" "সাধু-সন্ন্যাসী" "ফকির ও রাজা" "দানশীলরাজা" "গদাই চিংড়ীর তীর্থ যাত্রা" ও "তিনটী প্রশ্ন" প্রবন্ধগুলি কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ; কেবলবালক বালিকার নয়,অভিভাবকদেরও শিক্ষার বিষয় আছে।

৭। আর্য্যদর্পণ—(বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়) ইহা ধর্ম্মপিপাসুর সুশীতল উৎস। প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধই পরম পবিত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। ইহা পাঠে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে। "উপদেশসংগ্রহ" "জীবন্মুক্তাবস্থা" "জড়ভরত" উপাখ্যান বেশ সুখপাঠ্য।

৮। জন্মভূমি—(মাঘ) ইহাও ধর্ম্মান্বেষীর গুপ্তরত্ন বিশেষ। "দয়াময় ভগবান্" "হিংসাকি ও হিংসাকেন" "বিশ্বরূপে কালীরূপ" ও "নিয়তির খেলা" প্রভৃতি প্রবন্ধ জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ, শিক্ষায় রত্নখনি।

৯। শাশ্বতী—(বৈশাখ ১ম সংখ্যা) ইহা নূতন হইলেও বৃদ্ধের দাদা; হিন্দুর প্রাণারামের মূলমন্ত্র; কালরূপ-অসদাচারের—পথভ্রষ্ট বিলাস-বাসনা-পূর্ণ অন্ধ পথিকের জ্ঞানদর্পণ! "ধর্ম্ম ও সমাজ" "ধর্ম্মকথা" "সেই আর এই" ও "আত্মগ্লানি" যেমনি সুখপাঠ্য, তেমনি উপদেশে অতুলনীয়।

১০। উৎসব—(আষাঢ়) ইহাও ধর্ম্মের রত্ন-সোপান-স্বরূপ। "মহাত্মা কবিরের সাধনা" "তেমার কথা" "বন্ধন ও মুক্তি" "উৎপাত নিবারণ" ও "মৃত্যুর পরে" প্রত্যেকটী প্রবন্ধই ভক্তযোগীর পরমোপাদেয়।

১১। অর্ঘ্য—(বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ) "ভারত ও মিনার" "সৎসঙ্গ" "ইংরাজের প্রাচীন দণ্ডনীতি" "শঠে শাঠ্যম্" ও "তিনদর্গা" প্রবন্ধ সমূহ বেশ কৌতুকাবহ—সুখপাঠ্য ও প্রীতিপ্রদ।

১২। কুশদহ—(বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়) 'কৃষ্ণার্জ্জুন, ও 'কৃতজ্ঞতা' বিষয় দুইটী বড় বিচিত্রতাব্যঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ। 'কৃতজ্ঞতা'য় প্রকৃত কবিত্ব ফুটিয়াছে। ভগবানকে এমনি জিনিস দিতে হয়।

১৩। 'ফুলের ডালা"—(ক্ষুদ্র পদ্যগ্রন্থ) শ্রীযুক্ত প্রভাত

চন্দ্র মজুমদার বি,এ প্রণীত। এ'কে 'ফুলের ডালা' না বলিয়া "ফুলের অঞ্জলি" বলিলে ভাল হইত না কি? ডালায় বহু ফুল থাকে—বহু প্রকার বাসি ও ছিন্ন ফুল—পূজার অযোগ্য ফুলও থাকে। ইহা ত মুষ্টিমেয় এক অঞ্জলি মাত্র—ফুলগুলিও বেশ স্বদেশী পবিত্র ও নিখুঁত। মধ্যে মধ্যে পদ্ম, গন্ধরাজ, এবং বেলিও দেখিলাম। লেখককে দেখি নাই—লেখা যেন শিশুর মত সরল।

ধর্ম্ম

"ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মো ধরাধারকঃ"

মনীষিগণ বলেন ধর্ম্মের ন্যায় উত্তম বস্তু জগতে আর কিছুই নাই, ধর্ম্মই ধরাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, ধর্ম্ম না থাকিলে জগতের অস্তিত্ব থাকিত না।

ধৃ ধাতুর পর মন্ প্রত্যয় হইয়া ধর্ম্ম শব্দ সাধ্য হইয়াছে; সুতরাং যে পদার্থে মনুষ্যকে ধারণ করিয়া রাখে, যাহা না থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না, তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-হীন মনুষ্য পশুর মধ্যে পরিগণিত, তাই শাস্ত্র বলেন—"ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"।

মহর্ষি মনু এই ধর্ম্মের সাধারণতঃ দশটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

ধৃতি—সন্তোষ, ক্ষমা—অপকারীর প্রত্যপকার না করা, দম—বিষয় সংসর্গ সত্ত্বেও মনের অবিকার, অস্তেয়—চুরি না করা, শৌচ—আহারাদির পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—দৃশ্য শ্রাব্যাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের অনাশক্তি, ধী—শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা—আত্মতত্ত্ব বোধ, সত্য—সত্য ব্যবহার ও সত্যবাক্য প্রয়োগ, অক্রোধ—ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ না করা, ধর্ম্মের লক্ষণ এই দশটী।

মনু বেদার্থের অনুবাদক, সুতরাং মনূক্ত এই লাক্ষণিক ধর্ম্ম বেদপ্রতিপাদ্য। ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমস্ত মানবের সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম; দেশ বিশেষ কি জাতিবিশেষের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। যে মানবে ইহার একটি লক্ষণও নাই, তাহাতে মনুষ্যত্বও নাই, সে মানবাকৃতি পশু, পূর্ব্বেই আমরা একথার উল্লেখ করিয়াছি। মানবীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ যে ধর্ম্মে মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়াছে তাহা মানবমাত্রেরই এক। ক্রোধ, অক্ষমা, অবিবেকতা, চুরি করা, মিথ্যা বলা প্রভৃতিকে সকল দেশের—সকল সম্প্রদায়ের লোকেই অধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং ধর্ম্ম সমস্ত মানবেরই এক, ব্যক্তি কি সম্প্রদায় বিশেষে পৃথক্ পৃথক্ নহে।

এইত গেল সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের কথা—আবার গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" সধর্ম্মে মরণও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর। এখানে আমরা নিজের ধর্ম্ম ও পরের ধর্ম্মকে বিভিন্নরূপে অবলোকন

করিতেছি। এই স্বধর্ম্ম বিধর্ম্ম, জাতীয় ধর্ম্ম সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম নহে।

সৃষ্টির প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। মানব মাত্রের একমাত্র সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম ছিল। জাগতিক কার্য্যের সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত গুণকর্ম্মভেদে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইলে এক এক জাতির এক এক রকম ধর্ম্ম নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যথা, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—যুদ্ধ বিগ্রহাদি, বৈশ্যের ধর্ম্ম—কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, পশুপালনাদি; ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে।

রুচি অনুসারে ধর্ম্ম সাধনের প্রণালীভেদেও আর এক রকম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম দেখা যায়। যথা—হিন্দুধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ন্যায় ব্যক্তিগত ধর্ম্মও সকল দেশে প্রচলিত। যথা, পিতার ধর্ম্ম, মাতার ধর্ম্ম, পুত্রের ধর্ম্ম, রাজার ধর্ম্ম, প্রজার ধর্ম্ম, নারীর ধর্ম্ম, পতির ধর্ম্ম প্রভৃতি

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি পুরাকালে সমস্ত মানবের একমাত্র সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম ছিল। সেই মূল ধর্ম্ম হইতে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের বংশ বৃদ্ধি পাইয়া আজকাল পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে। ধর্ম্মের জ্বালায় লোক অস্থির, কখন কে কোন্ ধর্ম্মের হাতে পড়ে, কোন্ ধর্ম্ম কাহাকে ভুলাইয়া নিয়া যায়, তাহার স্থিরতা নাই।

যে বস্তু যত অধিক, তাহার সমাদর তত অল্প; সুতরাং ধর্ম্মের গৌরব কমিয়া গিয়াছে। আজকাল অনেকেই আর ধর্ম্মের ধার ধারে না, অনেকের নিকট ধর্ম্ম অগ্রাহ্য। ধর্ম্মের সে দিন নাই, গ্রাহক নাই, সেরূপ আমল দখল নাই, ধর্ম্মের দল এখন অবসর পাইয়া নিদ্রিত। আর জাগেন কিনা সন্দেহ, জাগিলেও আর কাজ চালাইতে পারেন কিনা সন্দেহ। যাঁহারা ধর্ম্মে অনুরক্ত, তাঁহারা বলিতেছেন—হায় হায় ধর্ম্ম বুঝি আর জাগিল না; যাঁহারা ধর্ম্মে বিরক্ত, তাঁহারা বলিতেছেন—হায় হায় এই ধর্ম্মপঙ্গপালের জ্বালায় ভারত আর জাগিল না।

যিনিই যাহা বলুন না, ধর্ম্ম কিন্তু দ্বারে দ্বারে দাঁড়াইয়া কান্দিতেছেন, কেহই আর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে না।

কথাটা একটু উদাহরণ দেখাইয়া বলিতেছি, সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের ক্ষমা ধৃতি ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদি বহুদিন হইতে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে। অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা অশ্বডিম্বের ন্যায় একটা কথামাত্র রহিয়াছে। আজকাল চুরি না আছে এমন ব্যবসা নাই, এমন কাজ নাই। গভর্ণমেণ্টের আফিসে, জমীদারী সেরেস্তায়, দোকানীর দোকানে, শিল্পীর শিল্পালয়ে, যে দিকে তাকাও সেই দিকেই চুরির অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হইবে না। এমন কি, উপযুক্ত দক্ষিণা না পাইলে পুরোহিত ঠাকুরও মন্ত্র চুরি করিয়া থাকেন। গুরুদেবের তো কথাই নাই, শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ"।

আমি একজন পণ্ডিত গুরুঠাকুরকে দেখিয়াছি, তিনি শিষ্য-বাড়ী গিয়া আমার সাক্ষাতেই শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা! চাকুরিতে দশ বিশ টাকা উপরি 'আয় আছে ত, না হইলে কি শুধু বেতনে কুলায়। অর্থাৎ ১০।২০ টাকা চুরি করিতে পার কি না। চুরি করিতে না পারিলে গুরুঠাকুরেরও উপযুক্ত প্রণামীর আশা নাই, শিষ্যেরও সুখের আশা নাই, তাই ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বাগ্রেই চুরির সুবিধা আছে কি না জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

কি সর্ব্বনাশ! যিনি সত্যপথের প্রদর্শক, জ্ঞানাঞ্জনদ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার পাত্র, তিনি জ্ঞান-বিবেকের কথা, মন্ত্র-সিদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রথমেই চুরির কথার অবতারণা করিলেন। তখনই বুঝিলাম চুরি সর্ব্বত্র বিরাজিত; তাই চুরির কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা নাই, উত্তর দিতেও লজ্জা নাই।

যাহারা নামজাদা চোর, তাহারা নিশি সময় লোকের অজ্ঞানাবস্থায় চুরি করিয়া থাকে, আর যাঁহারা ফিকিরী চোর, তাঁহারা দিবালোকে লোকচক্ষুর সাক্ষাতে চুরি করিয়া থাকেন। বড় চোর কে—তাহা সহজেই অনুমেয়।

সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের আর একটী লক্ষণ 'সত্য'। এই সত্য ব্যবহার ও সত্যবাক্য জগতে নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইতে পারে না। যিনি সরল ও সত্যবাদী, তিনি সমাজে অকর্ম্মণ্য নির্ব্বোধ বলিয়া পরিচিত। যিনি সত্য গোপন

করিতে পারেন, মিথ্যা কথায় সমাজের চক্ষে ধূলি দিয়া লোক ঠকাইতে পারেন, তিনি চতুর চালাক বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত। মিথ্যা আজকাল জগৎ গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। যে দিকে তাকাও সেই দিকেই মুখে, কাগজে কলমে, ব্যবহারে মিথ্যার ছড়াছড়ী দেখিতে পাইবে।

হোটেলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, * ঔষধালয়ে অকৃত্রিম ঔষধ, † চিনির সিরায় পদ্মমধু, সর্পাদির বিষময় চর্ব্বিতে বিশুদ্ধ ঘৃত প্রভৃতির বিজ্ঞাপন এবং মেকী পুস্তকে আত্মীয় এডিটারের বাহবা, সর্ব্বদাই মিথ্যার জয় ঘোষণা করিতেছে।

সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের আর একটী লক্ষণ 'শৌচ', অর্থাৎ আহারাদি বিষয়ে পবিত্রতা। এই শৌচও এখন ম্রিয়মাণ। মুখপ্রক্ষালন নাই, পদপ্রক্ষালন নাই, পাদুকা পরিত্যাগ নাই, খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, রাত্রিদিন কুস্থানে অস্থানে অদ্ভুত আহার চলিতেছে। শৌচ কেবল পায়খানায় যাওয়ার পরেই আছে। সাহেবী চালচলনে তাহাও বোধ হয় অধিক দিন থাকিবে না।

শ্রুতি বলেন—মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি। কখনও কোনও

---

* গাঁজাখোর গুলিখোর মাতাল কুস্থানগামী আচারহীন ব্রাহ্মণ হোটলের পাচক। সেই হোটেলেরই দ্বারে লেখা "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল"।

† আজকাল সম্প্রদায়ের অকৃত্রিম ঔষধগুলি অনেকেই বোধ হয় চিনিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহা মনুষ্যকৃত তাহারই নাম কৃত্রিম। ঈশ্বর-নির্ম্মিত বৃক্ষ লতা ফল মূলাদি ঔষধগুলিই অকৃত্রিম, মানুষের চেষ্টা যত্ন কৃত ঔষধ কখনও অকৃত্রিম হইতে পারে না; সুতরাং এস্থলে ডবল মিথ্যা ব্যবহার হইতেছে।

প্রাণীর হিংসা করিবে না। এই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম সকল দেশে সকল জাতির স্বীকৃত, বহুদিনের চর্চ্চা, আন্দোলন, আলোচনায়, ঘষায় মাজায় অহিংসার অকার ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে। এখন কেবল হিংসা মাত্র আছে।

ধন মান বিত্ত পশাব বাড়ীঘর নিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র হিংসা বৃত্তি চলিতেছে। খুন জখমী বিবাদ বিষম্বাদ প্রতিদিন পূর্ব্ববঙ্গে বিরাজিত। পশ্চিমবঙ্গে কি নাই? সে খানেও আছে, তবে এত না। কলিকাতায় কষাই কালী আছেন, পূর্ব্ববঙ্গে কেবলই কষাই। যাঁহারা বৃথা মাংস খান না, তাঁহারা কষাই কালী বাড়ীর প্রসাদ নিয়া আসেন।

শাস্ত্র বলেন—দেবতা উদ্দেশে ও যজ্ঞে বধ করিলে তাহা বধই নয়, সুতরাং কষাই কালীবাড়ীর বধে জীবহিংসা হয় না। এদিকে আবার ডিঃ গুপ্ত মহাশয় পথ্যবিধানে জীবিত মৎসের ঝোল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এ অতি সুন্দর ব্যবস্থা, মাছের ঝোলও খাওয়া যায় অথচ প্রাণিহিংসাও হয় না; সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে হিংসাবৃত্তি পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষায় অল্প। কিন্তু হিংসার অগম্য স্থান জগতে কোথাও দেখিতে পাই না। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আরও অধঃপাতে গিয়াছে। ব্রাহ্মণাদি জাতির এখন আর সে গুণ নাই, ক্রিয়া নাই, বৃত্তি নাই, আচার নাই, জাতিভেদের কারণ কিছুই নাই; ইহারা এখন সামাজিক ব্রাহ্মণাদিরূপে পরিগণিত।

ব্যক্তিগত ধর্ম্মই বা এখন কোথায়, সেই পিতৃভক্তি নাই,

মাতৃভক্তি নাই, গুরুভক্তি নাই, আছে কেবল অপরিমিত স্বেচ্ছাচার। পুত্র পিতার নিকট স্বাধীন, শিষ্য গুরুর নিকট স্বাধীন, ভৃত্য প্রভুর নিকট স্বাধীন ; সকলেই এখন স্বরাট, কেহ কাহারও বশীভূত হইতে চায় না। সকলেই যেন স্বেচ্ছাচারের বশীভূত। অনেকে বলেন এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বলে ভারত একদিন উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিবে। আবার আর একদল বলেন অত্যুন্নতিই পতনের কারণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় উন্নতির আশা করিলে ভারত অধঃপাতের চরম সীমায় উপস্থিত হইবে। যিনিই যাহা বলুন আর যিনিই যাহা করুন, কিন্তু 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" ইহা ধ্রুবসত্য। ধর্ম্ম ভিন্ন জয় নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই, মঙ্গল নাই, ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে স্বীকৃত।

যতদিনে সত্যের আদর না হইবে, যতদিনে হিংসাবৃত্তি দূর না হইবে, যতদিনে চৌর্য্যবুদ্ধি না ঘুচিবে, যতদিনে শৌচ ক্ষমা ধৈর্য্য ইন্দ্রিয় সংযম না হইবে, যতদিনে কর্ত্তব্যপরায়ণতা বুদ্ধি না হইবে, ততদিন ভারতের দুর্গতি দুরবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। ধর্ম্ম আত্মগত বস্তু, আত্মসংযম আত্মপবিত্রতা ধর্ম্ম রক্ষার কারণ। ফোঁটা মালা শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বরে কখনও ধর্ম্মরক্ষা হয় না। "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং", যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করে ধর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম ত্যাগে আত্মরক্ষাই হয় না, সুখ শান্তি আর হইবে কিরূপে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

লক্ষ্মণ।

রামানুজ লক্ষ্মণের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভক্ত দৃঢ়-সংযম সর্ব্ব-সদ্‌গুণ-সম্পন্ন বীর-পুরুষ জগতে অতি দুর্লভ। মহাত্মা লক্ষ্মণের দেহে কখনও কোনও প্রকার দোষ প্রকাশ পায় নাই। বরং রামচন্দ্রেরও কখন কখন আত্মবিভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু লক্ষ্মণের বিবেক চিরনির্ম্মল—পরম পবিত্র। মায়ামৃগ বা সতী-সীতার চরিত্রে রামচন্দ্রের চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়াছিল, লক্ষ্মণের তাহাও হয় নাই। রামচন্দ্রও যে ইন্দ্রজিৎ বধে অক্ষম ছিলেন, লক্ষ্মণ তাহাকে সম্মুখ সমরে বিনাশ করিয়া অক্ষয় বীরত্ব ও অসীম কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। অগস্ত্য বলিতেছেন,—

"ইন্দ্রজিৎ বড় বীর লঙ্কার ভিতরে।
ইন্দ্র বেঁধে এনেছিল বিষম সমরে॥
মেঘের আড়ালে থেকে যুঝে অন্তরীক্ষে।
মেঘনাদ সমান বাণের নাহি শিক্ষে॥
তাহারে করিল বধ ঠাকুরলক্ষ্মণে।
লক্ষ্মণ সমান বীর নাই ত্রিভুবনে॥"
রাম কন কি কহিলে মুনি মহাশয়।
মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণ দুর্জ্জয়॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব রণে নাহি ধরে টান।
হেন রাবণেরে ছেড়ে ইন্দ্রজিতের বাখান॥

অগস্ত্য বলেন রাম কহি তব ঠাঁই।
ইন্দ্রজিৎ সমবীর ত্রিভুবনে নাই॥
চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন।
চৌদ্দবষ স্ত্রীমুখ না করে দরশন॥
চৌদ্দবর্ষ যেই বীর আছে অনাহারে।
ইন্দ্রজিৎ বধিবারে সেই জন পারে॥"

তৎপর লক্ষ্মণের এই সব পরীক্ষা করা হইল; লক্ষ্মণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। লক্ষ্মণ সম্মুখ-সমরেই ইন্দ্রজিৎকে নিধন করিয়াছেন, কৃত্তিবাস বলিতেছেন,—

"বিভীষণ-বচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান।
ইন্দ্রজিৎ কাছে গেল পূরিয়া সন্ধান॥
দুজনে দেখিয়া বাণ জুড়ে দুই জনে।
দুজনে পড়িল ঢাকা দুজনের বাণে॥
চারি দিকে পড়ে বাণ নাহি লেখা জোখা।
দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥
লক্ষ্মণ অশক্ত হন প্রহারের ঘায়।
ব্রহ্মা বলে পুরন্দর করহ উপায়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পুবন্দর করিলেন দান।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্ম অস্ত্রে পূরিল সন্ধান॥
বাণেরে বুঝায়ে কয় ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ব্রহ্মা ভাবি ব্রহ্মা তোমা করিলা সৃজন॥

যদি রঘুনাথ হ'ন বিষ্ণু অবতার।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার॥
এত বলি ব্রহ্ম-অস্ত্র করিলা সন্ধান।
অস্ত্র দেখি মেঘনাদের উড়িল পরাণ॥
জাঠা জাঠি কত অস্ত্র এড়ে কাটিবারে।
লোহার পাবড়া মারে অস্ত্র নাহি ফিরে॥
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান।
মেঘনাদের মাথাকাটি করে দুইখান॥
পড়িল সে ইন্দ্রজিৎ সংগ্রাম ভিতরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে॥
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় বলি কপি ছাড়ে সিংহনাদ॥"

রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

কবি কৃত্তিবাস অল্পক্ষণের যুদ্ধেই লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎকে নিধন করিলেন। কবিবর বাল্মীকি মুনি বহু যুদ্ধের পর ঘোর নিশিতে উভয়ের যমদণ্ড বাণযুগল ভগ্ন করাইয়া শেষে ইন্দ্র-প্রদত্ত ইন্দ্রবাণে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিলেন। উভয়েই সম্মুখ-সমরে ইন্দ্রদত্ত বাণে ইন্দ্রজিৎ বধ বলিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ-চরিত্রে বিন্দুমাত্রও দোষ লক্ষিত হয় নাই, বরং ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে কটূক্তি ও বহু ভৎর্সনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণের বদন হইতে কোনও প্রকার কর্কশ বাক্যও নির্গত হয় নাই। কবিগুরু বাল্মীকি অতি পরিষ্কার ভাবে যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন।

তবে সেদিন মেঘনাদ, যজ্ঞসম্পাদনজন্য যুদ্ধস্থল হইতেই যাইতেই পারে নাই; লক্ষ্মণ তাহাকে যজ্ঞসম্পাদনে যাইতে সময় দেন নাই। ধর্ম্মের বিঘ্ন না হইলে ভক্তের—ধার্ম্মিকের বিঘ্ন জন্মিতে পারে না। নল রাজ, শ্রীবৎস রাজ, ঘোর দৈত্য, এমন কি দেবতাদেরও প্রথমতঃ ধর্ম্মনষ্ট হইয়া পরে শরীরে পাপ প্রবেশ করায়, অনিষ্ট উৎপাদন হইয়াছে; শাস্ত্র তাহার ভূরি ভূরি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এখনও দেখিতে পাই, দৈবকার্য্যে বিঘ্ন জন্মিলে হঠাৎ বিপদ্ উপস্থিত হয়। কে না ইহার পরীক্ষা করিয়াছেন? যদি লক্ষ্মণে দোষ থাকে, তবে একমাত্র তিনি ইন্দ্রজিৎকে যজ্ঞার্থে বিদায় দেন নাই। প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রজিৎও বিদায় প্রার্থনা করে নাই। ইহাতে লক্ষ্মণের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে না; কিন্তু কবিবর মাইকেল তাঁহার "মেঘনাদবধ কাব্যে" লক্ষ্মণ-চরিত্র অন্যভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন পাঠক মহোদয়গণ তাহাও দেখুন। এখানে মেঘনাদ নিরস্ত্র, কোশাকুশিদ্বারা লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণ আততায়ীর ন্যায় অসিদ্বারা ইন্দ্রজিৎকে ছেদন করিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাল্মীকির অনুকরণ হয় নাই; যজ্ঞকুণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র নয়। মাইকেল বলিতেছেন,—

কহিলা বাসবজেতা—(অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্তশূরে—শূরতপ্ত লৌহাকৃতি
রোষে) ক্ষত্রকুল-গ্লানি শতধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয়-সমাজে

রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়। শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ! তস্কর সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি।
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে?
পামর! কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি?
চক্ষের নিমিষে কোশা তুলি ভীম বাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে।

* * *

বহিল রুধিরধারা—ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ—নারিলা তুলিতে।
তাহার কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ। সাপটিলা কোপে।"

* * *

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।

* * *

শঙ্খ ঘণ্টা উপহার পাত্র ছিল যত,
যজ্ঞাগারে একে একে নিক্ষেপিলা কোপে।

* * *

ত্যজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ। ঝলসিয়া ফলক আলোকে।
নয়ন! হায়রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরহরি কাঁপিলা বসুধা॥"

*　　*　　*

এক্ষণে আমরা বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড (৮৭—৯১ সর্গ) হইতে মূল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ করিতেছি। লক্ষ্মণের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া লউন।

বিভীষণ সহ লক্ষ্মণ সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বলবান্ রাবণাত্মজ কবচ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক ধ্বজশোভী অনলোজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, তখন তিনি বিভীষণের উপদেশে বলিলেন, "আমি তোমাকে সমরে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর।"

"সরথেনাগ্নিবর্ণেন বলবান্ রাবণাত্মজঃ।
ইন্দ্রজিৎ কবচী খড়্গী সধ্বজঃ প্রত্যদৃশ্যত॥
তমুবাচ মহাতেজাঃ পৌলস্ত্যমপরাজিতম্।
সমাহ্বয়েত্বাং সমরে সম্যগ্যুদ্ধং প্রযচ্ছমে॥

(বাঃ রাঃ ৮৭ সর্গ)

তখন ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে দেখিয়া কর্কশ বাক্যে তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। তৎপর বিভীষণের বাক্যে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ-অশ্বসঞ্চালিত

অলঙ্কৃত সুমহৎ রথে আরোহণ করিয়া বেগবান্ সুমহৎ বিপুল ভীষণ ধনু এবং শত্রুবিদারণ বাণ সকল লইলেন। পরে লক্ষ্মণাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,“অদ্য তোমরা আমার বিক্রম দেখ, আমার ধনু হইতে বিনির্গত অসহ্য বাণধারা বর্ষণ সহ্য কর; অগ্নি যেমন তূলারাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ অদ্য আমার সুমহৎ কার্ম্মুক হইতে বিনিঃসৃত বাণসমূহ তোমাদের দেহ বিদীর্ণ করিবে। অদ্য তীক্ষ্ণ শূল, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ ও অন্যান্য বাণসমূহ দ্বারা তোমাদিগকে যমপুরে পাঠাইব ইত্যাদি।”

“অদ্য মৎ কার্ম্মুকোৎসৃষ্টং শরবর্ষং দুরাসদম্।
মুক্তবর্ষমিবাকাশে ধারয়িষ্যথ সংযুগে॥
অদ্য বো মামকা বাণা মহা কার্ম্মুকনিঃসৃতাঃ।
বিধমিষ্যন্তি গাত্রাণি তূলারাশিমিবানলঃ॥
তীক্ষ্ণসায়কনির্ভিন্নান শূলশক্ত্যৃষ্টিপট্টিশৈঃ।
অদ্য বো গময়িষ্যামি সর্ব্বানেব যমক্ষয়ম্॥”

(বাঃ রাঃ ৮ অঃ)

* * *

রাত্রিযুদ্ধে তদা পূর্ব্বং বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ।
শায়িতৌ তৌ ময়া ভূয়ো বিসংজ্ঞৌ সপ্লবংসবৌ॥

(বাঃ রাঃ ৮৮অঃ)

ইন্দ্রজিতের বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ বলিলেন,—“রাক্ষস, তুমি কেবল কথায় কঠিন কার্য্যের শেষ করিলে বটে, কিন্তু যিনি কার্য্য দ্বারা দুর্গম পারে গমন করিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্।

তুমি পূর্ব্বে রণমধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা বীরগণের অনুমোদিত নহে; চোরে সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ওহে রাক্ষস! বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? যেরূপ আমি তোমার বাণমুখে অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ তুমিও সম্মুখরণে তোমার পরাক্রম দেখাও।"

উক্তশ্চ দুর্গমঃ পারঃ কার্য্যাণাং রাক্ষস ত্বয়া।
কার্য্যাণাং কর্ম্মণা পারং যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্॥
স ত্বমর্থস্য হীনার্থো দুরবাপস্য কেনচিৎ।
বাচা ব্যাহৃত্য জানীষে কৃতার্থোঽস্মীতি দুর্ম্মতে॥
অন্তর্দ্ধানগতে নাজৌ যত্ত্বয়া চরিতস্তদা।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈব বীর নিষেবিতঃ॥
যথা বাণপথং প্রাপ্য স্থিতোঽস্মি তব রাক্ষস।
দর্শয়স্বাদ্য তত্তেজো বচোত্বং কিং বিকত্থসে॥

(বাঃ রাঃ ৮৮ অঃ)

"লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণে মহাবল ইন্দ্রজিৎ প্রকাণ্ড ধনু-র্বিস্ফারণপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সর্পবিষসদৃশ মহাবেগবান্ বাণসমূহ লক্ষ্মণের গাত্রে পতিত হইয়াই মন্ত্রদ্বারা রুদ্ধবীর্য্য সর্প যেমন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পতিত হয়, সেইরূপ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বেগবান্ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ মহাবেগশালী বাণসমূহ দ্বারা সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলে, লক্ষ্মণ শরনিকরে সমাচ্ছন্নদেহ ও

শোণিতাক্ত শরীর হইয়া হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন” (১৭—২০ শ্লো ৮৮ অঃ)। তখন ইন্দ্রজিৎ স্বীয় কর্ম্ম দেখিয়া মহা গর্জ্জন করত গর্ব্বিতভাবে বলিলেন,—“সৌমিত্রে! অদ্য আমার কার্ম্মুকবিনির্গত প্রাণান্তকারী তীক্ষ্ণধার শর-নিকরে তোমার জীবন নাশ হইবে। অদ্য আমার হস্তে তুমি নিহত হইলে শৃগাল, শকুনি ও শ্যেনগণ তোমার উপরে পতিত হইবে। পরম দুর্ম্মতি ক্ষত্রিয়াধম অনার্য্য রাম, অদ্যই দেখিবে যে, তাহার ভক্ত ভ্রাতা তুমি আমার হস্তে নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছ। সৌমিত্রে! অদ্য তুমি আমা কর্ত্তৃক নিহত হইলে, রাম দেখিবে তোমার কবচ বিধ্বস্ত, শরাসন ছিন্ন এবং মস্তক অপহৃত হইয়াছে।” (২১—২৫ শ্লোঃ) তৎপরে লক্ষ্মণ এই বলিয়া—

অনুক্ত্বা পরুষং বাক্যং কিঞ্চিদপ্যনবক্ষিপন্।
অবিকত্থন বধিষ্যামি ত্বাং পশ্য পুরুষাধম॥” (২৯)

অর্থাৎ হে পুরুষাধম! আমি বৃথা আত্মশ্লাঘা বা কাহারও নিন্দা না করিয়া বা কর্কশ বাক্য না বলিয়াই তোমাকে নিধন করিতেছি।” তৎপর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবল বীরদ্বয় মেঘের বারিবর্ষণের তুল্য বাণ বর্ষণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। (৩০—৩৭ শ্লোঃ অঃ ৮৮)।

এই প্রকারে বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়া উভয়ের শর নিবারণ করত মুহুর্ম্মুহুঃ নিশ্বাস সহকারে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বহুক্ষণ

শাণিত শরদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরস্পরের শরীর বিদ্ধ করায় উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন ও রক্তাক্ত হইল। যুদ্ধবিশারদ সেই ভীমবিক্রম মহাত্মাদ্বয় বিজয় লাভের জন্য যত্নবান্ হইয়া পরস্পর পরস্পরের দেহ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ধ্বজ ও কবচ ছিন্ন হইল। প্রস্রবণ হইতে যেরূপ বারিধারা নির্গত হয়, সেইরূপ শরসমাকীর্ণ উভয়ের গাত্র হইতে উষ্ণ রুধির নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে নীলবর্ণ কালমেঘগণের বারিধারা বর্ষণের ন্যায় ভীমশব্দকারী ঘোরতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিলেন, কেহই ক্লান্ত হইলেন না। নিশা উপস্থিত হইল। (৮৯ অঃ ১—৩৩ শ্লোক) যজ্ঞক্ষেত্রে প্রদীপ্ত অগ্নিদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে যেরূপ কুশরাশি পড়িয়া থাকে, তদ্রূপ সেই ঘোরতর যুদ্ধে সেই বীরদ্বয়ের চারিদিকে বাণ সমূহ পড়িয়া রাশি প্রমাণ হইয়া গেল। (৮৯—৯০ অঃ) কবীন্দ্র বাল্মীকি তিন অধ্যায়-ব্যাপী তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। কখন কখন ইন্দ্রজিৎ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহার মূর্চ্ছিতাবস্থায় বাণ নিক্ষেপ করেন নাই। বীরবর ইন্দ্রজিৎও এত ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাঁহার রথ নষ্ট হই-হইলে, মুহূর্ত্তে অন্যরথ আনয়ন করিলেন; লক্ষ্মণ তাহা লক্ষ্যই করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রজিৎ একাই সারথি ও রথীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের সুশিক্ষিত অশ্বগণও সারথি ব্যতীত আপনা আপনি যুদ্ধপরিচালনে সমর্থ ছিল।

উভয় বীরের শিক্ষা, রণপাণ্ডিত্য, শরসন্ধান, পরাক্রম, লক্ষ্যনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই প্রভেদ ছিল না। এক সময়ে লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ উভয়ে বিশ্ব-সংহারকারী ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুঃসহ দুর্জ্জয় একটি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধনু হইতে বিচ্যুত বাণযুগলপ্রভায় আকাশ আলোকিত করত পথি মধ্যে মুখামুখি আঘাত করিয়া পরস্পর সমাহত মহাগ্রহের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। শর দুইটি রণমধ্যে বিফল হইল দেখিয়া লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ উভয়েই লজ্জিত ও কুপিত হইলেন। তখন সুমিত্রানন্দন ক্রোধভরে বরুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়া যেন সমস্ত লোককে নাশ করিতে উদ্যত হইলেন। লক্ষ্মণ সৌর্য্যাস্ত্র দ্বারা প্রশমিত করিলেন। অস্ত্র নিবারিত হইল দেখিয়া, ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুবিদারণ শাণিত আসুরিক বাণ গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই বাণ লইবামাত্র তদীয় ধনু হইতে প্রভাবিশিষ্ট কূট, মুদ্গর, শূল, ভুশুণ্ডি, গদা, খড়্গ এবং পরশু সকল বহির্গত হইতে লাগিল। বীরবর লক্ষ্মণ সর্ব্বভূতের অবার্য্য সেই নিদারুণ অস্ত্রকে মহেশ্বর-অস্ত্রে নিবারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে ভূত, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেব, ঋষি ও পিতৃগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন, পরে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ বধ করিবার জন্য একটি উৎকৃষ্ট বাণ লইলেন। ইহার পর্ব্ব ও পত্র অতি সুন্দর, উহা অনুক্রমে

বর্ত্তুল, স্বর্ণমণ্ডিত, আশীবিষ সর্পের বিষের মত ইহার বেগ অসহ্য, উহা রাক্ষসগণের প্রাণান্তকর, ইন্দ্রজিতের কালস্বরূপ। দেবগণ উহার পূজা করিতেন, পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামে মহাতেজস্বী ইন্দ্র উহারই সাহায্যে দৈত্যজয় করিয়াছেন। ঐ অস্ত্রের নাম ঐন্দ্র, উহা যুদ্ধে কখনও ব্যর্থ হয় নাই। লক্ষ্মীবান্ সৌমিত্রি ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া বাণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—দাশরথি রাম যদি সত্যবাদী এবং পৌরুষবিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাহা হইলে তুমি রাবণিকে বিনাশ কর। বীর লক্ষ্মণ এই বলিয়া, ঐন্দ্র অস্ত্রকে আকর্ষণ করিয়া রণমধ্যে ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্রজিতের কিরীটকুণ্ডলাবৃত সুচারু মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

"শরশ্রেষ্ঠং ধনুঃশ্রেষ্ঠে বিকর্ষন্নিদমব্রবীৎ।
লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণো বাক্যমর্থসাধকমাত্মনঃ॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
পৌরুষে চা প্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্॥
ইত্যুক্ত্বা বাণমাকর্ণং বিকৃষ্য তমজিহ্মগম্।
লক্ষ্মণং সমরে বীরঃ সসর্জ্জেন্দ্রজিতং প্রতি॥
তচ্ছিরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।
প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে॥

(বাঃ রাঃ, লঃ ৯১ অঃ)

পাঠক মহোদয়গণ! এক্ষণে বুঝিলেন ত? লক্ষ্মণ সম্মুখ-

সমরে—যুদ্ধক্ষেত্রে—আপনার ধর্ম্মানুশাসনে মহা তেজস্বী ইন্দ্রজিৎকে নিধন করিলেন। সং—

ধর্ম্মসার বা "ধর্ম্মে বিপত্তি"র প্রতিবাদ।

"আহার-নিদ্রা-ভয় মৈথুনঞ্চ,
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো,
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

ধর্ম্মই মানবত্বের বিধায়ক ; তদভাবে মানব পশুসদৃশ। হায়! আজ কাল-মাহাত্ম্যে সেই "ধর্ম্মই বিপত্তি"জনক শুনিতে হইল ; জানি না, ভগবান্ আরও কি শুনাইবেন। সুকেশী নামক এক রাক্ষসও সংশয়ান্বিত হইয়া মুনিগণকে ধর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মুনিগণ বলিয়াছিলেন—

"শ্রেয়োধর্ম্মঃ পরে লোকে ইহ চ ক্ষণদাচর।
তস্মিন্ সমাশ্রিতে সৎসু পূজ্যস্তেন সুখী ভবেৎ॥"

(বামন পুঃ ১১ অঃ)

'হে নিশাচার! একমাত্র ধর্ম্মই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকর, ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেই লোক সাধু সমাজে পূজিত হয় এবং ধর্ম্মদ্বারাই সুখসমৃদ্ধি সংঘটিত হয়।'

পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া তাহার উপকারিতা বা অপকারিতা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বিবেচকের কার্য্য নহে। অনেক নাস্তিক ঈশ্বর বা পরলোক স্বীকার করে নাই, কিন্তু ধর্ম্ম ভিন্ন পদার্থের সত্তা স্বীকার করিতে পারে নাই। ঐ যে আকাশ দেখ, ইহারও একটী ধর্ম্ম আছে, তাহা শব্দ; এইরূপ তেজের ধর্ম্ম রূপ, ক্ষিতির গন্ধ, জলের ধর্ম্ম রস, বায়ুর স্পর্শই ধর্ম্ম; ধর্ম্মছাড়া কিছুই নাই, কিছু হইতেও পারে না, থাকিতেও পারে না। যে কোনও পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তাহাদের সমস্তই ধর্ম্মের সহিত সমবেত। তবে বিভিন্ন জীবের ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকার।

"আমাদের বিবেক বলিয়া দিবে চুরি করা অন্যায়— ধর্ম্ম না থাকিলেও বিবেক আছে;" ইত্যাদি বাক্য যিনি লিখিতে পারেন, তাঁহাকে বুঝানো বড়ই মুস্কিল। ধর্ম্ম ও বিবেককে যে পৃথক্ করিতে পারে, ধর্ম্মছাড়া চুরি করিতে নিষেধকারী অন্য কেহ আছে, এই যাহার ধারণা, সেই "ধর্ম্মে বিপত্তি" লিখিবার যোগ্য। ধর্ম্মবিশেষের উপর চার্ব্বাক্, কালা পাহাড় প্রভৃতি বহু ব্যক্তি আঘাত করিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহারাও এরূপ অতি সাহসিক বাক্য ঘোষণা করিতে পারে নাই। লেখক ধর্ম্মকে যেন একটী ক্ষুদ্র মনোবৃত্তি বা সামান্য একটী জিনিষ মনে করেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সম্বলিত দেহ, দেহ হইতে সকল ইন্দ্রিয়েরই উদ্ভব। যেরূপ দেহ ছাড়িয়া ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না, তদ্রূপ ধর্ম্ম ছাড়িয়াও সদগুণনিচয় থাকিতে পারে না।

ধর্ম্মই সকলের ভিত্তি, ধর্ম্মই সকলের মূল, ধর্ম্মই সকলের ঈশ্বর।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ (মনু)

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। তা ছাড়া অহিংসা, অদ্রোহ, অচাপল্য, অলোভ, ভূতে দয়া, নীতি, তপঃ, ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম এগুলি ধর্ম্মের মূল। সুতরাং এসবকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার আর কি থাকিবে? মানব ত শ্রেষ্ঠ জীব; জগতের কিছুই ধর্ম্মছাড়া নয়। ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া মানব স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিবে, ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? বাস্তবিক ধর্ম্ম দ্বারাই একথা প্রতিপন্ন হয়। ধার্ম্মিক মানব সর্ব্বভূতে আত্মবৎ দর্শন করেন; অত্যধিক পরিমাণে সমাজে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত প্রাণিবর্গের মধ্যেই একত্ব সম্পাদিত হইবে, কখনও বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। এই ধর্ম্মই কি জন-সমূহকে পোষণ ও ধারণ করিতেছে না? পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে যে ধর্ম্মের অর্থ "যাহা ধারণ করিয়া আছে তাহাই ধর্ম্ম" উক্ত হইয়াছিল, ইহাই প্রকৃত সত্য। তবে ধর্ম্মকে দেখাইয়া দিবার কিছুই নাই, জ্ঞান দ্বারাই তাহা বুঝিতে হয়। চক্ষে ত পোণে ষোল আনা জিনিষই দেখিতে পাই না। এই যে এক জনের নামটী "কিরীটিমোহন" ইহা কি কেহ দেখিতে পায়? ইহা কি দেখার জিনিষ? অথচ এইনামের উপরই তিনি আজীবন

নির্ভর করিতেছেন, তবুও ইহার সত্তা উপলব্ধি হইতেছে না— আপনার দেহের সহিত নামের যোজনা থাকিলেও দেহের সঙ্গে সঙ্গে নাম ভস্ম হইবে না। এই নাম বহু দেহ আশ্রয় করিতে পারিবে, কিন্তু কাহারও অঙ্গে লিপ্ত হইবে না। ঠিক এই প্রকার ধর্ম্মের রহস্য বড় নিগূঢ়। ধর্ম্মই আপনার মনোবৃত্তি সমূহ অধিকার করিয়া আছে, ধর্ম্মই আপনাকে ঘোর কঠোর শাসন করিয়া সুপথে টানিয়া রাখিয়াছে; ধর্ম্মই আপনাকে অগাধ বিদ্যার অধিকারী করিয়াছে, ধর্ম্মই আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি দিবা পরিভ্রম করিয়া চৌর্য্যাদি কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি করিতেছে; কিন্তু তাহাকে উপলব্ধি করা বড় কঠিন। তবে তাহার লক্ষণ দিয়া ঠিক করিতে হয়। আগে মানুষ, পরে নাম; আগে লক্ষণ, পরে ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের জন্য কেহ কেহ প্রাণ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু ধার্ম্মিকগণ কাহারও প্রাণহরণ করেন নাই। মহাত্মা যিশু আত্মীয়বর্গের ন্যায় প্রাণ-হন্তাদের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরসন্নিধানে প্রার্থনাই করিয়াছেন। এ উদাহরণ অন্যে সম্ভবে না! ধর্ম্মপ্রাণ যিশুই একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল। মৃত্যু সকলেরই হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য যে মৃত্যু তাহা মৃত্যু নয়, সে মৃত্যু মরকে অমর করিয়া রাখে। ইহা কি ধর্ম্মের কৃপা নহে? ধর্ম্মই মৃতকে অমর করে, বিষকে অমৃত করে; জীবকে শিব করে; তাই বলি "ধর্ম্মই সার"।

দ্বিতীয় কথা "বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও ধর্ম্মসম্মত"

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সৌরভের প্রবন্ধ লেখক রাসন্তিক

সৌরভের মনোহর সৌরভ উপভোগ করেন নাই ; যদি সৌরভ-পরিমল সেবন করিতেন, তবে "চন্দ্রালোকে" দেখিতে পাইতেন "বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বা ধর্ম্মসম্মত নহে।"

সম্পাদক মহাশয়ের আদেশানুসারে প্রতিবাদটী প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিন্ন্যূনই করা গেল। (১)

শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন।

চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ ও আদিনাথের ন্যায় এরূপ প্রকৃতির বিচিত্ররূপ-সম্পন্ন স্থান অতি বিরল। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতশিখরে, আদিনাথ সমুদ্রগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপোপরি। চন্দ্রনাথের একদিকে অসীম অনন্ত বিশাল সমুদ্র, অপর দিকে আকাশস্পর্শী বৃক্ষরাজি-

(১) এই প্রবন্ধ বৈশাখের সৌরভে প্রকাশ-জন্য প্রেরিত হয়। প্রতিবাদ মূল পত্রিকায় প্রকাশ করাই উচিত ছিল তাহারা তাহা প্রকাশ না করায় আ। গৌরবে" প্রকাশিত হইল। 'আর্য্য গৌরবের প্রত্যেক প্রবন্ধেই ধর্ম্মের গুণ গৌরব, বিশিষ্টতা, শ্রেষ্ঠতা ও মৌলিকত্ব প্রমাণিত হইতেছে এবং বাঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মুখপত্র বঙ্গবাসী, নায়ক প্রভৃতি ধর্ম্মনিষ্ঠ পত্রিকায় "আর্য্য গৌরব হইতে সারগর্ভ-ধর্ম্মজ্ঞান সম্পন্ন প্রবন্ধগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেশের ও দশের পরম হিতসাধন করিতেছেন। এজন্য ঐ সব পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহোদয়গণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

চিরাবনত—
আঃ গৌঃ সম্পাদক।

সমন্বিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা ; আবার অন্যদিকে (পূর্ব্বদিকে) প্রশান্ত সমতল প্রান্তর—তৃণলতাগুল্মাদি শস্য পরিপূর্ণ বিচিত্র শ্যামল ক্ষেত্র। বাস্তবিক এ দৃশ্য দর্শনে পাপতাপ-পরিপীড়িত-শোক-দুঃখ-ব্যাকুল-চিত্ত ঘোর সাংসারিকেরও মনে আপনা আপনি এক অপূর্ব্ব আনন্দরস সঞ্চারিত হইতে থাকে। আর আদিনাথের চারিদিকেই অনন্ত অসীম বারিধি সর্ব্বদা খাঁ খাঁ করিতেছে, ইহাও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

আমরা যদিও "সাহিত্য-সম্মিলনী" যোগে চট্টগ্রাম গিয়াছিলাম, যদিও চট্টগ্রামবাসী অতিথিসেবক সরলচিত্ত প্রশান্তমনা উদারহৃদয় মহাত্মা ব্যক্তিগণের প্রীতিপ্রদত্ত পলান্নে উদর পরিপূর্ণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি সাহিত্য-সম্মিলনী সম্বন্ধে বহু বহু পত্রিকায় আমূল বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া, আমরা আর সে বিষয় "আর্য্য-গৌরবে" লিখিতে ইচ্ছা করি না। তবে কর্ম্মকর্ত্তাগণ অতিথি-সৎকারে যত্নের পরাকাষ্ঠাই দেখাইয়াছেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এত ভূরি ভূরি পরিমাণ পশু বধ করা, খাদ্যের সাড়ে পনর আনাই পলান্নযুক্ত করা, গরীব সাহিত্যসেবী জ্ঞান-চর্চ্চাশীল সংযতেন্দ্রিয় মিতাহারী মিতব্যয়ী স্বধর্ম্মরক্ষাকারী অগ্রণীবর্গের এই কি পরম কর্ত্তব্য ? তাঁহারা কি প্রতি বৎসর অম্বুবাচী বা তীর্থযাত্রীর ন্যায় ৪ চারিটা দিনও সাত্ত্বিক আহার করিয়া দ্বিসহস্রাধিক টাকা রক্ষা করিতে পারেন না ?

আমরা 'ল্যাকশ্যাম, ষ্টেশনে কিছুক্ষণ অবতরণ করিয়া

চট্টগ্রামগামী গাড়ীতে আরোহণপূর্ব্বক ‘চট্টনাথ’ ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় এক মাইল দূরে প্রসন্ন ঠাকুর পাণ্ডার বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। পরদিন প্রত্যূষে ব্যাসকুণ্ডে স্নান তর্পণ সমাপন-পূর্ব্বক সীতাকুণ্ড, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড ও দধিকুণ্ড প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া “জ্যোতির্ম্ময় শিব” দর্শন করিলাম। প্রকৃতপক্ষেই ইহা মহাদেবেরই বিচিত্র জ্যোতি। পৃথিবীতে আর কোথাও এরূপ বিনা ইন্ধনে অগ্নি জ্বলে কিনা এ পর্য্যন্ত তাহার সংবাদ পাই নাই। এই জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবের নয়নাগ্নি বিনা কাষ্ঠে বিনা যত্নে “দপ্ দপ্” “দপ্ দপ্” করিয়া প্রতিনিয়ত জ্বলিতেছে; প্রস্তরময় জ্বালানিকাষ্ঠবিহীন পরিষ্কার পর্ব্বতশিলার গাত্র ভেদ করিয়া এই অনুচ্চ অগ্নি থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠে। নিকটে কোনও জনমানবের বসতি বা গমনা-গমনও নাই। এ স্বাভাবিক ঐশ অগ্নি জলে বা বাতাসে নির্ব্বাপিত হয় না, বরং জল পাইলেই যেন আরও একটু প্রবল হয়; এ অগ্নিতে জলই ঘৃতের ন্যায় আহুতির কাজ সম্পাদন করে। বাস্তবিক ইহা হর-কোপাগ্নি বা ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা বই আর কি হইতে পারে? এরূপ অগ্নি দ্বারাই মদনভস্ম হওয়া সম্ভব বটে। ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াও যাঁহারা সন্দিগ্ধ হন, তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার আর কি উপায় থাকিতে পারে?

যাহা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও নির্ব্বাপিত হইতেছে না—যাহা কাষ্ঠতৃণাদি ব্যতীতও চিরদিন একরূপেই জ্বলিতেছে—যে অগ্নি নিশ্ছিদ্রপ্রস্তরগাত্র হইতে বহির্গত হইতেছে—তাহার উপর

কৃত্রিমতার ভাণ করা বাতুলতা বই আর কি হইতে পারে? এই অগ্নির বর্ণ ঈষৎ শ্বেতমিশ্র, অগ্নির উচ্চতা ৪।৫ অঙ্গুলের বেশী নয়; অগ্নির পার্শ্ব দিয়াই মৃদু জলপ্রবাহ চলিতেছে, কখন কখন বা অগ্নির উপরেই প্রস্রবণের জল পড়িতেছে, তাহাতেও অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতেছে না। আমরা দিবাতেই অগ্নি দর্শন করিয়াছি, রাত্রিতে অগ্নি দর্শন করিতে পারি নাই। এই স্বর্গীয় জ্যোতি দর্শনান্তর পর্ব্বতগাত্র অধিরোহণ ও অবতরণ করিয়া, কখন ঊর্দ্ধে কখন গভীর নিম্নে নামিয়া উঠিয়া ঊনকোটি শিব-লিঙ্গের দর্শন মানসে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া একটি বটবৃক্ষে দণ্ডায়মান চতুর্দ্দশ হস্তপরিমিত একটা মানবের অবস্থিতিব্যঞ্জক স্বাভাবিক গর্ত্তচিহ্ন পরিদর্শন করিয়াছিলাম। ইহাই কপিলাশ্রম। ঐ বৃক্ষগাত্রেই প্রবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান কপিল মুনি নাকি বহু বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন; ঠিক যেন এক ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবস্থানোপযোগী একটী অকৃত্রিম বৃক্ষকোটর; ঐ কোটরের সম্মুখে প্রকাণ্ড পর্ব্বত, উপরেও পর্ব্বত শাখা এবং পশ্চাদ্‌ভাগে বৃক্ষপার্শ্ব, ইহাতে ঝড় তুফান বা রৌদ্র বৃষ্টি পড়িবার আশঙ্কা নাই। কিরূপে যে বৃক্ষ-গাত্র তপোধনের কুটীরস্বরূপ হইয়াছে, তাহা আমরা ভাবিতেই পারি না।

তদনন্তর আমরা ঊনকোটি শিবলিঙ্গগুহায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, পর্ব্বতগুহার প্রতি অণু পরমাণুতেই ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য শিবলিঙ্গ বিরাজমান। প্রত্যেক লিঙ্গোপরিই অজস্র জলধারা পড়িতেছে। আমরা তাঁহার কয়েকটী লিঙ্গদেহ স্পর্শ

করিয়া, সেখান হইতে জল লইয়া, পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া ঊর্দ্ধ অধোদিকে উঠিয়া নামিয়া "বিরূপাক্ষ মহাদেব" দর্শনে গমন করিলাম। "বিরূপাক্ষ" দেবালয় বহু ঊর্দ্ধে, বৃক্ষ শিখর ধরিয়া কখন কখন প্রায় চিত হইয়া ঊর্দ্ধ মুখে ভয়ানক পিচ্ছিল পর্ব্বতগাত্রকে আলিঙ্গন করিয়া উঠিতে হয়। আমার অতি বৃদ্ধা জননীও ঐভাবে পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া উঠিয়া ছিলেন; তিনি যে কিরূপে অধিরোহণ করিলেন, পরে আমরা ভাবিতেই পারি না। চন্দ্রনাথের পথেও "বিরূপাক্ষ" দেবের মন্দিরে যাওয়া যায়; সে রাস্তা দুর্গম নয়। কিন্তু ঊনকোটি শিবালয় হইতে "বিরূপাক্ষ" দেবের মন্দিরে যাওয়ার ইহাই একমাত্র পথ। যদিও এইস্থান পর্ব্বতনিম্নস্থ পাণ্ডাদের বাড়ী হইতে দুই মাইল কি আড়াই মাইল দূরে হইবে, তথাপি আমাদিগকে কখন অধিরোহণ ও কখন অবতরণ জন্য প্রায় ছয় মাইল কি তদধিক পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

এই বিশাল পর্ব্বতের একটী অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় লক্ষণ আমাদের ভারতের পূর্ব্ব ইতিহাস ও বঙ্গমাতার পূর্ব্বাবস্থার ও অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রত্যক্ষ বিচিত্র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বঙ্গদেশ যে সাগরগর্ভ হইতে প্রসূত (বহির্গত) হইয়াছে, এই চন্দ্রনাথ পর্ব্বতই তাহার প্রকৃত নিদর্শন। এইরূপ লক্ষণ আর কোনও পর্ব্বতে অথবা এই পর্ব্বতের অন্য পার্শ্বেও দৃষ্ট হয় না। ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় এক মাইল ঊর্দ্ধে এই পর্ব্বতদেহে—দক্ষিণ-পশ্চিমপার্শ্বে সমুদ্রের দিকে স্তরে স্তরে সামুদ্রিক

তরঙ্গের প্রতিঘাতচিহ্ন পরিষ্কার রূপে দৃষ্ট হইতেছে, অপিচ তরঙ্গাঘাতে পর্ব্বতদেহের কটিদেশ বহু পরিমাণে ক্ষয় ও ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় পর্ব্বতোদরনির্গত শ্বেতাভ-ধবলবর্ণ-বৃক্ষ-লতাদিশূন্য প্রস্তররাশি অনতিদীর্ঘ সোপানের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে। গিরিবর সামুদ্রিক তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ জন্যই যেন রজতবরণ শিল-বসন পরিধান করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পর্ব্বতের কটিদেশ শীর্ণ হওয়ায় উপরিভাগ ন্যগ্রোধ-বৃক্ষ-শাখার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

মেঘনা পদ্মা প্রভৃতি নদীর বর্ষা কালের জলভগ্ন উচ্চ উচ্চ তীরগুলি শীতকালে যেরূপ অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতেও যেরূপ বর্ষার তরঙ্গাঘাতের চিহ্ন সকল দেখিয়া জলের বৃদ্ধির অনুমান করা যায়, ইহাও ঠিক তদ্রূপ ; পর্ব্বতগাত্রের তরঙ্গাঘাত দ্বারা বুঝা যায়, পূর্ব্বকালে সমতল ক্ষেত্রে বহু পরিমাণ জল ছিল, এবং সামুদ্রিক তরঙ্গ সকল প্রায় এক মাইল উর্দ্ধ হইতে পর্ব্বত-দেহে আঘাত করিতে করিতে কালপ্রবাহে ক্রমে ক্রমে নিম্নগামী হইয়াছে। সাগরের জলও বহুদূর সরিয়া গিয়াছে, বঙ্গমাতার আয়তনও বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই পর্ব্বতই হিমালয় পর্ব্বতের একটী হস্ত বা শাখা। এই পর্ব্বতে যে সকল প্রস্রবণ আছে, সেগুলিও হিমালয় হইতেই উৎপন্ন এবং অনেকগুলিই ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা বটে। এই স্থান হইতেই পর্ব্বতপথে হিঙ্গুলাজী পর্য্যন্ত গমন করা যায়।

এই স্থানে বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী দেখিতে পাইলাম। কেহ কেহ যেন লোকালয়ের অযোগ্য; তাঁহাদের লক্ষণগুলি যেন অমানুষিক, সর্ব্বদা ধ্যানমগ্ন ও জড়বৎ প্রতীয়মান হইল। এই প্রকার যতিদের সঙ্গে আলাপ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও পূর্ণ হইল না, কেহই বাগিন্দ্রিয় ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। দুই একটীকে দেখিয়া বোধ হইল তাঁহারা যেন বহুকাল আহার করেন নাই।

আমরা "বিরূপাক্ষ" শিবালয়ে মণিপুরী, ত্রিপুরী প্রভৃতি অনেক পাহাড়িয়া যাত্রী দেখিতে পাইলাম। তাহারা মৃতবৎ ভূপতিত হইয়া দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে (বহুক্ষণ থাকিয়া) প্রণাম করে। পাণ্ডাকেও যথেষ্ট পয়সা দেয়; তাহারা প্রায়ই বৈষ্ণব-লক্ষণাক্রান্ত এবং দীর্ঘ-শিখ।

চন্দ্রনাথে মহাদেবের কোন মন্দির নাই। সর্ব্বোচ্চ অত্যল্প পরিসর পর্ব্বতশিখরে খোলাস্থানে ৺চন্দ্রনাথ শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে ৮।১০ হাত স্থান সরিয়া গেলেই অগাধ নীচে পড়িয়া যাইতে হয়। পশ্চিম দিকে একটী অল্প পরিসর ইষ্টকসোপান আছে, তাহা দ্বারাই যাত্রিগণ যাতায়াত করেন। আমরাও ঐ পথে নামিয়া আসিলাম। ভূতল হইতে আড়াই মাইল উপরে এক একখানি ইট ও জল তুলিয়া যে মহাত্মা এই পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যের—তাঁহার মহিমার তুলনা নাই। এই স্থান হইতে অকূল সমুদ্র, অসীম পর্ব্বতরাজি ও প্রশান্ত প্রান্তর দর্শনে মন যেন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

নীচে আসিয়া ৺শম্ভুনাথ দর্শন করিলাম। এখানেই মোহান্তের আবাসস্থান ; অনেক অট্টালিকা, অনেক জাঁক জমক, অনেক লোক, ভয়ানক ভিড় : ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিয়া দেবতা দর্শন ও পূজাদি করিতে হয়।

তৎপর বেলা অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ী আসিলাম। তৎপর দিন রেলযোগে প্রায় তিন মাইল যাইয়া লবণাক্ষ শিব ও বাড়বানল দর্শন ও তাহাতে অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম। এ বাড়বকুণ্ডে জলের মধ্যে প্রবল আগুণ জ্বলিতেছে ; জল উষ্ণ, তাহাতে ডুবিয়া স্নান করিতে হয়। আগে লৌহজাল ছিল না, এখন লৌহতারের জাল আছে ; লোককে অতলে ডুবিতে হয় না। তাড়াতাড়ি কুণ্ড হইতে উঠিতে হয়। কুণ্ডে সমুদ্রের দিকেই অগ্নির অবস্থান।

তদনন্তর আমরা চট্টগ্রাম হইতে জাহাজে সমুদ্র মধ্যে ৺আদি-নাথের মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে বাঙ্গালা লোক অতি অল্প। মন্দিরসন্নিধানে থাকার স্থান নাই ; বাজারে গিয়া একটী পরিচিত ভদ্রলোক পাইলাম, তিনি অতিশয় মহৎলোক, সেখানে তাঁহার বড় কারবার, আমাদিগকে অতিশয় যত্ন করিলেন এবং মগদের 'ক্যোং' দেখাইলেন। 'ক্যোং' বড় কৌতূহলের জিনিষ—বড় আদরের সামগ্রী। মগদের প্রাণের ধর্ম্ম-প্রবণতাই 'ক্যোং' এর অপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। 'ক্যোং' বৌদ্ধ-মন্দির বিশেষ। ইহাতে বৌদ্ধদেবের বাল্য, যৌবন ও সন্ন্যাসা-শ্রমের বহুপ্রকার প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিদ্যমান। নিম্ন তলেই

এসব মূর্ত্তি থাকে, এবং বহুপ্রকার কারুকার্য্য ও নৃত্যগীত দ্বারা বৌদ্ধমূর্ত্তির সম্মান ও পূজা করা হয়। একটী 'ক্যোং' সপ্ততল, কিন্তু তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত নহে ; কি আশ্চর্য্য যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াও তাহারা বৃহৎ বৃহৎ শতহস্ত পরিমিত কাষ্ঠদ্বারা 'ক্যোং' প্রস্তুত করে। শ্যামদেশ হইতে এই সব সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় এবং সুন্দর কাষ্ঠ আনয়ন করে এবং নিম্নভাগ হইতে ক্রমে উপরে ছোট করিয়া মঠের ন্যায় সূক্ষ্ম করিয়া 'ক্যোং' প্রস্তুত করে। 'ক্যোং' এর সর্ব্বোচ্চ স্থানে স্বর্ণকলসী ও নিশান বসান থাকে। 'ক্যোং' এর ছাউনী টিনের, ইষ্টকনির্ম্মিত কোনও 'ক্যোং' আমরা দেখিতে পাই নাই। মহাদেব ৺আদিনাথের বাড়ীও ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি ভূমি হইতে ৫০।৬০ হাত উচ্চে অবস্থিত চারিদিকেই জলরাশি ধূ ধূ করিতে থাকে। ফুল দূর্ব্বাদি এখানে বড় দুষ্প্রাপ্য। পাণ্ডারা বেশ ভদ্র ব্যবহার করিলেন। আমরা ৺আদিনাথের পূজাদি করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

শ্রীমহেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী।

কিশোরগঞ্জ বেদবিদ্যালয়।

মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় এতদিনে কিশোরগঞ্জে স্থায়ী ভাবে বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড মাসিক ২০৲ কুড়ি টাকা সাহায্য দান করিলেন। এজন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই বিশ্বনিয়ন্তার পাদপদ্মে কৃতজ্ঞ চিত্তে বারংবার

প্রণাম করিতেছি এবং জেলবোর্ডকেও আমাদের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিতেছি। তবে বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের এ বিদ্যালয়ের সর্ব্ব-প্রধান উদ্‌যুক্তা কর্ম্মবীর বিদ্যালয়গতপ্রাণ মহাত্মা শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র সেন মহাশয় রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরিত হইলেন। আমাদের প্রধান আশ্রয়তরুর অভাবে আমরা সাতিশয় বিপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে ১৫।৬।১৩ তারিখে শ্রীযুক্ত পি, সি, দে, আই, সি, এস্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা পুনর্গঠিত হইয়া নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত পি, সি, দে, আই, সি, এস্ প্রেসিডেণ্ট। ২। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মুনসেফ ভাইস প্রেসিডেণ্ট। ৩। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট। ৪। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র সেন ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট। ৫। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র গোস্বামী ডাক্তার সেক্রেটরী। ৬। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল সেক্রেটরী। ৭। শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী এঃ সেক্রেটরী। ৮। শ্রীযুক্ত মোহান্ত দয়ালগোবিন্দ অধিকারী ৯। ভক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী ডাক্তার। ১০। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল। ১১। শ্রীযুক্ত কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী। ১২। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। ১৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কিশোর রায়। ১৪। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সেন কবীন্দ্র কাব্যতীর্থ কবিরাজ। ১৫। বেদবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

যাহা হউক সকলই ভগবানের ইচ্ছা; তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কোনও একটি বৃক্ষের শুষ্ক পত্রও পতিত হয় না, ইহা আমরা

বিশ্বাস করি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাব্যাপারেও ভগবানের অভিপ্রায় প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলের নিকটও আমরা সানুনয় অনুরোধ করি, যে তাঁহারাও ইহাকে ভগবানের ইচ্ছাপ্রসূত বলিয়া মনে করেন।

শুনিতে পাই কেহ কেহ নাকি বলিয়া থাকেন যে অধুনা এদেশে বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কিশোরগঞ্জে কেন বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা কিংবা বিদ্যাকেন্দ্র বিক্রমপুর নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিত-প্রধান স্থানেও অসম্ভব এবং উপহাসের বিষয়। যে দেশে আজও শতশত আর্য্যাচার-পরায়ণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান বিদ্যমান রহিয়াছেন, যে দেশে আজও শত সহস্র ব্যক্তি দৈনন্দিন সন্ধ্যাবন্দনা কালে সপ্রণব গায়ত্রীমন্ত্র ভক্তিভরে উচ্চারণ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, সে দেশে বেদবিদ্যার পুনঃ প্রচারজন্য,—বৈদিক আচার ও অনুষ্ঠানের পুনঃ প্রচলন জন্য একটি বেদবিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা কি একেবারেই অসম্ভব এবং উপহাসের বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হইবে? জানি, অধুনা আমরা অধঃপতিত, আমরা পথভ্রান্ত, আমরা আত্মবিস্মৃত, আমরা মোহমত্ত, তাই আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আমাদের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রকে চিনিতে পারিয়াও কি চিরদিনই অনাদর করিব?

সংস্কৃতের ন্যায় অতি প্রাচীন ও অত্যুৎকৃষ্ট ভাষা জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জগতের প্রাচীন ও নব্য, সমস্ত সভ্য

ও সমুন্নত সাহিত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট অল্পাধিক পরিমাণে ঋণী। * বহু পাশ্চত্য পণ্ডিত এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। † সংস্কৃত সাহিত্য শুধু প্রাচীন বলিয়াই বিশ্ব সাহিত্যিক সমাজে প্রশংসিত নহে, পরন্তু ইহা সুপরিমার্জ্জিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ‡ ইহার গঠন পদ্ধতি অতি আশ্চর্য্যজনক, ইহা গ্রীকভাষা অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণাঙ্গসম্পন্ন, লাটিন ভাষা অপেক্ষা অধিকতর প্রাচুর্য্যশালী এবং এতদুভয় অপেক্ষা পরিশুদ্ধতম। § শুধু তাহা বলিয়াও সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে গৌরব নহে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অক্ষয় ও অতুলনীয় এবং অন্যত্র দুস্প্রাপ্য জ্ঞানের ভাণ্ডার। ¶ সুতরাং যেদিক্ দিয়াই

---

* Mr. Pococke says :—" The greek language is a derivation from the sanskrit" (India in greece, p. 18)

† Prof. Heeren says "In point of fact, the find is derived from the sanskrit."

‡ "Mons. Dubois saysth at sanskrit is the original source of all the European languages of the present day" (Bible in India)

§ The Distinguished German critic schlegel says :—"Justly it is called sanskrit, *i, e,* perfect, finished." (schlegel's History of Literature p. 117.

Of a wonderful structure, more perfect than the greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either (Sir W. Jones. in Asiatic Researches Vol. I p 422.)

¶ A language of unrivalled richness and variety ; a language, the parent of all those dialects that Europe has fondly called Classical—the source alike of greek flexibility and Roman strength. A philosophy. compared with which, in point of age the lessons of pythagoras are but of yesterday, and in point of daring speculation plato's boldest efforts were tame and common place. A poetry more purely intellectual than

দেখা যাউক না কেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা জ্ঞান ও ধর্ম্মার্থী মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই আবশ্যক এবং উপকারী, তাহার সন্দেহ নাই।

এ সম্পর্কে আমাদের স্বদেশীয় সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল এখানে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। জ্ঞানগভীরতা, স্বদেশ-প্রীতি, স্বজাতি-হিতৈষণা, এবং স্বার্থত্যাগে মহাত্মা ভূদেবের এদেশে এযুগে বোধ হয় তুলনা নাই। তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় দেশীয় সাহিত্য সমাজতত্ত্ব, দর্শন ও ইতিহাসাদিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন দ্বারা অনন্যসাধারণ বিচারশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার চার্লস্ ইলিয়ট সাহেব ভূদেব বাবুর বিরচিত "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক অমূল্য গ্রন্থের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন :—No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of

---

any of those of which we had before any conception; and systems of science whose antiquity baffled all power of astronomical calculation.

...The utmost stretch of imagination can scarcely comprehend its boundless mythology. Its philosophy has touched upon every metaphysical difficulty; its legislation is as varied as the castes for which it was designed." (Journal of the Royal Asiatic society Vol II 1834, Mr. W. C. Taylor's paper on sanskrit Literature.)

the life long study and observation of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have had an equal share." (Annual address delivered to the Asiatic Society of Bengal.) এই ভূদেব এক সামান্যাবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। যৌবনে ৭৫৲ টাকা বেতনের শিক্ষকতায় তাঁহার কার্য্যারম্ভ, এবং পরিশেষে মাসিক ১৫০০৲ পনর শত টাকা বেতনে বঙ্গের শিক্ষাধ্যক্ষের কার্য্য, বিশেষ প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়া তাঁহার শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মের পরিসমাপ্তি। আমাদের এখানে এত কথা বলিয়া ভূদেবের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেহ যেন মনে না করেন ভূদেব ইংরাজী জ্ঞানালোক-বিহীন সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। মহাত্মা ভূদেবের আর্থিক অবস্থাও অত্যধিক সমৃদ্ধ ছিল এরূপ বলা যায় না, তিনি সমগ্র জীবন মিতাচার, মিতাহার এবং মিতব্যয় দ্বারা অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়, বহন করিয়া সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত অকাতরে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত যাহা কিছু সঞ্চিত করিতে পারিয়া ছিলেন, তাহার প্রায় সমস্তই অর্থাৎ প্রায় দুইলক্ষ টাকা তিনি বহুদেশে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। এ সাত্ত্বিক দানের মহত্ত্ব এ পতিত দেশে আমাদের মনে উপলব্ধি করিয়া সেই মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিতেছেন ?

সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চা যে উপেক্ষণীয় নিরর্থক এবং অনাবশ্যক নহে তাহা বোধ হয় এখন প্রতিপাদিত হইল।

আমরা এখন দেখিব যে একটী বেদবিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজ পরিচালনা করিতে যে সকল উপকরণের আবশ্যক, তাহা আমাদের কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত হওয়া যায় কিনা? কোনও একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে হইলে (১ম) বিদ্যার্থী (২য়) অধ্যাপক (৩য়) অর্থের আবশ্যক। ১ম—বিদ্যার্থী বালকদের বিষয় আর আমাদের চিন্তা করার আবশ্যক নাই। এপর্য্যন্ত ২৫।২৬ টি ছাত্র আমাদের এই বিদ্যালয়ে পাঠারম্ভ করিয়াছেন, তদ্‌ব্যতীত প্রায় আরও ২৫।২৬টী উপাধি পরীক্ষার্থী ছাত্র এবিদ্যালয়ে প্রবেশপ্রার্থী হইয়াছেন এবং ব্যাকরণে বহু পরিমাণ ছাত্রই ভর্ত্তি হইবার জন্য উপস্থিত হইতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্রবর্গের আবেদনও কম হইতেছে না।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় অধ্যাপক। এ বিদ্যালয়ে যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুযোগ্য এবং সুপরিচিত শাস্ত্রবিৎ। ক্রমে প্রয়োজন বিবেচনায় নানা শাস্ত্রজ্ঞ আরও কএকজন সুপণ্ডিত নিযুক্ত করা হইল।

তৃতীয় বিবেচ্য বিষয় অর্থ;—যে মহদনুষ্ঠানের পশ্চাতে এই সমৃদ্ধ প্রদেশের সমস্ত হিন্দুজাতির সমবেত অনুরাগ রহিয়াছে, যাহার সাফল্য ও স্থায়িত্ব জন্য আত্মহিতচিন্তা-পরায়ণ বুদ্ধিমান্ হিন্দুসন্তান মাত্রেরই সাহায্য চেষ্টা স্বভাবতই জন্মিবার কথা, তাহার জন্য আমরা অর্থচিন্তায় আকুল হইব কেন? ইতি-

মধ্যেই প্রায় পাঁচ হাজার টাকা নানাস্থান হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। এবং বহু অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত শিবনাথ সাহা একহাজার টাকা দিবার অঙ্গীকারে একশত টাকা সম্প্রতি দান করিয়াছেন। ইহা যে হিন্দু মাত্রেরই প্রাণপ্রিয় পুণ্যময় মহদনুষ্ঠান। এ ব্যাপারে ক্ষুদ্রতা, অনুদারতা, সংকীর্ণতা, নীচ স্বার্থ ভাব থাকিবে কেন? আমরা হিন্দুর সকল শ্রেণীর নরনারীর কায়িক, মানসিক ও আর্থিক —সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রাপ্তির আশায় রহিয়াছি। ভরসা করি সাধ্যানুসারে সাহায্যদান করিতে কেহ কুণ্ঠা প্রকাশ করিবেন না। কেহ অর্থ দ্বারা, কেহ ছাত্র দ্বারা, কেহ সদুপদেশ দ্বারা, কেহ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা, অর্থভিক্ষা সংগ্রহ দ্বারা, কেহ ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা, কেহ অবৈতনিক শিক্ষকের পদগ্রহণ করিয়া অধ্যাপন দ্বারা,—যিনি যে প্রকারে যত টুকু সাহায্য দান করিতে পারেন তিনি ততটুকুই উপকার করুন। যিনি অন্যকোন প্রকারে এ বিদ্যালয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার না করিতে পারিবেন, তিনি যেন ভগবানের নিকট ইহার মঙ্গল কামনা করিয়া কাতর প্রার্থনা করেন, এ বিদ্যালয়ের প্রতি শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। যিনি তাহাও না করিতে পারিবেন, তাঁহার নিকট আমাদের করযোড়ে শেষ নিবেদন এই, তিনি যেন কৃপা করিয়া ইহার অনিষ্ট কামনা—নিন্দাবাদ না করেন; অন্ততঃ তাহা হইলেও আমরা মহোপকৃত হইব। ৺শ্যামসুন্দর দেবা-

লয়ের সেবাধ্যক্ষ মহোদয় তাঁহার দেবালয়ের ত্রিতল ও দ্বিতল বাটীতে এই বিদ্যালয়ের স্থান দিয়াছেন, অধিকন্তু পাঁচটী ছাত্রের আহারাদির সমস্ত ব্যয় বহন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহোদয়গণ নিজ নিজ আলয়ে এক একটী ছাত্রের আশ্রয় দিয়া আহারাদি বহন করিতেছেন। ব্যয়াবশিষ্ট টাকা স্থানীয় কো অপারেটিভ বেঙ্কে আমানত আছে, তাহা হইতেও মাসিক প্রায় ২০৲ কুড়িটাকা সুদ পাওয়া যাইতেছে। ভগবান্! ক্রমেই আমাদের অর্থচিন্তার নিদারুণ ভাবনা দূর করিতেছেন।

হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই আমাদের ইহা ব্যক্তব্য যে, যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয এবং ব্রাত্য বৈশ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এখন বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার শিক্ষা করুন্ এবং তাঁহারা যে হিন্দু সমাজে উচ্চতর সম্মান পাইবার যোগ্য এবং অধিকারী তাহা প্রতিপাদিত করুন্। তাঁহারা স্ব স্ব সমাজের শিক্ষা ও আর্য্যাচার পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হউন; স্ব স্ব শ্রেণীর বালক ও পুরোহিতবর্গের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করুন্। জাতীয় উন্নতি ও সামাজিক সম্মান লাভের ইহাই উৎকৃষ্ট পথ, "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। হিন্দুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সাধন, ভজন, পূজা, উপাসনা প্রভৃতির মূল তত্ত্ব,—গূঢ় রহস্য প্রায় সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এ অবস্থায় জ্ঞানে, ধর্ম্মে, চরিত্রে, সভ্যতায় তাঁহারা সমুন্নত হইতে চাহিলে, তাঁহাদের

প্রত্যেক শ্রেণীর বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইল।

মুসলমান সমাজের অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণও "কোরাণ সরিফ্" পাঠ করিতে—অন্ততঃ অনেকেই সমাজের "সুরা" আবৃত্তি করিতে পারে। কিন্তু আধুনিক হিন্দুনরনারী-গণের অনেকেই ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে কার্য্যগত জীবনে যেন নাস্তি-কের জীবনই জাপন করিতেছেন! ভগবানের সহিত মানবাত্মার নিত্য সম্পর্ক; স্তন্যপায়ী শিশুর সহিত তাহার জননীর, মৎস্যের সহিত জলের অথবা জীবমাত্রের সহিত বায়ুর সম্পর্ক অপেক্ষাও যে সম্পর্কে অধিকতর গভীর প্রয়োজনীয় এবং মধুময়। কিন্তু কি গভীর পরিতাপের বিষয়! আজ আমরা সেই "প্রাণের ব্যাপার কে" শুধু একটা মৃত "প্রথার ব্যাপারে" পরিণত করিয়া দেখিয়াছি!! আমরা কি আমাদের শুষ্কজীবন-ভার বহনের প্রতিকার উপায় অবলম্বন করিব না? আর একটী কথা এই বেদবিদ্যালয়ে কাহারা বেদ পাঠের অধিকার পাইবেন, তাহা নিয়া কেহ কেহ অনর্থক বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। যিনি বেদ পাঠের প্রকৃত অধিকারী, কেবল তিনিই অধ্যয়ন করিতে পাইবেন, এই ত সোজা উত্তর। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে যেমন কেহ বি, এল পরীক্ষা দিতে পারে না, এফ, এ পাস না করিতে পারিলে যেরূপ কেহ মেডিক্যাল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতে পারে না, বি, এ পাস না করিয়া যেরূপ কেহ এম, এ, পড়িতে পারে না, ইহাও সেইরূপ

কথা। তবে একথার আর নূতনত্ব কি? ব্যাকরণতীর্থ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৈদিক ব্যাকরণে প্রয়োজনানুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ না করিতে পারিলে, কেহই এখানে বেদাধ্যয়ন করিতে পাইবেন না। যাঁহার ব্যাকরণে সেরূপ অধিকার নাই, তিনি ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কিংবা প্রোফেসর ম্যাক্সমূলর সাহেবের অনুবাদ পাঠ করিয়া "দুধের আস্বাদ ঘোলে" মিটাইতে পারেন, কেহ তাহাতে তাঁহাকে কোনদিন বাধা দেয় নাই, দিবেও না। মোট কথা বেদ পাঠের কে প্রকৃত অধিকারী, তাহা বেদের অধ্যাপক মহোদয়ই নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং করিবেন। দ্বিজজাতি মাত্রের বেদ পাঠে অধিকার পূর্ব্বেও ছিল, আজও রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যমাত্রেই দ্বিজ-জাতীয়, সুতরাং তাঁদের ভাবনার প্রকৃত কারণ নাই।

যাঁহারা এসব কথা উত্থাপন করিয়া গণ্ডগোল বাধাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা অধিকার পাইলেও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি, তাঁহারা ছয়মাস কালও বেদ অধ্যয়ন করিবার ক্লেশ স্বীকার করিবেন না।

এক্ষেত্রে সাহায্য দান করিবার জন্য হিন্দুসন্তানগণকেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। ইহা সমস্ত হিন্দুর করণীয় কার্য্য, কোন একজন লোক কিংবা অল্প সংখ্যক এক জন লোকের কাজ নহে। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া স্ব স্ব শক্তি ও অবসর দান করিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিজন্য চেষ্টা করিতে থাকি। যিনি যে বিষয়ের কর্ম্মভার গ্রহণে ক্ষমবান্ বলিয়া

আপনাকে বোধ করেন, তিনি সেই কর্ম্মভার গ্রহণ করুন। আমরা কোন শুভানুধ্যায়ী প্রকৃত সুহৃদ্‌কে সাহায্য দান করিতে কোন দিন কিঞ্চিন্মাত্রও বাধা দিব না—দিতে পারিও না। কারণ ইহা আমার কিংবা আপনার কাহারও ব্যক্তি বিশেষের যথেচ্ছা-চারের "সম্পত্তি" নহে। মানবীয় অনুষ্ঠানমাত্রেই ভ্রম ও ত্রুটি থাকে। আমাদের এ ব্যাপারে এযাবৎ ভ্রম, ত্রুটিও অনেক হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া যোগ্যতর ও অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তিরা আজও দূরে রহিবেন কেন? সুহৃদ্ কর্ম্মী মাত্রেরই এখানে তুল্যাধিকার। আমরা সকলের সাহয্য ও সদুপদেশ সর্ব্বদা সাদরে গ্রহণ করিব। কিন্তু নিন্দুকের নিন্দায় আমরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইব না। নিন্দা করা অতিহীন অপদার্থ লোকের কর্ম্ম বলিয়া সততই উপেক্ষার যোগ্য, এবং আমরা উপেক্ষাই করিব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

সতী সুনীতি।

আর্য্য-গৌরব।

১ম বর্ষ]   ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২০   [১১শ ও ১২শ সংখ্যা

মিত্র।

(১)

জানি আমি তুমি শুধু ওহে প্রাণেশ্বর,
মিত্র মম প্রেমাধার।
যখন যেখানে থাকি, যখন যেভাবে ডাকি,
তখনি তোমার প্রেম পাই অনিবার,
সুখে দুঃখে মিত্রতার না হয় বিকার।

(২)

স্থাবরে জঙ্গমে জীবে নাহি ভেদাভেদ,
অহো, জীবনে মরণে।
তোমার মিত্রতা প্রভো, মলিন না হয় কভু,
জানি ইহা তবু মন বুঝে না আমার,
তোমার (ও) প্রেমের যেন আছে অবিচার।

(৩)

ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি, মম ভ্রম অনিবার,
তোমায় বুঝিতে নারি।
বলির পাতালে গতি, বঞ্চিতা তুলসী সতী,
পাষাণের 'শালগ্রাম' তুমি বিশ্বেশ্বর,
তোমার প্রেমের লীলা বুঝে কি সে নর ?

(৪)

অতি মিষ্ট মিত্রবাণী মধুর মধুর,
শুনে হয় দুঃখ দূর।
বুঝিতে না পারি হায়, কেন হলাহল তায়,
কমলের মিত্র 'রবি' বলে সর্ব্বজন,
জীবন জীবন তার করে সে হরণ।

(৫)

এই যে শশাঙ্ক আহা কেমন সুন্দর !
জুড়ায় নয়ন মন।
কুমুদের প্রাণেশ্বর, সুধা ঢালে নিরন্তর,
শারদীয় করে করে বিমুগ্ধ অন্তর।
আবার শিশিরে তারে করিছে কাতর।

(৬)

বৃত্র-মিত্র দেবরাজ সহস্র লোচন,
অবিচার নাহি যার।

কি বলিব তার কথা, ভেবে প্রাণে বাজে ব্যথা,
বজ্রধর বজ্রময় সত্য এ বচন ;
মিত্ররূপে বিনাশিল বৃত্রের জীবন।

(৭)

অনিলে অনলে সদা এক প্রাণ মন,
অহো মিত্রতা কেমন ?
ছাড়িয়া না বাঁচে কভু, কি বলিব দেখ তবু,
দুর্ব্বল অনল যবে মিটি মিটি জ্বলে,
মিত্র সে পবন তায় বিনাশে সবলে।

(৮)

এইরূপ দশদিকে করি নিরীক্ষণ,
বিচিত্র মিত্রতা ভবে।
যারে ছেড়ে প্রাণ যায়, সময়ে সে নাশে তায়,
অমৃতে গরল, ঘটে প্রণয়ে প্রমাদ,
বর্ত্তমানে মিত্রতার বড় অপবাদ।

(৯)

একমাত্র মিত্র তুমি, সবের বান্ধব,
নির্ব্বিকার প্রেম তব।
তোমার মিত্রতা আশে, আছি সদা মহোল্লাসে,
নির্ভয় হৃদয়ে বলি তুমি শুধু মিত্র মম।
"সমস্তবন্ধবে তেজোমূর্ত্তয়ে তে নমো নমঃ ॥"

সম্পাদক।

———

সতী সুনীতি।

আজ মনের নিদারুণ উদ্‌বেগে হৃদয়ের প্রবল আবেগে এবং সতী বালিকার স্নেহানুরাগে আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিও পত্রিকায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহা ব্যক্ত করিবার আমার ভাষা নাই। কাহারও কাহারও থাকিতে পারে, কিন্তু সেরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিগণও এ অলৌকিক অযৌক্তিক অত্যাশ্চর্য্যজনক ও অসম্ভব ব্যাপার সুচারুরূপে প্রকাশ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। সতীর কর্ত্তব্য, দেবীর কার্য্য আমরা কিরূপে বুঝিব ? যাহার কাজ তাহারই বোধগম্য বটে, আমরা বুঝিতে গিয়া ভ্রম করিয়া বসিব ইহা আশ্চর্য্য নয়। আমরা এই প্রচ্ছন্ন শালগ্রামকে আজন্ম দেখিয়াও লোষ্ট্রবৎ জ্ঞানই করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে বুঝিলাম সেত লোষ্ট্র নয়—মানুষ নয়—অনেক উপরের নিষ্পাপদেবী।

সুনীতি—ইনি ময়মনসিংহের অন্তর্গত খালিয়াজুড়ীপরগণার অধীন মৃগাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা এবং সতীশতক লেখিকাই ইঁহার গর্ভধারিণী। খারুয়া গ্রামনিবাসী পুণ্যাত্মা মনোরঞ্জন চৌধুরীই ইঁহার প্রিয় পতি। এবং ঢাকা জিলার অধীন সাপমারা গ্রামের শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চৌধুরীই ইঁহার মাতামহ। ইনি অতি সুশীলা—সত্যবাদিনী—প্রিয়ম্বদা - দৃঢ়স্বাস্থ্যবতী—সর্ব্বগুণ - সম্পন্না—বিশুদ্ধস্বভাবা—রূপগুণযুক্তা—সর্ব্বাংশে: শ্রেষ্ঠা—অলৌকিকশক্তিসমন্বিতা—নবযৌবনবতী—বিদূষী—পতিগতপ্রাণা—পরমা সাধ্বী ছিলেন।

ইনি প্রাণপক্ষির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে চিতা সজ্জিত করিয়া পরমানন্দে আপন দেহ ভস্ম করত অনুমৃতা হইয়াছেন।

যাহা আমরা কখনও চক্ষে দেখি নাই, যাহা বিশ্বাস করিবার শক্তিও আমাদের নাই; মানবের অর্থে বা সামর্থ্যে যাহা সম্পন্ন হইতে পারে না, ইনি তাহাই আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন! মানব যে জড় দেহের মমতা ভুলিয়া গিয়া তৃণাদি জড় পদার্থের ন্যায় আপন দেহ পরমানন্দে অকাতরে অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিতে করিতে পতিগতপ্রাণে স্তোত্র পাঠ করিতে পারে ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? "অগ্নি হইতে তুলিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিও না, আমার এ পরম সুখে বাধা দিও না, তোমাদের পাপ হইবে, আমাকে স্পর্শ করিও না, অগ্নির তাপ নাই দেখ,......" উঃ কি চমৎকার শক্তি! কি অতুলনীয় পতিভক্তি! কি মধুর উক্তি!!! বাস্তবিক অগ্নিবেষ্টিত অবস্থায় যাঁহার দেহ তুষারবৎ শৈত্যসম্পন্ন, যাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সকলেই কম্পিত হইতে ছিলেন, যিনি তখন শীতে কাঁপিতে ছিলেন, তাঁহার মহিমা আমরা কি বলিব? যিনি সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধীভূত হইয়াও অজ্ঞানতা লাভ করেন নাই—যিনি জতুগৃহের ন্যায় সজ্জিত জ্বলন্ত শ্মশানে থাকিয়াও "আঃ আমার চিতা নির্ব্বাণ করিয়া কি সর্ব্বনাশ করিলে" একমাত্র এই কথাই বার বার বলিয়াছিলেন, যাঁহার অগ্নিস্পর্শই মাতৃকোলের ন্যায় আনন্দজনক বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাঁহার কথা আমরা কি লিখিব? যিনি পূর্ণাঙ্গ-দগ্ধাবস্থায় উত্থিতা হইয়াও পতির গৌরব

ভুলেন নাই—"মশারির উপরে "আর্য্য-গৌরব" আছে তাহা হইতে আপনারা পতিস্তোত্র পাঠ করিয়া আমাকে তৃপ্ত করুন্। ঠাকুর-কুমার! আমার প্রাণ জুড়ান। আমি কেবল ঐ স্তোত্রই শুনিতে চাই। এই আমার এক মাত্র আকাঙ্ক্ষা। আর আমার বাবাকে প্রণাম করিয়া আসিতে পারি নাই, সত্বরে আমাকে কিশোরগঞ্জ পাঠাইয়া দেন। সতীর ইহাই কর্ত্তব্য,(১) ইহা কখনও পাপ নয়, ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইব; আমার আর বিলম্ব সহ্য হয় না।" সতী শীতে ঘন ঘন কম্পিত হইয়া বার বার এই সব কথাই বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে কিছু খাওয়ার কথা বলিলে,তিনি কিছুই খাইবেন না বলিয়াছিলেন,তবে নান্দাইল হইতে তাঁহার স্বামীর প্রেরিত কমলা লেবু এবং স্বামী জল পিপাসা লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারও অসীম জল খাইতে প্রবৃত্তি হইয়াছে জানাইয়াছিলেন। আগন্তুক সমস্ত স্ত্রীলোককেই বলিয়াছিলেন "ইহাই সতীর কর্ত্তব্য, আমার জন্য কেহ চিন্তা করিও না। আমার কিছুই হয় নাই। আমি বড় দূরে রহিলাম, সকালে কিশোরগঞ্জ পাঠাইয়া দেন।" এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহারা সেদিন ১৩ই পৌষ রবিবার পাঠাইতে পারেন নাই। তাঁহারা সোমবার তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দেন। পথে বহু লোককে বহু প্রকারে প্রবোধ দিয়াছিলেন। তাঁহার

---

(১) সতী যে দিন পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে যান, তখন তাঁহার পিতা মফস্বল ছিলেন, সেজন্য প্রণাম করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বাল্যসখী বনগ্রামনিবাসী হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও পেশকার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের বাড়ীর বালিকাগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "আমি পতির সঙ্গে চলিলাম, ইহাই সতীর কর্ত্তব্য; আমার জন্য তোমরা শোক করিও না।" তখন তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় প্রফুল্ল বদন যেন কি এক স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিত হইয়াছিল। সত্য সত্যই সতী যেন তাঁহার স্বামীর আদেশে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে দ্রুতবেগে ধাবিতাই হইতেছেন এরূপ বোধ হইয়াছিল। সতীকে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল ও গতিশীলা দেখা গিয়াছিল।

সতী সোমবার সন্ধ্যার একটুকু পরেই এখানে আসিয়া পালকীতে থাকিয়াই "বাবা, বাবা, বলুন সতীর কি ইহা পাপ? সতীর কর্ত্তব্য কি?" বাবাকে প্রণাম করিয়া বার বার ঐ প্রশ্নই করিতে লাগিলেন। গুরুদেবকেও ঐ প্রশ্নই করিলেন সকলেই বলিলেন, "তোমার ইহা আত্মহত্যা নয়, তোমার কোনও পাপ হয় নাই,আমাদের শাস্ত্রমতে তুমি স্বামীর অনুগমনই করিতেছ।" সতী আবার বলিলেন, "আমরত কোনও কলঙ্ক থাকিবে না? আমি যেন নিষ্কলঙ্ক এবং নিষ্পাপ হইয়া যাইতে পারি।" এই বলিয়া শিবশত-নাম পাঠ করিলেন এবং "জল, জল" বলিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গীয় লোকের জল পান করিতে দিলে, সতী অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই জল অন্য লোকে খাইয়াছে, আমি খাইব না।" আহা! তখনও তাঁহার পবিত্রতা কত! অমনি আমরা অন্য জল দিলাম। পরে সমস্ত রাত্রিও দেহত্যাগের

পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বহু পরিমাণ গঙ্গাজলই পান করিয়াছিলেন। প্রথম গঙ্গাজল পান মাত্রই 'মাতর্গঙ্গে' বলিয়া শঙ্করাচার্য্য-কৃত গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সতী সম্মুখে দুর্গাপ্রতিমা দেখিয়া প্রণামাদিও করিয়াছিলেন। সতী এক বারও কাতরোক্তি প্রকাশ করেন নাই। "বড়ই দূরে রহিয়াছি, অনেক দূর যাইতে হইবে আর বিলম্ব সহ্য হয় না; বাবা, সকালে বিদায় দেন। এক বার 'উরে লন্'।" ইত্যাদি বাক্যই বলিয়াছিলেন। কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়াছিলেন "আমি অমরধামে যাব, আমি থাকিব না, আমার জন্য আপনারা (মাতা পিতাকে বলিয়াছিলেন) শোক করিবেন না; সংসারে অমর কে? কে না মরে? সকলেইত মরিবে।" তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে উরে (বুকে) লইয়া বলিয়াছিলেন "মা, তোর মত শাপভ্রষ্টা দেবীকে ছাড়িয়া দিয়া কে বাঁচিতে পারে? তুই কেন আমাদিগের সুখস্বপ্ন ভগ্ন করিতেছিস্? কিছু দিন থাকিয়া যা।" তখন সতী বলিয়াছিলেন, "আজ রাত্রি থাকিয়া, কাল খাওয়ার পূর্ব্বে চলিয়া যাইব, আপনারা শোক করিবেন না।" তখন কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "তুমি কাহাকে কি আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও।" সতী বলিলেন—"বাবা, মা, সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকুন; কামাখ্যা কনক দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকুক। মালতী পূর্ণিমা এয়ো থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ করুক্।" তাঁহার শ্বশুর বাড়ীর সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলে সতী বলিলেন, "ঠাকুরকুমার বিদ্যা শিখুক।" কে খরচ

দিবে বলিলে, বলিলেন, "তাহা আমি বলিতে পারি না।" 'ঠাকুরের খড়িকাগুলি কে তৈয়ার করিবে' ইহা বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ধন্য তাঁহার শ্বশুর-ভক্তি, ধন্য পারিবারিক প্রীতি! সতী প্রত্যহ শ্বশুরের পাদোদক পান করিতেন। সেই শ্বশুরের জন্যই প্রফুল্ল বদন হইতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমরা ঔষধ খাইতে বলায়, তিনি একবারেই ঔষধ খাইবেন না বলিয়া অত্যন্ত অনুরোধ করিয়া কবিরাজ মহাশয়কে এবং তাঁহার (একটী পিসৃতাত) ভ্রাতা অতুল বাবু ডাক্তারকে বাহিরে থাকিতে বলিয়াছিলেন। কেহ কেহ জলের সঙ্গেই ঔষধ দিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে এরূপ ভাবে ঔষধ দেওয়া কাহারও সাধ্য হইবে না এবং তাঁহার পিতারও মত হয় নাই। তখন কেবল কবিরাজের ভালবাসা এবং খাতির রক্ষার জন্যই সতী দুই একবার ঔষধ সেবন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গঙ্গাজল ভিন্ন অন্য কিছুই গলাধঃ করেন নাই। দুগ্ধ দিলেও তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিতেন, গঙ্গাজলই তাঁহার অন্তিমের একমাত্র পানীয় ছিল। ঐ রাত্রি স্বপ্নদর্শনবৎ যেন মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। দিবালোকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিদর্শন করিয়া দেখা গেল, শরীরের প্রায় পনর আনা অংশের চামরা ও মাংস পুড়িয়া গিয়াছে, অথচ কোনও প্রকার ঘা "পচা ধরা" বা ফোস্কা হয় নাই। পোড়া পোড়া স্থানে লাল লাল চর্ম্ম হইয়া স্বাভাবিক দেহের ন্যায় ঐ ঐ স্থান দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল।

কাপড়াদির সঙ্গে কখনও জড়িত হইত না*, কেবল 'বাম হাতে একটী ও ডান হাতের আঙ্গুলে একটী ফোস্কা ছিল।' মুখের বর্ণ কাল হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর সময় তাঁহার মুখমণ্ডল ঠিক তাঁহার স্বামীর বদনের আকৃতিতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি যখন স্বকৃত শ্মশানে দগ্ধ হইতে থাকেন, তখন তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্বামীও যে দগ্ধ হইতেছিলেন, তাঁহার দেবর প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিল। তখন সে ভাবিতেছিল, আগে দাদাকে ধরি কি বৌদিদিকে ধরি। অমনি সে মূৰ্চ্ছিত হয়। তাঁহার দেবরের বয়সও ২১ বৎসর। কয়েক জনে তাঁহার দেবরকে ধরাধরি করিয়া গৃহে লইয়া যান এবং কয়েক জনে তাঁহার জ্বলন্ত শ্মশানে জল ঢালিয়া দিয়া সতীকে ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তখন সতীর দেহ তুষারবৎ শীতল ছিল। আহা! বিধির খেলা কত আশ্চর্য্যজনক, কত অসম্ভব,

---

* সতীর দেহের অগ্নিদগ্ধস্থানে কেন ফোস্কা হয় নাই এ সম্বন্ধে ৺কাশীধামের রামদেহিন ব্রহ্মচারী এখানে আসিয়া সতীর জন্মস্থান প্রদর্শন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার উক্তিটী এ স্থলে না লিখিয়া পারিতেছি না।

তিনি বলেন "সতীর ইচ্ছামতই সব হইয়া থাকে।" তিনি দেশলাই অথবা অন্য কোনও প্রকারে কৃত্রিম আগুনে দগ্ধ হওয়া বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বলেন "সতী যখন পতিগতপ্রাণ হইয়া উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় গলবদ্ধ প্রস্তরখণ্ডরূপ জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তখন সতী ঘৃত-চন্দনাদি দ্বারা দেহকে শুদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিতে বাসনা করামাত্রই তাঁহার দেহ হইতেই পবিত্র অগ্নি উদ্ভব হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারাই বিনা যন্ত্রণায় সতীর দেহ দগ্ধ হইয়াছে।

তাহা মানব-বুদ্ধির অধিগম্য নহে। তাপের ভিতর শৈত্য, শৈত্যের ভিতর অগ্নি, তিনিই নিহিত করিয়া দিয়াছেন; তাই আমরা জলের ভিতরে অগ্নি, অগ্নির ভিতরে জল প্রতিনিয়তই দেখিতে পাই, কিন্তু বুঝিতে পারি কৈ? সে ধারণার শক্তিও আমাদের নাই। তাই বলি, সতীত্বের মাহাত্ম্য—সতীর গৌরব আমাদের সতী-প্রসূতি 'শতীশতকে' যাহা লিখিয়াছিলেন, পাঠক-গণ তাহাই একবার পাঠ করিয়া বুঝিয়া লন্। শাস্ত্রকারগণ সতীকে কি বলিতেছেন তাহাও দেখুন।—

"সতী-মহাত্ম্যম্"

পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ সতী স্ত্রী চ সমুদ্ধরেৎ।
পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥
নাস্তি তেষাং কর্ম্মভোগঃ সতীনাং ব্রততেজসা।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ নিষ্কর্ম্মা মোদতে হরিমন্দিরে॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্ববেদানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ॥
তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং ব্রতিনাং যৎ ফলং ব্রজ।
দানে ফলং যদ্দাতৃণাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততম্॥
স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভু বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বে চ মুনয়ো ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততম্॥
সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ॥

ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।
স্বতেজসা সমর্থা সা মহাপুণ্যবতী সদা।
সতীনাঞ্চ পতিঃ সাধ্বা পুত্রো নিঃশঙ্ক এব চ।
নহি তস্য ভয়ং কিঞ্চিদ্দেবেভ্যশ্চ যমাদপি॥
শতজন্ম পুণ্যবতাং গেহে জাতা প্রতিব্রতা।
পতিব্রতা প্রসূঃ পূতা জীবন্মুক্তঃ পিতা তথা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৩ অঃ।

এইত সতীর মাহাত্ম্য। সতী স্বয়ং বার বার ‘সতীর কর্ত্তব্য কি’, ‘সতীর কর্ত্তব্য কি’ বলিয়াছিলেন। পাঠকগণ তাহাও শুনুন। “পতিব্রতা সতত স্বামীর অনুরাগিণী থাকিবে এবং নিত্য ভর্ত্তার অনুমতি লইয়া তাঁহার পাদোদক পান করিবে। ব্রত তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর চরণসেবা, স্বামীর স্তব ও স্বামীর তুষ্টিসাধনই পতিব্রতার কর্ত্তব্য। সতী রমণী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোনও কার্য্য করিবেন না এবং নিজ ভর্ত্তাকে নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন। সতী স্ত্রী পরপুরুষের মুখাবলোকন, পরপুরুষের প্রতি নেত্রপাত এবং যাত্রা মহোৎসব নৃত্য-গীতাদি ও ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করিবেন না। স্বামীর যাহা ভক্ষ্য পতিব্রতার তাহাই ভোজন করা কর্ত্তব্য। সতী ক্ষণ কালও পতিসঙ্গ ত্যাগ করিবেন না। পতিব্রতা স্বামীর উত্তরে উত্তর করিবেন না এবং স্বামীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন না। স্বামী ক্ষুধিত হইলে তুষ্টভাবে তাঁহাকে ভোজন ও জল দান করিবেন এবং নিদ্রাগত স্বামীকে জাগরিত ও কোনও কার্য্যে

প্রেরিত করিবেন না, সতী পতীকে পুত্রগণের শতগুণ স্নেহ করিবেন, সতীগণের পতিই পরম বন্ধু, পতিই গতি এবং পতিই ভরণ-পোষণকারী দেবতা। সতী ভক্তিভাবে যত্নের সহিত শুভ দৃষ্টিতে স্বামীকে দর্শন করিবে।” সতী এই জন্যই বার বার “নয়নে” “নয়নে” এই কথাটী (আমাদের পক্ষে প্রলাপের ন্যায়) বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেন। সতীর কর্ত্তব্যজ্ঞান ভাবিয়া আমাদিগকে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় উপবিষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। যাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালেও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হৃদয়ের স্তরে স্তরে উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতে ছিল, তাঁহার বিষয় প্রচার করা অসম্ভব ভিন্ন আর কি বলিব? তাঁহার মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল; মৃত্যুসময় তাঁহার মুখের গঠন, তাঁহার পতির মুখের আকৃতিতে পরিণত হইল। যাঁহারা তাঁহার পতিকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এই পতিগত দেহ-মনসমর্পিত সতীকে ঠিক পতিরূপেই দেখিতে পাইলেন। ভাবিতে ভাবিতে যে, দেহও ভাবিত পদার্থের মত হয় তাহা এই প্রথম আমরা দেখিতে পাইলাম। মৃত্যুর আধ ঘণ্টা বাকী আছে, সতী ইহাও তাঁহার আত্মীয় মাইনার স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া না আসায় আর তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পারেন নাই। সতী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন প্রত্যেক কথাই ধ্রুব সত্যে পরিণত হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি গুরুদেবের পাদোদক পান করিয়াছিলেন এবং শিব-শতনাম জপ করিয়াছিলেন। প্রত্যহই

তিনি ইহা জপ করিতেন। ১৩২০সনের ১২ই পৌষ শেষ রাত্রিতে তিনি সজ্জিত চিতায় অনুগমনজন্য দগ্ধ হন! এবং ১৫ই পৌষ পূর্ব্ব রাত্রির কথিত মত বেলা সোওয়া দুই প্রহরের সময় ঠিক পনর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া মাত্রই অমর-ধাম চলিয়া যান। তাঁহার এই পবিত্র মৃত্যুর সময় প্রবল বাতাস ছিল এবং বহু ক্ষেমঙ্করী (শঙ্খচিল) তাঁহার শয্যার উপরে ও চারি পার্শ্বে বিচরণ করিতেছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক সানন্দে তাঁহার শ্মশান-কাষ্ঠাদি বহন করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চিতায় অন্য শবাদির ন্যায় কোনও প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয় নাই। ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকে তাঁহার চিতাভস্ম নিতে আসিয়াছিলেন এবং পরম ভক্তিসহকারে তাহা নিয়া গিয়াছেন। সতীর চিতাস্থান বেড়া দিয়া চিহ্নিত ভাবে রাখা গিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রাখা অত্যন্তপ্রয়োজন বলিয়া সকলেই মনে করিতেছেন। নানাস্থান হইতে তাঁহার পিতা মাতার নিকট ভক্তি, আশীর্ব্বাদ, প্রশংসা ও সান্ত্বনাদিপূর্ণ বহুসংখ্যক পত্রাদি আসিতেছে। সকলে ইঁহার পতিভক্তি ও দৈবশক্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রশংসা করিতেছেন। বঙ্গের প্রধান প্রধান সমস্ত সংবাদপত্রেই এই সতী-কীর্ত্তি প্রচারিত হইয়াছে। কোন কোনও মহাত্মা বলিতেছেন, হরিসংকীর্ত্তন স্থলে হরির আবির্ভাব হয়। রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর আরাধনা করিয়া সাবিত্রী লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামাতাও সতী-মাহাত্ম্য প্রচার ও খ্যাপন করিয়া এই সতী-কন্যা লাভ করিয়াছেন। এই

শাপভ্রষ্টা দেবী কয়েক দিনের জন্য মর্ত্ত্যধামে আসিয়াছিলেন। সময় অতীত হওয়ায় অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্য দুঃখ করার কিছুই নাই।
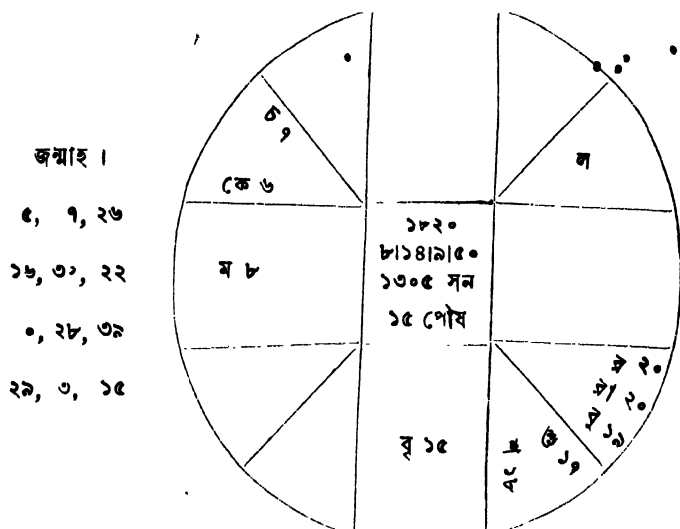
আমরা সতীর জন্মপত্রিকা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে কি আছে তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণই বিচার করিবেন। ইহার ধর্ম্মস্থান ৯ম গৃহে বৃহস্পতি আছেন, তাহার ফলে জাতক ধনী, মানী, গুণী, ধার্ম্মিক, কুলগৌরব-বর্দ্ধক, কীর্ত্তি-মান্ ও মহাসৌভাগ্যশালী হন এবং বৃহস্পতি দ্বিতীয় ও একাদশ গৃহের অধিপতি হওয়ায় জাতক শাস্ত্র-প্রিয়, সুবুদ্ধিযুক্ত, ধর্ম্মকার্য্য-রত, বিদ্যা ও ধর্ম্ম দ্বারা ধার্ম্মিকের প্রীতিভাজন হন। সংক্ষেপে

আমরা ইহার কেবল ধর্ম্মস্থানের বিষয়ই লিখিলাম। ১৩০৫ সনের ১৫ই পৌষ ইঁহার জন্ম হয়; জন্মকালীন ধাত্রী ইঁহার ঘরে প্রবেশের পূর্ব্বেই ইনি নিরুদ্বেগে ভূমিষ্ঠা হন্। ঐ সময়েই তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত একটী বহুমূল্যবান্ জমিদারী সামান্য টাকায় নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। আজন্মই তাঁহার অত্যন্ত পবিত্রভাব ছিল, যখন তাঁহার বয়স দেড় বৎসর তখনও প্রস্রাবের জল লইবার জন্য, জলকে 'গ' 'গ' বলিয়া চীৎকার করিতেন, জল দিলেই তাঁহার কাঁদন বারণ হইত। শৌচ না করিয়া কখনই ঘরে প্রবেশ করিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার পিতামাতারও শুচিবায়ু আছে বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। তাঁহার পিতা আজীবন প্রাতঃস্নান ত করেনই, তা ছাড়া দিবসে কখন কখন দুই তিন বারও স্নান করিয়া থাকেন। তাঁহার মাতা এবং ভ্রাতা ভগিনীরা সকলেই একাধিকবার স্নান করিয়া থাকেন। বালিকা সুনীতিও বাল্যকাল হইতেই শৌচাচার পালন করিতেন। অতি শৈশবেই মাঘমণ্ডল প্রভৃতি ব্রতের জন্য প্রাতঃস্নান করিতেন। গরু তাঁহার প্রাণের সদৃশ প্রিয় ছিল; আম, কলা, কাঁটাল প্রভৃতি নিজে না খাইয়াও পরম আহ্লাদে গরুকে খাওয়াইতেন। অনেক সময় নিজের কাপড় দিয়া শীতকালে গোবৎসকে জড়িয়া রাখিতেন। আখ ক্ষেত হইতে বাছিয়া বাছিয়া আখের কোমল পাতাগুলি আনিয়া গোবৎসকে খাইতে দিতেন। গোবৎস পাইলে আর তাঁহার আহার নিদ্রা মনে থাকিত না। বিবাহের পরও প্রায় প্রত্যেক পত্রেই গবাদি

কেমন আছে তাহা লিখিতেন। অল্প দিন হইল এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, (একটী গাভীকে তাহার ভ্রাতা দুষ্টমণি স্থলে টুমণি ডাকিত) "টুমণি কথাটী কামাখ্যার মুখে কত যে মধুর লাগে তাহা বলিতে পারি না, এখনও যেন কাণে বাজে।" হায়! সেই আদরের টুমণি গাভীটীও তাহার কিছু দিন পূর্ব্বেই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছে।

বালিকার সংযম অতুলনীয়, বাল্যকালে তাঁহার তিন বৎসর বয়সে পৌষ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত জ্বর হয়। সে সময় সে কমলা, কলা, আম প্রভৃতি লোভনীয় এক একটি ফল সর্ব্বদাই হাতে রাখিত, বলিত আমি খাইব না।

সংযম

প্রকৃতপক্ষেও তাহাই হইত, এক একটী ফল ক্রমান্বয়ে কয়েক দিন হাতে রাখিয়া নষ্ট হইয়া গেলে অন্য একটী ফল হাতে রাখিত, ভ্রমেও একদিন খাইতে ইচ্ছাও করে নাই। এই সংযমের বীজ হইতেই তাহার লেখা "কামাখ্যা" প্রবন্ধে "আমরা জাহাজে ফলমূলাদিও আহার করি না। দুই বৎসরের একটি শিশুকে নারীকেলের জল দেওয়া যাইত"......তিন দিবস নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়াগেলে"......আমরা দেবী দর্শন করিয়া পূজা দিয়া বাসায় ফিরিলাম তখন পিতামহী দেবী আমাদের একজনকে বলিলেন, মালতি! (ছোটভগ্নী) তোরা খাবি না?" আমরা বলিলাম, "আমাদের খাওন মনেই নাই। বাস্তবিক মনে করিলেই ঠেকা, তিনি মনে করামাত্রই যেন আহারের কথা মনে পড়িল।" এই কয়েকটি কথা দ্বারা তাঁহার সংযমের বিশেষরূপেই পরিচয়

পাওয়া যাইতেছে। বালিকার চতুর্থ দিবসেও খাওয়ার কথা মনেই নাই, ইহা দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি মনই মূল, মনে করিলেই ঠেকা; যে বালিকা এরূপ ভাবনা করিতে পারে তাহা দ্বারাই জড়দেহ পরমানন্দে দগ্ধ করা সম্ভবপর বটে। আমরাও বলি মনই সুখদুঃখের মূল, মনে করিলেই ঠেকা; ইহা সতীর সত্য বাক্য। মনে না ভাবিলে সর্পও রজ্জু হয়, উষ্ণও শৈত্য বোধ হয়। যাহার যে কার্য্য অকর্ত্তব্য তাহাও মনে আকাঙ্ক্ষা করিলে এড়াইয়া যাওয়া বড় কঠিন হয়। এজন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ পাপচিন্তা কখনও মনে স্থাপন দিবে না বলিয়া বারংবার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি-যোগলেখক অশ্বিনী বাবুও পাপেন্দ্রিয় স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; প্রকৃত পক্ষে সতীর বাক্যে আমরা বলিতে পারি পাপেন্দ্রিয় শরীরে আছে, তাহাও মনে না করাই মঙ্গল। সতীর এই একটী কথারই কতমূল্য কত গভীরতা ভাবুক পাঠক তাহা বুঝিয়া লউন্।

শিক্ষা

এখান কার উচ্চপ্রাইমারি বালিকা-বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে তিনি পাঠ সমাপন করেন। সর্ব্বদাই শ্রেণীর প্রথম থাকিতেন, অনেক রকম পুরস্কারও পাইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষক তাঁহাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন, তিনি যে সুদীর্ঘ কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার কয়েক পংক্তিমাত্র আমরা এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

"আমার স্নেহের ছাত্রী সরলে বালিকে !
ভূমিষ্ঠ সময়ে কোন হেরি সুলক্ষণ,
রাখিলেন তব পিতা মহাজ্ঞানবলে,
সুনীতি তোমার নাম সার্থক হইল।
মানব সমাজে আজ শত-শত মুখে
হইতেছে প্রতিধ্বনি এই ধরা মাঝে।
দেখালে সুনীতি তুমি যে সব ঘটনা,
দেখেও বিশ্বাস নহে কবির কল্পনা।
স্বর্গীয় ললনা হায় ! শাপভ্রষ্টা হয়ে
এসেছিলে মহীতলে ক' দিনের তরে।
জগদীশপদে মন করি সমর্পণ
হৃদয়মন্দিরে স্থাপি স্বামীর মূরতি !
শাপমুক্ত হয়ে গেলে সতী-শিরোমণি,
মণিহারা হ'ল তব জনক-জননী।"

তিনি ইহাও বলিতেন সুনীতিকে শিক্ষা দিতে লজ্জা পাইতে হয়, সুনীতি অনেক সময় শিক্ষার এরূপ কৌশল বাহির করিয়া লয় যে, তাহাতে অতি সহজে শিক্ষা অক্ষয় ও দৃঢ়মূল হইয়া পড়ে। একদিন তিনি পুংলিঙ্গ 'বান্' স্থলে, স্ত্রী লিঙ্গে কি হবে প্রশ্ন করায়, সুনীতি—ভগবান্ ভগবতী, ফলবান্ ফলবতী, মালাবান্ মালাবতী, বলবান্ বলবতী, রূপবান্ রূপবতী প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশটী শব্দ তখনই বলিয়া ফেলিলেন। সমপাঠার্থিনীগণ একদিনেই যাহা শিখিলেন তাহা আর সহজে ভুলিবার নয়।

সুনীতি বিদ্যালয়ের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতা পিতারও অনেক গ্রন্থ পাঠের সাহায্য করিতেন। সতীশতকের অনেক জীবনী তিনি নিজে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সমস্ত, সংহিতা প্রভৃতি সর্ব্বদাই পাঠ করিতেন এবং তাহা হইতে 'সত্য' 'নীতি' ও ধর্ম্ম বিষয়ে যে যে স্থান মূল্যবান্ বোধ করিতেন, সেই সেই স্থানে চিহ্ন দিয়া তাঁহার পিতাকে তাহা উদ্ধৃত করিতে বলিতেন। এক দিবস তাঁহার পিতা একটী শ্লোকের তৃতীয় চরণ পূরণ করিবার জন্য মহাচিন্তায় নিমগ্ন, আহারের সময় অতীত হইতেছে তথাপি শ্লোকটী পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। বালিকা সুনীতি তাঁহার পিতাকে অনুরোধ করিয়া শ্লোকের ভাবার্থ বুঝিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা, কন্যা দ্বারাই মায়ের পরিচয়" এই কথাটিকে সংস্কৃত করিলেইত হইতে পারে। অমনি তিনি উৎফুল্ল চিত্তে শ্লোকটীর তৃতীয় চরণ পূরণ করিয়া লইলেন এবং ঐ গ্রন্থ খানার নামও "সুনীতি শতকম্" রাখিলেন। শ্লোকটী এই—

"ফলেন জ্ঞায়তে বৃক্ষঃ পুত্রেণ জ্ঞায়তে পিতা।
কন্যায়া জ্ঞায়তে মাতা কর্ম্মণা জ্ঞায়তে নরঃ॥"

আর এক দিবস মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যতীর্থ পণ্ডিত মহাশয় "মালতীমালে"...নামক একটী শ্লোক তাঁহার ভগিনী মালতীকে উপহার দেন। সুনীতি তাহার বঙ্গানুবাদ শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, একটু পরিবর্ত্তন হইলে যেন ভাল হয়। গুণগ্রাহী শাস্ত্র-তেজঃপুঞ্জঝলসিত

সুবিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর তাঁহাকে কোলে লইয়া তাঁহার গণ্ডদেশে করাঘাত করিয়া সহর্ষে বলিলেন,"বেশ, তুই আমার মত পণ্ডিতের ভুল ধরিলি, তুই দেবী, তুই অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাবি ;" অমনি সুনীতির ভাবেই শ্লোকটী পূর্ণ করিলেন। আজ সেই জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাক্য বরে পরিণত হইল। সুনীতির হেঁয়ালী রচনায় বড়ই উৎসাহ ছিল এবং বসুমতী আফিসের প্রকাশিত "হিন্দু-সর্ব্বস্ব" বই খানা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। সুনীতিকে কেহ কেহ সুহাসিনী ও সুভাষিণী ডাকিতেন। গুরুজনে ও দেব দ্বিজে তাঁহার

ভক্তি

অত্যন্ত ভক্তি ছিল, যে কোনও ব্রত বা পূজার দিবস প্রাতঃস্নান করিয়া অতি পবিত্রভাবে ফুল-দূর্ব্বাদি পূজার সমস্ত উপকরণ নিজে সংগ্রহ করিতেন এবং পূজাদি সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত কখনই জল গ্রহণ করিতেন না। ৺শারদীয়া পূজার পুরোহিতগণ কেবল সুনীতি-মুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিতেন, তাঁহারা বলিতেন, এক সুহাসিনী দ্বারাই প্রত্যহ পূজার সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। বালিকা পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেবালয়ে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকিত এবং দেবী-প্রণামাদি জপ করিত। দেবতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। প্রতি মঙ্গলবারে স্থাপিত দেবালয়ে কদলি দান করিয়া আহার করিত। তীর্থ দর্শনের জন্য পাগল ছিল। একদা ৺ চন্দ্রনাথতীর্থ যাওয়ার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাকে সঙ্গে না নিয়া নিজে চন্দ্রনাথ রওয়ানা হইয়া যান, সতী বলিয়াছিলেন. বাবাও এবার যাইতে পারিবেন না। বাস্তবিক

কাজে তাহাই হইল, তিনি নারায়ণগঞ্জ গিয়াও এমনই এক বিচিত্র ঘটনায় জাহাজে আরোহণ করিতে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসেন। ব্রাহ্মণে বড়ই ভক্তি ছিল, সে শূন্য হাতে ব্রাহ্মণবাড়ীতে যাইতে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইত। লক্ষপতি ব্যক্তিকেও তাহার প্রিয় অতি সামান্য ফল মূল দিতে শঙ্কিত হইত না। তাহার পিতা মাতা নিষেধ করিলেও ভক্তিভরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু পূজ্য ও পবিত্র লোককে বিতরণ করিত। তাঁহারাও আহ্লাদ সহকারে শিশুর দান বলিয়া গ্রহণ করিতেন, বালিকার ভক্তিগদ্গদ্ চিত্ত দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন। বাড়ীতে ব্রত পূজা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইলে সতীর চিত্ত যেন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিত। তাঁহার এত দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল যে মন্ত্রাদি একবার মাত্র শ্রবণ করিয়াই শিখিতে পারিতেন। ৺কামাখ্যার বাড়ীতে পাণ্ডার মুখে অস্পষ্ট ভাবে শুনিয়াও প্রণাম দুইটী কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর-বাড়ীতে বৎসরে একমাস স্থাপিত দেবতার পূজা হইত। সেই সময় আসিবার পূর্ব্বে আপনা হইতেই তথায় উপাস্থিত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা মনে করিয়া প্রত্যহ পদবন্দনা করিতেন। তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী তাঁহার ভক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। শ্বশুরের পাদোদক পান করিতেন। তাঁহারাও সাংসারিক প্রায় সমস্ত কাজেই এই বালিকার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বালিকার প্রগাঢ় ভক্তিতে তাঁহার শ্বশুরালয়ের সমস্ত পূজ্য ব্যক্তিগণই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

ছোট ছোট দেবর ননন্দেরা তাঁহাকে সর্ব্বদাই প্রাণের সহিত ভালবাসিত। গ্রামবাসী সমস্ত লোকই তাঁহার ভক্তি ও গুণের প্রশংসা করিয়াছেন।

দয়া ও দৈববল

তাঁহার প্রাণ অন্যের দুঃখ দেখিয়া গলিয়া যাইত, শৈশবেই কোনও কোন দিন শীতকালে রাস্তার ছেলেদিগকে নিজের কাপড় খানা দিয়া অবস্ত্র অবস্থায় দৌড়িয়া আসিত। একদা একটী মুসলমান কৃষককন্যার হাত কাটিয়া দ্রুত বেগে রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া নিজের নূতন বসন ছিঁড়িয়া তাহার হাতে জলপটি দিয়া আসিয়াছিল। পাড়ার কাহারও অসুখ হইলে সে অস্থির হইত, এমন কি তৎসম্বন্ধে রাত্রিতে স্বপ্নাদিতে আদেশ লইয়া ঐ প্রকার ঔষধ দিত। একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের * একটী ছেলে জ্বর ও রক্তামাশয়ে অত্যন্ত কাতর হন্; পিতামাতা ব্যাকুল হইয়া পড়েন, জীবনের আশাই কম ভাবিয়া তাঁহারা অস্থির হন্। তখন সতীর প্রাণ বিগলিত হইল, তিনি প্রাতে দেখিলেন ঐ বালক আরোগ্য হইয়াছে। ঐ সংবাদ তাঁহার পিতা মাতাকে জানাইয়া দিলে তাঁহারাও উহার কথায় অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন। তৎপর সুহাসিনী স্বয়ং কামাখ্যা-পীঠের জল নিয়া দিয়াছিলেন। কি অলৌকিক কাণ্ড! তম্মুহূর্ত্ত হইতেই বিদ্যুদ্বেগে রোগ বিদূরীত হইল, বালক আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। বালকের পিতা সেই দিন হইতেই তাঁহার

* শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ছেলে কাতর হন্।

কথা সত্য হয় বলিয়া সুহাসিনী নামের স্থলে সুভাষিণী নাম রাখিয়া ছিলেন, তিনি বড় আদর করিতেন, তিনি তাঁহার জন্য শোকে হর্ষে বহুক্ষণ অশ্রু মোচন করিয়াছেন।

অন্য একটী প্রতিবাসীরও একটী ছেলে ২০।২৫ দিন পর্য্যন্ত জ্বরে মুমূর্ষু হইয়া পড়ে, তাঁহার পিতামাতার সম্পূর্ণ আদেশ না পাইয়াও সতী কামাখ্যাপীঠের জল দিয়া আসিয়া বলিয়া ছিলেন "জ্বর ছাড়িবে।" বাস্তবিক সেইদিন হইতেই তাহারও জ্বর পরিত্যাগ হইয়াছিল।

সতীর বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই ভাবী পতির জ্বর হয়, বিবাহের দিন প্রথম রাত্রিতেও ৫ ডিগ্রী জ্বর ছিল। সতী রাত্রি আট ঘটিকার সময় তথায় পৌঁছেন। কি অদ্ভুত লীলা! তখন হইতেই তাঁহার জ্বর পরিত্যাগ হয়। ঐ রাত্রিতেই মধ্য-ভাগে উভয়ের বিবাহবন্ধন সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার স্বামীর আর জ্বরাদি কোনও প্রকার পীড়া হয় নাই। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাকে ম্যালেরিয়া দ্বারা সর্ব্বদাই আক্রান্ত হইতে হইত। বিবাহের পরে তিনি নীরোগ হন্।

ঈশ্বরচন্দ্র দে নামক এক ব্যক্তি বহুকাল জ্বর ও ঔদরিক প্রভৃতি পীড়ায় জীবনের আশা পরিত্যাগ করে; কিন্তু একদা সে এই সতী বালিকার ভুক্তান্ন সেবন করিতে স্বপ্নাদেশ পায়. চলিবার শক্তি না থাকা অবস্থায়ও বহুকষ্টে আসিয়া পরমাহ্লাদে সতী-দত্ত অন্ন আকণ্ঠ ভোজন করে। সতীর পিতা মাতা তাহাতে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু

সতী তাহাকে যথেচ্ছা আহার করান। বিধির লীলা অন্যের বুঝিবার শক্তি কি? ঐ ভোজনের পর হইতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আর কোনও প্রকার ঔষধ সেবন করিতে হয় নাই। বৃদ্ধ এখন যুবকের ন্যায় নীরোগ দেহে জীবিত আছে। ঢাকায় এক পীর সাহেব আছেন, তিনি আব্দুল হেকিম্ নামক তাঁহার এক শিষ্যকে একটী "ক্ষুদ্র দ্বীপ" আছে বলিয়া এই সতী বালিকার জন্মস্থান দর্শন করিতে পাঠাইয়াছেন। সে আজ তিন বৎসরের কথা। তখন তাঁহার কথা আমরা প্রলাপোক্তিস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। এখন সবই বুঝিতে পারিলাম। ধন্য পীর! ধন্য শিষ্য!! আর ধন্য আমাদের সতী সুনীতি!!!

দৈবশক্তি ও ভক্তি ব্যতীত এ অলৌকিক কার্য্য কখনই হইতে পারে না। সাবিত্রী, সতী, সীতা, শৈব্যা, মালাবতী, মনোরমা, অরুন্ধতী, অনসূয়া, চিন্তা ও দময়ন্তী প্রভৃতি সতীদের ন্যায় ইনি ঐকান্তিক স্বামিভক্তি-প্রভাবেই এই জড় দেহকে অকাতরে অগ্নিদগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গৃহকার্য্য, তদ্জ্ঞান ও স্বাস্থ্য

বালিকার ফুলে বড় ভালবাসা ছিল, যে খানে যে ফুলগাছ থাকিত তাহা বড় লোকের বাসায় হইলেও অনেক চেষ্টা করিয়া চাহিয়া তাহার নিজের বাগানে আনিয়া রোপণ করিত। তাহার বাগানে এত ফুলাদি হইত যে সরস্বতী পূজায়ও ঐ সমস্ত ফুল ব্যয়িত হইত না। সর্ব্বদাই নানা প্রকার শাক শব্জী আম কাঁটাল

প্রভৃতি গাছের প্রতি অত্যন্ত যত্ন ছিল। এমন কি ধানের গাছ রোপণ করিয়া তাহার পক্ক শীষ্‌গুলি পরম যত্নে আটি বাঁধিয়া রাখিয়া দিত। ছোট ছোট ভাই ভগিনীকে এমন কৌশলে কান্না বারণ করিত ও শিক্ষা দিত যে তাহা জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিরও. অসাধ্য বোধ হইত।

রোগীর শুশ্রূষায় তাঁহার পরম উৎসাহ ছিল, এমন কি বিবাহের দিনও ছোট ভগিনীর জন্য ঘি ও ধূপ দ্বারা শতবার ধৌত করিয়া এক মাসের পোড়ার ঔষধ বানাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তাহার নিজের পাঁচ বৎসরের পর হইতে আর কোনও পীড়া হয় নাই। একবার একটা মাত্র স্ফোটক হইয়াছিল। তাহার শরীর অত্যন্ত বলবান্, হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যশীল ছিল, মৃত্যুর সময়েও কফাদির প্রাবল্য দৃষ্ট হয় নাই। সর্ব্ব প্রথমে প্রাতরুত্থান করিয়া তাহার পিতার সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য কোশাকুশী মার্জ্জন ও ধূপাদি প্রদান করিত, একদিনও তাহার ভুল হওয়া মনে পড়ে না।

বাল্যাবস্থা হইতেই সুগন্ধ ব্যবহারে তাহার বড় অনুরাগ ছিল, কিছুতেই দূষিত বায়ু সেবন করিতে পারিত না। মুক্ত ও সুগন্ধ বায়ু তাহার এত আদরের ছিল যে, কেবল নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ বায়ু গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি পাইত না, মুখ দ্বারাও গ্রহণ করিত। নৌকাদিতে গমনকালে মুক্ত বায়ুর জন্য প্রায়ই বাহিরে বসিয়া থাকিত। তাঁহার শয়নকোঠায় কেবল তাহার অনুরোধেই নয়খানা জানালা ও দুইখানি দরজা রাখা গিয়াছে। সে

নিজে 'এলোকেশী' নামক সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। বাজারের দ্রব্য ব্যবহারে তাহার প্রবৃত্তিই হইত না। সে বলিয়াছিল 'ছোট ছোট ভাই ভগিনীকে আমি সবরকম কোর্ট, শার্ট, সেমিজ, জ্যাকেট বানাইয়া দিব, কখনও খরিদ করিতে দিব না'। প্রকৃতপক্ষে তাহাই করিয়াছিল। তাহার প্রস্তুত কাপড় দোকানের কাপড় হইতে অনেক ভাল ও দৃঢ় হইত। তাহার মিষ্টান্নাদি এত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং সুস্বাদু হইত যে, বড় বড় ব্যাপার ব্যতীত কখনও দোকানের জিনিষ গ্রহণ করা হইত না। বালিকা তাহার পিতামহীকে একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি এত তাড়াতাড়ি সুস্বাদু পাক কিরূপে করেন? বিনা মসল্যাও আপনার পাকে সুঘ্রাণ হয় কিরূপে?" তিনি বলিতেন "তুই তোর স্বামীকে ভক্তি করিস্, তবেই পাক ভাল হইবে।" তখন বড় লজ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু কাজেও বোধ হয় তাহাই করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র বধূর পাকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয় স্বজন সকলেই বড় প্রশংসা করিতেন।

বাল্যকালে সবজজ শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত রায় মহাশয়কে এরূপভাবে মিষ্টান্নাদি পরিবেশন করিয়াছিল যে, তিনি মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, এই "মেয়ে মানুষ নয়"। সেই পুণ্যাত্মার কথা এত দিনে সত্যই বুঝিতে পারিলাম।

তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান কত, "কামাখ্যা" প্রবন্ধে তিনি জন-প্রাণিশূন্য জলময় প্রান্তর ও বৃহৎ নদী দেখিয়া লিখিয়াছেন। "ষ্টেসনগুলির নামও তদ্রূপ নদীচর জাতীয় অর্থাৎ "রুইমারা"

"চিলমারা", 'খাইট্যা মারা" ইত্যাদি। যাহা হউক, বেলা ১২ ঘটিকায় একটা বড় ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, সেটাও বোধ হয় "ডুবুরী" (ধুবড়ী)।" * হায়! আমরা লেখিকার ভাব বুঝিতে না পারিয়াই 'প্রুফে' শুদ্ধ করিয়াছিলাম "ধুবড়ী"। প্রকৃত পক্ষে, "ডুবরী" লিখাটী রাখিয়া দিলে কত ভাবুকতা, কত ঐতিহাসিক বিচিত্রতা বিকাশ পাইত!! আমরা পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারিলাম কৈ?

সতী সর্ব্বদাই বড় প্রফুল্ল থাকিতেন, তাঁহার কোনও কার্য্যে ভয় বা হতাশ্বাস ছিল না। ভয় ছিল বড় নিন্দকের। নিন্দকের পাশ দিয়া যাইতেও বড় ভীত হইত। সর্প হইতেও পরনিন্দা-কারী দলকে বড় ভয় করিত। একদা তাহার পিত্রালয়ের 'ঝী' তাহার শ্বশুর বাড়ীর কোনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়া নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া সতী রাগান্বিত হইয়া ঝীকে বলিল "তুমি ওসব কথা বলিও না"। তথাপি ঝি আবার তাহা উল্লেখ করায়, ভয়ানক দুঃখাবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার জননীকে বলিয়া ছিলেন, "ঝী যদি ওরূপ করে তবে তাহাকে রাখিতে পারিবেন না। আমি নিন্দাবাদ সইতে পারিব না।" তাঁহার মাও হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তুই সতী হইয়াছিস্।" স্বামীর বাড়ীর নিন্দা সতীর প্রাণে কিরূপ লাগে তাহা এই বিষয়টী দ্বারাই বেশ জানা গেল।

---

* "আর্য্যগৌরব" চৈত্র সংখ্যা ১৯১৩ সন।

উপসংহারস ১৩১৭ সনের ১১ই ফাল্গুন ময়মনসিংহ সদরের এলাকায় খারুয়া গ্রামে মনোরঞ্জন চৌধুরীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার স্বামীর যে রাশি নক্ষত্র, ইহারও সেই পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ও মিথুন রাশিতে জন্ম হয়।

তাঁহার পিতাই জন্ম পত্রিকা বিচার করিয়াছিলেন। মৃত্যু-কালীন তাহার স্বামীর বয়স ২৩ বৎসর কয়েক মাস ছিল। তাহার স্বামী সেটেল মেণ্টের নাজির হইয়া নান্দাইল কেম্পে ছিলেন। ১৩১৯ সনের ১০ই আষাঢ় সোমবার গর্ভাধান হইয়াছিল, তখন অম্বুবাচী ছিল, সতী সেরপুর ছিলেন। তাঁহার স্বামীর নিকট চিঠি পত্র লেখা অথবা তাহার চিঠি পত্র পাঠ করা প্রায়ই লোকচক্ষুর অগোচরে হইত। তাঁহার স্বামীও কখন কাহারও নিকট পত্নীবিষয়ে আলাপ করিতেন না। তিনিও তাঁহার ছোট ছোট ভাই ভগনীর নিকট পতির পত্রাদি বা তৎ সম্বন্ধীয় কোনও বিষয় প্রকাশ করিতেন না। তাঁহা-দের প্রেম ভালবাসা ভক্তি স্নেহ শ্রদ্ধা সবই অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় অতি গুপ্ত ও নির্ম্মল ছিল। ১৩২০ সালের ১০ই পৌষ তাহার স্বামীর সামান্য রকমের পেটের অসুখ হয়। ১১ই পৌষ তাহার বাড়ীতে সংবাদ যায়, তাঁহার মাতাপিতা পুত্রের নিকট আসেন, ঐ রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সতী পাগলিনীর ন্যায় বাড়ীতে থাকিয়া ছট্ ফট্ করিতে থাকেন। একবার একটী বালককে নিয়াই পদব্রজে অসূর্য্যম্পশ্যা বধূ ছয় ক্রোশ পথ যাইবার মানসে রওয়ানা হইয়া ছিলেন। বাধা

পাইয়া ফিরিয়া যান এবং স্বামীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হন্। এই সংবাদ শ্রবণের পর তাঁহার চক্ষের জল শুকাইয়া যায়, অবগুণ্ঠনও রহিত হয়, জল কি স্থল ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। লোকে তাঁহাকে ঘাটে স্নান করাইতে নিয়া গেল জলের নীচেই বসিয়া থাকেন, অথচ অন্যান্য লোককে প্রবোধ দিয়া বলেন, ইহাত কাঁদিবার বিষয় নয়। সতীর অবস্থা দেখিয়া অনেকে পাহারায় ছিলেন, কিন্তু সতীর উদ্দেশ্যে কে বাধা দিতে পারে? ঐ রাত্রিতে তিনি সকলের অলক্ষিতে শয়ন ঘরের বাহিরে চিতা সজ্জিত করিয়া পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নির কোলে বসিয়া থাকেন। পূবের ঘর হইতে তাঁহার খুড়াশ্বশুর এবং দক্ষিণের ঘর হইতে তাঁহার দেবর যুগপৎ আলোক দর্শনে বাহিরে আসেন। দেবর কিন্তু দাদাকেও সতীর সঙ্গে দেখিতে পায়। তৎপর কিরূপে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, সতী যে অগ্নিনির্ব্বাণকারিগণকে প্রাণপণে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি যে বলিয়াছিলেন অগ্নি শীতল, তোমরা স্পর্শ করিও না, তাঁহার যে জড়দেহের মায়া মমতাই ছিল না, তিনি যে স্বামিভক্তি ও ঈশ্বর-উপাসনা বলে দৈবী শক্তি লাভ করিয়া অগ্নির উষ্ণতাকে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। কিশোরগঞ্জ (সোমবার) আসিয়া যে তিনি সতীর কর্ত্তব্য কি, সতীর দৈবজ্ঞান, অলৌকিক সংযম, অসাম শক্তি দেখাইয়া সংসারের অনিত্যতা, জীব মাত্রই মরণশীল, সকলকেই দেহ ত্যাগ করিতে হয়, ইত্যাদি জ্ঞান-গর্ভ বিষয় তাঁহার পিতা মাতাকে বলিয়া দিয়া ছিলেন এবং

পরের দিন মঙ্গলবারে খাওয়ার পূর্ব্বেই অমরধাম চলিয়া যাইবেন, তিনি বহুদূরে রহিয়াছেন এসব বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করাগিয়াছে। তাঁহার কেবল মনটা স্বামিগত ছিল না, দেহও স্বামিগত ছিল। ঠিক পরের দিন তাঁহার আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিল, সুদীর্ঘ চুল তৎপূর্ব্বেই পুড়িয়া গিয়াছিল, (চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি নবদ্বার ব্যতীত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই বিদগ্ধ হইয়াছিল) মুখের আকৃতি ঠিক তাহার স্বামীর মুখের গঠনে পরিণত হইল, বর্ণও কৃষ্ণ বর্ণ হইল (তাঁহার স্বামী কালবর্ণ ছিলেন), নাসিকা চেপ্টাকার হইয়া গেল; আমরা স্তম্ভিত হইলাম। ক্রমেই সতীর কথিত সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তিনি তখনও শিবশত নাম জপ করিলেন এবং 'নয়নে' 'নয়নে' শব্দ বলিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতামহ (১) ও পিতামহীকে দেখিতে লাগিলেন; সতী বলিলেন "ঐ যে ঠাকুর দাদা, ঐ যে ঠাকুর দুদু" আসিয়াছেন। তখন তাঁহার দেহের কান্তি 'অবাঙ্‌মানসগোচর' হইয়া ছিল। ঠিক যখন তৃতীয় বেলা (অর্থাৎ সতীর পূর্ব্ব কথিত পরের দিনের খাওয়ার পূর্ব্ব সময়) উপস্থিত হইল। সেই শুভলগ্নে পরমানন্দে সতী আপন ইচ্ছায় স্বামীর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া ১৩২০ সনের ১৫ ই পৌষ বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় পনর বৎসর বয়স

---

(১) সতীর পিতামহ রামগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় প্রায় ৪৩ বৎসর হইল স্বর্গীয় হইয়াছেন। তিনিও অতি সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। সর্ব্বদাই গোমূত্র ও গোময় দ্বারা স্নান করিতেন। তিনিও বিনা রোগে অতি সদ্‌জ্ঞানে স্বর্গীয় হইয়াছিলেন।

পূর্ণ হওয়া মাত্রই শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে স্বর্গারোহণ করেন। জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, সতী আমাদিগকে ইহাই দেখাইয়া গেলেন। সতী দ্বারা যে সকলই সম্ভবপর তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। আজ সতী চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি চির দিন রহিয়া যাইবে। তাঁহার পিতা সতীর চিতায় একটী মঠ দিয়া তাহাতে সতীর নামাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযামিনীকুমার বিদ্যাবিনোদ।

প্রার্থনা।

তোমার কৃপায় আসি এ ধরায়
পেয়েছি স্নেহের জননী আমার।
ভাই বোন যত সখা সখী কত
স্নেহ ভালবাসা কত সবাকার।
মাতৃগর্ভ হ'তে এসে অবনীতে
মায়ের স্তনে পেয়েছি জীবন।
সকলি তোমার করুণা অপার
ওহে দয়াময় পতিত-পাবন!
তোমারি নিদেশে উদিত আকাশে
রবি শশী গ্রহ তারা অগণন।

করিছে আপন কর্ত্তব্য পালন
নাহিক বিরাম কি মহা-সাধন।
মৃদু সমীরণ বহি অনুক্ষণ
সৌরভে মাতায় জগত-পরাণ।
বিহগ-নিকর কিবা মনোহর
গায়িছে নিয়ত তব গুণগান।
স্রোতস্বিনী-গণে প্রেমকান্ত সনে
করিছে তোমার মহিমা কীর্ত্তন।
মনের হরষে প্রিয়ার পরশে
করিছে সাগর প্রিয়-সম্ভাষণ।
আমি দীন হীন শকতি বিহীন
কেমনে গাহিব মহিমা তোমার।
অজ্ঞান বালকে জ্ঞানের আলোকে
দূর করে দাও মোহের আঁধার।
অপরাধ কত করেছি সতত
লক্ষ্যহারা হ'য়ে এ ভব-ভবনে।
ক্ষম দয়াময় পতিত-আশ্রয়!
স্থান দিয়ে তব রাতুল-চরণে।

শ্রীমনোমোহন মজুমদার।

ব্যথা।

(১)

কাহাকে বলিব হৃদয়ের ব্যথা
তেমন আমার কে আছে ধরায় ?
যাহাকে বলিলে মরমের কথা
আমার তাপিত পরাণ জুড়ায় ?

(২)

খুঁজিয়ে দেখেছি এ ভব মাঝারে
নাহি কেহ মম এ ব্যথার ব্যথী,
জনে জনে মোরে যায় ত্যাগ ক'রে
যাকে ভাবি আমি বিপদের সাথী।

(৩)

ভেবেছিনু তা'রে জগত মাঝারে,
একমাত্র মোর জীবনের তারা।
হায় হায় এবে অকূল পাথারে
ত্যজিছে আমায় ক'রে পথহারা।

(৪)

কত শত বার কত শত জন
গিয়েছে চলিয়া পথহারা ক'রে,
আবার উঠেছি করিয়ে যতন
আবার এসেছে দু'দিনের তরে।

(৫)

কতনা যতন করিছে আমায়
স্বীয় সুখ দুঃখ সকলি ত ভুলে,
কালের শাসনে, দৈন্যের দশায়
আবার সকলি গিয়েছে চ'লে।

(৬)

সম্পদ্ সময়ে সদাই নিরখি
সকলেই আমার প্রাণের বন্ধু,
বিপদ্ সময়ে দেয় তারা ফাঁকি
তরাইতে কেহ নাহি ভব-সিন্ধু।

(৭)

জেনে শুনে তবে কেন ওরে মন
মানব-পিছনে ঘুর অনিবার,
স্বার্থময়-প্রেমে হইতে মগন
কেন এত সাধ হয়েছে তোমার ?

(৮)

নিকটে থাকিতে অতুল রতন
যাও দূরে কেন কাচের তরে,
বিভু-পদে মন কররে অর্পণ
বিরহ বিচ্ছেদ সবি যাবে দূরে।

(৯)

তুমিই আমার বিপদের সাথী
তুমিই আমার হৃদয়ের সব,
তুমিই আমার এ ব্যথার ব্যথী
তুমিই আমার সকল বিভব।

(১০)

দয়ার আধার তুমি দয়াময়
ক্ষমি অপরাধ তনয়ের যত
চরণকমলে রাখিও আমায়
জীবনে মরণে মধুকর মত।

শ্রীরজনীকান্ত বল মুন্সী।

অনিত্যতা।

কাহার কারণ এ ভব সংসারে
হ'তেছ চিন্তিত তুমি অনুক্ষণ;
বদ্ধ রহি সদা মায়ার বন্ধনে
কার তরে চিন্ত অসার সে ধন?
দেখ এ জগতে কে আছে তোমার,
"আমার আমার" বল সদা মুখে;
সুখের সময় সবাই তোমার,
হয় কি সহায় তোমার দুঃখে?

সুখের সময় কত কিছু বলি
তোমার শ্রবণ জুড়াইছে যারা,
ও সব কেবল স্বার্থের কারণ
অসময়ে কেহ আসিবে না তারা।
এমন বান্ধব আছেন তোমার
ইহ-পর-কাল উভয়ের সাথী,
ভুলেও চিন না রে মন আমার
এমন মরম-ব্যথার ব্যথী।
সে জন বিহনে নাহি কোন জন
বান্ধব জীবনে ভাবিও মনে,
সুখে দুখে সেই অনাথশরণ
ঢালে শান্তি-নীর তাপিত পরাণে।

শ্রীরজনীকান্ত বল মুন্সী।

কৃষি।

(৪৪১ পৃষ্ঠার পর)

(২)

আমরা পূর্ব্ববারেই দেখাইয়াছি, কৃষিই আমাদের জীবন-ধারণের মূল; কৃষি ব্যতীত আমরা অল্পদিনও বাঁচিতে পারি না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কৃষিব্যবসায়ীই ছিলেন; তাঁহারা দূরাগত আত্মীয় দর্শনমাত্রই কৃষির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন—"ধান্যস্য

কুশলং বদ" ; ইহাই প্রথম প্রশ্ন ছিল। পূর্ণাত্মা শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূটে তদনুজ ভরতকে দর্শনমাত্রই বহু শুভ প্রশ্নের সহিত বলিয়াছিলেন,........"যাহার প্রান্তদেশসকল সুন্দররূপে কর্ষিত ও গো মহিষ প্রভৃতি পশুগণে পূর্ণ এবং হিংসাদি পরিবর্জ্জিত, বৃষ্টির জলের অপেক্ষা না করিয়া নদীর জলদ্বারা যেস্থানে শস্য উৎপন্ন হয়, যাহা হিংস্রজন্তুবিহীন ও সর্ব্বপ্রকার ভয়শূন্য, যাহা সর্ব্বরত্ন প্রভৃতির আকর দ্বারা সুশোভিত, যাহা পাপশীল মানববিবর্জ্জিত, যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সুরক্ষিত, সেই সুরম্য শস্যক্ষেত্রযুক্ত জনপদ ভাল আছে ত? বৎস, কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারিগণের প্রতি সন্তুষ্ট আছ ত? সম্প্রতি সেই সব লোক কৃষি-বাণিজ্য-বিষয়ে অনায়াসে সমৃদ্ধিশালী হইতেছে ত? সেই সকল কৃষি-জীবীদিগের ইষ্টলাভ ও অনিষ্টপরিহার দ্বারা তুমি তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতেছ ত? যেহেতু রাজ্যবাসী প্রজামাত্রেই রাজার রক্ষণীয়।"

বাল্মীকিরামায়ণ অঃ কাঃ ৪৪—৪৮ শ্লোক যথা—

প্রহৃষ্ট নরনারীকঃ সমাজোৎসবশোভিতঃ।
সুকৃষ্টসীমাপশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জ্জিতঃ॥ ৪৪
অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ।
পরিত্যক্তো ভয়ৈঃ সর্ব্বৈঃ খনিভিশ্চোপশোভিতঃ॥ ৪৫
বিবর্জ্জিতো নরৈঃ পাপৈর্ম্মম পূর্ব্বৈঃ সুরক্ষিতঃ।
কচ্চিজ্জনপদঃ স্ফীতঃ সুখং বসতি রাঘব॥ ৪৬

কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্ব্বে কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ।
বার্ত্তায়াং সাম্প্রতং তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে ॥ ৪৭
তেষাং গুপ্তি পরীহারৈঃ কচ্চিৎ তে ভরণং কৃতম্।
রক্ষ্যা হি রাজ্ঞা ধর্ম্মেণ সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ ॥ ৪৮

আমাদের রাজাও রামচন্দ্রের ন্যায় পরমদয়ালু এবং প্রজা-রঞ্জনে ও কৃষি-রক্ষণে অতিশয় যত্নবান্। তিনি আমাদের মৃতকল্প কৃষির উন্নতিকল্পে নিজ ব্যয়ে বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া, কখন কখন বা অল্প সুদে টাকা দিয়া ও বিনামূল্যে বীজাদি বিতরণ করিয়া প্রজাপালনের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন এবং আমাদের প্রাণস্বরূপ কৃষির উন্নতি ও রক্ষা করিতেছেন। আমরা মূর্খ, অকৃতজ্ঞ ও নির্ব্বোধ বলিয়াই রাজদত্ত অযাচিত করুণাকেও উপেক্ষা করত কৃষিবিষয়ে অমনোযোগী হইতেছি। আমাদের রাজা "গোময়-সার" রক্ষার জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু আমরা সেই পরম পবিত্র, সর্ব্বরোগ-নিবারক, সর্ব্বশস্য-উৎপাদক কল্প-রত্নস্বরূপ গোময়কে অবহেলা করিয়া নাক-শিট্‌কাইয়া ফেলিয়া দিয়া ফুলবাবু সাজিতেছি। আমরা প্রাচীন রীতি ত পরিত্যাগ করিয়াছিই, ওদিকে নূতন রীতিও অবলম্বন করিতে শিখি নাই। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপথও অতিক্রম করিতে পারি নাই; কেবল শূন্যে শূন্যে, শূন্যপ্রাণে, শূন্যজ্ঞানে, শূন্যোদরে ঘূর্ণায়মান হইতেছি। আমরা ধর্ম্মভয় ভুলিয়া গিয়া কর্ম্ম-ভয়কে আশ্রয় দিয়াছি, ভয়কে সযত্নেই রাখিয়াছি। কিন্তু

তাহা ধর্ম্মের সঙ্গে নয়, কর্ম্মের সঙ্গে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও পরম যত্নে গোময় রক্ষা করিতেন। মাঘ মাসে গোময় উদ্ধার করিয়া ক্ষেত্রে সার দেওয়া একটী পরম ব্রত ছিল। শাস্ত্র বলিতেছেন, যথা—

"মাঘে গোময়কূটন্তু সংপূজ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সারং শুভদিনং প্রাপ্য কুদ্দালৈস্তোলয়েৎ ততঃ॥
রৌদ্রে সংশোষ্য তৎসর্ব্বং কৃত্বা গুণ্ডকরূপিণম্।
ফাল্গুনে প্রতিকেদারে গর্ত্তং কৃত্বা নিধাপয়েৎ॥
ততো বপনকালে তু কুর্য্যাৎ সারবিমোচনম্।
বিনা সারেণ যদ্ধান্যং বর্দ্ধতে ন ফলত্যপি॥"

বাস্তবিক বিনাসারে ধান্য বৃদ্ধি হইলেও ফল হয় না। আমরা শাস্ত্র-বচনকে ত অগ্রাহ্য করিয়াই থাকি, রাজার আদেশও পালন করিতেছি না, এই আমাদের পরম দুঃখ। আমরা বাবু সাজিয়া পায়ের জুতা বক্ষে লইয়া বহন করিয়া যাইতে পারি;—ইহাতে আমাদের মান যায় না, জাতি যায় না, ফুলবাবুত্বের হানি হয় না;—হায় কি ক্ষোভের বিষয়! যে কার্য্যের জন্য রাজার এত যত্ন, যাহা আমাদের দেহ-পোষণের প্রধান উপাদান, সেই কৃষিকার্য্যোপযোগী 'লাঙ্গল', 'যোয়াল' বা 'মৈ' প্রভৃতি কি কোনও বাবু বহন করিয়া নিতে স্বীকৃত হইবেন? ভদ্র বাবুদের জুতা বহনের পরিবর্ত্তে কি লাঙ্গল বহন জাতি বা মান নাশের পক্ষে ঘৃণনীয় বটে? এ কুসংস্কার কি আমাদের দূর হইবার নয়? আমাদের রাজার ন্যায় শাস্ত্রও কৃষিকার্য্য

স্বয়ং করিতে আদেশ দিয়াছেন; কৃষিকার্য্যের উত্তমরূপ তত্ত্বাবধান করিলে উহা হইতে স্বর্ণ ফলে, আর উপেক্ষা করিলে দৈন্য আগত হয়।' মুনিগণ বলিয়াছেন,—"পিতাকে অন্তঃপুরে, মাতাকে পাককার্য্যে এবং গোপালনে আপনার ন্যায় লোক নিযুক্ত করিবে; কিন্তু কৃষিকার্য্য স্বয়ং করিবে, ইহা পিতা মাতা বা বন্ধু ব্যক্তি দ্বারাও চলিবে না।" যথা—

"ফলত্যবেক্ষিতা স্বর্ণং দৈন্যং সৈবানবেক্ষিতা।
কৃষিঃ কৃষিপুরাণজ্ঞ ইত্যুবাচ পরাশরঃ॥
পিতুরন্তঃপুরং দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসম্।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"

হায়! হায়! ভাবিতে প্রাণে আঘাত লাগে, বুক ফাটিয়া যায়—ভাষায় ব্যক্ত করিতে চক্ষু ফাটিয়া রক্ত পড়ে। কৃষক বলিলেই আমরা ষণ্ডা গণ্ডা কদাকার নিরেট মূর্খ কিম্ভুত কিমাকার একটা মানুষ পশুর মত বুঝিয়া বসি। এইত আমাদের বুদ্ধির গভীরতা—শিক্ষার বাহাদুরী—জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। আমি বলি, কৃষকই মানবের প্রধান—রাজর্ষি জনকই এক জন প্রধান কৃষক। কৃষক বহু জীব-পোষক, কৃষকই প্রকৃত জ্ঞানী—কৃষকই প্রকৃত বীর—প্রকৃত ধার্ম্মিক। যথার্থ কৃষক হইতে হইলে বহুবিধ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞান, কর্ম্মজ্ঞান, জ্যোতিষজ্ঞান, বৃষ্টিজ্ঞান উদ্‌ভিদ্‌জ্ঞান, উপাদানজ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নজ্ঞান, ভবিষ্যদ্‌জ্ঞান, গগনজ্ঞান, মৃত্তিকাজ্ঞান, বিবিধ লক্ষণজ্ঞান, আচারজ্ঞান, গোমহিষাদি পশু-লক্ষণজ্ঞান, এবং জীব,লতা, ক্ষার,জল,ভূমি,বৃক্ষ,

ফল, ধাতু ও গবাদি সর্ববিধ পশু-চিকিৎসাজ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কৃষকের একটীতে ভ্রম ঘটিলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পরে তাহা আর সংশোধন করা যায় না। খনার ন্যায় জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই "কৃষি" তাহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসেন। কৃষকের দিব্য-চক্ষু লাভ করিতে হয়; কখন বৃষ্টি হইবে, কখন রৌদ্র হইবে, কখন ঝড় হইবে, ইত্যাদি বহু বিষয় সম্বৎসর পূর্ব্বেই জানিয়া রাখিতে হয়।

আমাদের শাস্ত্র এসব বিষয় পরিষ্কাররূপে বলিয়াগিয়াছেন, পাঠকের ধৈর্য্যহানি ভয়ে সেগুলির বিশদ ব্যাখ্যা এবার দিতে পারিতেছি না। কৃষির মধ্যে সর্বপ্রধানই ধান্য, এবার ধান্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিয়াই প্রসঙ্গের শেষ করিব। প্রচুর পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইলে দেশের হাহাকার—দশের হাহুতাশ—দীনের হতাশ্বাস—অনেকটা বিদূরিত হইতে পারে। যে ধান্য ব্যতীত আমরা (বাঙ্গালী) জীবন ধারণে অক্ষম হই—যাহা আমাদের জীবনের নামান্তর মাত্র; "কলৌ অন্নগতপ্রাণাঃ" বলিয়া আমাদের শাস্ত্রকারগণও উপদেশ দিতেছেন। তথাপি আমরা সেই পরম অন্ন ধান্যের জন্য কিছুই যত্ন বা চিন্তা করি না—আমরা আফিংসেবীদের মত বৎসরে নয় মাসকাল নাকে তেল দিয়া ঘুমাইয়া থাকিয়া, মাত্র তিন মাসকাল যৎসামান্য যত্নে ধান্যের উৎপাদনে নিযুক্ত হই। তাহাতেও আমাদের সুশিক্ষিত শক্তিমান্, বুদ্ধিমান্, ধনবান্ এবং সমাজের ও দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বাদ পড়িয়া থাকেন। সুতরাং আমরা উদর পোষণ

উপযোগী ধান্য পাইবার আশা কিছুতেই করিতে পারি না। এই ধান্যোৎপাদন সম্বন্ধে মহাজ্ঞানবতী খনা বলিয়াছেন—

"শতেক চাষে মূলা, তার অর্দ্ধেক তূলা,
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনাচাষে পান।"

এই বাক্যানুসারে ধান্যের জন্য আমাদিগকে ক্ষেত্রে পঁচিশটা চাষ দিতে হয়। জ্ঞানীর বাক্য লঙ্ঘন করা কেবল পাপ নয়, সুফল পাওয়ারও প্রতিবন্ধক ঘটিবে নিশ্চয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কর্ম্মভয় আমাদিগকে জড়াইয়া রাখিয়াছে, কাজেই খনার বাক্য পালনে অক্ষম। এক্ষণে ধান্যক্ষেত্রে তিন চারিটী চাষ দিয়া অথবা কখন কখন বিনা চাষেও ধান্য রোপণ করা হয়। কাজেই আমরা শস্যও তদ্রূপ ভাবেই পাইয়া থাকি।

মহাজ্ঞানশীলা খনার বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। আরও একটী প্রবাদ আছে—"যত চাষ, তত আশ"; সুতরাং ভূমিকে বিশেষরূপে কর্ষণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। সকল পদার্থই (কি জীব, কি বৃক্ষলতা, কি মৃত্তিকা প্রস্তর) চর্ম্ম বা অন্যবিধ আবরণে আবৃত। তাহা ভেদ না করিলে পদার্থের স্বরূপত্বই উপলব্ধি হয় না। পৃথিবীর অন্ততঃ দুই হাত মৃত্তিকা খনন না করিলে তাহার হৃদয়নিহিত পীযূষধারা পান করিবার আশা করা বৃথাই বটে। আমাদের পরম স্নেহবতী সন্তানবৎসলা পুত্রপ্রাণা মাতৃদেবীও সন্তানের উপযুক্ত বদনাকর্ষণ ব্যতীত স্তন্য দানে অসমর্থা হন্। বসুমতীও আমাদের স্নেহস্বরূপিণী অমৃত-দায়িনী জননী, কিন্তু তিনিও উপযুক্ত কর্ষণ ব্যতীত পীযূষরূপ

সুফলদানে সমর্থা নহেন। মহাজ্ঞানী প্রবলশক্তিমান্ মহারাজা পৃথুই তাঁহাকে উপযুক্ত কর্ষণ করিয়া দোহনপূর্ব্বক অমৃতরাশি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা ১৩০৪ সনে দেখিয়াছি, যে যে স্থানে ভূমিকম্পে পৃথিবীর দেহ বিদীর্ণ হইয়া অঙ্গারাদি মৃত জীবদেহ উত্থিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে কখনও বা পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ শস্যও উৎপন্ন হইয়াছিল। এই প্রকারে ভূমিকে গভীরভাবে বিদীর্ণ ও উলট পালট করিতে হইলে, কিরূপভাবে কর্ষণ করিতে হইবে তাহাও শাস্ত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন। বোরযুদ্ধে বত্রিশটী গোরুদ্বারা গাড়ী চালাইয়াছে ইহা আমরা পরিজ্ঞাত আছি। বিশেষতঃ সহরে আট ঘোড়ার গাড়ীও দেখিতে পাই। সুতরাং ঋষিদের "আটটি গোরু যুতিয়া চাষ দেওয়াই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মবিধি", তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহারা দুইটী গোরুদ্বারা হালচাষ করা অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

"হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং ব্যবসায়িনাম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাম্॥"

আবার গোরুগুলি শরভের (হস্তীর) ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট, বৃহৎ ও নীরোগ হওয়া প্রয়োজন। সেই হলের ফালের পরিমাণই এক হাত কিংবা তদপেক্ষা পাঁচ অঙ্গুলি অধিক হইবে। যথা—

"পঞ্চাঙ্গুলাধিকো হস্তো হস্তো বা ফালকঃ স্মৃতঃ।"

পাঠক! দেখুন এইরূপে পঁচিশটী চাষ দিলে বসুমতী কি আর সুফল না দিয়া থাকিতে পারেন?

আজকাল বিলাতী লাঙ্গলের ফালও প্রায় তিন পোয়া হাত হইয়াছে। আমাদের ফাল ৩।৪ অঙ্গুলিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের যে প্রকার কঙ্কালসার গতপ্রাণ গোরুদ্বারা চাষ করা হয়, তাহাতে ফালের মুখ এক অঙ্গুলী হইলেও জুলুম হয়। আমাদের অযত্নে ও অতি লোভেই গো-বংশ ধ্বংস হইয়েছে।—

"অতি লোভে জাতি নষ্ট" এ কথাটী মিথ্যা নয়। প্রতি বৎসর ঢাকা ও ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে এবং ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশে বর্ষাকালে কত লক্ষ গোধন নিধন হয়, তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়—মনে হয়, মা বসুমতি তুমি দ্বিধা হও, তোমাতে প্রবেশ করিয়া শান্তি লাভ করি; এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না। দশ বৎসর পূর্ব্বে ত এরূপ গো-মড়ক ছিল না—শুধু খাদ্যাভাব—দীর্ঘকাল অনাহারই ইহার প্রধান কারণ। কেন এ প্রকার অনাহার ঘটিয়াছে তাহাও এ স্থলে বলা আবশ্যক। এতদঞ্চলে পূর্ব্বে একমাত্র বোর ধান্যই হইত। সে ধান্য কার্ত্তিক মাসে জালার জন্য বপন করিয়া অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত রোপণ করা হইত এবং তাহা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে কাটা ও গোলাজাত হইত। তখন (২০ বৎ পূর্ব্বে) প্রতি বিঘায় ধান্য ১৬/ হইতে ২০/ মণও হইত। তৎপর ঐ সব জমিতে বর্ষাকালে 'ঝরা' 'ফুট্‌কি' 'কলমী' প্রভৃতি বহুবিধ গো-খাদ্য ঘাস উৎপন্ন হইত। প্রত্যেক গ্রামের মাত্র ৷৷ জমি আবাদ ছিল, তাহাও হ্রদ বা বিলগর্ভজাত। উচ্চ ভূমিগুলি চিরপতিত থাকিত। বর্ষকালে ঐ সব উচ্চ

ভূমির উপরেও ৫।৬ হাত জল হইত, এখনও হয়। ঐ সব জমিতেই বর্ষাকালে ধানের ন্যায় অতি ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে ‘ঝরা’ ঘাস হইত, এমন কি তাহা ভেদ করিয়া ছোট লোকও চলিতে পারিত না। নৌকা চলাচলের নির্দ্দিষ্ট রাস্তা থাকিত, তাহাতেই জল দৃষ্ট হইত, নতুবা সব হাওর তৃণে ঢাকা থাকিত।

ঐ সব হাওরের ঘাস নিয়াই বর্ষাকালে গোরুকে দিত, গোরুগণ তাহাই পরমানন্দে আহার করিয়া সবল ও হৃষ্ট পুষ্ট থাকিত এবং অবশিষ্ট ঐ সব ঘাস পচিয়া অন্যান্য জমিতে এত সার উৎপাদন করিত যে, তদ্দ্বারা ভূমির চরম উৎকর্ষ সাধন হইত এবং তাহারই ফলে প্রতি বিঘায় প্রায় ২০/ বিশ মণও ধান্য হইত। এক্ষণে এই বিস্তৃত ভূভাগে একটী তৃণও দৃষ্ট হয় না—বর্ষাকালে কেবল শ্বেতবর্ণ জলরাশি ঊর্ম্মিমালা লইয়া খেলা করিতে থাকে। পূর্ব্বে যে স্থানে ঘাসের জন্য নৌকা চলিতে পারিত না, এখন সেখানে ঢেউয়ের জন্য নৌকা ডুবিয়া যাইতেছে। কত লোক পুত্র-পরিবার সহ অকালে অতলে ডুবিয়া যাইতেছে, তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে? আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই লোক ও গোরুক্ষয়কর ভীষণ ব্যাপার নিরাকরণ মানসে কয়েকটী উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছি। তাহাতে এক দিকে যে প্রকার কৃষির বৃদ্ধি হইবে, অপর দিকে বর্ষায় বহু পরিমাণ ঘাস উৎপন্ন ও ঢেউ নিবারিত হইবে। কাহাকেও আর ভীষণ তরঙ্গে পড়িতে হইবে না।

ঐ সব ঘাস কেন নির্ম্মূল হইল তাহাও উল্লেখ না করিয়া

পারিতেছি না। দেশে পাটের চাষ আসিলে অত্যুচ্চ ভূমিতে আগুন দিয়া ঘাস পোড়াইয়া পাট বপন করে। পূর্ব্বে ঐ সব দেশে জীবিত ঘাসের উপর আগুন দেওয়া বড় পাপ মনে করিত এবং কেহই দিত না। ক্রমে পাটের সময়ে ফাল্গুন চৈত্র মাসে নিম্ন ভূমিগুলিও পোড়াইয়া তাহাতে বাওয়া ধান বপন করিতে লাগিল। তখনও চারিদিকে কিছু কিছু ঘাস থাকায় কয়েক বৎসর ঢেউয়ে নষ্ট করে নাই। কাজেই এক রকম ভাবের ফসল হইয়াছিল, প্রতি বিঘায় ৭।৮/ সাত আট মণ হইত। ঐ ধান্য অগ্রহায়ণ মাসে পরিপক্ক হইত। একের দেখাদেখি অন্যেরাও ঐ প্রকারে পোড়াইয়া বাওয়া জমি আবাদ করিয়া লইল। বোর জমির প্রতি আর কাহারও একদাই মনোযোগ নাই। এখন সকলেই বাওয়া করে, একটীও তৃণের ক্ষেত্র নাই যে ধান্যজমিকে রক্ষা করে। বাস্তবিক "ধানের রক্ষক বন, বনের রক্ষক ধান" এই প্রবাদটী কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। এখন বনও নাই, ধানও নাই। সকল জমিতেই চৈত্র বৈশাখে ধান বপন করে, আর জ্যৈষ্ঠের জলে ডুবিয়া যায়, শেষে কেবল ঢেউ খেলিতে থাকে। ধানত ডুবিয়াই যায়, বনও আর জন্মায় না। কয়েক বৎসর যাবৎ এই প্রকাণ্ড ভূভাগে কিছুই ধান হয় না, গোরুরও ঘাস নাই, তাইত এত গোমড়ক হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা ইহার প্রতিকারের কথাই বলিতেছি। ঐ সব বাওয়া জমির স্থান বোর জমি হইতে একটু উচ্চ। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেই শুকাইয়া উঠে। ঐ সব অঞ্চলে ভাদ্র মাসের

সংক্রান্তিতে "বুড়াই বুড়ি" নামক ব্রত হয়, ঐ ব্রতের সময় ধান্যের জালা প্রস্তুত করা প্রধান নিয়ম। এই চির ক্রমাগত নিয়মটী রক্ষা করিলে সর্ব্বাংশে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারা যায়। শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছেন—

"যাং বৃত্তিং বর্ত্ততে তাতো যাশ্চ নঃ প্রপিতামহঃ।
তাং বৃত্তিং বর্ত্তসে কচ্চিদ্ যা চ সৎপথগা শুভা॥"

"পিতা পিতামহগণ যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তুমিও সেই শিষ্টগণের অনুষ্ঠানপথগামিনী কল্যাণদায়িনী বৃত্তিকে আশ্রয় কর।"

আমরাও বলি, হে মহাত্মা কৃষকগণ! আপনারাও সেই পুরুষানুক্রম নিয়মটী পালন করিয়া ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যে বোর ধান্যের জালা বপন করুন্। তৎপর ষাইট দিনের জালা হইলে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে, ঐ সব বাওয়া জমিতে জল বাঁধিয়া বিশেষরূপে চাষ করিয়া তাহা রোপণ করিবেন এবং পৌষ ও মাঘ মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জল দিবেন। ঐ ধান মাঘ ও ফাল্গুন মাস মধ্যে সুপক্ক হইবে। তখন বেশ আনন্দের সহিত ঝড়-বৃষ্টিবিহীন সময়ে তাহা কাটিয়া গোলা-জাত করিয়া লইবেন। এই অভিনব ফসলের অন্য কোনও প্রকার ভয় নাই,—ঝড়, বন্যা, জল, বর্ষা কিছুরই আশঙ্কা নাই। প্রতি বিঘায় ১৫/ মণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু সাবধান—

"জালা ষাইট্ রোপণ নব্বই
কাঁড়ি ভবে ধান থুই।"

প্রবাদটী যেন মনে থাকে। ভাদ্র মাসে ধান্যের চাবা না জন্মাইলে কখনই মাঘ মাসে ধান্য পাকিবে না এবং অপবিপক্ক জালা রোপণ করিলে ভালরূপ শস্যও উৎপন্ন হইবে না। ষাইট দিনের জালাই রোপণ করা বিধি। সর্ব্বপ্রকার ধান্য সম্বন্ধেই এই নিয়ম সুপ্রশস্ত। এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ধান্যক্ষেত্রে জল রক্ষা করিবে। যথা—

"আশ্বিনে কার্ত্তিকে চৈব ধান্যস্য জলরক্ষণম্।
ন কৃতং যেন মূর্খেণ তস্য কা শস্যবাসনা॥"

জল না রাখিলে শস্যের বাসনা বৃথা।

এক্ষণে আমরা গো-ঘাস সম্বন্ধেও নিঃসন্দিহান হইয়া বলিতেছি, ঐ সব বোর জমির ধান্য কাটিয়া নেওয়ার পর হইতে ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বহু পরিমাণ ঘাস উৎপন্ন হইবে এবং তাহা বর্ষাকালে আরও বৃদ্ধি পাইবে, তদ্দ্বারাই সমস্ত গোগণের প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ হইবে। আর খাদ্যাভাবে মড়ক জন্মিতে পারিবে না।

আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ দ্বারা যদি একটী কৃষক ও একটী গোও খাদ্যলাভে সমর্থ হন, তবে আমরা সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব। ধান্যের চাষ ও উৎকর্ষ সাধনবিষয়ে বারান্তরে বিশদরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

সম্পাদক

অহল্যা।

(প্রতিবাদ)

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রকাশিত বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাসের "আর্য্য-গৌরবে" অহল্যা-শীর্ষক প্রবন্ধে ইতিহাস পুরাণের ইতি-বৃত্ত প্রায়ই মিথ্যা এবং রূপক অলঙ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা প্রবন্ধলেখকের সম্পূর্ণ ভ্রম। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিদের বাক্যে অবিশ্বাস করা যুগমাহাত্ম্য ; হিন্দু-শাস্ত্রে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, এবং আমরা সমস্ত শাস্ত্র দেখি না বলিয়া এ সমস্ত সন্দেহ হইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি পত্রিকায় এরূপ প্রবন্ধ বাহির করেন, তবে অনেকেই কুসংস্কারাপন্ন হইতে পারে বলিয়া প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

১। অহল্যা গৌতম-শাপে পাষাণদেহ লাভ করিয়া-ছিলেন। ইহা যদিও বাল্মীকি রামায়ণে স্পষ্ট লিখিত হয় নাই, তথাপি অন্যান্য গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র বহু বিস্তৃত, সকলের পক্ষে তাহার সমস্ত অংশের পর্য্যালোচনা করা একরূপ অসম্ভব। কোনও আখ্যায়িকা কোনও এক গ্রন্থে না থাকিলেই যে তাহা প্রমাণশূন্য হইবে এরূপ হেতু নাই। যে কথার কিয়দংশ বাল্মীকি রামায়ণে

সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, তাহার অবশিষ্টাংশ অনেক স্থানই অধ্যাত্মরামায়ণাদিতে আবার বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ যে সকল কিংবদন্তি চলিয়া আসিতেছে, অনুসন্ধান করিলে তাহার মূলে কোনও না কোনও আকর গ্রন্থে অবশ্যই প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে, "ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"।

বাল্মীকি-রামায়ণ যদি প্রমাণ হয়, তবে বেদব্যাসাদিপ্রণীত অধ্যাত্মরামায়ণাদিও অবশ্যই প্রমাণ হইবে।

অহল্যার পাষাণ হওয়া এবং ইন্দ্রের সহস্রযোনি প্রাপ্ত হওয়ার বৃত্তান্ত অধ্যাত্মরামায়ণের আদিকাণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে ২০—২৮ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

"একদা মহর্ষি গৌতম গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, ইন্দ্র তাঁহারই বেশে কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক অহল্যার ধর্ম্মনাশ করিয়া সত্বর পলায়ন করিতেছেন, সেই সময়ে মুনিও স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং ইন্দ্রকে গৌতমরূপে গমন করিতে দেখিয়া সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রে দুষ্টাত্মন্! পামর! কে তুই আমার রূপ ধারণ করিয়াছিস্? সত্য বল, নতুবা নিশ্চয়ই এখনই ভস্ম করিব।" ইন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমি দেবরাজ; কামপরতন্ত্র হইয়া নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি; আমাকে ক্ষমা করুন।" ক্রোধতাম্রাক্ষ গৌতম অমরেন্দ্রকে শাপ দিলেন, "রে যোনিলম্পট! দুষ্টাত্মন্! তুমি সহস্র ভগযুক্ত হও।" দেবরাজকে এইরূপে অভিশপ্ত করিয়া গৌতম সত্বর

স্বীয় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, অহল্যা কৃতাঞ্জলি-পুটে ভয়ে কাঁপিতেছেন। গৌতম কহিলেন, "রে দুষ্টে! দুর্ব্বৃত্তে! তুই পাষাণময়ী হইয়া এই আশ্রমে থাক্। নিরাহারে বাত, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিয়া দিবারাত্র পরম তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক হৃদয়স্থ পরমেশ্বর রামচন্দ্রকে একাগ্র মনে ধ্যান কর্।"

কদাচিন্মুনিবেশেন নির্গতে গৌতমে গৃহাৎ।
তাং দর্শয়িত্বা নিরগাৎ ত্বরিতং মুনিরপ্যগাৎ ॥ ২১
দৃষ্টায়াস্তং স্বরূপেণ মুনিঃ পরম কোপনঃ।
পপ্রচ্ছ কস্ত্বং দুষ্টাত্মন্ মম রূপধরোঽধমঃ ॥ ২২
সত্যং ব্রূহি নচেদ্ভস্ম করিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
সোঽব্রবীদ্দেবরাজোঽহং পাহি মাং কামকিঙ্করং ॥ ২৩
কৃতং জুগুপ্সিতং কর্ম্ম ময়া কুৎসিতচেতসা।
গৌতমঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ শশাপ দ্বিজাধিপং ॥ ২৪
যোনিলম্পট দুরাত্মন্ সহস্রভগবান্ ভব।
শাপ্ত্বা তং দেবরাজানং প্রবিশ্য সাশ্রমং দ্রুতং ॥ ২৫
দৃষ্ট্বাহল্যাং বেপমানাং প্রাঞ্জলিং গৌতমোঽব্রবীৎ।
দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম ॥ ২৬
নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা ॥ ২৭
আতপানিলবর্ষাদি সহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরং।
ধ্যায়ন্তী রাম রামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতং ॥ ২৮

ইত্যাদি—

পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে অহল্যা গৌতমশাপে পাষাণী হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্র অনন্তযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

শাপদগ্ধা পুরা ভর্ত্রা রাম শক্রাপরাধতঃ।
অহল্যাখ্যা শিলা জজ্ঞে শতলিঙ্গী কৃতঃ স্বরাড়্॥

যদ্যপি বাল্মীকি রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে "তুমি ভস্ম-মধ্যে থাক," অধ্যাত্মরামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে "তুমি শিলা-দেহ লাভ কর"। তথাপি এই উক্তিদ্বয়ে কোন বিরোধ নাই। শিলাময়ী মূর্ত্তি ভস্ম মধ্যে থাকিতে কোন বাধা নাই, বরং যজ্ঞ-ভূমিতে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপ ইন্দ্রের সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, বাল্মীকি রামায়ণোক্ত ইন্দ্রের মুষ্কপতন, অধ্যাত্মরামায়ণ ও পদ্মপুরাণোক্ত সহস্র ভগপ্রাপ্তি ইহাও পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। সহস্র ভগপ্রাপ্তি ও মুষ্কপতন উভয়ই একদা হওয়া পক্ষে বাধা নাই।

রাবণের দশস্কন্ধ, বিংশতি বাহু ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্র বাহু সম্বন্ধেও কোন বিপ্রতিপত্তি আছে বলিয়া দেখা যায় না।

শাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের সত্যতা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হওয়াই সঙ্গত। লৌকিক যুক্তি অনেক স্থলেই দুষ্প্রবেশ্য নিগূঢ় তত্ত্বের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে পরাভূত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ রাবণের বিংশতি ভুজ ও দশস্কন্ধ যদি কাল্পনিক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে অধ্যাত্মরামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৫ অধ্যায়ের উক্তি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সেখানে উক্ত আছে যে, ৪২—৪৪ শ্লোক।

দৃষ্ট্বা রাবণমাসীনং মন্ত্রিভিঃ পরিবেষ্টিতং।
শশাঙ্কার্দ্ধনিভেনৈব বাণেনৈকেন রাঘবঃ॥
শ্বেতচ্ছত্রসহস্রাণি কিরীটদশকং তথা।
চিচ্ছেদ নিমিষার্দ্ধেন তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥

রাম নিমিষার্দ্ধ মধ্যে এক বাণ দ্বারা রাবণের সহস্র শ্বেতচ্ছত্র, এবং দশটী কিরীট ছেদন করিলেন। এস্থলে রাবণের এক মুণ্ড হইতে দশটী কিরীট ছেদন অযৌক্তিক হইয়া পড়ে।

বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ৯ম সর্গে, অদ্ভুত রামায়ণ ১৭শ সর্গে এবং অগ্নিপুরাণে 'বরাহপ্রাদুর্ভাব" নামকাধ্যায়ে রাবণের দশগ্রীব এবং বিংশতি বাহুর বিষয় এমন ভাবে উক্ত হইয়াছে যে, সেখানে রূপক অলঙ্কারের কল্পনা হইতে পারে না।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্র বাহুও রূপক বলিয়া ধরা যায় না, যেহেতু ব্রহ্মপুরাণ ১৩শ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, সহস্র বাহুদ্বারা নর্ম্মদার জল অবরুদ্ধ করিয়া রমণীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেন। যদি সহস্র বাহুর শক্তি-যুক্ত দুই বাহুর দ্বারা নর্ম্মদার জল রুদ্ধ করা হয়, তবে সেই দুই বাহু কত স্থূল এবং তাহার পরিমাণ কত বিস্তৃত ছিল তাহার ধারণা লৌকিক বুদ্ধির অতীত। বৃহৎ নদীর বেগরোধযোগ্য স্থূল বাহুদ্বয় যাহার দেহে সমাবেশ হয়, উক্ত দেহে সহস্র বাহুর স্থানেরও সমাবেশ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ইহার প্রমাণের জন্য যদি শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, তবে সহস্র বাহুর প্রমাপক শাস্ত্রবচন অবলম্বনীয় না হইবে কেন?

মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৮শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে পরবীরহা ভার্গব, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পরিঘসন্নিভ সহস্র বাহু নিশিত ভল্ল দ্বারা ছিন্ন করিয়াছিলেন। বেদব্যাস—

"বাহূন্ পরিঘসন্নিভান্" এই বহু বচন দ্বারা বাহুর বহুত্ব, এবং বৃহত্ব প্রতিপাদন করিয়াও "সহস্রসম্মিতান" এই পদের উপাদান করিয়াছেন যথা—

"চিচ্ছেদ নিশিতৈ র্ভল্লৈর্ব্বাহূন্ পরিঘসন্নিভান্।
সহস্রসম্মিতান্ রাজন্ প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ॥ ২৪

যদি বহু পদ সহস্র বাহুর শক্তিশালিত্বে উপচরিত হইত তবে সহস্রসম্মিতান্ এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইত না।

মানবশক্তি দেখিয়া পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবশক্তির অনুমান হইতে পারে না। যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, তাঁহার ইচ্ছায় গণেশের গজমুণ্ড ও ইন্দ্রের মেষবৃষণ প্রাপ্তি ইত্যাদি কিছুই অসম্ভব নহে। ইদানীং বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সাধারণের বুদ্ধিতে সে সকল অদ্ভুত ও অসম্ভব হইলেও প্রকৃত পক্ষে সত্য ঘটনা। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতে উন্নতি দ্বারা জীবান্তরের দেহ হইতে আনীত চক্ষুরাদি দ্বারা তত্তৎকার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। এ সমস্ত ঘটনা যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদের বিশ্বাসযোগ্য না হওয়াই সম্ভব; কিন্তু ইহা শিক্ষিত সমাজের অবিশ্বাস্য নহে। প্রবন্ধলেখক পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের বহু প্রাচীন মতবাদের অনুবাদ করিয়াছেন; অহল্যা, ইন্দ্র, সহস্রলোচন

প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনাদিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিশ্বাসী আস্তিক হিন্দুগণ সে সকল ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহেন।

অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই শেষ করা গেল, আবশ্যক হইলে কালান্তরে বিস্তারিত সমালোচনা করা যাইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শর্ম্ম স্মৃতিতীর্থস্য।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

"গো-ধন"—ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রের কথা—যথার্থ হিন্দুর কথা—জ্ঞানবান্ মানবের গভীর গবেষণার কথা—গো ব্যতীত আর ধনের আবশ্যকতা কি? গো দ্বারা সব ধনই লাভ হইতে পারে। গো-সেবায় গোলোকে বাস হয়—ইহলোকে ধনের অভাব দূর হয়; গব্য সেবনে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। গো মানবের পিতা মাতা স্বরূপ—জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ। গ্রন্থকার নানাবিধ শাস্ত্র হইতে তাহা দেখাইয়া আজকালের ভ্রমান্ধের চক্ষের খোলস—হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই যাঁহারা দীর্ঘজীবন ও অসীম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই যথাশাস্ত্র গো-সেবা ও গো-

দুগ্ধাদি সেবন করিয়াছেন। গোদুগ্ধাদি সেবনে কি প্রকারে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় তাহাও দেখুন—

"দুগ্ধভোজী পঞ্চশতী সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ।
ক্ষীরেণ মধুনা বাপি শতায়ুঃ খণ্ডদুগ্ধভুক্॥
মধ্বাজ্যশুণ্ঠীং সংসেব্য পলং প্রাতঃ স মৃত্যুজিৎ।
বলীপলিতজিজ্জীবেন্মাণ্ডকীচূর্ণদুগ্ধপাঃ॥
উচ্চটা মধুনা কর্ষং পয়ঃপা মৃত্যুজিন্নরঃ।
মধ্বাজ্যৈঃ পয়সা বাপি নির্গুণ্ডী রোগমৃত্যুজিৎ॥
মধুনাজ্যং ততস্তদ্বচ্ছতা বর্ষা রক্তঃ ফলম।
ক্ষৌদ্রাজ্যৈঃ পয়সা বাপি মৃত্যুজিন্মুষলীপলম্॥

*　　*　　*　　*

রুদন্তিকাজ্যমধুভুক্ দুগ্ধভোজী চ মৃত্যুজিৎ।
কর্ষচূর্ণং হরীতক্যা ভাবিতং ভৃঙ্গরাড্রসৈঃ॥
ঘৃতেন মধুনা সেব্যং ত্রিশতায়ুশ্চ রোগজিৎ॥
বারাহিকা ভৃঙ্গরসং লৌহচূর্ণং শতাবরী।
সাজ্যং কর্ষং পঞ্চশতী কার্ত্তচূর্ণং শতাবরী॥
ভাবিতং ভৃঙ্গরাজেন মধ্বাজ্যৈস্ত্রিশতী ভবেৎ।
তাম্রসূতং সূততুল্যং গন্ধকঞ্চ কুমারিকা॥
রসৈর্বিমৃজ্য দ্বে গুঞ্জে সাজ্যং পঞ্চশতাব্দবান।
অশ্বগন্ধা পলং তৈলং সাজ্যং খণ্ডং শতাব্দবান॥
পলং পুনর্ণবাচূর্ণং মধ্বাজ্যপয়সা পিবন্॥
অশোকচূর্ণস্য পলং মধ্বাজ্যপয়সার্ত্তিনুৎ॥

তিলস্য তৈলং (১) সমধু ন স্যাৎ কৃষ্ণকচঃ শতী।
কর্ষমক্ষং সমধ্বাজ্যং শতায়ুঃ পয়সা পিবন্॥
অভয়ং সগুড়ং জগ্ধা ঘৃতেন মধুরাদিভিঃ।
দুগ্ধান্নভুক্ কৃষ্ণকেশোঽহরোগী পঞ্চশতাব্দবান্॥
পলং কুষ্মাণ্ডিকাচূর্ণং মধ্বাজ্যপয়সা পিবন্।
মাসং দুগ্ধান্নভোজী চ সহস্রায়ুর্বিরোগবান্॥
শাল্মকচূর্ণং ভৃঙ্গাজ্যং সমধ্বাজ্যং শতাব্দকৃৎ॥” অঃ পুঃ।

দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত কি কি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মানব শত ও সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতে পারে, উপরে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে লোকে দুগ্ধাদি পান করিয়া সহস্রাধিক বৎসর জীবিত থাকিতেন। প্রকৃতপক্ষে গো-ই দেবতা (গম্+ডো), গো শব্দেই জগৎ বুঝায়; চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, জল, জ্যোতিঃ, চক্ষুঃ, মাতা, দিক্, পাবনী, স্বর্গ ও কল্যাণী প্রভৃতিই গো শব্দের অর্থ; সুতরাং জগতে যাহা যাহা শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণপ্রদ, তাহাই গো। এই সর্ব্বমহিমাপ্রদ গো-র জন্যই গ্রন্থকার বহুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অদম্য উৎসাহে গ্রন্থখানা প্রচার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পরম উপকারসাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই শুভ চেষ্টাদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য ও সমাজের একাঙ্গ পূরণ করিয়াছেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদ, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি

(১) পাঠান্তর—“নিম্বস্য তৈলং” অঃ পুঃ।

সংস্কৃত গ্রন্থ, বহু বাঙ্গালা ও ইংরেজী গ্রন্থ হইতে প্রাচীন সাহিত্যে গোজাতির উচ্চস্থান দেখাইয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থকার আর্য্য-গৌরবে প্রথম গোরক্ষণ নামক ক্রমশঃ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হইতেই এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই গ্রন্থে আর্য্য-ঋষিদের গো-প্রীতি ও গো-ভক্তি এবং গো-বাৎসল্য বিশদরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু ইয়োরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও এসিয়ার প্রধান প্রধান জাতিদের গো-প্রীতি, গো-পালন ও গো-উন্নতির বিষয়ে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। আইন আকবরী হইতে মুসলমান সমাজের সম্রাট্ দিল্লী-শ্বর আকবর সাহেবের গো-প্রীতি ও গো-ভক্তি দেখাইয়া দিয়া সমস্ত বাঙ্গালী ও মুসলমান ভদ্রলোকগণের মন গো-পালনে আকৃষ্ট করিয়াছেন। হিন্দু ভ্রাতাদেরতো জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ব্রত, যজ্ঞ, শুদ্ধি, শৌচ প্রভৃতি কিছুই গোর সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। হিন্দুপরিবারে গোগণ সযত্নে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইলেই সুখশান্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই দেবদুর্ল্লভ গোধনের উপযোগিতা, স্থান, উন্নতি, অবনতি, বিস্তৃতি, পানীয়, বায়ু, খাদ্য, চারণ, পালন, জনন, উৎপত্তি ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে বিশদরূপে আলোচনা হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহী মাত্রেরই গৃহপঞ্জিকার ন্যায় এক একখানি "গো-ধন" গৃহে রাখিলে বিশেষ ফললাভ করিতে পারিবেন।

গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, গ্রন্থকার সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গৃহস্থ—(বৈশাখ—আশ্বিন) ইহার যেমনি আয়তন (ডবল-ক্রাউন ১২ ফর্ম্মা) তেমনি পরিষ্কার ছাপা ও কাগজ, ভিতরেও উপদেশের রত্নখনি। মূল্যও অতি অল্প, উপন্যাস হইলে বার খণ্ডে ১২৲ টাকা হইত। ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ইহার আলোচনা অংশ যেমনি উপাদেয়, মফস্বলের বাণী অংশও তেমনি প্রশংসনীয়, আবার পরিশিস্টভাগও অতি চমৎকার। পরিশিষ্টে "গণিত-জ্যোতিষ" ও "মার্কণ্ডেয়পুরাণম্" এর বঙ্গানুবাদ চলিতেছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণমতেই আমাদের ৺দেবী ভগবতীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে, ইহা পুরাণশ্রেষ্ঠ। মদালসা, বীরা, বৈশালিনী ও মনোরমা প্রভৃতি এক একটী সতী রমণীর উপদেশ পালন করিলে প্রকৃত গৃহস্থ হওয়া যায়। ইহার এক একটী শ্লোক অমূল্য; যথার্থ যোগী ও ধর্ম্মশীল হইতে হইলে ইহার উপদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। ইহার পদ্যানুবাদ "আর্য্যগৌরবের" দেবীভাগবতের পদ্যানুবাদের অনুরূপ, যেন এক হাতের লেখা। পদ্যানুবাদ পাঠ করিতে করিতে চিত্তে যেন কি এক মাধুরী খেলিতে থাকে। ইহা সম্পূর্ণ হইলে দ্বিতীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে।

আশ্বিনের আলোচনা অংশে লেখা আছে (খ) "আজ কালের রেল ষ্টিমারে গতায়াত সত্ত্বেও ধর্ম্মের আচার ব্যবহারানু-

যায়ী চলা যায় কিনা ইহা ভাবিবার বিষয়। আহারের সহিত স্বাস্থ্যের যে কি অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা সকলেই অবগত আছেন। আহারই স্বাস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের মূল ; স্বাস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্যই স্বাধীন চিন্তা উন্মেষ করে।" এই প্রকার মধুর উপদেশ কয়-জন দিয়া থাকেন ? বাস্তবিক "গৃহস্থ" সর্ব্বাংশেই পথভ্রষ্ট অন্ধ বাঙ্গালী বাবুর গৃহসোপান—অস্থিরচিত্ত ধর্ম্মান্বেষীর রত্ন-খনি—জ্ঞানপিপাসুর সুশীতল উৎসস্বরূপ।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ—(বৈশাখ—আশ্বিন) দিন দিন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইতেছে। লোকে এক্ষণে প্রকৃত পথ চিনিতেছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ, প্রকাশক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম-এ, বি-এল, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের যুগপৎ সম্মিলনে ইহাতে মণিকাঞ্চন যোগ উৎপাদন করিয়াছে। আর্য্যাচার, আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যঋষিদের চিকিৎসার গুণগৌরব ইহাতে বিশদভাবে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করিতেছি।

সুরমা—(সাপ্তাহিক) শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত। ইহা আকারে, ছাপার পরিপাট্যে, প্রবন্ধনির্ব্বাচনে, স্বধর্ম্মরক্ষণে ও স্বদেশসেবায় এবং মফস্বলের অভাব অভিযোগ প্রচারে বেশ প্রশংসনীয়।

প্রান্তবাসী—(নেত্রকোণা হইতে প্রকাশিত) ইহা পাক্ষিক। আজকাল অনেকে "বিদেশী," "পরদেশবাসী"

নামেরই আদর করেন। 'প্রান্তবাসী,'. 'আবাসবাসী', 'গৃহবাসী' এ সব নামই আমাদের নিজের। ইহাতে "বঙ্গে গোজাতি" প্রভৃতি প্রবন্ধ বড়ই উপাদেয়। 'নেত্রকোণা'য় অনেক রত্ন আছে। "প্রান্তবাসী" দীর্ঘজীবী হইয়া তাহা আবিষ্কার করুন্।

আমাদের দুর্দ্দশা।

(১)

আমাদের কি ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে—দিন দিন আমরা যে অধঃপাতে যাইতেছি। আমাদের সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম, নীতি, প্রীতি, স্বাস্থ্য, বল, ধন, জন প্রভৃতি সমস্তই যে বিলুপ্ত হইতেছে, তাহা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়, চক্ষু স্থির হয়, মানব-জীবন পশু-জীবন হইতেও অধম বলিয়া পরিগণিত হয়।

মানব একমাত্র ধর্ম্ম ও সত্যবাক্য দ্বারাই পশু হইতে শ্রেষ্ঠ ও সুখী—আমাদের এই পরম পদার্থ দুইটী আছে কিনা তাহাই

ধর্ম্মহীনতা ও অসত্যবাদিতা।

একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। যদি আমাদের এই দুটী গুণ থাকিত তবে আমরা গো, মেষ, মহিষ, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি পশু হইতে সুখী হইতাম; শোক, তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ ও দুঃখ যন্ত্রণাদি দ্বারা প্রাণান্ত-কর কষ্টভোগ করিতে হইত না। অর্থাভাবে আমাদিগকে

গায়ের বস্ত্র ও পেটের ক্ষুধার জন্য ছট্‌ফট করিতে হইত না—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দুরাকাঙ্ক্ষায় আমাদিগকে অর্দ্ধ সহস্রাধিক রাজ বিধানে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে হইত না। আমরা ধর্ম্ম ও সত্যকে ছাড়িয়া দিয়াছি—শুধু স্থূলদেহ পোষণের ও প্রবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দুরাকাঙ্ক্ষায় এবং হিংসাদ্বেষাদি আশু সুখকর মায়ামরীচিকার ঝক্‌মারিতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি! পশুগণ বিনা আয়াসে উদর পূরণ, ইন্দ্রিয় পোষণ ও রোগ নিবারণ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে মিথ্যা, ধনগ্রহণ, ছলনা, চৌর্য্য ও সতীত্বাদি হরণজন্য চেষ্টিত বা দণ্ডিত হইতে হয় না। পশু পক্ষীদের ন্যায় যদি আমাদেরও দেহ পোষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবেই বলিব তাহারাই আমাদের হইতে সুখী। কারণ আমরা জড় দেহ পোষণেও অক্ষম। আমরা এই দেহ রক্ষার জন্যই মিনিটে মিনিটে দীর্ঘ নিশ্বাস ও হা হুতাশ ছাড়িয়া থাকি। বাস্তবিক আমরা নামে মানুষ, কাজে পশু, "নামে গোয়ালা কাজে কাঁজী ভক্ষণ"। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আয়ু দীর্ঘ ছিল—দেহ নীরোগ ছিল—আকাঙ্ক্ষায় নিবৃত্তি ছিল—ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল—সত্যে নির্ভর ছিল—ঈশ্বরে ভক্তি ছিল—বিপদে ধৈর্য্য ছিল—কর্ম্মে আস্থা ছিল—মনে শান্তি ছিল—আত্মায় জ্ঞান ছিল—দীক্ষায় শিক্ষা ছিল। তাই তাঁহারা হা ধন! হা ভাত! হা শীত! হা উষ্ণ!! বলিয়া অস্থির হইতেন না। তাঁহারা ধর্ম্মকে মস্তকে ও সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া ঈশ্বরে নির্ভর দিয়া কাজ করিতেন। সিদ্ধি অসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষার ধার ধারিতেন না,

ফলাফলে সুখ দুঃখের ভাগ চাহিতেন না, তাঁহাদের কর্ত্তব্য নিষ্কাম ছিল। তাই তাঁহারা চিরসুখী। এখন আমাদের সত্য ও ধর্ম্ম দুই-ই চলিয়া গিয়াছে—আমরা কেন্দ্র ও মেরুদণ্ডহীন হইয়া গিয়াছি, আমাদের গন্তব্যের লক্ষ্য স্থির নাই—হাল ঠিক নাই—চিত্তে স্থৈর্য্য নাই—হৃদয়ে ধৈর্য্য নাই—দেহে বীর্য্য নাই—জ্ঞানে ব্রহ্মচর্য্য নাই—কর্ম্মে দার্ঢ্য নাই—কথায় পবিত্রতা নাই—তাই সংসারেও শান্তি নাই।

আমাদের এই প্রকার সর্ব্ববিধ অশান্তি বিনাশের জন্য সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম ও সত্যের আশ্রয় লইতে হইবে। তাহা হইলে সত্বরেই এদুর্দ্দশার অবসান হয়। আমরা যদি ধর্ম্ম ও সত্যকে লক্ষ্য করিয়া চলি, ধর্ম্মের মর্য্যাদা, ধর্ম্মের গৌরব ও ধর্ম্মের আদর করিতে শিখি, তবেই আমাদের সব দুঃখ চলিয়া যায়। ধর্ম্মকে হৃদয়ে রক্ষা করিলে ধর্ম্মই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমাদিগকে মনে মুখে এক হইয়া সর্ব্বদা অতি সন্তর্পণে জগদেকব্রত 'সত্যকে' প্রাণপণে পালন করিতে হইবে। আমরা আগে সত্যে ও ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতে শিখিব, তবেই তাঁহারাও আমাদের হইবেন। যে ব্যক্তি "আমি তোমার" ভগবান্‌কে এই সত্যবাক্য বলিতে পারে, ভগবান্ মহেশ্বরও তৎক্ষণাৎ তাহাকে "আমি তোমার" এই মহৎ বাক্য বলিয়া কোলে লইয়া থাকেন। ঘাত প্রতিঘাত—ভাবনা ধারণা—কায়া ছায়া সর্ব্বদা জীবে জড়ে ঠিক অনুরূপই হইয়া থাকে। তুমি বৃহৎ কুম্ভে বা নদীকূপে কিংবা নির্জ্জনে বিনা বাধায়

যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করিবে, ঠিক তদনুরূপ প্রতিশব্দ তন্মুহূর্ত্তেই শ্রুত হইবে। কায়ার ছায়া অন্যরূপ হয় না। তুমি ধর্ম্মকে যেরূপ ভাবনা কর, ধর্ম্মও তৎক্ষণাৎ তোমাকে সেরূপ ভাবনা করিবেন। ধর্ম্মের মত বিচারক নাই, তোমার মনের ভাব, তোমার ভক্তি, তোমার একাগ্রতা, তোমার ঔৎসুক্য সকলই তিনি জানিতে পারেন। তিনি অবিলম্বে তোমার উপযুক্ত তপস্যার ফল বিতরণ করিবেন। ধর্ম্ম ও সত্যের সর্ব্বাঙ্গ, সুন্দররূপে পালন করিতে পারিলে মানব অমর অজর ও ঈশ্বর হইতে পারেন। ধর্ম্ম-নিবাস-ভারতবাসী আমরা দেব-দুর্ল্লভ হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম হইতেছি। হায়! কি ভয়ানক পরিতাপের বিষয়!

যে ব্যক্তি বা যে জাতি সত্য ও ধর্ম্মের একাঙ্গও আংশিক রূপে পালন করিতে পারেন, তাঁহারাই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকেন। অহিংসাকে আংশিকরূপে আশ্রয় করিয়া পার্ব্বতীয় গহ্বরবাসী অনার্য্য জাতিগণও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বনে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

এই প্রকার আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড ও বোয়র প্রভৃতি জাতিগণ ধর্ম্মাঙ্গের রাজভক্তি, স্বজাতিবাৎসল্য, সত্যপ্রিয়তা, স্বার্থত্যাগ, বিদ্যার্জ্জন ও গুণাদরের আংশিক প্রতিপালন দ্বারাও জগতের উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে ধর্ম্মের কেবল কয়েকটী গুণ প্রতিপালন করিলেই

চলিত না, তাঁহারা ধর্ম্ম ও সত্যের সম্পূর্ণ অবয়বকে প্রতিপালন করিয়া জগতে—এমন কি দেবলোকেও শীর্ষস্থান অধিকার ও অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সে গৌরবের তুলনা হইতে পারে না। আজও হিন্দুরমণীগণ ধর্ম্মের একাঙ্গ সতীত্বব্রত পালন করিয়া স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতের সমস্ত জাতিকে অতিক্রম করত অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া অমর হইয়া যাইতেছেন।

হায়! আমরা সেই পতিপরায়ণা অক্ষয়কীর্ত্তিশালিনী পুর-কামিনীগণের পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্র প্রভৃতি হইয়াও ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে—সত্যের আদর করিতে বিন্দুমাত্রও শিক্ষা করিতে পারি নাই। ধর্ম্ম ও সত্যহীনতায়ই আমাদের আয়ু ক্ষীণ হইতেছে, দেহ রুগ্ন হইতেছে, নরকের পথ প্রশস্ত হইতেছে, —আমরা শতপ্রকার দুঃখের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছি। আমরা জ্ঞান গৌরব, জাতি, কুল, শীল, মান, ব্রত, ধ্যান, পূজা, যম, নিয়ম, জপ, তপঃ, শান্তি, কান্তি, শিক্ষা, দীক্ষা, ভক্তি, শক্তি, রতি, মতি সবই হারাইয়া বসিয়াছি। ঐহিক পারত্রিক উভয় প্রকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি। "ধর্ম্মহীন দেহ কখনও স্পর্শনীয় নহে" —"সত্যহীন জীবন কখনও রক্ষণীয় নহে" এসব সাধুবাক্য-গুলিকে আমরা শ্রবণ করিতে হইলেও বধিরতা অবলম্বন করি। বরং বাঙ্গালীর সত্যহীনতা দুর্ণাম গ্রহণ করিতেও আমরা কুণ্ঠিত হই না। হায় কি পরিতাপের বিষয়! আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ধর্ম্ম ও সত্য পালনে সক্ষম হইতে

পারিতেছি না। ইহা হইতে কলঙ্কের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

"চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" ; আমরাও এমনটী হইয়া দাঁড়াইয়াছি যে, আমরা ধর্ম্মের কথা একদাই শুনিতে ইচ্ছা করি না। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ধর্ম্মের সেবা করিতেই হইবে। এই যে আমাদের দেহ চিররুগ্ন, ইহার সুস্থতা সম্পাদন করিতে হইলেও ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। উপবাস ও সংযম রক্ষা করিতে হইবে। 'উপবাস' ধর্ম্মের একটী অঙ্গ, অথচ ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নিরাকৃত হয়। বন্য পশু-পক্ষিগণও রোগ হওয়া মাত্রই সুদীর্ঘ উপবাস দ্বারা কঠিন কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই চিকিৎসাবিদ্ ঋষিগণ রোগ হওয়া মাত্রই উপবাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। পৃথি-বীর কোনও জাতিই ঋষিদের অপেক্ষা উন্নত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। যদি কোনও জাতি (সম্ভবতঃ আমেরিকান্) জ্ঞান-লাভে কিছু অগ্রসর হয়, তবে ঋষিদের পথই অবলম্বন করিবে ইহা ধ্রুব সত্য। আধুনিক সভ্যতা অনুসারে উপবাসের স্থলে ঘন ঘন আহার ব্যবস্থা করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এমন কি গোড়া হিন্দু ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বাড়ীতেও রবিবারে— একাদশী তিথিতে নিমন্ত্রণের পালা পড়িয়া থাকে। "আমাদের সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা।" এখন সর্ব্বত্রই নূতন ব্যবস্থা— নূতন বিধি ঢুকিয়াছে। বাস্তবিক আমাদের আর কথা বলিবার

স্থান নাই। আমাদের চির উপবাস এখন কবি-কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। আমরা ফলমূলাশী মুনিগণকে দীর্ঘজীবী বলিয়া আর বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় আহার না করিলেই প্রিয় প্রাণকে হারাইয়া বসিব, এই ধারণাই দৃঢ় করিয়া বসিয়াছি। তাইত জাহাজে রেলে আরোহণ করিয়া ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়া দর্শন করিয়া মাত্রই উদর-ইঞ্জিনেও ভাত ও রুটি-রূপ কয়লা ঢালিয়া দিয়া থাকি। অপিচ ইঞ্জিনের কয়লার বাঁধা নিয়ম আছে, একটু বেশী দিবার সাধ্য বা নিয়ম নাই। আমাদের উদর-ইঞ্জিনের সে নিয়ম নাই, যত পারি ততই দিই ; কিন্তু ভাবি না,অধিক কয়লায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ইঞ্জিন নষ্ট হইয়া পড়িবে। বাস্তবিক কাজেও তাহাই ঘটে। আজকাল উদর-ইঞ্জিনে আর বড় আগুন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাইত প্রায়ই শুনিতে পাই ১০৲ দশ টাকার কম দরের চাউল আমরা কখনও আহার করি না। ধন্য বাহাদূরী ! ধন্য বাবুগিরী !! প্রকৃত পক্ষে শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে প্রতি তিন দিন অন্তর একদিন নির্জ্জল উপবাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা অক্ষম বা নূতন উপবাসার্থী, তাঁহারা জলপান করিতে পারেন। জল উপবাসের পঞ্চমাঙ্গ। এক কাপড় সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে যেরূপ মলিন ও অকর্ম্মণ্য হয়, মধ্যে মধ্যে, এমন কি প্রত্যহ ধৌত করা যেরূপ আবশ্যক, তদ্রূপ উদরকে উপবাস দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধৌত করা নিতান্ত প্রয়োজন। উপবাস দ্বারা কেবল উদর নয়, সমস্ত দেহ—সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ পবিত্র ও নির্ম্মল হয়।

কোনও প্রকার রোগ হওয়া মাত্রই নির্জ্জল উপবাস করিলে সত্বর রোগ নিবৃত্ত হইয়া ২।৩ দিন পরেই শরীর সবল হইয়া উঠে। বৎসরে অন্ততঃ দুইমাস উপবাস করিলে পরমায়ু অকালে ক্ষয় হইতে পারে না। আমরা যে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে আদরের শিশু ও গর্ভিণীগণকে অকালে কাল-কবলে বিসর্জ্জন করিতেছি, ইহার অধিকাংশই আহারের কুফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। বালক-বালিকাগণ যত ইচ্ছা খাইতে পারে, আর 'গর্ভিণীকে দুই জনের শরীর পোষণ করিতে হইবে'—এই সব ভ্রম ধারণায় অধিক মাত্রায় আহার করিতে দিয়া অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় মাত্র। মনে রাখা উচিত "ঊনা ভাতে দোনা বল, অতি ভাতে রসাতল।" এই প্রবচন দ্বারাও আমরা দেখিতে পাই অল্পাহারই দীর্ঘজীবী হওয়ার মূল কারণ।

আমাদের শাস্ত্র ১ম চির-উপবাস, ২য় ফল জল আহার, ৩য় লবণাদি রুক্ষাহার, ৪র্থ অন্নাদি ভোজন, ৫ম তৈলাক্ত আহার, ৬ষ্ঠ মাংসাদি আমিষ ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

১ম ব্যবস্থা দেবতা ও দেবকল্প ঋষিগণই পালন করিয়াছিলেন। অন্যান্যগুলি মানবেও ব্যবহার করিতে পারেন। আমরাও যদি সুস্থ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে চাই, তবে আহার গ্রহণে ক্রমোন্নতি লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অত্যাহারই পতনের মূল কারণ। যদিও ইংরেজগণ বার বার আহার করেন বলিয়া আমাদের মত বাঙ্গালী বাবুরা ধোঁয়া ধরিয়া বহু আহারের বিধি দেখাইতে চান, তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি—সিংহ করি-মস্তক

ভোজন করিতে পারে, মেষশাবক একটী পতঙ্গও জীর্ণ করিতে অক্ষম। আমরা একটী ইংরেজ বিচারককে ছয় মণ লোহার সিন্ধুক স্থানান্তরিত করিতে দেখিয়াছি। কয়টী বাবু দ্বারা ছয় মণ সিন্ধুক স্থানান্তরিত হইতে পারে? ইহাই একবার ভাবিয়া দেখিয়া আহারের ব্যবস্থাটা করিলেই ভাল হয়। রুগ্নদেহীর উপবাসই পরম ঔষধ। যিনি যে পরিমাণে উপবাস পালন করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভ করিবেন নিশ্চয়। আমাদের দেশের সাধু, ব্রহ্মচারী, বিধবা, সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ, ব্রতপরায়ণ কৃষক, নমাজ রোজাধারী মুসলমান ও ফকিরগণ প্রায়ই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। ইঁহাদের অধিকাংশই সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। একটী সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতেও বিনাকল্পনায় আপনাপনি অন্য সদ্‌গুণ আসিয়া থাকে। সংযম দ্বারা রোগ ও বহু পাপচিন্তা নিবারিত হয়, ইন্দ্রিয়গণ প্রশমিত হয়, মন কার্য্যক্ষম হয়, জটিল ও যোগ সাধনার পথ প্রশস্ত হয়। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রয় লইলে আমাদের দুর্দ্দশা উপশমিত হয়। আমাদের বাবুগিরী ও বিলাসিতা একদম রহিত হইয়া যায়; আমাদের অর্থাভাবের লাঘব হয়, জড়তা উদাসীনতা ও কর্ম্মে অবসাদ দূরীভূত হয়। আমরা যেমনটী ছিলাম তেমনটী হইতে পারি, আমরা ঘরের ছেলে ঘরে আসিতে পারি। তাই বলি নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১। আমাদের ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা এবং তাহার

গভীর আলোচনা ও পরীক্ষা করা আবশ্যক। ধর্ম্মহীন হইলে সর্ব্বস্বহীন হইতে হয়, জাতি লোপ পায়।

২। জল, বায়ু, অগ্নি, অন্ন ও পূজোপকরণাদি অতি নির্ম্মল ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আমরা যেন ভ্রমেও তাহা দুর্গন্ধ অথবা অপবিত্র বস্তু দ্বারা দূষিত না করি।

(ক) আমরা যেন কখনও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু, জল ও খাদ্য স্পর্শ না করি।

(খ) আমাদের শাস্ত্রাচারে বিশ্বাস করিতে হইবে।

(গ) শুক্র বিক্রয় মহাপাপ, এই শাস্ত্রাদেশ সর্ব্বাগ্রে পালনীয়।

৩। প্রাচীন আচার, সন্ধ্যা বন্দনা ও সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে। যোগে মন্ত্রে দীক্ষায় বিশ্বাস করিতে হইবে।

৪। পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে। আত্মগোপন, ছলনা, হিংসা, নিন্দা ও অহঙ্কার যেন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে।

৫। বিনা আয়াসে লব্ধ দেশীয় দ্রব্যের সম্মান করিতে হইবে।

৬। বৃদ্ধ ও প্রাচীনের কথার মূল্য বুঝিতে হইবে। প্রভাতী সমীরণ ও সান্ধ্য প্রান্তরশোভা উপভোগ করিতে হইবে। তজ্জন্যই গ্রামে গ্রামে পতিত মাঠ রাখিতে হইবে।

৭। বিলাসিতায় ও বাবুত্বে মগ্ন তরণীকে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশ ও কালোপযোগী বসন পরিধান করিতে হইবে।

৮। গোপালন ও কৃষিকার্য্যকে মুখ্য করিয়া চলিতে হইবে। গো ও কৃষক মানব-সমাজের শিরোভাগ বুঝিতে হইবে।

৯। জন্মভূমি পল্লীগ্রামকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে হইবে। বৎসরে অন্ততঃ এক ঋতু কাল তথায় নিজে বাস করিতে হইবে।

১০। হুজুরে বাবু, সহরে মেয়ে সাজিলে চলিবে না। ছোট বড় সকলকেই ভালবাসিতে হইবে।

১১। আহারে বিহারে সংহিতাকারের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। মিতাহারী ও মিতব্যয়ী হইতে হইবে।

১২। রাজ-ভাষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-ভাষা ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হইতে হইবে।

১৩। রাজাজ্ঞায় ও রাজসেবায় এবং রাজবিধিপালনে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। রাজাকে দেবতাসদৃশ মান্য করিতে হইবে।

১৪। তুমি যেমন, বেশভূষাদিও তোমার তেমন হওয়া উচিত। ইহাতে বড়র অনুকরণ নিষিদ্ধ।

১৫। সঞ্চয় রাখিয়া ব্যয় করিতে হইবে। বৃথা বাক্যব্যয় করাও দূষণীয়।

১৬। নিজের দেহ, মন ও চরিত্রকে সংস্কার করিতে হইবে। চরিত্রবান্ পুরুষই দেবতা, ইহাই মূলমন্ত্র জ্ঞান করিতে হইবে।

১৭। ভক্তি, শ্রদ্ধা, জ্ঞান, প্রীতি, প্রেম, শৌচ ও সদাচারকে দেহের অলঙ্কার করিতে হইবে।

১৮। আহারে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। যথায় তথায় যখন তখন যাহার তাহার অনুরোধে ঢেকি ভক্ষণ করা বিধেয় নহে।

১৯। অন্যের অন্ন, বস্ত্র, জল, পত্নী, ভ্রমেও গ্রহণ করা বিধেয় নহে। খাদ্যাখাদ্য বিচার করা অত্যাবশ্যক। এতদ্ব্যতীত আরও বহুপ্রকারে আমাদিগকে অতি সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। নতুবা কখনও আমরা সংসার-সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতে পারিবই না।

(ক্রমশঃ)

কিশোরগঞ্জ শ্যামসুন্দর দেবের আখড়ার ইতিহাস

(৩৫৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্রজবল্লভ গোস্বামী, অকিঞ্চন ঠাকুর, ও উমর খাঁ তিন জনে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। ব্রজবল্লভ গোস্বামী কহিলেন, "উমর খাঁ, আমি আর অকিঞ্চন উভয়ে এক গুরুর শিষ্য, অকিঞ্চন আমাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করে; আমার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করে। আমি তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি; আমরা উভয়ে এক সঙ্গে গুরু-পাট হইতে বাহির হইয়া এই নিবিড় অরণ্যে উপস্থিত হই। এখানে

তোমাকে আর রাখালবালককে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হই। তোমার দর্শন সুলভ, রাখাল বালকের দর্শন তার ইচ্ছাধীন। কিন্তু যখন কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারি, রাখাল বালক আসিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেয়। তোমাদের উৎসাহে, শ্যামসুন্দর দেবের ইচ্ছায়, এখানে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহুলোক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। নিবিড় অরণ্য আজ জনকোলাহলে পূর্ণ; গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থাদি পাঠে, সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তনে এই স্থানে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম আজ সশরীরে বর্ত্তমান। যাহাতে এই ধর্ম্মের সেবা সুনিয়মে পরি-চালিত হয়, যাহাতে এই ধর্ম্মের জন্য আমরা ভগবানের নিকট কলঙ্কিত না হই, তাহার উপায় নিরূপণ জন্যই তোমাদিগকে ডাকিয়াছি। শান্তিরাম আমার জ্যেষ্ঠ শিষ্য, আমি ইচ্ছা করিয়াছি তাহার উপর শ্যামসুন্দর দেবের সেবার ভার অর্পণ করি। তোমাদের মত হইলেই কার্য্য করিতে পারি।" উমর খাঁ কহিলেন, "প্রভো! আমি সামান্য ফকির, আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; আপনার ধর্ম্মবলে আজ কত শত নাস্তিক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। কত দস্যু আপনার তেজোময় মূর্ত্তি দর্শনে দস্যুতা পরিত্যাগ করিয়া পরম পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আপনি বৈষ্ণব হইয়াও আজ আমার মত দরিদ্র মুসলমান ফকিরকে বন্ধু বলিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং পরম স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। ধন্য আপনার মহিমা, ধন্য আপনার ধর্ম্ম; ধন্য আপনি, আমি আজ বিধর্ম্মী মুসলমান

হইয়াও আপনার মহিমায় মুগ্ধ। আপনার ধর্ম্ম হিংসাদ্বেষ-পরিবর্জ্জিত। আপনি যখন এ দেশ পবিত্র কর্তে এসেছেন, তখন আপনার আদেশ সুচারুরূপে প্রতিপালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য কাজ। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত। শান্তিরাম শান্তির প্রতিমূর্ত্তি, গাম্ভার্য্যে তেজে সাহসে অদ্বিতীয়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে ভক্তিতে আচার ব্যবহারে এই ভার গ্রহণের উপযুক্ত পাত্রই বটে; কিন্তু তাঁহার উদাসীনতার ভাবটাই যেন প্রবল বলিয়া বোধ হয়, তবে আপনার ধর্ম্মের ভাবই উদাসীনতা এই আমার মত।”

তখন অকিঞ্চন ঠাকুর শিষ্যদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। ব্রজবল্লভ কহিলেন, “বৎসগণ, আজ আমি এই দেবালয়ের সমস্ত দেবসেবার কর্ম্মভার শান্তিরামের উপর অর্পণ করিলাম। তোমরা সমস্তে তাহার কার্য্যের সহায়তা কবিবে। বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিবে। যাহাতে শ্যামসুন্দর দেবের মহিমায় মন্দাকিনী স্রোতের ন্যায় চারিদিকের কলুষিত জনগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় তাহাই করিবে। আমাদের ধর্ম্ম যেন সকলেরই ধর্ম্ম হয়। আমাদের ধর্ম্ম জাত্যভিমান-পরিবর্জ্জিত; হিংসা দ্বেষ ঘৃণা যেন এই পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্রতা নষ্ট না করে। নিন্দা যেন এই ধর্ম্মের ছায়া স্পর্শ করিতে না পারে। পবিত্র বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মহিমা যেন দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপী হয়। শ্যামসুন্দর দেবের সেবা পূজাদি যে নিয়মে (১) চলিতেছে

(১) নিয়মাদি পরিশিষ্টে দিব।

তাহার যেন ব্যতিক্রম না হয়। উপযুক্ত শিষ্যের হস্তে সেবার ভার অর্পণ করিয়া নিজের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিও। বন্ধুর কথায়, কিংবা চাটুকারের চাটুকারিতায় ভুলিয়া অযোগ্য শিষ্যের প্রতি এইভার অর্পণ করিয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করিও না। আমার বিশ্বাস, তোমাদ্বারা সেবার কার্য্যাদি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে। তাই আজ তোমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলাম। তুমি ৺সেবায় উন্নতি করিতে পারিবে। আগামী পরশ্ব দিবস তোমাকে অভিষেক করিব।" শান্তিরাম কহিলেন, "প্রভো, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। দাসের এক নিবেদন আছে।" ব্রজবল্লভ কহিলেন, "তোমাদের মতামত নির্ভয়ে বলিতে পার।" শান্তিরাম কহিলেন, "প্রভো, আপনি আমাদের প্রভু, আমরা আপনার দাস; যতদিন প্রভু এখানে আছেন ততদিন আমরা আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব। তবে যদি নিতান্তই এই গুরুভার আমাদের উপর অর্পণ করিতে চান, তাহা হইলে এই ভার কৃষ্ণমঙ্গলের উপর অর্পণ করুন। কৃষ্ণমঙ্গল আমাদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র; তাহার হাতে এইভার ন্যস্ত করিলে দিন দিন উন্নতি করিতে পারিবে। এখন কৃষ্ণমঙ্গলের যে তেজ, যে গাম্ভীর্য্য, যে অমানুষিক ক্ষমতা দেখা যায়, তা আমাদের নাই। দক্ষিণ বাম ভেদ (১) লইয়া তাহাকে যাহা অর্পণ করিলেন সে তাহাই বজায় রাখিল। গুরুর ভুল তাহার সহ্য হইল না। গুরু যা অর্পণ করিলেন তাহাই সে সত্য বলিয়া

(১) পরিশিষ্টে দক্ষিণ বামভেদের বিবরণ দেওয়া যাইবে।

গ্রহণ করিল। আপনি সংশোধন করিতে চাহিলেন, সে তাহা অস্বীকার করিল; বিনীতভাবে কহিল, 'প্রভো, আপনি আমাকে যাহা অর্পণ করিলেন তাহাই সত্য, তাহা ভুল হইতে পারে না। আমি যদি আপনার শিষ্য হইয়া থাকি, তবে এই মতেই দেশ জয় করিব, আপনার শ্রীপদরজ সহায় করিয়া অগ্রসর হইব; কার সাধ্য সে গমনে বাধ প্রদান করে। শ্রীগুরু আমার সহায়।' প্রভুর তা অবিদিত নাই। কি অমানুষিক তেজ! গুরুভক্তির কত শক্তি! ধন্য কৃষ্ণমঙ্গল, তুমিই প্রকৃত গুরুভক্ত; তোমা দ্বারাই এই মহতী সেবা পরিচালিত হইবে। প্রভো! মনের আবেগে অনেক কথা বলিলাম, অযোগ্য শিষ্যের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" ব্রজবল্লভ কহিলেন, "শান্তিরাম, জানি, আমি সব জানি। জানিয়া বুঝিয়া, পরামর্শ করিয়াই আজ তোমার প্রতি সেবার ভার অর্পণ করিয়াছি। তুমি পারিবে কি না তাহাও আমি জানি। তোমাকে আজ আমি যে ভার অর্পণ করিলাম, তাহাতে আমার আর কোন স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব নাই, সুতরাং তাহা আমি কৃষ্ণমঙ্গলকে দিতে পারি না।" শান্তিরাম কহিলেন, "প্রভো, আমাদের দেহ প্রাণ আপনার ঐ অভয় শ্রীপদে বিক্রীত; আপনি ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে বিক্রয়, দান যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আমাদের স্বামিত্ব প্রভুত্ব শ্রীগুরুর শ্রীপদে অর্পিত—" বাধা দিয়া ব্রজবল্লভ কহিলেন, "শান্তিরাম, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য হইলেও আমি যাহা অর্পণ করিয়াছি তাহা আর

ফিরাইতে পারিব না। সুতরাং তোমার সমস্ত যুক্তি, যুক্তিসঙ্গত হইলেও আমি তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমি আবার বলিতেছি, আগামী পরশু তোমাকে ঐ ভার গ্রহণ করিতে হইবে।” সকলেই নীরব। এমন সময় রাখালবালক উপস্থিত। ব্রজবল্লভ কহিলেন, “রাখাল বালক, বহুদিনে কোথা হতে এলে? এত দিন কোথায় ছিলে? এত দিন কেন আস নাই?” রাখাল বালক কহিল, “এত দিন আমাকে ডাক নাই তাই আসি নাই। আজ ডাকিলে তাই আসিলাম। যাক্, আজ তোমাদিগকে এত বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন? কি হয়েছে শীঘ্র বল।” ব্রজবল্লভ কহিলেন, “বালক, তোমার স্বভাব বড়ই চঞ্চল, কথাগুলি আবার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। তুমি কে?” রাখাল বালক কহিল, “আমি রাখাল, আর কি?” ব্রজবল্লভ কহিলেন “তুমি কি ব্রজের রাখাল?”

রাখাল—হাঁ, আমি ব্রজের রাখালই বটি।

ব্রজবল্লভ—তবে তুমি এখানে কেন?

রাখাল—তুমি ব্রজবল্লভ এখানে কেন?

ব্রজবল্লভ—ভগবানের আদেশে।

রাখাল—ব্রজবল্লভ যেখানে সেখানেই ব্রজ। ব্রজবল্লভ ছাড়া কি ব্রজ, না ব্রজ ছাড়া ব্রজবল্লভ? যাক্, তুমি এখান কার কর্ত্তৃত্বভার শান্তিরামের উপর অর্পণ করেছ, শান্তিরাম তা গ্রহণ করতে চায় না; সে বলে কৃষ্ণমঙ্গলকে দাও। তা বেশ, তুমি শান্তিরামকে দিয়েছ। এখন শান্তিরামের উপরই

সম্পূর্ণ স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে। শান্তিরাম এখন আবার কৃষ্ণমঙ্গলকে এই স্বত্ব প্রদান করুক, তাহা হইলেইত সব গোল চুকে যায়। আগামী পরশু ভাল দিন স্থির করেছ, সেই দিন কৃষ্ণমঙ্গলকে অভিষেক কর। যাই এখন সন্ধ্যা হয়ে এলো; গরু নিয়ে এখন গৃহে যেতে হবে। ভেবে দেখ যা বলে যাই, তাতে কোন দোষ হবে না। গুরু শিষ্যের ভাব ঠিক থাক্‌বে অথচ শান্তি-রামের অপূর্ব্ব শান্ত ভাব উজ্জ্বলতম হবে। যেরূপ বলে গেলাম সেই ভাবে কার্য্য কর। তাতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হবে। ভগবান্ কি ভাবে কি কার্য্য কার দ্বারা করান তা তিনিই জানেন। আজ শান্তিরাম এই স্বামিত্ব পরিত্যাগ কর্‌লেও এমন একদিন আস্‌বে যে দিন শান্তিরাম নিজেই এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা কর্‌বে। শুধু শান্তিরাম কেন, ভেকধারী তোমার সমস্ত শিষ্যই এক দিন এক একটী দেবালয় প্রতিষ্ঠা করে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তার কর্‌বে। তবে এখন আসি।” এই বলিয়া রাখাল বালক চলিয়া গেল। ব্রজবল্লভ কহিলেন, “রাখাল বালক যা ব’লে গেল তন্মতেই কার্য্য করা যাইবে; এখন সমস্তই নিজ নিজ কর্য্যে গমন কর।” সমস্ত শিষ্য চলিয়া গেল। অকিঞ্চন কহিলেন, “প্রভো, রাখাল বালক কে?” ব্রজবল্লভ কহিলেন, “রাখাল বালক কে, তা তোমাকে আমি বুঝাতে পারব না। রাখাল বালক অসামান্য মানব; তার প্রখর বুদ্ধিতে আমি মুগ্ধ। যাও, এখন সন্ধ্যা আরতিতে যোগ দাও। সকলেই চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে।

পরিশিষ্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জমা জের— ৪২৭৪।৵০

৫১। মহেশচন্দ্র গুপ্ত
(পত্রিকার মূল্য)— ১॥০

৫২। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী
(লোন আফিসের প্রাপ্য
সুদ)— ৩৪।০

৫৩। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী
(বেঙ্কের সুদ)— ৩৮৸০

৫৪। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী
(৯ জন গ্রাহকের মূল্য
আদায়)— ১৩॥/০

৫৫। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
(ডিঃ বোডের সাহায্য জুলাই
পর্য্যন্ত ত্রৈমাসিক)— ৫৯।৵০

খরচ জের— ১১৫৩॥৴০

১২১। গোপালচন্দ্র দাসের জুন
মাসের বেতন— ৫৲

১২২। শিবনাথ সাহার বাড়ীতে
লোক পাঠাইবার খরচ— ২॥০

১২৩। গ্রাহকের নিকট ভিঃ পিঃতে
পত্রিকা পাঠাইবার খরচ— ৩৲

১২৪। সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থের
"মে" মাসের বেতন— ২০৲

১২৫। "আর্য্য-গৌরব" ছাপার খরচ
সহ মণিঅর্ডার—৪০।৴০

১২৬। বেদ-বিদ্যালয়ের দরজা ৫ খান
প্রস্তুতের খরচ—৩॥০

১২৭। সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থের
জুন মাসের বেতন— ২০৲

১২৮। আষাঢ় শ্রাবণের পত্রিকার
কাপি পাঠাইবার খরচ সহ
রেজেষ্টরী— ॥৵০

১২৯। টেলিগ্রাম এবং চিঠি— ।৴০

১৩০। পত্রিকার জন্য মণিঅর্ডার
সহ ফি— ১০৵০

৫৬। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী
(৮ জন গ্রাহকের মূল্য আদায়)— ১২৷৹

৫৭। হরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
(সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বেঙ্কের ত্রৈমাসিক সুদ)— ৫৮৵৹

৫৮। শিবনাথ সাহা
(মাসিক চাঁদা আশ্বিন)— ১০৲

৫৯। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী
(আর্য্যগৌরবের মূল্য)— ৭৲

১৩১। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের জুলাই মাসের ২২ দিনের বেতন— ১৪৶

১৩২। সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থের জুলাই মাসের বেতন— ২০

১৩৩। রামদয়াল দপ্তরীর জুলাই মাসের বেতন— ২৸৴

১৩৪। পত্রিকা ও পত্র পাঠাইবার খরচ—

১৩৫। বেদবিদ্যালয়ের কাগজাদি খরিদ— ১৫

১৩৬। ডিঃ বোর্ডের ষ্ট্যাম্প ও চিঠি রেজেষ্টরী খরচ— ১

১৩৭। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের আগষ্ট মাসের বেতন—

১৩৮। সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থের আগষ্ট মাসের বেতন—

১৩৯। রামদয়াল দে দপ্তরীর আগষ্ট মাসের বেতন—

১৪১। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের সেপ্টেম্বর মাসের বেতন—২

১৪২। সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থের সেপ্টেম্বর মাসের বেতন—২

১০। রাজেন্দ্রকিশোর রায়— ১০৲

১১। কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী— ২৫৲

১২। শিবনাথ সাহা
মাসিক চাঁদা (কার্ত্তিক)— ১০৲

১৩। বিপিনচন্দ্র গোস্বামী
(ডিঃ বোর্ডের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বরের সাহায্য মণিঅর্ডার ফি বাদে)— ৫৯।৵০

১৪। হরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
(কোঃ বেঙ্কে আমানতি টাকার অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বরের সুদ)— ৫৮৵০

৫৬৭১॥৶০

১৪৪। আষাঢ় শ্রাবণের পত্রিকার রেলভাড়া ও কুলি খরচ – ৩॥০

১৪৫। ঐ পত্রিকা বিলির ১২৪ খানার ডাক খরচ— ৪৸৵০

১৪৬। পত্রিকা প্যাকিং ইত্যাদির জন্য কাগজ— ॥৵

১৪৭। আর্য্যগৌরবের ছাপার বাকী মধ্যে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট মণিঅর্ডার মায় ফি— ১৫৶০

১৪৮। ঐ মণিঅর্ডার— ২০৲

১৪৯। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের অক্টোবর মাসের বেতন— ২০৲

১৫০। ঐ নবেম্বর মাসের বেতন মধ্যে— ১৫৲

১৫১। সতীশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থের অক্টোবর মাসের বেতন— ২০৲

১৫২। ডিঃ বোর্ডের বিল পাঠান ও ছাত্রের নিকট চিঠি লেখার খরচ— ॥৴

১৫৩। বেদ বিদ্যালয়ের কাব্য (ভট্টি, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব) খরিদ— ৬৲

জমা জের— ৪৬৭১৷৷৶০

বাদ খরচ— ১৫৫৪।০

৩১১৭৷৶০

১৫৭। রামদয়াল দে দপ্তরীর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের বেতন— ১২৲

১৫৮। বেদ বিদ্যালয়ের কাগজ কালি ইত্যাদি— ২৲

১৪৮। ১৪৮ নং চেকের মনি-অর্ডার ফি— ।৶০

১৫৫৪।০

মঃ তিন হাজার এক শত সত্তর টাকা সাত আনা মধ্যে তিন হাজার একশত টাকা বেঙ্কে আমানত আছে। অবশিষ্ট সত্তর টাকা সাতআনা তহবিলে আছে।

৯।১।১৪ তারিখের সভায় আয় ধব হিসাব পরিশুদ্ধ বলিয়া মঞ্জুর ।

শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।
৯।১।১৪

মূল্য প্রাপ্তি ।*

৩৯৫ । শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাগচী মুন্সেফ—

৮৮ । ,, মহিমচন্দ্র দাস উকিল—

৬৭ । ,, জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

৬৭০ । ,, গোবিন্দচন্দ্র সাহা—

* গ্রাহকগণের নিকট মূল্য বাকী থাকায় এবং শীতল বাবু স্থানান্তর যাওয়ায় ত সময় মত পত্রিকা বাহির করিতে পারি নাই; ফণ্ডের অর্থাভাবই ইহার মূল কারণ। গ্রাহ . আমাদের এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন এবং তাঁহাদের দেয় মূল্য পরিশোধ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। সকলেই স্মরণ রাখিবেন "আর্য্য গৌরবের" যাবতীয় আয় বেদ-বিদ্যালয়ের কার্য্যে ব্যয়িত হয়। ইহা ব্যক্তিবিশেষের ধন নহে।